~*MASUD RANA SERIES*~

Noro Pichash Part I & II By Kazi Anwar Hossain

মাসুদ রানা

নরপিশাচ

তিনখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওরা তাকে বর্বর আফ্রিকান পদ্ধতিতেই খুন করেছে। সিক যেভাবে চাকা ও মিজম্বিকাজির শয়তানরা পরাজিত উপজাতির শিশুপুরুষদের খুন করত। ছোট্ট মাসুদের দুই গোড়ালি শক্ত করে ধরে পাঁচিলে বাড়ি মেরে খুলি ফাটিয়েছে, পাঁচিলের সাদা গায়ে মগজ লেগে রয়েছে এখনও।

ছোট ছেলেটার উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। খুলি চুরমার হলেও বাপের সঙ্গে চেহারার মিলটা পরিষ্কার ধরা যায়। রানার চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, ধীরে ধীরে সিধে হলো ও।

ভাইটির চেয়ে বোন দুটো বয়েসে বড়। মরিয়মের বয়স দশ আর নাসরিনের প্রায় আট। বিছানার পায়ের দিকটায় নগ্ন পড়ে আছে ওরা, রক্তাক্ত। দু'জনকেই বারবার ধর্ষণ করা হয়েছে।

কোঁপাচ্ছে রানা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তবু মনে মনে এই কথাগুলো উচ্চারণ করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল, 'এর জন্যে যে বা যারাই তোমরা দায়ী হও, তোমাদের মৃত্যু লেখা আছে আমার হাতে। কসম খোদায়!'

সেবা বই

প্রিয় বই

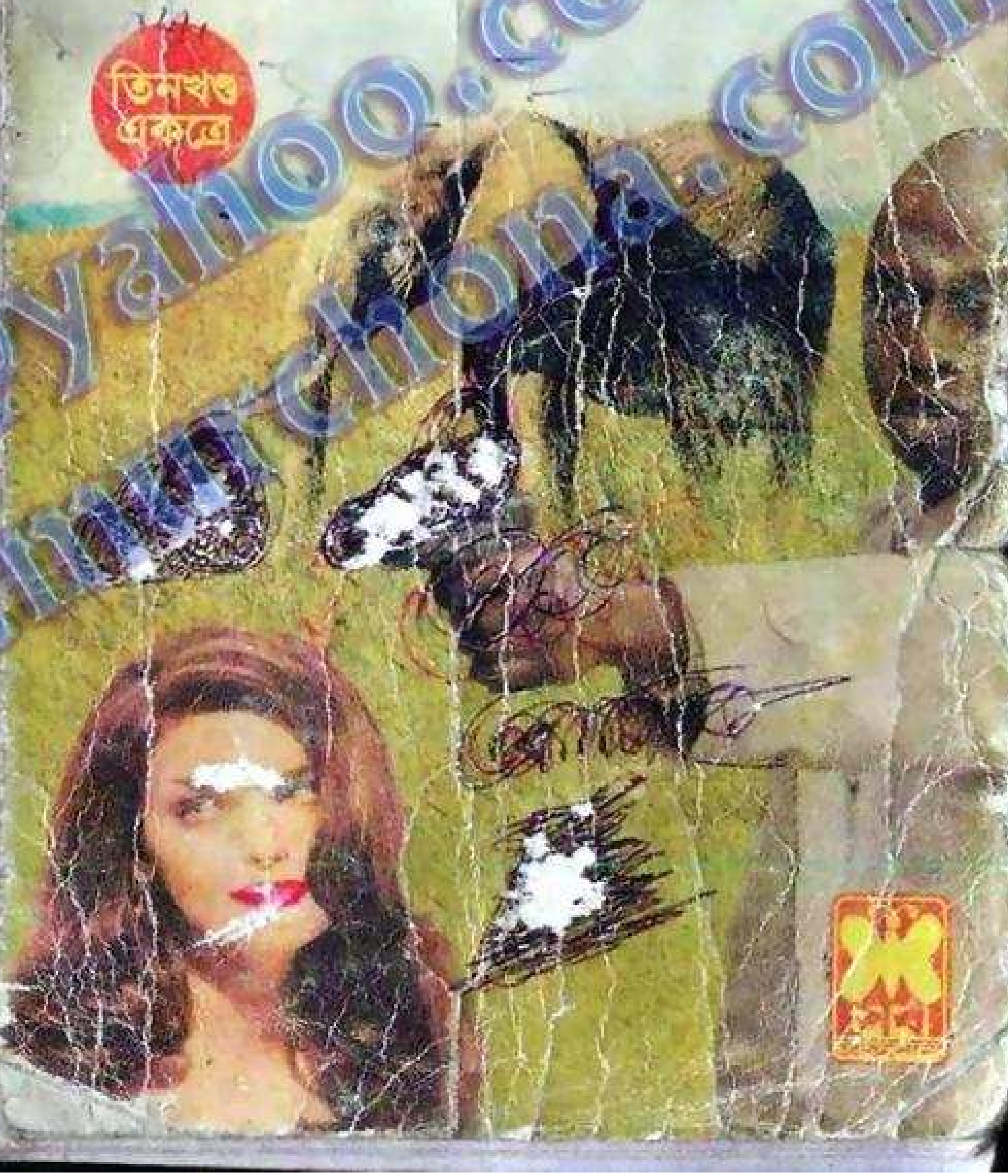
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

নরপিশাচ

কাজী আনোয়ার হোসেন



সস্তায় মাসুদ রানার বইঃ ভলিউম

নরপিশাচ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

বনভূমির চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলাল মাসুদ রানা। মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল কিছু মধুর ও তিক্ত স্মৃতি। এই অরণ্যের প্রতিটি গাছ, প্রতি ইঞ্চি মাটির সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। এখানে শিকার করেছে ও, যুদ্ধও করেছে। হারিয়েছে অনেক প্রিয় বন্ধুকে, তেমনি ওর হাতে মারা পড়েছে মানুষ নামের দ্বিপদ কয়েকটা পিশাচ।

জিম্বাবুই, চিউইউই ন্যাশনাল পার্ক।

লম্বা একটা বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পার্কের ট্রেজার হাউস বলা হয় এটাকে। ভারি প্যাডলকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলল চিউইউই ন্যাশনাল পার্কের চীফ ওয়ার্ডেন আলি শাহ। রানার কনসেশন লাইসেন্স বাতিল হবার আগে আলি শাহ ছিল ওর ট্র্যাকার ও গানবেয়ারার। প্রাণচঞ্চল ম্যাটাবেল তরুণ, কয়েকশো ক্যাম্পফায়ারের আলোয় রানার কাছে ইংরেজি লিখতে ও বলতে শিখেছে। পরে নিজের চেষ্টায় ও রানার খরচে ম্যাট্রিক, আইএ ও বিএ পাস করে সে। একটা সময় ছিল, সারাটা দিন গভীর অরণ্যে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াত ওরা। মাঝখানে অনেকগুলো বছর দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও যোগাযোগ ছিল, ফলে ওদের বন্ধুত্বে এতটুকু মরচে ধরেনি।

এবার আফ্রিকায় এসেছে রানা সম্পূর্ণ নতুন এক ভূমিকা নিয়ে। এর আগে হয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নয়ত ছুটি কাটাবার জন্যে এসেছে। এবারের আসার সঙ্গে ওর পেশার কোন সম্পর্ক নেই। পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা সম্পর্কিত সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করছে ও। এটা ওর নতুন একটা হবি বা শখ। নেচারালিস্ট হিসেবে সারা দুনিয়ার টিভি দর্শকদের কাছে এরইমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে ও। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে বিশ্ব জুড়ে যে যুদ্ধটা শুরু হয়েছে, সেটাও কম রোমাঞ্চকর বা কম বিপজ্জনক নয়। আর তাছাড়া, ঢেঁকি তো স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

গুদামের ভেতর আলো খুব কম। তারপরও যা দেখল, চোখ বড় হয়ে উঠল রানার। মৃদু শিস দিল ও, বলল, 'করেছ কি হে, আলি! পার্কের সব হাতি দেখছি মেরে সাফ করে ফেলেছ!'

গুদামের ভেতর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সাজানো রয়েছে হাতির দাঁত—আইভরি। কত দাম হবে আন্দাজ করা কঠিন। ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'আলোর ব্যবস্থা করো দেখি, পরিষ্কার ছবি চাই আমি।'

সামনে বাড়ল ক্যামেরাম্যান, কোমরে ভারি ব্যাটারি প্যাক জড়ানো থাকায় কুঁজো হয়ে আছে। হাতের আর্ক ল্যাম্প অন করল সে। তীব্র নীলচে-সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভেতরটা।

'পল, ওয়্যারহাউসের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত আমাকে আর ওয়ার্ডেনকে অনুসরণ করবে তোমার ক্যামেরা,' নির্দেশ দিল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে আরও সামনে চলে এল ক্যামেরাম্যান, কাঁধে সনি ভিডিও রেকর্ডার। পল নিউম্যানের বয়স রানার কাছাকাছি, আটাশ। পরনে খাকি শর্টস শুধু, পায়ে খোলা স্যাণ্ডেল। জাম্বেজি উপত্যকার গরমে তার খালি গা ঘামে চকচক করছে। মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল, ঘাড়ের পিছনে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হবে পপ স্টার, তবে সনি ক্যামেরা হাতে থাকলে সে সত্যিকার একজন উঁচুদরের শিল্পী। প্রথমে আইভরির ছবি নিল সে, তারপর রানার ওপর স্থির হলো ক্যামেরা।

'আইভরি,' শুরু করল রানা, 'সেই ফেরাউনদের যুগ থেকে, দুনিয়ার অন্যতম সেরা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।' রানার পাশে চলে এল চীফ ওয়ার্ডেন আলি শাহ। 'এই সাদা সোনা সংগ্রহের জন্যে দু'হাজার বছর ধরে হাতি শিকার করছে মানুষ,' বলে চলেছে রানা। 'তারপরও, মাত্র এক দশক আগেও, আফ্রিকা মহাদেশে হাতি ছিল বিশ লাখ। এখন, দশ বছর পর, হাতির সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দশ লাখে। দশ বছরে মেরে ফেলা হয়েছে দশ লাখ হাতি। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। এটা ঘটল কিভাবে? সেই কারণটা জানার জন্যেই আমরা এখানে এসেছি। সেই সঙ্গে আমরা আরও জানার চেষ্টা করব কি করলে আফ্রিকান হাতিকে নিশ্চিহ্ন হবার বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়।' এরপর চিউইউই ন্যাশনাল পার্কের চীফ ওয়ার্ডেন আলি শাহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। 'চীফ ওয়ার্ডেন, এই মুহূর্তে আপনার স্টোর রুমে ক'টা হাতির দাঁত রয়েছে?'

'প্রায় পাঁচশো-চারশো ছিয়াশিটা। প্রতিটির গড়পড়তা ওজন সাত কিলো।'

'প্রতি কিলো তিনশো ডলার। তারমানে এগুলোর দাম এক মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এ-সব কিভাবে পেলেন আপনি?'

ভারি গলায় জবাব দিল আলি শাহ। কিছু আইভরি সংগ্রহ করা হয়েছে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত হাতি থেকে। কিছু উদ্ধার করা হয়েছে পোচারদের কাছ থেকে। তবে বেশিরভাগ সংগ্রহ করা হয়েছে কালিং অপারেশনের মাধ্যমে।

গুদামের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। 'আপনাদের কালিং অপারেশন সম্পর্কে পরে আলোচনা করব, মি. শাহ। তার আগে আপনি আমাদেরকে পোচিং সম্পর্কে বলুন। পরিস্থিতি কতটা খারাপ?'

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল চীফ ওয়ার্ডেন। 'কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া ও জাম্বিয়ার হাতি শেষ করার পর পোচাররা এখন জিম্বাবুইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। দেখামাত্র গুলি করে তারা–হাতি, গণ্ডার, মানুষ–যাকে সামনে পায়। বাধ্য হয়ে আমরাও তাই করছি, দেখামাত্র গুলি করি পোচারদের।'

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চিউইউই পার্কের করুণ অবস্থার বিশদ বর্ণনা দিল রানা। শেষে বলল, 'আফ্রিকার হাতি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, আফ্রিকাও কি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে?' সচিত্র প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব শেষ হতে সময় লাগল বিশ মিনিট।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে রানা প্রশ্ন করল, 'জিম্বাবুইয়ে মোট কত হাতি আছে? তারমধ্যে চিউইউইয়ে ক'টা?'

আলি শাহ জানাল, 'জিম্বাবুইয়ে হাতি আছে প্রায় বাহান্ন হাজার। চিউইউইয়ের হিসেবটা আরও নিখুঁত দিতে পারব আমরা। মাত্র তিন মাস আগে জরিপ চালিয়েছি। এখানে হাতি আছে আঠারো হাজার।'

'শুধু চিউইউইয়ে এত হাতি? নিশ্চয়ই আপনারা গর্ববোধ করেন?'

ভুরু কুঁচকে চেহারা বিষণ্ণ করে তুলল চীফ ওয়ার্ডেন। 'না, মি. মাসুদ রানা। আমরা গর্বিত তো নই-ই, এই সংখ্যা নিয়ে বরং উদ্বিগ্ন।'

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'এক কথায়, এত বেশি হাতি পোষা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। আমাদের হিসেবে, জিম্বাবুইয়ের জন্যে ত্রিশ হাজার আদর্শ সংখ্যা। মাত্র একটা হাতির জন্যে প্রতি দিন দরকার এক টন ভেজিটেবল। এই খাবার পাবার জন্যে এমন সব গাছ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে সে, যেগুলোর বেড়ে উঠতে সময় লেগেছে কয়েকশো বছর।'

'হাতির সংখ্যা আরও যদি বাড়তে দেন, কি ঘটবে?'

'অল্পদিনের মধ্যেই চিউইউই পার্ককে ধুলোর একটা পাত্রে পরিণত করবে তারা। তারপর খাদ্যের অভাবে সবগুলো মারা যাবে। কিছুই থাকবে না আমাদের–না হাতি, না গাছ, না পার্ক।'

'এর সমাধান কি, ওয়ার্ডেন?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সমাধান আছে,' বিষণ্ণ সুরে বলল আলি শাহ। 'তবে সেটা অত্যন্ত তিক্ত ও করুণ।'

'কি সেটা?'

'চাইলে নিজের চোখেই সমাধানটা দেখতে পারেন আপনি, মি. রানা। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, দৃশ্যটা বীভৎস।'

সূর্য ওঠার বিশ মিনিট আগে ঘুম ভাঙল রানার। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে হাত বাড়াল বুট জোড়ার দিকে। মাঝখানে ক্যাম্পফায়ার, চারধারে শুয়ে রয়েছে লোকজন। নদীর পাড়, যেখান থেকে সিংহের গর্জন ভেসে আসে, এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে।

ঘুমন্ত লোকগুলো আগুনের চারধারে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, তাদেরকে টপকে বেরিয়ে এল রানা। ঘাসের ডগায় মুক্তো দানার মত শিশির, ওর ট্রাউজারের নিচের দিকটা ভিজিয়ে দিল। পাহাড়-প্রাচীরের শেষ প্রান্তে উঁচু একটা পাথরের দিকে এগোল ও। ওটার ওপর বসে পুব দিকে তাকাল।

নদীর ওপর মেঘগুলোকে রাঙিয়ে তুলল নতুন দিনের প্রথম রোদ। জাম্বেজি নদী কুয়াশায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল একটা সিংহ, পরমুহূর্তে ধস্তাধস্তির আওয়াজ হলো, ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল কাতর একটা গোঙানি। শব্দগুলো অদ্ভুত এক শিহরণ সৃষ্টি করল রানার শরীরে। আগেও অনেক বার শুনেছে, তবু প্রতিবার একই রকম প্রতিক্রিয়া হয় ওর। ঠিক এরকমটি দুনিয়ার আর কোথাও নেই। রানার কাছে এটাই হলো আফ্রিকার কণ্ঠস্বর।

পিছনে মৃদু শব্দ। ঘাড় ফেরাতে যাবে রানা, ওর কাঁধে হাত রাখল আলি শাহ। পাথরের ওপর উঠে এসে রানার পাশে বসল সে, একটা সিগারেট ধরাল। 'দশ মিনিট আগে ট্র্যাকাররা ক্যাম্পে ফিরে এসেছে,' রানাকে বলল সে। 'হাতির একটা পাল দেখতে পেয়েছে ওরা।'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'ক'টা?'

'প্রায় পঞ্চাশটা।' আদর্শ সংখ্যা। আরও বেশি হলে প্রসেস করতে পারবে না ওরা, কারণ প্রচণ্ড গরমে মাংস ও নাড়িভুঁড়িতে দ্রুত পচন ধরে। সংখ্যাটা আরও কম হলে খাজনার চেয়ে বাজনা হয়ে যেত বেশি। প্রচুর লোকবল ও মূল্যবান ইকুইপমেন্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। 'ঠিক জানো, উচিত হবে, এরকম একটা ব্যাপার ক্যামেরায় বন্দী করা?'

'ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া বা গোপন করা রীতিমত অন্যায় হবে।'

'লোকে মাংস খায়, চামড়া ব্যবহার করে, কিন্তু কসাইখানার ভেতরে কি ঘটছে জানতে চায় না,' যুক্তি দেখাল আলি শাহ।

'তবু মানুষের জানার অধিকার আছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলি শাহ। 'অন্য কেউ হলে সন্দেহ করতাম, সাংবাদিক হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি জানি, কালিং অপারেশনকে আমার মতই ঘৃণা করো তুমি–যদিও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তুমিই প্রথম আমাকে সচেতন করেছিলে।'

'চলো কাজ শুরু করি,' বলে পাথরটা থেকে নেমে পড়ল রানা, পার্ক করা ট্রাকগুলোর কাছে চলে এল দু'জন। ক্যাম্প জেগে উঠেছে, খোলা আগুনে পানি ফুটছে কফির। রেঞ্জাররা কেউ বিছানা গুটাচ্ছে, কেউ রাইফেল চেক করছে। মোট চারজন ওরা, দু'জন কালো, দু'জন সাদা। সবার পরনে পার্কস ডিপার্টমেন্টের খাকি ইউনিফর্ম, কাঁধে সবুজ ব্যাজ। পল নিউম্যান এরইমধ্যে ছবি তুলতে শুরু করেছে। তাকে দেখে রানার মনে হলো, সনি ক্যামেরাটা যেন তার শরীরেরই একটা অংশ।

'দর্শকদের স্বার্থে বোকা বোকা প্রশ্ন করব আমি,' আলি শাহকে সাবধান করে দিল রানা। 'ঠিক আছে?'

'গো অ্যাহেড।'

ধোঁয়াটে ক্যাম্প ফায়ারের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াল ওরা। ওদের দিকে ক্যামেরা তাক করল পল।

'এইমাত্র সূর্য উঠল, আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জাম্বেজি নদীর কাছাকাছি। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, আপনার ট্র্যাকাররা হাতির একটা পাল দেখতে পেয়েছে। এর আগে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন, চিউইউই পার্কে কেন আপনারা এই বিশাল আকৃতির এত বেশি পশু রাখতে পারবেন না। বলেছেন, শুধু এই বছরই অন্তত এক হাজার হাতিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। শুধু যে ইকোলজির স্বার্থে তা নয়, অবশিষ্ট হাতির পালগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেও। এখন বলুন, কিভাবে ওগুলোকে আপনি সরাতে চান?'

'সরাতে চাই কালিং অপারেশনের মাধ্যমে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল আলি শাহ।

'কালিং অপারেশন?' জানতে চাইল রানা। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, ওগুলোকে আপনারা মেরে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ। আমি ও আমার রেঞ্জাররা ওগুলোকে গুলি করব।'

'সব ক'টাকে, ওয়ার্ডেন? আজ আপনি পঞ্চাশটা হাতিকে মারবেন?'

'আমরা গোটা পালটাকে সরিয়ে দেব।'

'বাছুর আর গর্ভবতী? ওদেরকেও?'

'সবগুলোকে যেতে হবে।'

'কিন্তু কেন, ওয়ার্ডেন? ইচ্ছে করলে আপনি ওদেরকে ধরে অন্য কোথাও পাঠাতে পারেন না?'

ঠোঁটে তিক্ত হাসির ক্ষীণ আভাস, জবাব দিল আলি শাহ। হাতি পরিবহন অত্যন্ত খরচবহুল একটা ব্যাপার। বড় একটা মদ্দার ওজন ছয় টন, গাভীগুলোর গড়পড়তা ওজন চার। চারদিকে পাহাড় আর খাদ, হাতিগুলোকে অন্য কোথাও পাঠাতে হলে বিশেষ ধরনের ট্রাক ও রাস্তা দরকার, দুটোর কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়। আর যদি পাঠানো সম্ভব হতও, কোথায় পাঠাবে তারা? জিম্বাবুইয়ে অতিরিক্ত হাতি বিশ হাজার। কে জায়গা দেবে এত হাতিকে?

'তারমানে এত সুন্দর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ স্রেফ অপচয় হবে?'

প্রতিবাদ করল আলি শাহ। অপচয় হবে কেন? হাতির পালটাকে মারার পর যে আইভরি, মাংস আর নাড়িভুঁড়ি পাওয়া যাবে তা বিক্রি করবে তারা। ওই টাকা ব্যবহার করা হবে পার্ক রক্ষা ও পোচারদের প্রতিরোধ করার কাজে।

'কিন্তু ওয়ার্ডেন, বাছুর আর মায়েদের কেন মারবেন আপনি?'

'মারব, তার কারণও আছে। হাতির পালগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, পারিবারিক আত্মীয়স্বজনদের মত। কুকুর, ডলফিন বা বিড়ালের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হাতি। পালের একটা হাতি যদি বেঁচে যায়, সে তার আতঙ্ক অন্যান্য পালগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। হাতিদের সামাজিক আচরণে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা।'

'ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কথাটা। যুদ্ধের সময় গাভীগুলোকে রেখে মারা হলো শুধু বাছুর আর বয়স্ক পুরুষগুলোকে। এক এক মরশুমে এক এক এলাকায় থাকে হাতির পাল, নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন আছে এলাকা বদল করার–সেটা ভেঙে গেল। এমন কি সন্তান ধারণের অভ্যেসেও অসঙ্গতি দেখা দিল। পরিণত পুরুষরা যেন টের পেয়ে গেল তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, নাবালিকা হস্তিনীর ওপর চড়াও হলো তারা। ওরা যে বাচ্চা প্রসব করল সেগুলো হলো বামুন ও পঙ্গু।' মাথা নাড়ল আলি শাহ। 'না, পালের সব ক'টা হাতিকেই মারতে হবে।' হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাল সে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'স্পটার প্লেন এসে গেছে।' হাত বাড়াল রেডিওর মাইক্রোফোনের দিকে।

বাছুর আর গাভী নিয়ে পালে রয়েছে মোট বাহান্নটা হাতি। স্পটার প্লেন পালটাকে খেদিয়ে নদীর পাশে সমতল জমিনে নিয়ে এল। এখানে, ঘাসবনে, শুরু হলো নিধন পর্ব। গোটা ব্যাপারটা শুধু নিষ্ঠুর নয়, অমানবিক ও বীভৎসও বটে, তবে হাতিকুলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এর কোন বিকল্পও নেই। রানার ক্যামেরাম্যান পল নিউম্যান গোটা শিকার পর্বের ছবি তো তুললই, চীফ ওয়ার্ডেনের আলি শাহের অকাট্য যুক্তিও রেকর্ড করে নিল।

পরদিন সকালে বিষণ্ন মন নিয়ে সূর্যোদয় দেখছে রানা। চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে আজই ওর শেষ দিন। অনেক দিন পর আলি শাহের সঙ্গে দেখা হবার পর পুরানো বন্ধুত্ব ও ভালবাসা নতুন করে আবিষ্কার করেছে ও, মনটা খারাপ হয়ে আছে আবার কত বছর পর দেখা হবে ভেবে। বছর কয়েক আগে ম্যানুয়েল রিভেরা ও তাঁর মেয়ে মনিকাকে নিয়ে 'অসুর'-কে শিকার করার সময় জিম্বাবুই গেম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর পিটার ফাঙ্গাবেরার সঙ্গে রানার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, বাতিল করা হয় ওর কনসেশন লাইসেন্স। শুধু তাই নয়, শাঙ্গানি সর্দার জেনারেল কিরিকিটি বাওনা রানাকে জিম্বাবুই থেকে স্টিংগার মিসাইল লুঠ করে আনতে বাধ্য করেছিল, ফলে জিম্বাবুই সরকার রানাকে অপরাধী ও শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। সে-সময় মনে হয়েছিল ভবিষ্যতে আর কখনও জিম্বাবুইয়ের মাটিতে পা ফেলতে পারবে না রানা। পরে, কিরিকিটি বাওনা নিহত হবার পর, দূতাবাসের মাধ্যমে দেয়া বাংলাদেশ সরকারের ব্যাখ্যা মেনে নেয় জিম্বাবুই সরকার, রানার বিরুদ্ধে ঘোষণাটা প্রত্যাহার করে নেয়। দুর্নীতির অভিযোগে পিটার ফাঙ্গাবেরার চাকরি যাবার পর ওর কনসেশন লাইসেন্সও ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ইচ্ছে করলেই চিউইউই পার্কে শিকার করতে পারবে রানা, যদিও আবার কবে সময় ও সুযোগ পাবে বলা মুশকিল।

আজ শেষ দিন রানাকে দাওয়াত দিয়েছে আলি শাহ। ওর জন্যে জাল দিয়ে ঘেরা বাংলোর বারান্দায় অপেক্ষা করছিল সে। বারান্দার নিচে একবার থামল রানা, বাগানের চারদিকে চোখ বুলাল। এই বাংলো ও বাগান তৈরি করা হয় রানা যে-বছর প্রথম কনসেশন লাইসেন্স পায়, ইঁটের গাঁথুনি দেয়ার ও ফুলের চারা লাগাবার সময় রাজমিস্ত্রি ও মালীদের সঙ্গে ওর ঘামও ঝরেছে এখানে। আজ সেই বাংলো ও বাগান দেখাশোনা করছে আলি শাহ আর তার বউ রুমানা।

ভুট্টার তৈরি পরিজ, দুধের সর, পাখির সেদ্ধ ডিম, হাতে বেলা আটার রুটি, বাচ্চা মুরগির সুপ খাওয়াল রুমানা। নাস্তা শেষ করে রানাকে নিয়ে আইভরি গোডাউনের দিকে রওনা হলো আলি শাহ। পাহাড় বেয়ে নামার সময় একবার থামল রানা, চোখের ওপর হাত তুলে রোদ ঠেকাল, তাকাল অতিথিশালার দিকে। নদীর কিনারায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে খানিকটা জায়গা, পাশাপাশি খড় দিয়ে ছাওয়া কয়েকটা ঘর। খড় দিয়ে মোড়া হয়েছে আসলে সুন্দর দেখানোর জন্যে, ভেতরে পাথরের তৈরি দেয়াল ও ছাদ। ঘরগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বুনো ডুমুর গাছ। 'আলি, তুমি না আমাকে বললে ভিজিটরদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পার্ক?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'একটা ঘরে তো মনে হচ্ছে লোক

আছে, ঘরটার সামনে একটা গাড়িও দেখতে পাচ্ছি।'

'উনি আমাদের বিশেষ অতিথি, একজন ডিপ্লোম্যাট-হারারে-তে তাইওয়ানিজ রিপাবলিক অভ চায়নার অ্যামব্যাসাডর,' ব্যাখ্যা করল আলি শাহ। 'ভদ্রলোক ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে সাংঘাতিক ইন্টারেস্টেড, বিশেষ করে হাতি সম্পর্কে। এ-দেশে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্যে যে আন্দোলন চলছে, তাতে তাঁর প্রচুর অবদান আছে। সেজন্যেই তাঁকে আমরা বিশেষ সুযোগ দিচ্ছি। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে নয়, একা আসতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর জন্যে আমি অতিথিশালা খুলে দিয়েছি...,' হঠাৎ থামল আলি শাহ, পরমুহূর্তে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওই তো অ্যামব্যাসাডর সাহেব!'

পাহাড়ের গোড়ায় তিনজনের একটা দল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও এতটা দূরে যে চেহারাগুলো কেমন বোঝা যাচ্ছে না। আবার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে রানা জানতে চাইল, 'কালিং অপারেশনে কাল যে দু'জন সাদা রেঞ্জার সাহায্য করল, তারা কোথায়?'

'ওদেরকে ওয়াঙ্কি ন্যাশনাল পার্ক থেকে ধার করা হয়েছিল। আজ খুব ভোরে বাড়ি ফিরে গেছে।'

দলটার কাছাকাছি চলে এল ওরা, তাইওয়ানিজ অ্যামব্যাসাডরকে আলাদাভাবে চিনতে পারল রানা। এত বড় একটা পদের তুলনায় বয়স কম ভদ্রলোকের। চীনাদের বয়স আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন হলেও, রানা ধারণা করল কমবেশি চল্লিশ হবে। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, একহারা গড়ন। সোজা, কালো চুল। সচরাচর মেধাবি লোকদের যেমন দেখা যায়, লম্বাটে নারকেল আকৃতির মাথা। ভদ্রলোক সুদর্শন, কলঙ্কহীন চামড়া। চেহারার মধ্যে কি যেন একটা আছে, সন্দেহ হয় শরীরে নির্ভেজাল চীনা রক্ত বইছে না, ইউরোপিয়ান রক্তের মিশেল আছে। তবে চোখ দুটো ঘন কালো, প্রায় গোলই বলা যায়। চোখের ওপরের পাতার কোণে, ভেতর দিকে যে ভাঁজটা চীনা বৈশিষ্ট্য জাহির করে, সেটা অনুপস্থিত।

'গুড মর্নিং, ইওর এক্সেলেন্সী,' বলল আলি শাহ, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে সামান্য মাথা নোয়াল সে। 'আশা করি উপভোগ করছেন পরিবেশটা। আপনার জন্যে যথেষ্ট গরম তো?'

'গুড মর্নিং, ওয়ার্ডেন।' কালো দু'জন রেঞ্জারকে পিছনে রেখে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন অ্যামব্যাসাডর। 'আমি আসলে ঠাণ্ডা ভালবাসি।' বুক খোলা হাফহাতা শার্ট পরে আছেন, কোমরে স্ল্যাকস। আসলেও মার্জিত ও শীতল লাগছে দেখতে।

'মে আই প্রেজেন্ট মি. মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল আলি শাহ। 'রানা, হিজ এক্সেলেন্সী দা অ্যামব্যাসাডর অভ তাইওয়ান, চণ্ডমণ্ড গণ্ড।'

'পরিচয় দেয়ার কোন দরকার নেই, মি. রানা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।' রানার হাতটা ধরার সময় ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসি উপহার দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আপনার টিভি প্রোগ্রামগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে, মি. রানা।' ভদ্রলোকের ইংরেজি দারুণ, যেন তাঁর মাতৃভাষা। 'বিশ্বাস করুন, আমি আপনার একজন ফ্যান।'

'আলি আমাকে বলছিল, আফ্রিকান ইকোলজি সম্পর্কে আপনি উদ্বিগ্ন। এ-দেশের বন্য প্রাণী সংরক্ষণে আপনার অবদানেরও প্রশংসা করছিল ও।'

মাথা নেড়ে ওয়ার্ডেনের প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'তেমন কিছুই আমি করতে পারিনি।' রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, দেখে মনে হলো চিন্তিত। 'মাফ করবেন, মি. রানা, আমি কিন্তু বছরের এ-সময়টায় চিউইউইতে অন্যকোন ভিজিটর আশা করিনি। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছিল, পার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

বলার সুরটা নরম ও মার্জিত হলেও, রানা বুঝতে পারল কোন কারণ ছাড়া প্রশ্নটা করা হয়নি। 'চিন্তা করবেন না, মি. গণ্ড। ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আজ বিকেলেই আমি চলে যাচ্ছি। গোটা চিউইউই আপনার একার দখলে থাকবে।'

'ওহ্, প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এতটা স্বার্থপর নই যে আপনাকে চলে যেতে বলব। সত্যি কথা বলতে কি, এত তাড়াতাড়ি আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে দুঃখই লাগছে আমার। এমন অনেক বিষয় আছে, আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম।' মুখে যা-ই বলুন, রানা অনুভব করল ও চলে যাবে শুনে স্বস্তিবোধ করছেন ভদ্রলোক। তাঁর চেহারায় এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আন্তরিকতা রয়েছে, আচরণে রয়েছে বন্ধুত্বের ভাব, তারপরও এসব বহিরাবরণের নিচে বিভিন্ন স্তর ও গভীরতা আঁচ করতে পারছে রানা।

আইভরি ওয়্যারহাউসের দিকে হাঁটছে ওরা, ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিলেন অ্যামব্যাসাডর। খোশ মেজাজে গল্প করছেন, আচরণে শিথিল ভাব। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রেঞ্জার ও পোর্টারদের পথ ছেড়ে দিলেন, ওয়্যারহাউসের সামনে দাঁড়ানো ট্রাক থেকে গতকাল সংগ্রহ করা আইভরি নামাচ্ছে তারা। সনি ক্যামেরা নিয়ে আগেই হাজির হয়েছে পল নিউম্যান, প্রতিটি কোণ থেকে কাজটার ছবি তুলছে সে।

এখনও জমাট বাঁধা রক্ত লেগে রয়েছে প্রতিটি আইভরিতে। ট্রাক থেকে একটা করে নামিয়ে মান্ধাতা আমলের সমতল স্কেল-এ ওজন করা হলো। নড়বড়ে একটা টেবিলে বসে মোটা একটা লেজারে ওজন লিখে রাখল আলি শাহ। প্রতিটি দাঁতের জন্যে একটা করে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বরাদ্দ করল সে, এক সেট ইস্পাতের ডাইস দিয়ে নাম্বারটা দাঁতের গায়ে বসিয়ে দিল তার একজন রেঞ্জার। দাঁতটা এখন আইনগত বৈধতা পেলো, এটাকে নিলামে তোলা যাবে বা রফতানি করা যাবে বিদেশে।

কাজটা গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছেন অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড। একজোড়া আইভরি, ভারি বা বিরাট না হলেও, দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। দুর্লভ বৈশিষ্ট্য হলো, দুটো দাঁত হুবহু একইরকম দেখতে-দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, রঙে ও বাঁকগুলোয়।

স্কেলে তোলা হলো ওগুলো, সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন অ্যামব্যাসাডর। ওগুলোর গায়ে হাত বুলালেন তিনি। তাঁর ভঙ্গিটা অদ্ভুত লাগল রানার, যেন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার গায়ে হাত বুলাচ্ছে। 'নিখুঁত,' আটকে

রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'পারফেক্ট। আ ন্যাচারাল ওঅর্ক অভ আর্ট---।' রানা তাঁকে লক্ষ করছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন তিনি।

কেন যেন রানার মনে হলো গোটা আচরণটার মধ্যে অশ্লীল কি যেন আছে।

পিছিয়ে এসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন অ্যামব্যাসাডর, ব্যাখ্যা দিলেন, 'হাতির দাঁতের জাদুকরী প্রভাব আছে আমার ওপর। আপনি হয়তো জানেন, আমরা চীনারা আইভরিকে একটা পবিত্র মাঙ্গলিক হিসেবে জ্ঞান করি। হাতির দাঁত নেই, এমন চীনা পরিবার খুব কমই আছে। হাতির দাঁত মঙ্গল ও সৌভাগ্য বয়ে আনে।'

'তাই!' রানার ঠোঁটে ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি।

'বলতে পারেন কুসংস্কার, তবে এতে আমরা বিশ্বাসী। অবশ্য গজদন্তের ওপর আমার পরিবারের বিশেষ আগ্রহের অন্য একটা কারণ আছে। আমার বাবা তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আইভরি-কার্ভার হিসেবে। তিনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী-ভাস্কর। এই শিল্পে তিনি এতই দক্ষ ছিলেন যে আমার জন্মের সময় খদ্দেরদের চাহিদা মেটানোর জন্যে তাইপে, ব্যাংকক, টোকিও ও হঙকঙে দোকান খুলতে হয় তাঁকে-সে-সব দোকানে শুধু গজদন্তের তৈরি শিল্পকর্মই বিক্রি হত। আমার ছোটবেলার স্মরণীয় অভিজ্ঞতার বেশিরভাগই আইভরি দর্শন ও স্পর্শকে ঘিরে। আমাদের তাইপের দোকানে নবিস আইভরি-কার্ভার হিসেবে কাজ শুরু করি আমি, বাবার মতই আইভরিকে বুঝতে ও ভালবাসতে শিখেছি। বিশাল কালেকশন বাবার, মহামূল্যবান বললেও কিছু বলা হয় না...,' হঠাৎ থামলেন তিনি, তারপর ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসলেন। 'মাফ করবেন, প্লীজ। আসলে এ-প্রসঙ্গে নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারি না-তবে ওই জোড়াটা সত্যি ভারি সুন্দর। জোড়ার দুটো দাঁত একই রকম, এটা সাধারণত দেখা যায় না-সত্যি দুষ্প্রাপ্য। বাবা দেখলে তো পাগল হয়ে যেতেন।'

চোখে শুধু আগ্রহ নয়, নগ্ন লোভ ফুটে উঠল, দাঁত দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। ওজন করার পর ওয়্যারহাউসে নিয়ে গিয়ে আরও কয়েকশো আইভরির সঙ্গে রেখে দেয়া হলো ওগুলো।

'অদ্ভুত এক চরিত্র,' মন্তব্য করল রানা, প্রতিটি গজদন্ত ওয়্যারহাউসে রেখে তালা দেয়ার পর পাহাড় বেয়ে বাংলোয় ফিরছে আলি শাহের সঙ্গে, লাঞ্চ খাবে। 'কিন্তু কারিগরের ছেলে অ্যামব্যাসাডর হলো কিভাবে?'

জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্-টট্ শব্দ করল আলি শাহ। 'মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবা কারিগর হিসেবে জীবন শুরু করলেও, সেখানে থেমে থাকেননি। যতটুকু জানি, আইভরির দোকানগুলো এখনও আছে বটে, তবে ও-সব এখন স্রেফ তাঁর হবি। তিনি এখন তাইওয়ানের অন্যতম ধনীদের একজন। চাইনীজ ধনী বলতে কি বোঝায় তুমি জানো। শুনতে পাই, প্যাসিফিক রিম-এর চারদিকের দেশগুলো থেকে মাখন তুলে নিচ্ছেন ওঁরা, মাখন তুলছেন আফ্রিকা থেকেও। বিরাট একটা পরিবার, ছেলেও অনেকগুলো, তাদের মধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ড সবার ছোট-সবার চেয়ে নাকি বুদ্ধিমানও। তাঁকে আমার ভালই লাগে। তোমার কেমন লাগল?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট মার্জিত এবং ভদ্র, তবে আচরণে বিদঘুটে কি যেন একটা আছে। আইভরিতে হাত বুলানোর সময় মুখটা লক্ষ করেছ? মনে হলো···,' সঠিক শব্দ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো রানা, 'আল্ল্যাচাবাল।'

'নতুন হলে কি হবে, লেখকদের বৈশিষ্ট্য এরই মধ্যে এসে গেছে তোমার মধ্যে।' কৃত্রিম হতাশা ও বিস্ময়ে মাথা নাড়ল আলি শাহ। 'রোমাঞ্চকর কিছু খুঁজে না পেলে, নিজেরাই বানিয়ে নাও।' দু'জনেই ওরা হেসে উঠল।

চণ্ডমণ্ড গণ্ড কালো একজন রেঞ্জারকে পাশে নিয়ে পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দেখলেন মাসাসা গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল রানা ও আলি শাহ।

'টিভি সাংবাদিকের উপস্থিতি আমার ভাল ঠেকছে না,' বলল জামবু। আলি শাহের অধীনে চিউইউই পার্কের সিনিয়র রেঞ্জার সে। 'অপারেশনটা পিছিয়ে দিলে ভাল হয়। পরে কোন এক সময়···।'

'টিভি সাংবাদিক আজ বিকেলে চলে যাচ্ছে,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তাছাড়া, কাজটা করার জন্যে প্রচুর টাকা নিয়েছ তোমরা। যে প্ল্যান করা হয়েছে তা এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। বাকি সবাই এরইমধ্যে এখানে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেছে, তাদেরকে ফেরত পাঠানো যাবে না।'

'আমাদেরকে যা দেয়ার কথা তার মাত্র অর্ধেক দিয়েছেন আপনি,' প্রতিবাদ করল জামবু।

'বাকি অর্ধেক পাবে কাজ শেষ করার পর, তার আগে নয়,' নরম সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, লক্ষ করলেন জামবুর চোখ দুটো সাপের মত স্থির হয়ে আছে। 'পাওনা তো পাবেই, পুরস্কারও পাবে। কাজটা করতে রাজি হয়েছ তুমি, তাই না?'

চুপ করে থাকল জামবু। বিদেশী ভদ্রলোক এক হাজার ডলার দিয়েছেন তাকে। এক হাজার ডলার মানে তার ছ'মাস বেতনের সমান টাকা। কাজটা শেষ হলে আরও এক হাজার ডলার দেবেন।

'কি, কাজটা তুমি করবে তো?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো জামবু। 'করব।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যামব্যাসাডর। 'কাজটা আজ রাতে বা কাল রাতে হতে হবে, তার পরে নয়। দু'জনেই তোমরা তৈরি থাকো।'

'আমরা তৈরি হয়েই আছি,' আশ্বাস দিয়ে ল্যাণ্ডরোভারে উঠল জামবু। দ্বিতীয় রেঞ্জার আগেই গাড়িতে উঠে বসে আছে। চলে গেল তারা।

জনশূন্য অতিথিশালায়, নিজের কটেজে ফিরে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ত্রিশটা কটেজ, সবগুলো একই রকম দেখতে, সাধারণত শুকনো ও ঠাণ্ডা মরশুমে ট্যুরিস্টরা দখল করে নেয়। রিফ্রিজারেটর থেকে বরফ দেয়া হুইস্কি নিয়ে পর্দা ঘেরা পোর্চ-এ চলে এলেন অ্যামব্যাসাডর, আগুনে দুপুরটা পার করতে হবে।

নার্ভাস ও অস্থির বোধ করছেন তিনি। জামবুর আশঙ্কাটা তাঁর মনেও শিকড় গেড়েছে। সম্ভাব্য কি কি ঘটতে পারে মনে রেখে, প্রতিটির জন্যে আলাদা প্ল্যান তৈরি করা হলেও, অপ্রত্যাশিত কিছু একটা সবসময়ই ঘটে–

যেমন, মাসুদ রানার উপস্থিতি।

এত বড় মাপের কাজ এই প্রথম হাতে নিয়েছেন তিনি। এটাকে প্রায় একটা অভ্যুত্থানই বলা যায়। গোটা ব্যাপারটা তাঁর একার উদ্যোগে ঘটতে যাচ্ছে। পুরস্কারের তুলনায় ঝুঁকিটা বিরাট, কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদি সফল হন, তাঁর বাবা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। আর্থিক লাভের চেয়ে এটার গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক বেশি। ভাইদের মধ্যে সবার ছোট তিনি, বাবার প্রিয়তম পুত্র হতে চাইলে কঠিন সাধনা করতে হবে তাঁকে। সেই সাধনারই একটা অংশ আজকের এই অপারেশন। কোনভাবেই তাঁর ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

হারারে দূতাবাসে বেশ ক'বছর আছেন তিনি, অবৈধ আইভরি ও গণ্ডারের শিং পাচারে ভালই হাত পাকিয়েছেন। ব্যাপারটা শুরু হয় মাঝারি শ্রেণীর এক সরকারী কর্মকর্তার একটা মন্তব্যে। এক ডিনার পার্টিতে তিনি বলেন, বিদেশী কূটনীতিকরা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধে পান, তবে সবাই তা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন না। কি ধরনের সুযোগ? জানতে চান চণ্ডমণ্ড গণ্ড। উত্তর আসে, এই যেমন ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার সার্ভিস। বাবার কাছ থেকে ব্যবসার ট্রেনিং পেয়েছেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেন তাঁকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সরাসরি কিছু না বলে সরকারী কর্মকর্তাকে উৎসাহ দেন তিনি।

এরপর এক হপ্তা কেটে গেল জটিল ও মন্থরগতি আভাস ও ইঙ্গিত আদান-প্রদানে। তারপর সরকারের আরও উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তার সঙ্গে গলফ খেলার আমন্ত্রণ পেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তাঁর ড্রাইভার অ্যামব্যাসাডোরিয়াল মার্সিডিজ পার্ক করল হারারে গলফ ক্লাবের পিছন দিকে, তারপর নির্দেশ মত গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। দশ মিনিট পর গাড়ি থেকে নেমে কোর্স-এ পা রাখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গলফার হিসেবে খুবই দক্ষ তিনি, তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ইচ্ছে করে হেরে গিয়ে ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের সামনে নগদ তিন হাজার মার্কিন ডলার খেসারত দিলেন। সরকারী বাড়িতে ফিরে এসে মার্সিডিজটা গ্যারেজে রেখে বিদায় নিতে বললেন ড্রাইভারকে। গাড়ির বুটে পেলেন বড় আকারের ছ'টা গণ্ডারের শিং, পাটের বস্তা দিয়ে মোড়া।

পরবর্তী ডিপ্লোম্যাটিক পাউচে ভরে ওগুলো তিনি তাইপে-তে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে দাম পাওয়া গেল ষাট হাজার মার্কিন ডলার। ছেলের এই ব্যবসা বুদ্ধি দেখে ভারি খুশি হলেন চণ্ডকিণ্ড গণ্ড, দীর্ঘ চিঠি লিখে আইভরির ওপর তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ও আগ্রহের কথা জানাতেও ভুললেন না।

চণ্ডমণ্ড গণ্ড কৌশলে ও সাবধানে বিশেষ একটা মহলে কথাটা ছড়িয়ে দিলেন, গণ্ডারের শিং ও হাতির দাঁত তাঁর খুবই প্রিয়, তাঁর ওপর এগুলোর জাদুকরী প্রভাব আছে। রেজিস্টারে ওঠেনি বা সীল মারা হয়নি, এরকম দাঁত ও শিং বিক্রি করার প্রস্তাব আসতে শুরু করল তাঁর কাছে। পোচারদের ছোট্ট, বদ্ধ একটা জগতে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা, মাঠে নতুন একজন ক্রেতার আবির্ভাব ঘটেছে।

মাস কয়েকের মধ্যে মালাবি-র একজন শিখ ব্যবসায়ী লাভজনক ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। মালাবি লেকে মাছ ধরার বিশাল এক প্রকল্পে তাইওয়ানিজ পুঁজি দরকার তার। ব্যবসার ধরন ও লাভের হারটা তাইপেতে চিঠি

লিখে বাবাকে জানালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, চণ্ডকিণ্ড গণ্ড চাখার সিং-এর সঙ্গে জয়েন্ট
ভেঞ্চারে ব্যবসা করতে রাজি হলেন। দূতাবাসে বসে চুক্তিপত্রে সই করলেন চণ্ডমণ্ড
গণ্ড, সেই রাতেই তিনি চাখার সিংকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন। ডিনারে বসে
চাখার সিং বলল, 'আমি জানতে পেরেছি, আপনার মহান পিতা আইভরি খুব
ভালবাসেন। আমার খুব ইচ্ছে, আপনার পরিবারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আনুগত্য
প্রমাণের জন্যে, নিয়মিত আইভরি সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করি। আমি জানি
সরকারী বাধা নিষেধ এড়িয়ে ওগুলো আপনি নিরাপদেই আপনার বাবার কাছে
পাঠিয়ে দিতে পারবেন। ভাল কথা, আইভরিগুলো হবে সীল ছাড়া।'

অল্পদিনের মধ্যেই চণ্ডমণ্ড গণ্ডের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আফ্রিকার যে-
সব দেশে এখনও প্রচুর হাতি ও গণ্ডার আছে সে-সব দেশে একটা নেটওঅর্ক-এর
মাধ্যমে অপারেশন চালাচ্ছে চাখার সিং। তার ব্যবসার পরিধি কল্পনাকেও হার
মানায়। বতসোয়ানা, অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া ও মোজাম্বিক থেকে সাদা
সোনা ও শিং সংগ্রহ করছে সে। এ-সব দেশে তার নিজস্ব লোক আছে, সবাই
তারা সশস্ত্র, প্রতিটি ন্যাশনাল পার্কে নিয়মিত হানা দেয়।

প্রথমদিকে চণ্ডমণ্ড গণ্ড ছিল তার আরেকজন খদ্দের মাত্র, তবে মাছ ধরার
ব্যবসায় প্রচুর লাভ হওয়ার সূত্রে সম্পর্কটা দ্রুত বদলে গেল। ঘন ঘন দেখা হলো
ওদের, বিশ্বাস ও আন্তরিকতা বাড়ল। অবশেষে চাখার সিং চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও তার
বাবাকে আইভরি ব্যবসাতেও পার্টনার হবার প্রস্তাব দিল। ব্যবসাটা বড় করার
জন্যে স্বভাবতই একটা বড় অঙ্কের পুঁজি দাবি করল সে, আরও বড় একটা অঙ্ক
দাবি করল তার দ্বারা অর্জিত ব্যবসার গুডউইল-এর মূল্য বাবদ। সব মিলিয়ে প্রায়
তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বাবার পরামর্শ মত দরকষাকষি করে প্রাথমিক
দেয় টাকার পরিমাণ অর্ধেক কমাতে পারলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

পার্টনার হবার পরই কেবল ব্যবসাটার রহস্য ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে
পারলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। হাতির পাল আছে এমন প্রতিটি দেশের সরকারী মহলে
নিজের লোক আছে চাখার সিং-এর, যারা তার কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ খায়।
তার কনট্যাক্ট-এর মধ্যে অনেকেই মন্ত্রীসভার সদস্য। বড় আকারের প্রতিটি
ন্যাশনাল পার্কে বেতনভুক ইনফর্মার আছে তার। তাদের কেউ সামান্য রেঞ্জার বা
গেইম স্কাউট, আবার কেউ চীফ ওয়ার্ডেন।

ইতিমধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবা ও ভাইরা আফ্রিকায় পুঁজি খাটানোর সুযোগ
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ব্যবসা আছে দেখলেই পুঁজি ঢালতে শুরু করল
তারা, বৈধ বা অবৈধ কিনা বিবেচনা করল না। প্রথম তারা পুঁজি খাটাল দক্ষিণ
আফ্রিকায়। সাদা-কালোর যুদ্ধ হচ্ছে ওখানে, বিদেশী সাহায্যের ওপর রয়েছে
নিষেধাজ্ঞা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এত খারাপ যে পানির দামে বিক্রি হচ্ছে
জমি। তাইপেতে তিন কামরার একটা ফ্ল্যাটের যে দাম সেই একই দামে দক্ষিণ
আফ্রিকায় দশ হাজার একর জমি কেনা যায়। শুধু যে জমি তা নয়, পানির দামে
অফিস পাড়া কিনল তারা, কিনল শপিং সেন্টার আর কল-কারখানা—এক ডলারের
জিনিস পাঁচ বা দশ সেন্টে।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবা, এককালে যিনি হঙকঙ রেসিং ক্লাবের স্টুয়ার্ডও ছিলেন,

একটা মাত্র ঘোড়ার ওপর সর্বস্ব বাজি ধরাটা পছন্দ করলেন না। আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও পুঁজি খাটাল তারা। নামিবিয়া স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছে, মাছ ধরার ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের এজেন্সি কিনে ফেলল। চাখার সিং-এর মাধ্যমে জাম্বিয়া, জায়ারে, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়া সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হলো চণ্ডমণ্ড গণ্ডের, নিজেদের দেশে তাঁরা তাইওয়ানিজ পুঁজি পেতে চান।

দিনে দিনে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়লেও তাবাকোজনিত কারণে হাতির দাঁতের ব্যবসার প্রতি চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবার দুর্বলতা থেকেই গেল। বাবার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার জন্যে প্রায়ই তাইপেতে আসেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। একবার তিনি ছেলেকে বললেন, 'বাপ আমার, একটা জিনিসের অভাব আমাকে খুব কষ্ট দেয়। রেজিস্টার করা ও সীল মারা আইভরি খুব বেশি নেই আমাদের। এবার আফ্রিকায় ফিরে দেখো দেখি বড় একটা চালান ম্যানেজ করতে পারো কিনা।'

'কিন্তু বাবা, বৈধ আইভরি শুধু সরকারী নিলাম থেকে কেনা যায়...,' বাবার চোখে তিরস্কার দেখে মাঝপথে থেমে গেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'সরকারী নিলাম থেকে কেনা আইভরির ব্যবসায়ে লাভ খুব কম,' হিসহিস করে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তোমার কাছ থেকে এরকম একটা জবাব আশা করিনি আমি।' বাবার তিরস্কার গভীর দাগ কাটল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের মনে, এরপর প্রথম সুযোগেই চাখার সিং-এর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি।

চাখার সিং চিন্তিতভাবে তার দাড়িতে হাত বুলাল। সুদর্শন পুরুষ সে, সাদা পাগড়িটা দারুণ মানিয়ে গেছে। 'এই মুহূর্তে সীল মারা আইভরির একটিমাত্র উৎসের কথা মনে পড়ছে আমার—সরকারী ওয়্যারহাউস।'

'আপনি বলতে চাইছেন, নিলামে তোলার আগে ওয়্যারহাউস থেকে আইভরি সরিয়ে ফেলা যায়?'

'হয়তো যায়...,' কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং। 'তবে সেজন্যে দরকার হবে জটিল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ প্ল্যান। উৎকট একটা সমস্যা, মাথা ঘামানোর জন্যে কিছুটা সময় দিন আমাকে।'

তিন হপ্তা পর আবার তারা বসল চাখার সিং-এর অফিসে। অফিসটা অভিজাত লাইলঙ্গি এলাকায়। 'মাথা আমি প্রচুর ঘামিয়েছি, একটা সমাধানও ধরা দিয়েছে,' চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে জানাল চাখার সিং।

'কি রকম খরচ পড়বে?' প্রথম প্রশ্ন অ্যামব্যাসাডরের।

'সীল না মারা আইভরি প্রতি কিলো যে দামে কেনেন, সেই একই দামে পাবেন। এটাই প্রথম ও শেষ সুযোগ, পরে আর ব্যবস্থা করা যাবে না, কাজেই প্রথমবারই যত বেশি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে। পুরো এক গুদাম মাল, নেভার মাইণ্ড। আপনার বাবার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

খর্বকায় বাবা উল্লাসে তিনটে লাফ দেবেন, জানেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। সীল মারা আইভরি মানে বৈধ আইভরি, অবৈধ আইভরির চেয়ে তিন কি চার গুণ বেশি দামে বিক্রি হবে তাইওয়ানের বাজারে।

'আসুন বিবেচনা করে দেখি কোন দেশের গুদামে আমাদের লুঠ করার অপেক্ষায় আইভরি রাখা আছে', বলল চাখার সিং, তবে পরিষ্কারই বোঝা গেল যে

কোথায় হানা দিতে হবে জানে সে। 'জায়ারে নয়, নয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুটো দেশে আমার সংগঠন তেমন শক্তিশালী নয়। জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া আর কেনিয়ায় খুব বেশি আইভরি নেই। বাকি থাকল বতসোয়ানা, যেখানে বড় ধরনের কালিং অপারেশন এখনও শুরু হয়নি, আর থাকল জিম্বাবুই।'

'গুড।' সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন অ্যামব্যাসাডর।

'ওখানকার আইভরি গেম ডিপার্টমেন্টের ওয়্যারহাউসে জমা রাখা হয়—ওয়্যারহাউসগুলো আছে ওয়াঙ্কি, হারারে ও চিউইউইতে। তিনটের যে-কোন একটা ওয়্যারহাউস থেকে দাঁত সংগ্রহ করব আমরা।'

'আসলে কোনটা থেকে?'

'হারারের অয়্যারহাউসে কড়া পাহারা,' বলল চাখার সিং, খাড়া করা তিনটে আঙুল দেখাল চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে, একটা নামিয়ে নিল, অর্থাৎ হারারেকে বাতিল করল। 'ওয়াঙ্কি হলো সবচেয়ে বড় ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু অসুবিধে আছে, জাম্বিয়ান সীমান্ত থেকে অনেক দূরে জায়গাটা।' আরেকটা আঙুল ভাঁজ করল সে। 'বাকি থাকল চিউইউই। ওখানকার স্টাফদের মধ্যে বিশ্বস্ত লোক আছে আমার। তারা আমাকে জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সীল মারা আইভরিতে প্রায় ভরাট হয়ে আছে ওয়্যারহাউস। পার্কের হেডকোয়ার্টার জাম্বেজি নদী ও জাম্বিয়ান সীমান্ত থেকে ত্রিশ মাইলেরও কম দূরে। আমার একটা দল নদী পেরিয়ে সারা দিন হাঁটলেই পৌঁছে যাবে ওখানে, নেভার মাইণ্ড।'

'আপনি ওয়্যারহাউসটা লুঠ করতে চান?' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'সন্দেহের লেশ মাত্র নেই,' আঙুলটা নামিয়ে বলল চাখার সিং, বিস্মিত দেখাল তাকে। 'আপনিও কি ঠিক তাই চাইছেন না, একেবারে প্রথম থেকে?'

'সম্ভবত,' সাবধানে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি সম্ভব?'

'চিউইউই নির্জন ও দুর্গম একটা এলাকা, নদীর তীরে—নদীটা আবার আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে রয়েছে। আমি বিশজনের একটা হানাদার বাহিনী পাঠাব, যাদের কাছে শুধু অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে, নেতৃত্বে থাকবে আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সেরা একজন শিকারী। অন্ধকারে ক্যানুতে চড়ে নদী পেরোবে তারা, সারাদিন হেঁটে পার্কের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে হানা দেবে। তারা কোন সাক্ষী রাখবে না…।'

আড়ষ্ট ও নার্ভাস হলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, খুক করে কাশলেন একবার। চোখে প্রশ্ন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে চাখার সিং। 'কোন সাক্ষী রাখবে না…মানে?'

'মানে মানকচু, ভাতে দিলে ভর্তা—সাক্ষীদের খেয়ে ফেলা হবে, যদিও আক্ষরিক অর্থে নয়।' হাসল চাখার সিং। 'ব্যবসা করতে হলে সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না। আরে ভাই, লোক বলতে ওখানে থাকবে চার কি পাঁচজন। পারমানেন্ট রেঞ্জাররা আমার টাকা খায়। বৃষ্টির মরশুমে অতিথিশালা বন্ধ থাকবে, কর্মচারীদের বেশিরভাগ ছুটি নিয়ে যে-যার গ্রামে চলে যাবে। থাকবে শুধু পার্ক ওয়ার্ডেন আর দু'একজন নগণ্য স্টাফ'।'

'তবু, ওদেরকে না সরিয়ে কোন ব্যবস্থা করা যায় না?' কারণটা মানুষের প্রতি

ভালবাসা বা কোমল হৃদয় নয়, অনাবশ্যক ঝুঁকি না নেয়ার প্রবণতা। ইতস্তত করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'আপনি যদি কোন বিকল্প দেখাতে পারেন, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি আছি আমি,' বলল চাখার সিং।

কয়েক মুহূর্ত পর এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। 'না, এই মুহূর্তে কোন বিকল্প পাচ্ছি না। আপনার প্ল্যানের বাকি অংশটুকু শোনান, প্লীজ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, নেভার মাইণ্ড। আমার লোকেরা সব সাক্ষীকে সরিয়ে দেবে, আগুন লাগাবে ওয়্যারহাউসে, তারপর নদী ধরে ফেরত যাবে।' থামল শিখ পার্টনার, চেহারায় চেপে রাখতে না পারা উল্লাস, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের পরবর্তী প্রশ্ন শোনার আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ব্যাপারটা প্রশ্ন করে জেনে নিতে হচ্ছে বলে অস্বস্তিবোধ করলেন অ্যামব্যাসাডর। প্রশ্নটা তার নিজের কানেই বোকার মত লাগল।

'কিন্তু আইভরি?'

খ্যাক খ্যাক করে হাসল চাখার সিং, পান খাওয়া খয়েরি দাঁত ও মাড়ি বেরিয়ে পড়ল, প্রশ্নটা আরেকবার উচ্চারণ করতে বাধ্য করল চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে।

'আপনার পোচাররা কি আইভরি নিয়ে যাবে? আপনি বললেন ছোট একটা দল। অত আইভরি তারা বয়ে নিয়ে যাবে কিভাবে?'

'আমার প্ল্যানের বৈশিষ্ট্যই এখানে। জিম্বাবুই পুলিস কেসটার কোন সমাধানই করতে পারবে না।' চাখার সিং-এর কথায় এবার একটু হাসি ফুটল অ্যামব্যাসাডরের ঠোঁটে। 'আমরা চাই পুলিস বিশ্বাস করুক পোচাররা সমস্ত আইভরি নিয়ে চলে গেছে। তাহলে তারা দেশের ভেতর ওগুলো খুঁজবে না, খুঁজবে কি?'

এই মুহূর্তে, আগুনে দুপুরটা বারান্দায় বসে পার করার সময়, চোয়াল শক্ত করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। চাখার সিং-এর প্ল্যানটা সত্যি দারুণ, তবে প্ল্যানটা করার সময় মাসুদ রানা ও তাঁর টিভি ক্রুদের উপস্থিতির কথা ভাবা হয়নি।

অপারেশনটা বাদ দেয়া যায় কিনা আরেকবার চিন্তা করলেন তিনি, প্রায় সাথে সাথে বাতিল করে দিলেন ধারণাটা। ইতিমধ্যে চাখার সিং-এর লোকজন নদী পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে ক্যাম্পের দিকে। তাদের কাছে বার্তা পাঠানোর কোন উপায় নেই তাঁর, কাজেই ফেরত যেতে বলা সম্ভব নয়। বিকেলেই যদি মাসুদ রানা ও তাঁর ক্রুরা চলে যান, সব দিক থেকে ভাল হবে সেটা। ওঁরাও প্রাণে বাঁচবেন, হানাদার বাহিনীরও ঝামেলা কমবে। কিন্তু যদি উল্টোটা ঘটে, হানাদার বাহিনী এখানে পৌঁছে যদি দেখে যে টিভি ক্রুদের নিয়ে মাসুদ রানা ক্যাম্পে রয়েছেন, তাহলে চীফ ওয়ার্ডেন, তার পরিবার, ও স্টাফদের সঙ্গে ওদেরকেও সরিয়ে দিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

চিন্তায় বাধা পড়ল, বারান্দার শেষ মাথায় টেলিফোন বাজছে। অতিথিশালায় শুধু ভিআইপি কটেজে টেলিফোন আছে। লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত পায়ে এগোলেন এমব্যাসাডর। ফোনটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এটাও অপারেশন প্ল্যানের একটা অংশ, অনেক ভেবেচিন্তে আয়োজন করা হয়েছে।

'অ্যামব্যাসাডর গণ্ড,' রিসিভার তুলে বললেন তিনি।

আলি শাহ্ বলল, 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনার হারারে এমব্যাসী থেকে একটা কল এসেছে। এক ভদ্রলোক, নাম বলছেন মি. চ্যাঙ। বলছেন, তিনি আপনার সেক্রেটারি। কলটা আপনি ধরবেন কি?'

'ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন। হ্যাঁ, মি. চ্যাঙের সঙ্গে কথা বলব আমি।' জেলার টেলিফোন এক্সচেঞ্জটা দেড়শো মাইল দূরে ছোট্ট এক গ্রামে, লাইনটা এসেছে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দুর্গম পাহাড়গুলোকে পাশ কাটিয়ে, হারারে থেকে রিলে করা তাঁর সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর এত অস্পষ্ট লাগল যেন সৌরজগতের শেষ প্রান্ত থেকে কথা বলছে সে। মেসেজটা ঠিক যেমন আশা করেছিলেন তিনি। হাতলটা ধরে ঝাঁকাতে লাইনে আবার আলি শাহ্ ফিরে এল। অ্যামব্যাসাডর বললেন, 'ওয়ার্ডেন, হঠাৎ একটা জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এখুনি আমাকে হারারেতে ফিরে যেতে হবে। খুবই হতাশ বোধ করছি, ভেবেছিলাম আরও ক'টা দিন বিশ্রাম নেব এখানে। কিন্তু কপাল মন্দ...।'

'সেকি! কিন্তু আমি আর আমার স্ত্রী ভাবছিলাম কাল বা পরশু আপনাকে দাওয়াত দেব...।'

'লোভনীয় প্রস্তাব, কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত না করে উপায় নেই আমার। কথা দিলাম, পরের বার যখন আসব, আপনার গিন্নীর হাতের রান্না না খেয়ে চিউইউই থেকে যাব না।'

'আজ সন্ধ্যায় রিফ্রিজারেটর ট্রাক রওনা হচ্ছে হাতির মাংস নিয়ে, কারোই পর্যন্ত যাবে। ভাল হয় আপনি যদি কনভয়টার সঙ্গে যান। আকাশের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে অথচ আপনার মার্সিডিজ ফোর-হুইল ড্রাইভ নয়।'

এটাও ওদের প্ল্যানেরই একটা অংশবিশেষ। কালিং অপারেশন ও রিফ্রিজারেটর ট্রাক রওনা হবার দিন ও ক্ষণ মনে রেখে হানা দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে, জানতে চাওয়ার আগে ইচ্ছা করে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'ট্রাকগুলো ঠিক কখন রওনা হবে?'

'একটার এঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।' রেঞ্জার জামবু অলটারনেটর নষ্ট করে রেখেছে। উদ্দেশ্য হলো, হানাদার বাহিনী না পৌঁছুনো পর্যন্ত কনভয়টাকে রওনা হতে দেরি করিয়ে দেয়া। 'তবে ড্রাইভার আমাকে জানিয়েছে, সন্ধে ছ'টার দিকে রওনা হতে পারবে তারা।' তারপর, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়, আলি শাহ্ তাড়াতাড়ি বলল, 'অবশ্য মি. মাসুদ রানা একটু পরই রওনা হয়ে যাচ্ছেন, আপনি তাঁর সঙ্গেও যেতে পারেন। দুর্গম রাস্তা, কত রকম বিপদ ঘটতে পারে...।'

'না। না!' দ্রুত বাধা দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'এত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ট্রাকগুলোর জন্যেই অপেক্ষা করব।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন,' গলা শুনে মনে হলো বিস্মিত হয়েছে আলি শাহ্। 'তবে ড্রাইভার যা-ই বলুক, কখন যে ট্রাকগুলো রওনা হতে পারবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। আমি বললে মি. রানা এক-দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে রাজি হবেন।'

'না।' দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'মি. রানাকে বিরক্ত করতে বা দেরি করিয়ে দিতে রাজি নই আমি। আপনার কনভয়ের সঙ্গেই যাব। ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন।' কথা বাড়ানোর আর সুযোগ না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, চিন্তা করছেন। মাসুদ রানার উপস্থিতি ক্রমশ জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় লোকটা ততই ভাল।

আরও প্রায় বিশ মিনিট পর ওয়ার্ডেনের বাংলোর দিক থেকে ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। চেয়ার ছেড়ে এগোলেন তিনি, বারান্দার জাল দেয়া দরজার সামনে দাঁড়ালেন। পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে টয়োটা ল্যাণ্ডক্রুজার। ট্রাকের দরজায় আঁকা রয়েছে মাসুদ রানা প্রডাকশন-এর লোগো–দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা হাত, ইস্পাতের কাঁটাঅলা ব্রেসলেট পরানো হয়েছে কব্জিতে, কনুই ভাঁজ হয়ে আছে, শক্ত হয়ে আছে বাহু, বডি-বিল্ডারের মত ফুলে আছে বাইসেপ। ড্রাইভারের সীটে বসে রয়েছে রানা, পাশের সীটে ওর ক্যামেরাম্যান।

আপদ অবশেষে বিদায় হচ্ছে, ভাবলেন অ্যামব্যাসাডর। ঠোঁটে সন্তুষ্টির ক্ষীণ হাসি, হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। হেডকোয়ার্টারে হামলা শুরু হবার আগে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্যে অন্তত চার ঘণ্টা সময় পাবে ওরা।

তাঁকে দেখতে পেয়ে ব্রেক করল রানা। পাশের জানালার কাচ নামিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আলি শাহ্ বলল আপনিও আজ চলে যাচ্ছেন,' বলল ও। 'আমরা কি সত্যিই আপনার কোনও সাহায্যে আসব না?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা,' সবিনয়ে হাসলেন অ্যামব্যাসাডর। 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। প্লীজ, আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।'

রানা তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, মেদহীন ঋজু কাঠামো, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল–সব মিলিয়ে চেহারায় এমন কিছু আছে যা ভয় পাইয়ে দেয়। বিশেষ করে মনে যদি কোন পাপ থাকে। হ্যাঁ, বিশেষ করে মনে যদি কোন পাপ থাকে। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সোজা, হাসিটা অলস। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ভাবলেন, পশ্চিমা বা অন্যান্যদের চোখে, বিশেষ করে মেয়েদের চোখে, লোকটার চেহারা দারুণ আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, তবে তাঁর চোখে নাকটা অতিরিক্ত খাড়া, চওড়া মুখে শিশুসুলভ জ্যান্ত একটা ভাব। গুরুতর কোন হুমকি নয় মনে করে ওকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন, পারছেন না শুধু চোখ দুটোর জন্যে। ওই চোখ জোড়াই তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। সুন্দর চোখ; চীনাদের মত নয়, জাদু ও মায়ায় ভরা, তবে অত্যন্ত সতর্ক ও অন্তর্ভেদী।

আবার হাসার আগে ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর জানালা দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দিলেন ডান হাতটা।

'বেশ, উদ্বিগ্ন হলাম না, মি. অ্যামব্যাসাডর। মনে আশা থাকল, শিগগির কোন একদিন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন গল্প করার সুযোগ পাব।' গিয়ার-শিফট এনগেজ করল রানা, ডান হাতটা তুলে নাড়ল একবার, ক্যাম্পের

মেইন গেটের দিকে ছেড়ে দিল গাড়ি।

ট্রাকটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালেন পাহাড় চূড়ার দিকে। পাহাড়ের মাথার দিকটা কুমীরের দাঁতের মত অসমান ও উঁচুনিচু।

প্রায় বিশ মাইল পশ্চিমে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল, আলোর সরু একটা রেখা এঁকেবেঁকে ছুটল। তারপর মেঘের ফুলে থাকা পেট থেকে ঝরতে শুরু করল বৃষ্টি। ঝাপসা হয়ে গেল দূরের পাহাড়গুলো।

মনে মনে চাখার সিংকে ধন্যবাদ দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। এর চেয়ে ভাল সময় আর হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা উপত্যকা ভেসে যাবে বৃষ্টির পানিতে। চিউইউইয়ে যদি কোন রহস্যময় ঘটনা ঘটে, খবর পাওয়ামাত্র একটা পুলিস টিমকে তদন্তের জন্যে পাঠানো হবে, কিন্তু রওনা হবার পর তারা দেখবে রাস্তা বন্ধ। তবু যদি কোনভাবে তারা পার্কের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে পারে, কোন লাভ হবে না–ফিরতি পথে রেখে যাওয়া হানাদার বাহিনীর সমস্ত ছাপ ও চিহ্ন ধুয়েমুছে যাবে তুমুল বর্ষণে।

'এখন শুধু ওরা এলেই হয়,' ব্যাকুল প্রার্থনার মত বিড়বিড় করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'ঘটনাটা যেন আজ ঘটে, কাল নয়।' আবার হাতঘড়ি দেখলেন। এখনও দুটো বাজেনি। সূর্য ডুববে সাতটা ত্রিশে, তবে আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আরও আগে অন্ধকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। 'যেন আজই ঘটে,' আবার বিড়বিড় করলেন তিনি।

বারান্দার একটা টেবিল থেকে বিনকিউলার ও 'বার্ডস অভ সাউথ আফ্রিকা' নামে একটা বই নিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তিনি যে একজন নির্ভেজাল ন্যাচারালিস্ট, ওয়ার্ডেনের কাছে এটা প্রমাণ করার একটা তাগাদা অনুভব করছেন। এখানে এসে থাকতে চাওয়ার পিছনে সেটাই অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মার্সিডিজে চড়ে আইভরি গুদামের পিছনে ওয়ার্ডেনের অফিসে চলে এলেন তিনি। নিজের ডেস্কে বসে আছে আলি শাহ। বাকি সব সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদের মত ওয়ার্ডেনের মোট কর্ম-সময়ের অর্ধেকটাই ব্যয় হয়ে যায় পূরণ করা ফর্ম ফাইলবন্দী করতে ও বিস্তারিত রিপোর্ট লিখতে। কাগজ-পত্রের স্তূপ থেকে মুখ তুলল সে, দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'রিফ্রিজারেটর ট্রাক মেরামত হতে দেরি হবে, তাই ভাবলাম ফিগ ট্রি প্যান-এর ওয়াটার-হোল থেকে একবার ঘুরে আসি,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন অ্যামব্যাসাডর। সহানুভূতিসূচক হাসি ফুটল ওয়ার্ডেনের ঠোঁটে, দেখল ভদ্রলোকের সঙ্গে বিনকিউলার ও ফিল্ড গাইড রয়েছে। আলি শাহের নিজেরও বার্ড-ওয়াচিং একটা নেশা, প্রকৃতি প্রেমিক যে-কোন মানুষকে ভাল লাগে তার।

'কনভয় রওনা হবার জন্যে রেডি হলেই আমার একজন রেঞ্জারকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে,' বলল আলি শাহ। 'তবে কনভয়টা আজ সন্ধ্যায় রওনা হতে পারবে কিনা বলতে পারছি না। ওরা বলছে, একটা ট্রাকের অলটারনেটর জ্বলে গেছে। এ-দেশে স্পেয়ার পার্টস পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার-ফরেন ক্যারেন্সি কোথায় যে প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করব।'

গাড়ি নিয়ে কৃত্রিম ওয়াটার-হোলে চলে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। চিউইউই হেডকোয়ার্টার থেকে এক মাইল দূরেও নয়, ছোট একটা ঢালের মাথায় মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে ওয়াটার-হোলটা, একটা উইণ্ড মিলের সাহায্যে তোলা পানি নিচের কাদাজলের পুকুরে নেমে যায়, ফলে ক্যাম্পের আশপাশ থেকে পাখি ও পশুরা এদিকে না এসে পারে না।

অবজারভেশন এরিয়ায় গাড়ি থামালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, পুকুরটা এখান থেকে দেখা যায়। কুডু-র ছোট একটা পাল পানি খাচ্ছিল, গাড়ির শব্দে ছুটে পালাল ঝোপের ভেতর।

চণ্ডমণ্ড গণ্ড এত বেশি অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে আছেন যে চোখে বিনকিউলার তোলার ইচ্ছে হলো না, যদিও ওয়াটার হোলে মেঘের মত ঘন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পাখির ঝাঁক। কোন কোন পাখি এত লাল যে দেখে মনে হয় আকাশ-পথে ছুটে যাচ্ছে আগুনের টুকরো। শুধু যে আইভরি কার্ভারের ছুরি হাতে থাকলে চণ্ডমণ্ড গণ্ড শিল্পী হয়ে ওঠেন তা নয়, হাতে তুলি থাকলেও ওয়াটার কালার খুব ভাল আঁকেন তিনি। তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় হলো বুনো পাখি, ট্র্যাডিশনাল রোমান্টিক চীনা পদ্ধতিতে আঁকেন।

আজ তাঁর পাখির ওপর মন দেয়ার মানসিকতা নেই। আইভরি হোল্ডারে সিগারেট গুঁজে ধরালেন তিনি, নার্ভাস ভঙ্গিতে টান দিলেন ঘন ঘন। এই জায়গাতেই পোচারদের লিডারের সঙ্গে তাঁর দেখা হবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে ঝোপগুলোর দিকে বার বার চোখ বুলাচ্ছেন।

আশপাশে কেউ আছে, এটা তিনি প্রথম টের পেলেন তাঁর পাশের জানালার সামনে থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনে। চমকে উঠে ঝট করে ঘাড় ফেরালেন গণ্ড, তাকালেন গাড়ির পাশে সদ্য উদয় হওয়া লোকটার দিকে।

লোকটার মুখে একটা কাটা দাগ, বাম চোখের কোণ থেকে ওপরের ঠোঁট পর্যন্ত লম্বা। ঠোঁটের ওদিকটা কেউ যেন টেনে তুলে ধরেছে, দেখে মনে হবে সারাক্ষণ ব্যঙ্গাত্মক ও আড়ষ্ট হাসি হাসছে লোকটা। দাগটা সম্পর্কে আগেই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে চাখার সিং। লোকটাকে চেনার সহজ একটা উপায়।

'গুচ?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। পোচার লোকটা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। 'তুমি পিটার গুচ?'

'হ্যাঁ,' বলল লোকটা, দোমড়ানো-মোচড়ানো মুখের মাত্র অর্ধেকটায় হাসি ফুটল। 'আমি গুচ।'

গায়ের রঙ বেগুনি-কালো, তার ওপর ক্ষতটা লালচে সরীসৃপ যেন। একটু খাটো, তবে ফুলে আছে পেশীগুলো, কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। শার্টটা ছিঁড়ে গেছে, কোমরের খাকি শর্টসে শুকনো কাদা লেগে রয়েছে। লোকটা যে দীর্ঘ পথ দ্রুত হেঁটে এসেছে তা বোঝা যায় হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন পা দুটো ধুলোয় ঢাকা দেখে। কড়া রোদে তার চামড়া থেকে উৎকট একটা গন্ধ বেরুচ্ছে, মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের, বমির ভাব হতে পিছিয়ে এলেন তিনি। ব্যাপারটা লক্ষ করল পোচারদের লিডার, মুখে চওড়া হলো হাসিটা।

'তোমার লোকজন কোথায়?' জানতে চাইলেন অ্যামব্যাসাডর, আঙুল তুলে

পাশের ঝোপ-ঝাড়গুলো দেখিয়ে দিল গুচ।

'তুমি সশস্ত্র? তোমাদের সবার কাছে অস্ত্র আছে?' আবার জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, গলায় ঝাঁঝ। গুচের হাসিতে বিনয়ের অভাব আরও প্রকট হলো, এ-ধরনের বোকার মত আজেবাজে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। চণ্ডমণ্ড গণ্ড বুঝতে পারছেন, অকস্মাৎ স্বস্তিবোধ করায় এবং নার্ভের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বোকার মত বকবক করছেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেকে সামলে রাখতে হবে, কিন্তু ঠেকাবার আগেই পরবর্তী প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। 'কি করতে হবে তুমি জানো?'

আঙুলের ডগা দিয়ে চকচকে ক্ষতটা চুলকাল গুচ, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'তোমরা কোন সাক্ষী রাখতে পারবে না।' চোখ দেখে চণ্ডমণ্ড গণ্ড অনুমান করলেন তাঁর কথা বুঝতে পারেনি গুচ, কাজেই আবার বললেন, 'ওদের সবাইকে তোমরা খুন করবে। পুলিস এসে যেন কথা বলার জন্যে কাউকে না পায়।'

মাথাটা একপাশে কাত করল গুচ। কিভাবে কি করতে হবে সবই তাকে ব্যাখ্যা করেছে চাখার সিং। চাখার সিং-এর আদেশ খুশিমনে পালন করতে রাজি হয়েছে সে। জিম্বাবুই পার্ক ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে তার একটা আক্রোশ আছে। মাত্র এক বছর আগে গুচের দুই ভাই ছোট একটা দলের সঙ্গে জাম্বেজি পেরিয়ে চিউইউইয়ে এসেছিল গণ্ডার শিকার করার জন্যে। পার্কের অ্যান্টি-পোচিং ইউনিটের সামনে পড়ে যায় তারা। লোকগুলো ছিল প্রাক্তন গেরিলা, ওদের মত তাদের কাছেও ছিল এ-কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। সে যুদ্ধে গুচের এক ভাই মারা পড়ল, অপর ভাইটি শিরদাঁড়ায় গুলি খেয়ে চিরকালের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল। আহত হওয়া সত্ত্বেও হারারেতে নিয়ে গিয়ে বিচার করা হয় তার, জেল দেয়া হয় সাত বছরের।

কাজেই পার্ক রেঞ্জারদের প্রতি তার কোন দরদ নেই। সে বলল, 'কাউকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব না।'

'শুধু দু'জন রেঞ্জারকে বাদে,' শুধরে দিয়ে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'জামবু আর দোরাদে। ওদেরকে চেনো তুমি?'

'চিনি।' ওদের সঙ্গে আগেও কাজ করেছে গুচ।

'ওঅর্কশপে আছে ওরা, বড় একজোড়া ট্রাকে। তোমার লোকদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও কথাটা, কোনভাবেই ওদের দু'জনের বা ট্রাক দুটোর কোন ক্ষতি করা যাবে না।'

'বলব।'

'ওয়ার্ডেনকে পাওয়া যাবে তার অফিসে। তার বউ আর বাচ্চা তিনটে আছে পাহাড়ের ওপর বাংলোয়। ডোমিস্টিক কম্পাউণ্ডে আছে চারজন ক্যাম্প সারভেন্ট ও তাদের পরিবার। গুলি ছোঁড়ার আগে দেখে নিয়ো জায়গাটা ঘেরাও করা হয়েছে কিনা।'

'গাছের ডালে বসে লেজ ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা বাঁদর, একটা শিয়াল লেজটা কামড়ে ধরল—বাঁদর এখন কি করবে? সে যা করবে আপনি এখন ঠিক তাই করছেন।' গুচের চেহারায় বিরক্তি ও রাগ। 'কি করতে হবে না হবে সবই আমার

জানা। চাখার সিংই তো একবার বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে যাও, যেমন বলা হয়েছে করো,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

জানালার দিকে হঠাৎ ঝুঁকল গুচ, দম আটকে কয়েক ইঞ্চি সরে বসলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তর্জনীর মাথার দিকটায় ঘন ঘন বুড়ো আঙুলের নখ ঘষল গুচ, টাকার আন্তর্জাতিক সংকেত দিচ্ছে। মার্সিডিজের ড্যাশবোর্ডের দিকে হাত বাড়ালেন অ্যামব্যাসাডর, একটা দেরাজ খুলে এক হাজার ডলারের তিনটে বাণ্ডিল বের করে ধরিয়ে দিলেন গুচের বাড়ানো হাতে। ক্যাম্প ওয়্যারহাউসে রাখা সমস্ত আইভরির দাম পড়ছে প্রতি কিলো প্রায় পাঁচ মার্কিন ডলার, তাইপেতে ওগুলো বিক্রি হবে প্রতি কিলো এক হাজার ডলারে।

লাভবান একা শুধু চণ্ডমণ্ড গণ্ডই হচ্ছেন না, সবুজ নোটগুলো গুচের জন্যেও বিরাট একটা সম্পদ। একবারে এত টাকা জীবনে কখনও তার হাতে আসেনি। জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে হয় তাকে, যে-কোন মুহূর্তে অ্যান্টি-পোচিং ইউনিটের গুলি খেয়ে প্রাণ হারাতে হতে পারে, তারপর যদি ভাল একটা হাতি মারতে পারে, সেটার দাঁত কাঁধে নিয়ে দুর্গম এলাকার ওপর দিয়ে হেঁটে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছুতে হবে তাকে, তবেই মজুরি হিসেবে পাওয়া যাবে ত্রিশ ডলার। সে তুলনায় তিন হাজার ডলার তার কাছে ঐশ্বর্য বৈকি। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে পাঁচ বছরে যা আয় করবে সে, এবার একদিনেই তা পেয়ে যাচ্ছে। কাজেই কয়েকজন পার্ক কর্মচারীকে খুন করতে অসুবিধে কি! তুলনা করলে, এই কাজে ঝুঁকির পরিমাণ কম। তাছাড়া, প্রতিশোধ নেয়ারও সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

লাভের হিসেব করে দু'জনেই ওরা খুশি।

'গুলির শব্দ না শোনা পর্যন্ত এখানেই আমি অপেক্ষা করব,' চাপা গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, শুনে গুচের একদিকের ঠোঁটে হাসি ফুটল।

'আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' কথা দিল সে, তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

দুই

ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ি নিয়ে খুব কম লোকই পার্কে আসে, সে-কথা মনে রেখে নিয়মিত মেরামত করা হয় রাস্তাটা। তবে কোন ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়ো নেই, শান্ত ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। ওর টয়োটায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এড়াতে পারলে মোটেল বা হোটেলে উঠতে চায় না ও। এ-দেশে ওগুলো শুধু যে সংখ্যায় কম তা নয়, সেবা ও খাবারের মানও ভাল নয়, তারচেয়ে ওর অস্থায়ী ক্যাম্প অনেক বেশি সন্তুষ্ট করতে পারে।

আজ বিকেলটা চলার মধ্যেই থাকবে ও, সূর্য ডোবার খানিক আগে বনভূমির পছন্দসই কোন ফাঁকা জায়গা বা কোন মনোরম পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে ক্যাম্প

ফেলবে, রাস্তা থেকে যথেষ্ট দূরে হতে হবে সেটাকে। ওর ধারণা, খুব বেশি হলে মানা পুল পর্যন্ত যেতে পারবে ওরা, আজ আর মেইন হাইওয়েতে পৌঁছুনো সম্ভব হবে না। জাম্বেজি নদীর ওপর চিরুণ্ডু ব্রিজ থেকে শুরু হয়েছে হাইওয়েটা, দক্ষিণ দিকে চলে গেছে কারোইকে ছুঁয়ে হারারে পর্যন্ত।

সঙ্গী হিসেবে পল নিউম্যান চমৎকার। তাকে ভাড়া করার সেটাও একটা কারণ। মাঝখানে মাস কয়েক বিরতি দিয়ে প্রায় এক বছর হলো একসঙ্গে কাজ করছে ওরা। পল ফ্রিল্যান্স ক্যামেরাম্যান, রানা কোন নতুন প্রজেক্ট সই করলেই তাকে ডেকে নেয়। দু'জন একসঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশ প্রায় চষে ফেলেছে ইতিমধ্যে–নামিবিয়ার নিষিদ্ধ সৈকত স্কেলিটন কোস্ট থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষপীড়িত ঈথিওপিয়া ও সাহারার গভীরতম প্রদেশ, কোথাও যেতে বাকি রাখেনি। যদিও প্রাণপ্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠেনি ওরা, তবে দুর্গম এলাকায় একসঙ্গে কাজ করার ও পরস্পরকে সম্মান দেখানোর মানসিকতা তৈরি করে নিয়েছে। ওদের মধ্যে ঝগড়া বা মন কষাকষি প্রায় হয় না বললেই চলে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছুটছে ভারি ট্রাক, খুশি মনে গল্প করছে দু'জন। যখনই কোন পাখি, পশু বা অসাধারণ কোন গাছ চোখে পড়ছে, গাড়ি থামিয়ে নোট নিচ্ছে রানা, ছবি তুলছে পল।

বিশ মাইলও এগোয়নি, রাস্তার এমন একটা অংশে পৌঁছুল, যেখানে আগের দিন রাতে হাতির বড় একটা পাল খাদ্য গ্রহণ করেছে। ডালপালা ভেঙেছে তারা, ফেলে দিয়েছে বড় আকারের অনেকগুলো গাছ। কোন কোন গাছ রাস্তার ওপর পড়েছে, ফলে গাড়ি নিয়ে এগোবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যে-সব গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, একটারও ছাল বলে কিছু নেই–সাদা কাণ্ডগুলো নগ্ন দাঁড়িয়ে, রস ঝরিয়ে কাঁদছে।

'ব্যাটারা মহা পাজি,' আপনমনে হাসছে রানা। 'যেন রাস্তা বন্ধ করাটাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।' নিয়মিত কালিং অপারেশন যে একান্ত দরকার, চারদিকের ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডই তার প্রমাণ।

অনেক কষ্টে রাস্তা থেকে নামতে পারল ওরা, ধরাশায়ী অসংখ্য গাছ এড়িয়ে ঘুরপথে এগোল। মাঝে মধ্যে নামতে হলো ট্রাক থেকে, টয়োটার টো চেইনের সঙ্গে বেঁধে বিশাল আকৃতির কাণ্ড সরাতে হলো দু'চারটে। কাজেই উপত্যকার নিচে পৌঁছুতে চারটে বেজে গেল ওদের। বনভূমির ভেতর পুবদিকে ঘুরল ওরা, এগোল মানা পুল টার্ন-অফ লক্ষ করে–যেখানটায় কালিং অপারেশনের ছবি তুলেছিল, জায়গাটা তার কাছাকাছি।

এই পর্যায়ে ওরা মগ্ন হয়ে আলোচনা শুরু করেছে, টেপে যে বিপুল ফিল্ম রয়েছে তা কতটা ভালভাবে রানার পক্ষে সম্পাদনা করা সম্ভব। রীতিমত উত্তেজিতই বলা যায় রানাকে। সমস্ত মাল-মশলা ওর হাতের মুঠোয়, এখন শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলোকে সাজানোর ব্যাপার। লণ্ডনে ফিরেই নিজের স্টুডিওতে ঢুকবে, ডার্করুমে কাটিয়ে দেবে দিনের পর দিন।

পল কি বলছে সেদিকে একটা কান থাকলেও, চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রানা। তাসত্ত্বেও ব্যাপারটা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি

চালিয়ে আরও দুশো গজ এগিয়ে আসার পর ওর খেয়াল হলো, অস্বাভাবিক কিছু পাশ কাটিয়ে এসেছে। ব্রেক করল ও। মুখে কথা আটকে গেল পলের, অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল সে।

'কি ব্যাপার, রানা?'

'কি জানি।' সীটে মোচড় খেল রানার শরীর, পিছু হটছে ল্যান্ডক্রুজার। 'হয়তো কিছু না,' বিড়বিড় করল ও, যদিও মনে সন্দেহের একটা কাঁটা খচ খচ করে বিঁধতে শুরু করেছে।

ট্রাক থামাল রানা, নিচে নামল।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' অপরদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকল পল।

'সেটাই তো ব্যাপার,' সমর্থন করল রানা। 'এখানে একটা অংশ একেবারে খালি।' আঙুল দিয়ে ধূলিময় রাস্তাটা দেখাল ও। ধুলোর ওপর অসংখ্য জটিল রেখা আঁকা রয়েছে–খুদে গুলতি আকৃতির রেখা, ওগুলো পাখির পা; কিছু রেখা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, সরীসৃপের তৈরি; আঙটা আকৃতির দাগগুলো হরিণের। শিয়াল ও বেজির ছাপগুলোও আলাদাভাবে চেনা গেল। কিন্তু রাস্তার একটা পাশে এ-সব কোন দাগই নেই। হাঁটু মুড়ে বসল রানা, জায়গাটা ভাল করে দেখল। বলল, 'দাগ বা ছাপ কেউ একজন মুছে রেখে গেছে।'

'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?' ট্রাক থেকে নেমে রানার পাশে চলে এল পল।

'হয়তো কিছু নেই,' সিধে হলো রানা। 'কিংবা অনেক কিছু আছে। নির্ভর করে কিভাবে তুমি ব্যাপারটাকে দেখছ।'

'জ্ঞানদান করো,' আমন্ত্রণ জানাল পল।

'শুধু মানুষ তার পদচিহ্ন গোপন করে, এবং সাধারণত শুধু যখন তাদের উদ্দেশ্য খারাপ থাকে। ভেবে দেখো, একটা ন্যাশন্যাল পার্কের মাঝখানে কোন লোকের হাঁটাহাঁটি করার কথা নয়।'

নরম মাটি পাতাসুদ্ধ ডাল দিয়ে সাবধানে ঝাড়ু দেয়া হয়েছে। জায়গাটাকে ঘিরে ঘুরছে রানা, পথ থেকে নেমে এল কিনারার ঘাসের ওপর। অ্যান্টি-ট্র্যাকিং, কোন সন্দেহ নেই–আরও অনেক লক্ষণ চোখে পড়ল। ঘাসের চাপড়াগুলো চ্যাপ্টা হয়ে আছে, একদল মানুষ ওগুলোকে ধাপ হিসেবে ব্যবহার করে এগিয়ে গেছে। লক্ষণ দেখে ধারণা করা যায়, বেশ বড়সড় একটা দল ছিল–রানা অনুভব করল, ওর বাহুর রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, শিরশির করছে ঘাড়ের পিছনটা।

রাস্তা ধরে আরও পঞ্চাশ গজ এগোবার পর প্রথম একটা মানুষের পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখতে পেল রানা। আরও কয়েক গজ এগিয়ে দলটা সরু একটা পথে নেমে গেছে, যে-পথে শুধু পশুরা আসা-যাওয়া করে। এখান থেকে তারা এক লাইনে এগিয়েছে, পায়ের ছাপ মোছার ঝামেলায় যায়নি। পদক্ষেপগুলো দীর্ঘ, সোজা যেন চিউইউই বেস ক্যাম্প-এর দিকে চলে গেছে। দলটা কত বড় হতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। পায়ের ছাপ গুণে ধারণা করল ষোলো থেকে বিশজনের মধ্যে হবে।

ছাপগুলো আরও দুই কি তিনশো গজ অনুসরণ করার পর থামল রানা, চিন্তা করছে। লোকগুলোর সংখ্যা ও যেদিক থেকে এসেছে, এ-সব মনে রাখলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ওরা আসলে জাম্বিয়ান পোচার, জাম্বেজি নদী পেরিয়ে হাতির দাঁত ও গণ্ডারের সিং সংগ্রহ করতে এসেছে। পায়ের ছাপ মুছে ফেলার কারণটাও বোঝা গেল।

রানার এখন উচিত আলি শাহকে সাবধান করে দেয়া, সে যাতে অ্যান্টি-পোচিং ইউনিট পাঠিয়ে দলটাকে বাধা দিতে পারে। কাজটা করার সহজ উপায় কি ভাবছে ও। মানা পুল-এ, রেঞ্জারের অফিসে, ফোন আছে–গাড়ি পথে এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টা লাগবে পৌঁছুতে। কিংবা রানা চিউইউই পার্কে ফিরে যেতে পারে, সশরীরে উপস্থিত হয়ে খবরটা দেবে।

জঙ্গলের ভেতর, খুব বেশি দূরে নয়, টেলিফোন পোলগুলো দেখতে পেল রানা, ফলে সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ হয়ে গেল। পোলগুলো গাছ কেটে তৈরি করা, পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে গায়ে কালো তেলতেলে অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড মাখানো হয়েছে। প্রতি জোড়া পোলের মাঝখানে ঝুলে থাকা তামার টেলিফোন তার শেষ বিকেলের রোদে চকচক করছে–শুধু সরাসরি সামনে একজোড়া পোলের মাঝখানটা বাদে, ওখানটায় কোন তার নেই।

দ্রুত সামনে বাড়ল রানা, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টেলিফোনের তার কেটে ফেলা হয়েছে। কাছের পোলটার সাদা সেরামিক ইনসুলেটার থেকে কাটা অংশটুকু ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে কাটা অংশের শেষ প্রান্তটা ধরল রানা, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। কোন সন্দেহ নেই, সযত্নে কাটা হয়েছে। কাটা তারের কিনারায় প্লায়ার্সের দাগ স্পষ্ট। তাছাড়া, পোলের গোড়ায় অনেক লোকের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

'একদল পোচার টেলিফোন লাইন কাটবে কেন?' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা। এখন শুধু বিস্মিত নয়, সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে ও। 'গোটা ব্যাপারটা কুৎসিত একটা চেহারা নিচ্ছে। আলিকে আমার সাবধান করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ভদ্রলোকদের তার বাধা দেয়া দরকার। এখন তাকে সাবধান করার একটাই উপায় আছে...।' ফেলে আসা ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে ছুটল ও।

'কি ছাই ঘটছে এখানে?' জানতে চাইল পল।

লাফ দিয়ে ট্রাকের ক্যাব-এ উঠল রানা, স্টার্ট দিল মোটর। 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে যা-ই হোক না কেন, ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।' পিছু হটে রাস্তা থেকে গাড়ি নামাল ও, তারপর বাঁক ঘুরতে শুরু করে আবার রাস্তায় উঠল, ফিরে যাচ্ছে উল্টোপথে।

এবার রানা দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে, টয়োটার পিছনে রেখে যাচ্ছে ধুলোর দীর্ঘ একটা মেঘ, গতি কমিয়ে আনছে শুধু শুকনো নালাগুলোর ঢাল বেয়ে ওঠা বা নামার সময়। এক সময় ওর মনে হলো, রাস্তাটা ঘোরা পথ ধরে এগিয়েছে, পোচাররা যদি রাস্তা ছেড়ে ঢালগুলোর মাথা টপকে হাঁটে, ত্রিশ মাইল পথ কমিয়ে আনতে পারবে তারা। মনে মনে একটা হিসেব করল ও, টেলিফোনের তার কাটা

হয়েছে পাঁচ কি ছ'ঘণ্টা আগে।

একটা ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকছে না। পোচারদের একটা দল চিউইউই হেডকোয়ার্টারে যাবে কেন! সত্যিই কি ওখানে যাচ্ছে তারা? ওদিকেই যে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ওদিকে নয়, ওখানেই যাচ্ছে; তা না হলে টেলিফোন লাইন কাটবে কেন? ওদের আচরণ অদ্ভুত, রহস্যময়, অশুভ ও বৈরী। সত্যি যদি ওদের গন্তব্য চিউইউই হয়ে থাকে, এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘুরপথে না গিয়ে ওরা ঢালের ওপর দিয়ে গেছে, ফলে হেডকোয়ার্টার ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে এক কি দেড় ঘণ্টা আগে।

কিন্তু কেন? ওখানে কোন ট্যুরিস্ট নেই। কেনিয়া সহ দক্ষিণের অন্যান্য দেশে পোচাররা হাতি শেষ করার পর ট্যুরিস্টদের ওপর হামলা চালায়, সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেয় তাদের। এই দলটা হয়তো ছিনতাই বা ডাকাতি করার জন্যে গেছে। কিন্তু চিউইউইয়ে কোন ট্যুরিস্ট নেই। মূল্যবান এমন কিছু নেই যে...। হঠাৎ প্রায় শিউরে উঠল রানা। 'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল ও। 'আইভরি!' হঠাৎ গায়ের ঘাম বরফ হয়ে উঠল যেন। 'আলি,' ফিসফিস করল। 'রুমানা...বাচ্চারা...!'

রাস্তার ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে ল্যাণ্ডক্রুজার। প্রথম বাঁকটা পেরোবার সময় স্পীড একটুও কমাল না রানা। চুলের কাঁটার মত বাঁক, কোণটায় পৌঁছুতেই দেখতে পেল প্রকাণ্ড সাদা একটা গাড়ি পুরোটা রাস্তা দখল করে রেখেছে। সাথে সাথে ব্রেক করল ও, দেখামাত্র চিনতে পেরেছে ওটা রিফ্রিজারেটর ট্রাকগুলোর একটা। সংঘর্ষ বাধতে বাধতেও বাধল না। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমে গেল রানার ট্রাক, একটা বুনো ডুমুর গাছে আরেকটু হলে ধাক্কা লাগত। ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে প্রায় থেঁতলে গেল পলের শরীর।

টয়োটা থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে একপাশে দাঁড়াতে পেরেছে রিফ্রিজারেটর ট্রাক, ওর টয়োটার টেইলগেইটের সামনে বাধা হয়ে। ছুটে এল ও, চিনতে পারল সিনিয়র রেঞ্জার জামবুকে। সেই রিফ্রিজারেটর ট্রাক চালাচ্ছে।

'দুঃখিত। দোষটা আমারই। তুমি ঠিক আছো তো?'

ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে জামবুর শরীরে। তবে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'আমি ঠিক আছি, মি. রানা।'

'চিউইউই থেকে কখন রওনা হয়েছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

ইতস্তত করছে জামবু। যে-কোন কারণেই হোক, প্রশ্নটা তাকে ঘাবড়ে দিয়েছে।

'কতক্ষণ আগে?' রানা নাছোড়বান্দা।

'সঠিক বলতে পারব না...,' ঠিক এই সময় আরেকটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল।

ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, পরবর্তী বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় রিফ্রিজারেটর ট্রাক। ঢাল বেয়ে নামছে ওটা, অত্যন্ত মন্থরগতি, ড্রাইভার খুব সতর্কতার সঙ্গে চালাচ্ছে। ওটার পঞ্চাশ গজ পিছনে দেখা গেল অ্যামব্যাসাডর

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের মার্সিডিজটাকে। গাড়ি দুটো জামবুর ট্রাকের পিছনে থামল। দ্রুত পা চালিয়ে মার্সিডিজের দিকে এগোল রানা।

রানা এগোচ্ছে, মার্সিডিজের দরজা খুলে ধুলো ঢাকা পথের ওপর নেমে পড়লেন অ্যামব্যাসাডর গণ্ড। 'মি. মাসুদ রানা, আপনি এখানে কি করছেন?' দেখে মনে হলো তিনি অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন, তবে গলার আওয়াজ খুব নরম, কোন রকমে শোনা গেল।

'চিউইউই থেকে কখন রওনা হয়েছেন আপনারা?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। আলি শাহ আর রুমানা নিরাপদে আছে কিনা জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ও। অ্যামব্যাসাডরের প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত লাগল ওর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের চেহারা। 'এ-কথা কেন জানতে চাইছেন?' ফিসফিস করলেন। 'কি কারণে ফিরে এলেন আপনি? আপনার তো হারারে যাবার কথা।'

'শুনুন, মি. অ্যামব্যাসাডর। আমি শুধু জানতে চাই চিউইউইতে কোন বিপদ ঘটেনি।'

'বিপদ? কি বিপদ? কেন কোন বিপদ ঘটতে যাবে?' পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রুমাল বের করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন আপনি, মি. রানা?'

'কিছুই বোঝাতে চাইছি না।' বিরক্তি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল রানার পক্ষে। 'রাস্তায় একদল লোকের পায়ের ছাপ দেখেছি আমি, চিউইউইয়ের দিকে এগিয়েছে। ওরা সম্ভবত সশস্ত্র পোচার বলে ভয় হচ্ছে আমার, তাই ওয়ার্ডেনকে সাবধান করার জন্যে ফিরে যাচ্ছি।'

'কোন বিপদ ঘটেনি,' রানাকে আশ্বস্ত করলেন গণ্ড। রানা লক্ষ করল, তাঁর কপালে ঘামের পাতলা একটা প্রলেপ পড়েছে। 'সব ঠিকঠাক আছে। এক ঘণ্টা আগে ওখান থেকে রওনা হয়েছি আমি। ওয়ার্ডেন আলি শাহ ভাল আছেন। রওনা হবার আগে আমি নিজে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। কোথাও কোন বিপদের আভাস পাইনি।' রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন তিনি।

'এক ঘণ্টা আগে?' জিজ্ঞেস করল রানা, চোখ নামাল স্টেনলেস স্টীল রোলেক্সে। অ্যামব্যাসাডর গণ্ডের আশ্বাস শুনে বিরাট স্বস্তিবোধ করছে ও। 'তারমানে আপনি সাড়ে পাঁচটার দিকে ওখান থেকে বেরিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তাই।' চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলায় ঝাঁঝ। 'আপনি আমাকে জেরা করছেন নাকি? আমার কথা অবিশ্বাস করছেন?'

তাঁর গলা শুনে অবাক হয়ে গেল রানা। 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, মি. অ্যামব্যাসাডর। আপনার কথা অবিশ্বাস করব কেন?'

অ্যামব্যাসাডর হিসেবে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের যে মর্যাদা, প্রধানত সেই মর্যাদার কারণেই চাখার সিং জেদ ধরেছিল অপারেশনের সময় তাঁকে চিউইউইয়ে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। অ্যামব্যাসাডরের স্বাভাবিক ইচ্ছে ছিল অকুস্থল থেকে অনেক দূরে থাকা, এমন কি চেয়েছিলেন যে হানা দেয়ার প্রস্তুতি চলার সময় তাইপেগামী প্লেনে উঠে বসবেন, যাতে নিশ্ছিদ্র একটা অ্যালিবাই পেয়ে যান। কিন্তু

চাখার সিং হুমকি দিয়ে বলেছে, সেক্ষেত্রে অপারেশন বাতিল করে দেবে সে। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে চিউইউইয়ে থাকতে বলার পিছনে কারণ আছে তার। ট্রাকের কনভয়টা চিউইউই ত্যাগ করার পর হামলা হয়েছে, তাঁর মত ব্যক্তিত্ব এ সাক্ষী দিলে পুলিসী তদন্তে দারুণ প্রভাব পড়বে। কালো দু'জন রেঞ্জারের সাক্ষী ততটা বিশ্বাসযোগ্য বলে না-ও গ্রহণ করা হতে পারে। থানায় আটকে রেখে জেরা করার সময় পুলিস যদি ওদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়, ওরা তা সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।

না, পুলিসকে অবশ্যই বিশ্বাস করাতে হবে যে কনভয়ের সঙ্গে চণ্ডমণ্ড গণ্ড যখন চিউইউই ত্যাগ করেন তখন সব ঠিক ছিল। তাহলেই শুধু তারা ধরে নেবে, হানাদাররা সমস্ত আইভরি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কিংবা আগুন লেগে গুদামের সঙ্গে ওগুলোও ছাই হয়ে গেছে।

'আমি আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করছি, আপনার এ-ধারণা কেন হলো বুঝতে পারছি না,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আপনার ভুল বোঝার জন্যে কোনভাবে যদি আমি দায়ী হয়ে থাকি, সেজন্যে দুঃখিত, মি. অ্যামব্যাসাডর। আসলে আমি শুধু আলি, ওয়ার্ডেনের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছি।'

'বললামই তো, আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।' হিপ পকেটে রুমালটা গুঁজে রাখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর সিগারেটের প্যাকেট বের করার জন্যে বুক-খোলা শার্টের টপ পকেটে হাত তুললেন। প্যাকেটে টোকা দিয়ে একটা সিগারেট বের করলেন তিনি, কিন্তু আঙুলগুলো সামান্য কাঁপতে থাকায় ফাঁক গলে সেটা দু'পায়ের মাঝখানে ধুলোর ওপর পড়ে গেল।

সেটা তোলার জন্যে ঝুঁকলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, রানার দৃষ্টিও তাঁর পায়ের মাঝখানে নেমে এল। অ্যামব্যাসাডরের পায়ে সাদা ক্যানভাস ট্রেনিং শ্যু। রানা লক্ষ করল, একটা জুতোর পাশে ও নীল সুতী স্ল্যাকসের কিনারায় ঘন দাগ লেগে রয়েছে, প্রথমদর্শনে মনে হলো যেন শুকিয়ে যাওয়া রক্ত।

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা, তারপর ওর মনে পড়ল সকালের দিকে গোডাউনে তাজা আইভরি তোলার সময় অ্যামব্যাসাডর উপস্থিত ছিলেন। গুদামে তোলার সময় আইভরিগুলোয় রক্ত ছিল, কাছাকাছি থাকায় সেই রক্তই কোনভাবে তাঁর কাপড় ও জুতোয় লেগেছে।

রানার দৃষ্টি কোথায় আটকে আছে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, ভঙ্গিটা একজন অপরাধীর মত। মার্সিডিজের ড্রাইভিং সীটে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। রাস্তার মিহি ধুলোয় তাঁর জুতোর সোল মাছের আঁশ আকৃতির দাগ এঁকেছে, অন্যমনস্কভাবে সেদিকে একবার তাকাল রানা।

'আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারায় আমি খুশি, মি. রানা।' মার্সিডিজের জানালা থেকে হাসলেন অ্যামব্যাসাডর। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছেন তিনি, তাঁর হাসি আবার মার্জিত ও মনোহর হয়ে উঠল। 'ভাল লাগছে আবার সেই চিউইউই ফিরে যাওয়ার কষ্ট থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি বলে। বোঝাই যাচ্ছে কনভয়ের সঙ্গে যোগ দেবেন আপনি, বৃষ্টি শুরু হবার আগে বেরিয়ে

যেতে চাইবেন পার্ক থেকে।' মার্সিডিজ স্টার্ট দিলেন তিনি। 'এক কাজ করুন না, কনভয়ের মাথায় চলে যান, পথ দেখান আমাদের।'

'ধন্যবাদ, মি. অ্যামব্যাসাডর।' মাথা নেড়ে পিছিয়ে এল রানা এক পা। 'কনভয়ের সঙ্গে আপনি যান। আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। চিউইউইতে এমনিতেও আমাকে যেতে হবে। মালিককে সাবধান করা দরকার।'

মুখের হাসি নিভে গেল, রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অ্যামব্যাসাডর। 'কোন প্রয়োজন নেই, শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিতে চাইছেন আপনি। সাবধান যদি করতেই চান, মানা পুল বা কারোই থেকে ফোন করলেই তো চলে।'

'আপনাকে বলিনি? টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে ওরা।'

'মি. রানা, এ একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আপনি যে ভুল করছেন এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। টেলিফোন লাইন অনেকভাবেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আপনি শুধু শুধু···।'

'যা খুশি তাই ভাবুন আপনি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি চিউইউইয়ে ফিরে যাচ্ছি।' মার্সিডিজের দিকে পিছন ফিরল ও।

'মি. রানা, আকাশের দিকে তাকান, প্লীজ।' পিছন থেকে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'মেঘগুলো কি রকম কালো দেখেছেন? আপনি এখানে কয়েক হপ্তার জন্যে আটকা পড়তে পারেন।'

'ঝুঁকিটা আমি নেব,' জানিয়ে দিল রানা। মনে মনে ভাবল, ভদ্রলোক এরকম জেদ ধরছেন কেন? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমাকে উনি চিউইউইয়ে ফিরে যেতে দিতে চান না। কারণ কি? কিসের যেন একটা দুর্গন্ধ রয়েছে এখানে। কিছু একটা পচেছে।

দ্রুত পায়ে ল্যাণ্ডক্রুজারের কাছে ফিরে এল রানা। ট্রাকগুলোকে পাশ কাটাবার সময় লক্ষ করল, ড্রাইভারের ক্যাব থেকে রেঞ্জাররা কেউ নিচে নামেনি। দু'জনকেই গম্ভীর দেখল ও, ওকে দেখেও কথা বলল না। 'ঠিক আছে, জামবু,' বলল ও, 'তোমার ট্রাক সামনে বাড়াও, আমি যাতে তোমাকে পাশ কাটাতে পারি।'

কোন কথা বলল না জামবু, তবে রানার নির্দেশ পালন করল। তারপর দ্বিতীয় ট্রাকটাও সগর্জনে সামনে বাড়ল। সবশেষে মার্সিডিজটা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নাড়ল রানা। ওর দিকে চণ্ডমণ্ড গণ্ড ভাল করে তাকালেন না, তবে সাড়া দিয়ে তিনিও হাতটা তুললেন। ট্রাকগুলোর পিছু পিছু বাঁক নিল মার্সিডিস, মানা পুলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'সর্পভুক ভদ্রলোকের বক্তব্যটা কি ছিল?' টয়োটাকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনছে রানা, জানতে চাইল পল।

'বললেন এক ঘণ্টা আগে রওনা হবার সময় চিউইউইয়ে সব ঠিক ছিল,' জবাব দিল রানা।

'তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' কোল্ড বক্সের দিকে হাত বাড়াল পল, বিয়ারের একটা ক্যান বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। মাথা নাড়ল রানা, মন দিল

সামনের রাস্তায়। ক্যানটা নিজেই খুলল পল, চুমুক দিল লম্বা, তারপর খোশ মেজাজে মস্ত এক ঢেকুর তুলল।

দ্রুত কমে যাচ্ছে আলো, বৃষ্টির ভারি ফোঁটাগুলো উইণ্ডস্ক্রীনে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে, তবু স্পীড কমাচ্ছে না রানা। চিউইউইয়ের পথে সর্বশেষ ঢালটাকে পাশ কাটানোর সঙ্গে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। অবশ্য মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠছে বনভূমি। হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ঝাঁক ঝাঁক রূপালি তীরের মত লাগছে। প্রতিটি ফোঁটা কাচে লেগে বিস্ফোরিত হচ্ছে, তারপর স্রোতের মত নেমে আসছে, ফলে ঝাপসা হয়ে গেল উইণ্ডশীল্ড, ওয়াইপার কোন কাজে আসছে না। ভেতর দিকে ঘেমেও যাচ্ছে কাচ। হাত দিয়ে মোছার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। মোছার পর আবার ঘেমে গেল। বিরক্ত হয়ে নিজের দিকের জানালাটা কয়েক ইঞ্চি খুলল ও, ভেতরে রাতের বাতাস ঢুকুক খানিকটা। জানালা খোলার প্রায় সাথে সাথে কুঁচকে উঠল ওর নাকের ডগা।

একই সময়ে পলও পেল গন্ধটা। 'ধোঁয়া!' অবাক হয়ে বলল সে। 'ক্যাম্প থেকে কত দূরে আমরা?'

'প্রায় পৌঁছে গেছি,' জবাব দিল রানা।

ধোঁয়ার গন্ধ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বাতাসে। রানা ভাবল, গন্ধটা চাকরবাকরদের চুলো থেকেও আসতে পারে।

হেডলাইটের আলোয় ওদের সামনে লাফিয়ে উঠল মেইন ক্যাম্পের গেট। প্রতিটি চুনকাম করা স্তম্ভের মাথায় ছাল ও মাংস ছাড়ানো হাতির কংকাল বসানো রয়েছে। সাইনবোর্ডের লেখাগুলো এরকম:

চিউইউই ক্যাম্পে স্বাগতম
হাতিদের সালাম নিন

তারপর ছোট হরফে লেখা হয়েছে:

সকল ভিজিটর এখানে পৌঁছামাত্র ওয়ার্ডেনের
অফিসে রিপোর্ট করবেন।

লম্বা গাড়ি-পথ বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে, দু'পাশে গাঢ় কাসিয়া গাছ। বিল্ডিংগুলোর দিকে ছুটছে রানার টয়োটা, টায়ার থেকে ঘন কুয়াশার মত পানির কণা ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ করে ওদের নাকে ধোঁয়ার গন্ধ তীব্র ধাক্কা মারল। বাঁশ ও কাঠ পোড়ার গন্ধ, সঙ্গে আরও কি যেন আছে–মাংস বা হাড় হতে পারে, কিংবা হয়তো আইভরি। যদিও পোড়া আইভরির গন্ধ কেমন হয় জানা নেই রানার।

'আলো দেখছি না।' গম্ভীরস্বরে বলল ও, বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার মেইন বিল্ডিংটা দেখতে পেয়েছে।

ক্যাম্পের জেনারেটর চলছে না, গোটা ক্যাম্প অন্ধকারে ডুবে আছে। তারপর খেয়াল হলো ওর, ভেজা কাসিয়া গাছগুলোর গায়ে ও বিল্ডিঙের দেয়ালগুলোয় আলোর লালচে একটা আভা নাচানাচি করছে।

'কোন একটা বিল্ডিঙে আগুন জ্বলছে।'

সীটের কিনারায় সরে এল পল। 'ধোঁয়াটা ওখান থেকে আসছে তাহলে।'

অন্ধকারের গায়ে বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করল টয়োটার হেডলাইট, তারপর স্থির হলো প্রকাণ্ড আকৃতির একটা স্তূপের ওপর। ঝাপসা উইণ্ডস্ক্রীন, জিনিসটা যে কি প্রথম কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারল না রানা। অদ্ভুত লালচে আভাটা মনে হলো ওটার ভেতর থেকেই বেরুচ্ছে। আরও কাছে যাবার পর, জোরাল আলো পড়ায় পুড়ে কালো ও ছাই হয়ে যাওয়া আইভরি ওয়্যারহাউসের ধ্বংসস্তূপ বলে চিনতে পারল ওটাকে। দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে ও আতংকে হাঁ হয়ে গেছে রানা, গাড়ি থামিয়ে কাদা ও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে আছে।

আগুনের তাপে ফাটল ধরে যায় দেয়ালগুলোয়, বেশিরভাগই কাত হয়ে পড়ে গেছে। ভয়াবহ বিশাল অগ্নিকাণ্ড ছাড়া এ-ধরনের তাপ সৃষ্টি হবে না। তুমুল বর্ষণ সত্ত্বেও আগুনটা এখনও জ্বলছে, হেডলাইটের আলোয় তেলতেলা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে লাফ দিয়ে উঠছে লকলকে শিখা।

ভিজে শার্ট রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে, ভিজে চুল নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে কপাল ও চোখের অংশবিশেষ। চোখ থেকে চুল সরিয়ে ধরাশায়ী দেয়ালগুলোর দিকে হোঁচট খেতে খেতে এগোল ও। মাটিতে পড়ে থাকা ছাদ মোটা ও কালো ছাই মাত্র, কয়লা হয়ে গেছে কড়িকাঠগুলো। বৃষ্টির মধ্যেও এত বেশি উত্তপ্ত যে কাছাকাছি যেতে পারল না রানা, ফলে আন্দাজ করা গেল না কালো স্তূপের নিচে এখনও কি পরিমাণ আইভরি পড়ে আছে।

পিছিয়ে এল রানা, ছুটল ট্রাকের দিকে। ক্যাবে চড়ে হাতের তালু দিয়ে চোখ থেকে বৃষ্টি মুছল।

'তোমার সন্দেহই সত্যি হলো,' বলল পল। 'দেখে মনে হচ্ছে শালারা হানা দিয়েছে ক্যাম্পে।'

জবাব দিল না রানা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছোটাল আলি শাহের কটেজের দিকে। 'লকার থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করো,' নির্দেশ দিল ও, প্রায় ধমকের সুরে। প্রতিবাদ না করে সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকল পল, ভারি টুল-লকারের ভেতরটা হাতড়াল, ট্রাকের মেঝের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো ওটা। হাতে বড় একটা টর্চ নিয়ে সিধে হলো সে।

ক্যাম্পের বাকি অংশের মত ওয়ার্ডেনের কটেজও সম্পূর্ণ অন্ধকার। গাছের পাতা ও ডাল থেকে জলপ্রপাতের মত বৃষ্টি ঝরছে, হেডলাইটের আলোয় সামনের জাল ঘেরা বারান্দা আলোকিত হলো না। পলের হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নামল রানা। 'আলি!' চিৎকার করল ও। 'রুমানা!' ছুটে চলে এল কটেজের সদর দরজায়। দরজার অর্ধেকটাই ভেঙে চুরমার হয়ে আছে, পুরোপুরি খোলা। দৌড়ে বারান্দায় উঠে পড়ল ও। 'আলি! রুমানা!'

ফার্নিচারগুলো ভাঙা, এদিক ওদিক ছুঁড়ে উল্টে ফেলা হয়েছে। চারদিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। ওর উপহার দেয়া আলির প্রিয় বইয়ের কালেকশন শেলফ থেকে নামানো হয়েছে, খোলা ও মেরুদণ্ড ভাঙা বইগুলো পড়ে আছে ছেঁড়া কাগজের একটা স্তূপ হয়ে।

'আলি!' চিৎকার করল রানা। 'কোথায় তুমি?'

খোলা দরজা দিয়ে ছুটে সিটিংরূমে ঢুকল রানা। এখানের দৃশ্যটা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল ওর শরীরে। পাথরের ফায়ারপ্লেসে রেখে রুমানার সমস্ত গহনা, ফুলদানি ও চীনামাটির জিনিস-পত্র হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চুরমার করা হয়েছে। টর্চের আলো লেগে চকচক করছে টুকরোগুলো। সোফার ফোম ও কাভার ছেঁড়া হয়েছে, ছেঁড়া হয়েছে ইজিচেয়ারের ক্যানভাস। কার্পেটের ওপর মলত্যাগ করা হয়েছে, প্রস্রাব করা হয়েছে দেয়ালে।

নোংরা স্তূপ টপকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, ছুটল বেডরূমের দিকে। 'আলি!' হতাশা ও রাগে কর্কশ শোনাল ওর গলা, হাতের টর্চ থেকে আলো পড়ল প্যাসেজের শেষ প্রান্তে।

শেষ মাথার দেয়ালে একটা ছবির মত কি যেন লটকানো রয়েছে, আগে ছিল না। আরও কাছে এসে রানা দেখল, গাঢ় রঙ ছড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে নক্ষত্র আকৃতির একটা নকশা, সাদা দেয়ালের প্রায় সবটুকু জুড়ে। জিনিসটা কি বুঝতে না পেরে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর টর্চের আলো তাক করল দেয়ালের গোড়ায় পড়ে থাকা কুণ্ডলী পাকানো ছোট একটা আকৃতির দিকে।

আলি আর রুমানা তাদের একমাত্র পুত্রসন্তানের নাম রেখেছিল ওর নামের সঙ্গে মিলিয়ে–মাসুদ শাহ। পরপর দুটো মেয়ের পর প্রথম ছেলে হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারি খুশি হয়েছিল। মাসুদ শাহের বয়স হয়েছিল চার বছর। রানার সামনে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে সে। চোখ দুটো খোলা, টর্চের আলোর দিকে তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে।

ওরা তাকে বর্বর আফ্রিকান পদ্ধতিতে খুন করেছে। ছোট্ট মাসুদের গোড়ালি দুটো এক করে ধরে দেয়ালের গায়ে বারবার আছাড় মেরেছে, ফাটিয়ে দিয়েছে খুলি। দেয়ালের গায়ে মগজ দেখতে পেল রানা–সাদা দেয়াল ও লাল রক্তের ওপর সোনালি রঙ।

ফোঁপাচ্ছে রানা, মাসুদের ওপর ঝুঁকল। খুলিটা চুরমার হয়ে গেলেও বাপের সঙ্গে তার চেহারার মিলটা পরিষ্কার ধরা গেল। চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, ঘুরল বেডরূমের দরজার দিকে।

দরজাটা আধ খোলা, ঠেলা দিয়ে পুরোপুরি খুলল রানা। কাতর শব্দে গুঙিয়ে উঠল কজাগুলো।

টর্চের আলো অনুসরণ করল রানার চোখ, আলোটা বেডরূমের চারদিকে ঘুরল। তারপর টলতে টলতে পিছিয়ে এল ও, হেলান দিল দেয়ালে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে।

ভাইটির চেয়ে বোনগুলো বয়েসে বড়। নাসরিনের দশ আর সুরাইয়ার প্রায় আট। পা-গুলো যতদূর সম্ভব দু'দিকে মেলে বিছানার নিচে মেঝেতে নগ্ন পড়ে আছে তারা। দু'জনকেই ধর্ষণ করা হয়েছে বারবার। নাভির নিচে শুধু রক্ত আর ছেঁড়াফাড়া মাংস।

রুমানা পড়ে আছে বিছানার ওপর। ওরা তাকে পুরোপুরি নগ্ন করার

ঝামেলায় যায়নি, টান দিয়ে স্কার্টটা তুলে ফেলেছে কোমরের কাছে। হাত দুটো মাথার দু'পাশে, খাটের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা। দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক নির্যাতনের সময় বাচ্চা মেয়ে দুটো নির্ঘাত আতংক ও রক্তক্ষরণে মারা গেছে। রুমানা সম্ভবত ওদের সবার দ্বারা নির্যাতিত হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল, তারপর তার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়েছে ওরা।

নিজেকে বেডরূমে ঢুকতে বাধ্য করল রানা। অতিরিক্ত বিছানার চাদর কোথায় রাখা হয় জানে, কয়েকটা বের করে লাশগুলো ঢেকে দিল। মেয়েদের কাউকে ছুঁতে পারল না, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখগুলো খোলাই থেকে গেল।

'আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি?' দোরগোড়া থেকে ফিসফিস করল পল। 'কোন মানুষের দ্বারা এ সম্ভব নয়! হিংস্র জানোয়ারও কি…!'

কামরা থেকে পিছিয়ে এল রানা, বন্ধ করে দিল দরজাটা। ছোট্ট মাসুদের লাশটা ঢেকে দিল চাদরে।

'আলিকে দেখলে?' পলকে জিজ্ঞেস করল ও, গলা থেকে বেসুরো আওয়াজ বেরুল।

'না।' মাথা নেড়ে দ্রুত ঘুরল পল, প্যাসেজ ধরে ছুটল। বারান্দায় হোঁচট খেল সে, তারপর লাফ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়ল।

বাগানে বমি করছে পল, তার ওয়াক-ওয়াক শব্দ রানাকে স্থির হতে সাহায্য করল। রাগ, শোক ও ঘৃণার লাগাম টেনে ধরল ও, নিয়ন্ত্রণে আনল ভাবাবেগ। 'আলি,' নিজেকে মনে করিয়ে দিল। 'আলিকে খুঁজে পেতে হবে।'

বাকি দুটো বেডরুম ও বাড়ির অবশিষ্ট অংশ দ্রুত ঘুরে এল রানা। কোথাও পেল না বন্ধুকে। এই প্রথম ক্ষীণ একটা আশা জাগল বুকে।

আলি হয়তো পালিয়ে যেতে পেরেছে, ভাবল ও। হয়তো জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে স্বস্তিবোধ করল রানা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির দিকে মুখ তুলল। ফোঁটাগুলো ধুয়ে দিল চোখের পানি, মুখের ভেতরে তেতো ভাব। তারপর পায়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখল ওর জুতোয় লেগে থাকা রক্ত পানিতে মিশে যাচ্ছে, লালচে হয়ে উঠছে পানি। গাড়ি-পথের নুড়িপাথরে জুতোর কিনারা ঘষল ও, তারপর পলকে ডাকল। 'এদিকে এসো, আলিকে খুঁজতে হবে।'

টয়োটা নিয়ে পাহাড়ের পিছন দিকে চলে এল ওরা, চাকরবাকরদের ক্যাম্পে। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে জায়গাটা মাটির দেয়াল ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়াটা অবশ্য ভেঙেচুরে নেই বললেই চলে, গেটটারও কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বেড়ার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ওরা, ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ ঢুকল নাকে। হেডলাইটের আলো পড়তে দেখা গেল কাজের লোকদের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ধসে পড়েছে ছাদ, জানালাগুলো খালি। বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেলেও, ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও এঁকেবেঁকে ধোঁয়া উঠছে।

কুঁড়েগুলোর আশপাশের মাটিতে খুদে কি যেন পড়ে রয়েছে অনেকগুলো, হেডলাইটের আলোয় মুক্তোদানার মত চকচক করছে। ওগুলো কি জানে রানা,

তবু ট্রাক থেকে নেমে কাদা থেকে তুলে নিল একটা। চকচকে তামার কার্টিজ কেস। আলোর সামনে ধরতেই হেড স্ট্যাম্পটা পড়া গেল। ৭.৬২ এমএম, তৈরি হয়েছে পুব ইউরোপে, এ/কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেলে ব্যবহারযোগ্য ক্যালিবার।

গুলি করে সবাইকে মেরেছে ওরা, তবে কোন লাশ রেখে যায়নি। রানা ধারণা করল, আগুন ধরাবার আগে লাশগুলো ওরা ঘরের ভেতর রাখে। এই সময় ওর দিকে ঘুরে গেল বাতাস–মাংস, হাড় ও চুল পোড়ার বোটকা গন্ধ ঢুকল নাকে।

কাদার ওপর থুথু ফেলে কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল রানা। 'আলি!' রাতের অন্ধকারে চিৎকার করল। 'আলি, এদিকে আছো তুমি?' কিন্তু আম গাছের পাতার খসখস আলাপ, বাতাসের ফিসফিসানি আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। এগোবার সময় ডানে বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলল ও। তারপর দেখল, খোলা জায়গায় পড়ে রয়েছে এক লোক।

'আলি!' বলেই ছুটল রানা, লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

শরীরটা পুড়ে বীভৎস চেহারা পেয়েছে। খাকি পার্ক ইউনিফর্ম অর্ধেকটা ছাই হয়ে গেছে। পোড়া ধড় ও মুখের একটা পাশ দগদগে ঘায়ের মত দেখাচ্ছে। সন্দেহ নেই, জ্বলন্ত কুঁড়েঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, যেখানে তাকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। তবে লোকটা আলি শাহ নয়। জুনিয়র রেঞ্জারদের একজন সে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, ছুটে ফিরে এল ট্রাকের কাছে।

'পেলে তাকে?' জানতে চাইল পল।

মাথা নাড়ল রানা।

'যীশু, ক্যাম্পের সবাইকে খুন করেছে ওরা। কিন্তু কেন এ-কাজ করল?'

'সাক্ষি!' ট্রাক স্টার্ট দিল রানা। 'সমস্ত সাক্ষি সরিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'কেন? কি চায় ওরা? আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ওরা আইভরি নিতে এসেছিল।'

'আইভরি নিতে…কিন্তু ওরা তো ওয়্যারহাউসটাই পুড়িয়ে দিয়েছে!'

'আইভরি বের করে নেয়ার পর।'

রাস্তার ওপর উঠে এল ট্রাক, পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে রানা।

'ওরা কারা, রানা? এর জন্যে দায়ী কে?'

'কি করে বলব কারা। ডাকাত হতে পারে, পোচার হতে পারে। বোকার মত প্রশ্ন করো না।'

প্রবল শক্তিতে রাগটা মাত্র ফিরে আসতে শুরু করেছে রানার মধ্যে। এতক্ষণ বিস্ময়, শোক ও আতংকে প্রায় ভোঁতা হয়ে ছিল ওর মন। পাহাড়ের ওপর অন্ধকার বাংলোটাকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে এল ও মেইন ক্যাম্পে।

ওয়ার্ডেনের অফিস এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। তবে টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদের একটা অংশ কালো হয়ে আছে, যেন ওদিকটায় কেউ একজন জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়েছিল। গোলপাতা ভালভাবে বোনা বা

সাজানো হলে সহজে আগুন ধরে না; কিংবা হয়তো ভাল করে ধরার আগে বৃষ্টিতে নিভে গেছে আগুনটা।

আফ্রিকার বৃষ্টি তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখল। এইমাত্র তুমুল ঝরছিল, টর্চের আলোয় পঞ্চাশ গজের বেশি দেখা যাচ্ছিল না, এখন একদম নেই। এখন শুধু গাছ থেকে ঝরছে ফোঁটাগুলো। মাথার ওপর ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল প্রথম তারা। এ-সব পরিবর্তন প্রায় লক্ষ্যই করল না রানা। ট্রাক ছেড়ে চওড়া বারান্দার দিকে ছুটল ও।

বাইরের দিকে পাঁচিল সাজানো হয়েছে চিউইউই পশুদের খুলি দিয়ে। বারান্দার ওপর দিয়ে হাঁটার সময় চোখবিহীন খুলি ও বাঁকা সিং-এর ওপর টর্চের আলো ফেলল রানা। দৃশ্যটা আরও শঙ্কিত করে তুলল ওর মনকে। এখন উপলব্ধি করতে পারছে, প্রথমে এখানেই খোঁজ করা উচিত ছিল ওর, বাংলোর দিকে ছুটে না গিয়ে।

আলি শাহের অফিসের দরজা খোলা রয়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে শক্ত করল রানা, তারপর ভেতরে পা ফেলল।

ছড়ানো সাদা কাগজে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে মেঝে ও ডেস্ক। গোটা অফিস কামরা ভাঙচুর করেছে ওরা, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ফর্ম ও ফাইলের স্তূপ। সবগুলো দেরাজ টেনে বের করে উপুড় করা হয়েছে মেঝেতে। আলির চাবিটা নিয়ে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো সেফ খুলেছে। চাবিটা এখনও তালার সঙ্গে রয়েছে, তবে সেফটা খালি।

কামরার চারদিকে ছুটোছুটি করল টর্চের আলো। তারপর স্থির হলো ডেস্কের সামনে পড়ে থাকা আকৃতিটার ওপর।

'আলি!' বিড়বিড় করল রানা। 'না…না…না!'

তিন

ফিগ ট্রি প্যান থেকে ঘুরে আসি, বলে অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড চলে যেতেই ডেস্ক ছেড়ে উঠল আলি শাহ, অফিস থেকে বেরিয়ে চলে এল ভেহিকেল ওঅর্কশপে। এখানে অচল ট্রাকটা মেরামত করছে রেঞ্জার জামবু। জামবু মেকানিক হিসেবে ভাল নয়, তার দ্বারা মেরামতের কাজটা হবে কিনা সন্দেহ আছে তার। সকালে হয়তো তাকে মানা পুল ওয়ার্ডেনকে ফোন করতে হবে, মেকানিক পাঠানোর জন্যে।

তবে চিন্তার তেমন কিছু নেই। হাতির মাংস কোল্ড স্টোরেজে তুলে রাখা যাবে। এই মুহূর্তে ট্রাকের রিফ্রিজারেটিং ইকুইপমেন্ট প্ল্যাগের সাহায্যে জোড়া লাগানো রয়েছে ক্যাম্প জেনারেটরের সঙ্গে, শেষবার চেক করার সময় আলি শাহ দেখেছে থার্মোমিটারের কাঁটা ফ্রিজিং পয়েন্টের বিশ ডিগ্রী নিচে। মাংসগুলো প্রসেস করার পর পশুখাদ্য হিসেবে হারারের একজন ঠিকাদার বাজারজাত করবে।

কাজে ব্যস্ত, ঘর্মাক্ত কলেবর জামবুকে ওঅর্কশপে রেখে নিজের অফিসে ফিরে গেল আলি শাহ। সে বেরিয়ে যেতেই মুখ তুলল জামবু, অপর কালো রেঞ্জার দোরাদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। একটা ক্ষয়া অলটারনেটর নিয়ে কাজ করছে সে, হারারের পুরানো ও বাতিল লোহার দোকান থেকে সে-ই কিনে এনেছে। ট্রাকটার আদি অলটারনেটর, এখনও নিখুঁত ও কাজের উপযোগী, ড্রাইভিং সীটের তলায় লুকানো আছে। জায়গামত বোল্ট দিয়ে আটকাতে ও তার জোড়া দিতে দশ মিনিটও লাগবে না।

অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট লেখার একঘেয়ে কাজে মন দিল আলি শাহ। কাজের ফাঁকে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে দেখল একটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। লাঞ্চ খেতে যাবার আগে চলতি হপ্তার রিপোর্টটা লিখে শেষ করতে চায় বলে উঠল না সে, যদিও বাড়ি ফেরার একটা ঝোঁক রয়েছে। লাঞ্চের আগে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খানিকটা সময় ব্যয় করা তার একটা অভ্যেস, বিশেষ করে ছেলেটার সঙ্গে। ঝোঁকটা দমন করে কাজ করে যাচ্ছে সে। জানে, আরও খানিক দেরি হলে রুমানা নিজেই তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেবে। লাঞ্চটা ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়াতে চায় সে। আপনমনে হাসছে আলি শাহ, দরজায় শব্দ শুনে মুখ তুলল।

হাসিটা মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অচেনা এক লোক। পা দুটো বাঁকা ও খাটো, শরীরটা পেশীবহুল, পরনের কাপড় ছেঁড়া ও নোংরা। দুটো হাতই পিছনে, যেন কিছু লুকিয়ে রেখেছে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল আলি শাহ। 'কে তুমি? কি চাও?'

ঠোঁট টিপে হাসল লোকটা। গায়ের রঙ কালো, তবে বেগুনি একটা ভাব আছে। হাসলে তার মুখের কাটা দাগটা আকৃতি বদলায়, হাসিটা হয়ে ওঠে আক্রোশে ভরা ও কুৎসিত।

ডেস্ক থেকে উঠে তার দিকে এগোল আলি শাহ। 'কি চাই তোমার?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

দোরগোড়া থেকে লোকটা বলল, 'তোমাকে।' পিছন থেকে এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেলটা সামনে এনে আলি শাহের তলপেটে তাক করল। 'তোমাকে চাই।'

ঘরের মাঝখানে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল আলি শাহ। হতভম্ব হলেও, প্রায় পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে সে। তার রিফ্লেক্স একজন শিকারী বা সৈনিকের মতই। আর্মারির দরজা তার বাম দিকে দশ পা দূরে, লাফ দিল সেদিকেই।

পার্কের সমস্ত অস্ত্র ওখানে রাখা হয়। খোলা দরজা দিয়ে দূর প্রান্তের দেয়ালে ফায়ার আর্মস-এর র‍্যাকটা দেখতে পাচ্ছে সে। হতাশা তার পা দুটোকে লোহার মত ভারি করে তুলল, হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে র‍্যাকের একটা অস্ত্রও লোড করা নয়। এটা তার নিজেরই কঠিন সেফটি রুল। গান-র‍্যাকের নিচে তালা দেয়া ইস্পাতের কাবার্ডে রাখা হয় অ্যামুনিশন।

দরজার দিকে লাফ দিয়েছে, এই সময়ের ভেতরই সমস্ত চিন্তা খেলে গেল

তার মাথায়। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, রাইফেলটা তার দিকে ঘোরাচ্ছে লোকটা। দরজার কাছে পৌঁছায়নি, তার আগেই দক্ষ অ্যাক্রোব্যাট-এর মত সামনের মেঝেতে খসে পড়ল আলি শাহ, অটোমেটিক রাইফেলের এক পশলা বুলেটের নিচে নামিয়ে নিল মাথাটা।

সাবলীল ভঙ্গিতে শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে এক লাফে সিধে হচ্ছে আলি শাহ, শুনতে পেল নিজেকে গাল দিল লোকটা। আবার দরজার দিকে ডাইভ দিল সে। বুঝে নিয়েছে, তার আততায়ী দক্ষ লোক। রাইফেল ধরার ভঙ্গিটাই বলে দিয়েছে, অভ্যস্ত খুনী। কাছ থেকে ছোড়া প্রথম দফার বুলেটগুলো এড়াতে পারাটা ছিল অবিশ্বাস্য।

গুলিগুলো দেয়ালে লেগেছে, ঘরটা ভরে গেছে ধুলোয়, সেই ধুলোর ভেতর ডাইভ দিল আলি শাহ, মনে মনে জানে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এ/কে ফরটিসেভেন হাতে ওই লোক অত্যন্ত অভিজ্ঞ, দ্বিতীয়বার তাকে বোকা বানানো যাবে না। দোরগোড়ার আশ্রয় বা আড়াল তখনও তার নাগালের অনেক বাইরে, দ্বিতীয় দফার বুলেটগুলো ছুটে এল।

আলি শাহের মাথার ভেতর ঘড়িটা সচল রয়েছে, ভারসাম্য ফিরে পেতে একজন লোকের কতক্ষণ লাগে জানে সে। অটোমেটিকে দিয়ে গুলি করলে এ/কে ফরটিসেভেনের মাজল সব সময় ওপর দিকে উঠে যায়, নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না; কাজেই নামিয়ে এনে লক্ষ্যস্থির করতে এক সেকেণ্ডের বেশিরভাগটাই ব্যয় হবে তাতে। সময়ের হিসেবটা নিখুঁত হলো তার, ভয়ানক মোচড় দিয়ে একপাশে সরিয়ে আনল শরীরটাকে। কিন্তু তারপরও দেরি হয়ে গেল সামান্য।

রাইফেল ওপরে উঠবে, সে-কথা মনে রেখে নিচের দিকে লক্ষ্যস্থির করেছিল লোকটা। একটা বুলেট আলি শাহের উরুর মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল, হাড় ছুঁতে পারল না, তবে দ্বিতীয় বুলেটটা তার নিতম্বের নিচের ভাঁজে ঢুকে গেল, গুঁড়িয়ে দিল উরুর জয়েন্ট, পেলভিস কাপ ও হেড।

আলি শাহ নিজেকে একপাশে সরিয়ে নেয়াতে বাকি তিনটে বুলেট লাগল না। যদিও বাম পা-টা একেবারেই গেছে। দরজার পাশে ধাক্কা খেল সে, চেষ্টা করল যাতে পড়ে না যায়। সবেগে ছুটে এসে ধাক্কা খাওয়ার পর গতির ঝোঁকটা ওকে দেয়ালে ঘষা খাইয়ে সামনে ঠেলে দিল, প্লাস্টারের ওপর সশব্দে আঁচড়ের দাগ ফেলল নখগুলো।

স্থির হবার পর দেখল এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, ঘরের দিকে পিছন ফিরে। তার বাম পা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া জয়েন্ট থেকে ঝুলছে, তাল সামলাবার জন্যে হাত দুটোকে দু'দিকে লম্বা করে দিয়েছে, ক্রুসবিদ্ধ যীশুর মত।

এখনও হাসি লেগে রয়েছে মুখে, ক্লিক শব্দে রেট-অভ-ফায়ার সিলেক্টর সিঙ্গেল-শটে আনল লোকটা। অ্যামুনিশন বাঁচাতে চায় সে। প্রতিটি রাউণ্ড অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে তাকে, বয়ে আনতে হয়েছে কয়েকশো মাইল। প্রতিটি কার্টিজ মহামূল্যবান, তাছাড়া ওয়ার্ডেন লোকটা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে, এখনও বেঁচে আছে তার দয়ায়। সে যে দয়ালু নয় এটা প্রমাণ করার জন্য আর মাত্র একটা বুলেট খরচা করলেই চলবে। 'এবার,' নরম সুরে বলল সে, 'এবার

তুমি মরবে।' তারপর গুলি করল আলি শাহের তলপেটে।

বুলেটের ধাক্কায় আলি শাহের ফুসফুস থেকে বিস্ফোরণের মত শব্দ করে বেরিয়ে এল বাতাস। সজোরে ধাক্কা খেল দেয়ালের গায়ে, প্রচণ্ড আঘাতে ভাঁজ হয়ে গেল কোমর, তারপর ঢলে পড়ল সামনে। যুদ্ধের সময় আগেও গুলি খেয়েছে আলি শাহ, তবে কোন বুলেটই সরাসরি বা পুরোপুরি শরীরে লাগেনি। মানসিক আঘাতটা শারীরিক আঘাতের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠল, যতটা খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি। কোমর থেকে নিচের দিকটায় কোন সাড়া না থাকলেও, পরিষ্কার কাজ করছে মাথা। বরং সব কিছু খুব দ্রুত ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে।

ভান করো মরে গেছো!

দেয়াল থেকে খসে পড়ার সময় চিন্তা করল আলি শাহ। শরীরের নিচের অংশ পঙ্গু হয়ে গেছে, মনের জোর খাটিয়ে ধড়টাকে শিথিল করল। ময়দা ঠাসা ভারি বস্তার মত মেঝেতে পড়ল সে, তারপর আর এক চুল নড়ল না।

মোচড় খেয়ে একদিকে বাঁকা হয়ে রয়েছে মাথা, ঠাণ্ডা সাদা সিমেন্টে সেঁটে রয়েছে গালের একটা পাশ। স্থির পড়ে থাকল আলি শাহ। মেঝেতে লোকটার পায়ের আওয়াজ পেল সে, এগিয়ে আসছে তার দিকে। একটু পরই তার দৃষ্টিসীমায় চলে এল বুটজোড়া। ধুলোয় প্রায় ঢাকা, ওপরের অংশ পর্যন্ত খয়ে গেছে। পায়ে মোজা নেই, বোটকা একটা গন্ধে বমি পেল তার–লোকটা দাঁড়িয়ে আছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

ধাতব শব্দ পেল আলি শাহ, আবার রেট-অভ-ফায়ার সিলেক্টর সরাল লোকটা। তারপরই কপালে ঠাণ্ডা মাজলের স্পর্শ অনুভব করল সে।

নোড়ো না! নিজেকে সাবধান করল আলি শাহ। এটাই তার সর্বশেষ আশা। জানে, নড়াচড়ার ক্ষীণ একটু আভাস পেলেই গুলি করবে লোকটা। লোকটাকে তার বোঝাতে হবে সে মারা গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কামরার বাইরে চেঁচামেচির আওয়াজ হলো, তারপরই ভেসে এল অটোমেটিক রাইফেলের গর্জন। রাইফেল মাজলের চাপ আলি শাহের কপাল থেকে সরে গেল। দুর্গন্ধময় বুটজোড়া ঘুরল, মেঝে ধরে চলে গেল দরজার দিকে।

'চলে এসো, সময় নষ্ট কোরো না।' খোলা দরজা থেকে চিৎকার করল লোকটা, তার আঞ্চলিক চিনিয়ানজা ভাষা বুঝতে পারল আলি শাহ। 'ট্রাকগুলো কোথায়? দেরি না করে আইভরি তোলো।' কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল জাম্বিয়ান খুনী, কামরার ভেতর একা পড়ে থাকল আলি শাহ।

এরকম আঘাতে মানুষ বাঁচে না, জানে সে। শরীরের ভেতর, তলপেটের গভীরে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে, অনুভব করতে পারল। পাশ ফিরে ট্রাউজারের ওপরটা ঢিলে করল সে, পরমুহূর্তে নিজের বিষ্ঠার গন্ধ পেল নাকে। বুঝল, দ্বিতীয় বুলেটটা তার অন্ত্র ছিঁড়ে ফেলেছে। হাত নামিয়ে উরুর মাঝখানে আনল, চেপে ধরল ক্ষতটা। লাফ ও ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল গরম রক্ত, ভিজে গেল কব্জি পর্যন্ত।

রুমানা আর বাচ্চারা! নিজের কোন আশা নেই বুঝতে পেরে স্ত্রী ও সন্তানদের

কথা ভাবল আলি শাহ। ওদের জন্যে কিছুই কি করতে পারবে না সে? পাহাড়ের ওপর থেকে আরও গুলির শব্দ ভেসে এল, তার নিজের বাংলো ও কাজের লোকদের কম্পাউণ্ড থেকে।

গোটা একটা দল নিয়ে এসেছে ওরা, হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা। আল্লাহ, আমার বাচ্চারা! বাবা মাসুদ, মাসুদ রে!

পাশের কামরার অস্ত্রগুলোর কথা ভাবল সে, কিন্তু জানে অতদূরে পৌঁছুতে পারবে না। যদি পারতও, যার অর্ধেক নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, রক্ত-সাগরে ভাসছে, তার পক্ষে কিভাবে একটা রাইফেল চালানো সম্ভব হত?

ট্রাকগুলোর শব্দ পেল সে। ভারি ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারল ওগুলো রিফ্রিজারেটর ট্রাক। হঠাৎ আশার একটা পরশ লাগল বুকে।

জামবু, ভাবল সে। দোরাদে···কিন্তু আশাটা বেশিক্ষণ টিকল না। পাশ ফিরে শুয়ে আছে সে, চেপে ধরে আছে বিচ্ছিন্ন একটা রগ, কামরার আরেক দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো খোলা দরজা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে।

একটা রিফ্রিজারেটর ট্রাক তার দৃষ্টিপথে এসে থামল। পিছু হটে আইভরি গোডাউনের সামনে স্থির হলো সেটা। লাফ দিয়ে নিচে নামল জামবু, নেমেই গ্যাঙলিডার লোকটার সঙ্গে হাত নেড়ে আলাপ জুড়ে দিল। মুখে কাটা দাগ, গ্যাঙলিডারকে চিনতে পারল আলি শাহ। গুরুতর আহত ও স্তম্ভিত, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার।

জামবু, ভাবল সে। জামবু ওদের একজন। ষড়যন্ত্রটা তার।

বিরাট আঘাত পাবার মত ব্যাপার আসলে নয় এটা। আলি শাহ জানে শুধু পার্ক ডিপার্টমেন্টে নয়, সরকারের সব ডিপার্টমেন্টেই দুর্নীতি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে জামবুকে চেনে সে। গোঁয়ার ও স্বার্থপর লোক। বেঈমানী করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তবে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারবে বলে ধারণা ছিল না।

হঠাৎ করে গুদামের চার ধারে, আলি শাহ যতটুকু দেখতে পাচ্ছে, দলের অন্যান্য লোকদের হাঁটাচলা শুরু হলো। তাদেরকে জড়ো করল গ্যাঙলিডার, টিম গঠন করে ভাগ করে দিল কাজ। তাদের একজন গুলি করে তালা ভাঙল, বাকি সবাই অস্ত্র রেখে দিয়ে ঢুকে পড়ল গুদামের ভেতর। আইভরির পাহাড় দেখে উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল লোকগুলো। তারপর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে এক লোক আরেক লোকের হাতে তুলে দিল একটা করে আইভরি, এভাবে হাত বদলের সাহায্যে ট্রাকে তোলা হচ্ছে ওগুলো।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে আলি শাহের। চোখের সামনে দিয়ে অন্ধকার মেঘ পার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে মৃদু শোঁ শোঁ আওয়াজ আসছে কানে।

আমি মারা যাচ্ছি, ভাবল সে, কোন রকম ভাবাবেগ ছাড়াই। অনুভব করল অসাড় ভাবটা পঙ্গু পা থেকে উঠে আসছে বুকের দিকে, ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।

চোখের সামনে থেকে জোর করে অন্ধকার সরাবার চেষ্টা করল সে, ভাবল স্বপ্ন দেখছে–কারণ বারান্দার নিচে রোদের মধ্যে অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের

দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়, কোন কারণ নেই। এখনও তাঁর কাঁধে বিন-কিউলারটা ঝুলছে। হাবভাব অসম্ভব রকম শীতল ও মার্জিত। চিৎকার করে তাঁকে সাবধান করতে চাইল আলি শাহ, কিন্তু গলা থেকে বেরিয়ে আসা নরম কাতর ধ্বনি কামরা থেকে বেরুতে পারল না।

তারপর অবাক বিস্ময়ে দেখল সে, গ্যাঙলিডার এগিয়ে এসে স্যালুট করল অ্যামব্যাসাডরকে। অভিবাদনটা ঠিক সম্ভ্রম না, খানিকটা ব্যাঙ্গাত্মকই বলা যায়, তবে কর্তৃত্ব স্বীকার করার ভাবটুকু স্পষ্ট।

গণ্ড। নিজেকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করল আলি শাহ। সত্যি আসলে গণ্ড। আমি আসলে স্বপ্ন দেখছি না।

তারপর ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল কামরার ভেতর। ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা।

'তোমার লোকদের তাড়া লাগাও,' অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড বললেন। 'আইভরি লোড করতে দেরি করলে চলবে না। এই জায়গা ছেড়ে এখুনি আমি চলে যেতে চাই।'

'টাকা,' বলল গুচ। 'এক হাজার ডলার···,' তার ইংরেজি খুবই বাজে।

'তোমার পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে,' কঠিন সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আবার কিসের টাকা?'

'আমার আরও টাকা চাই। আরও এক হাজার ডলার।' অ্যামব্যাসাডরের মুখের ওপর হাসল গুচ। 'হয় আরও টাকা দিন নয়ত আমি কাজ বন্ধ করে দেব। কাজ বন্ধ করে চলে যাব আমরা, আপনাকে ফেলে যাব, ফেলে যাব আইভরি।'

'তুমি দেখছি একটা স্কাউনড্রেল!' খেঁকিয়ে উঠল চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'স্কাউনড্রেল বুঝি না, তবে ধারণা করি আপনিও স্কাউনড্রেল–সম্ভবত।' গুচের হাসি মুখের একপাশে আরও চওড়া হলো। 'এবার ভালয় ভালয় টাকা বের করুন।'

'আমার সঙ্গে কোন টাকা নেই,' বললেন অ্যামব্যাসাডর।

'তাহলে বিদায় হই আমরা। আপনি নিজে আইভরি লোড করুন।'

'দাঁড়াও।' বোঝা গেল দ্রুত চিন্তা করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমার সঙ্গে সত্যি টাকা নেই। তুমি বরং আইভরি নিয়ে যাও, যেক'টা চাও–যতটা বইতে পারো।' জানেন, পোচাররা খুব কমই সঙ্গে নিতে পারবে, মাথাপিছু একটার বেশি দাঁত বইতে পারবে না। বিশজন লোক, বিশটা দাঁত। নগণ্যই বলা যায়।

প্রস্তাবটা বিবেচনা করার সময় অ্যামব্যাসাডরের দিকে তাকিয়ে থাকল গুচ। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে যতটা পারা যায় সুবিধে আদায় করাই তার উদ্দেশ্য, কাজেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিল প্রস্তাবটা। 'গুড। আমরা তাহলে আইভরি নেব।' ঘুরতে শুরু করল সে।

তাকে থামালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'দাঁড়াও, গুচ! বাকি সবার খবর কি? ব্যবস্থা করেছ?'

'সবাই তারা মারা গেছে।'

'ওয়ার্ডেন? তার স্ত্রী ও বাচ্চারা? তারাও সবাই মারা গেছে?'

'সবাই মারা গেছে,' আবার বলল গুচ। 'মেয়েলোকটা আর তার মাইয়া দুটোও। আমার লোকেরা তিনজনের সঙ্গেই পক পক করেছে। ভারি মজার ব্যাপার। তারপর মেরেছে।'

'ওয়ার্ডেন? কোথায় সে?'

আলি শাহের অফিসের দিকে মাথা ঝাঁকাল গুচ। 'বুম বুম। আমি তাকে গুলি করেছি। শুয়োর ছানার মত মরেছে সে।' কর্কশ শব্দে হাসল। 'একেবারে নিখুঁত কাজ, কি বলেন?'

কাঁধে রাইফেল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে, গলা থেকে এখনও হাসির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, তাকে অনুসরণ করে আলি শাহের দৃষ্টিপথ থেকে বেরিয়ে গেলেন অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড।। প্রচণ্ড রাগ খানিকটা শক্তি যোগাল আলি শাহকে। পোচারের কথা থেকে বুঝে ফেলেছে তার স্ত্রী ও মেয়ে দুটোর কপালে কি ঘটেছে। ছবিগুলো এত পরিষ্কার ভেসে উঠল চোখের সামনে যেন সে নিজে ওখানে উপস্থিত ছিল। হত্যা ও ধর্ষণ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে। সে-ও তো একজন আফ্রিকান, জানে আফ্রিকানরা কতখানি বর্বর হতে পারে।

রাগ থেকে পাওয়া শক্তিটা ব্যয় করল মেঝেতে ঘষা খেয়ে নিজেকে ডেস্কের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে। জানে কোন অস্ত্র ব্যবহার করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। অল্প যে সময়টুকু বেঁচে আছে, কোন ধরনের একটা মেসেজ রেখে যাওয়ার আশা করা যেতে পারে শুধু। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ-পত্র। কিছু যদি লিখতে পারে, তারপর কোন ভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে, পরে তাহলে পুলিসের হাতে পড়বে সেটা।

আহত একটা শুঁয়োপোকার মত নড়ছে সে, মেঝেতে পিঠ দিয়ে শোয়া অবস্থায়, এখনও চেপে ধরে আছে বিচ্ছিন্ন রগটা। ডান পা-টা টেনে ভাঁজ করল, গোড়ালি চেপে ধরল মেঝেতে, মেঝের ওপর ঘষে ঠেলল নিজেকে। প্রতিবার কয়েক ইঞ্চি করে পিছলে যাচ্ছে পিঠ, পথটা পিচ্ছিল করে তুলছে তার নিজেরই রক্ত। ডেস্কের দিকে ছ'ফুট এগোবার পর একটা কাগজ পেল নাগালের মধ্যে। দেখল, খরচ লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা ওটা।

কাগজটা ছোঁয়নি, এই সময় কামরার ভেতর আলো বদলে গেল। দোরগোড়ায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা ঘোরাল সে, অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখতে পেল, ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। বারান্দা হয়ে এসেছেন তিনি, তাঁর রাবার সোল ট্রেনিং শ্যু কোন শব্দ করেনি। দোরগোড়া থেকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তারপর তিনি চিৎকার দিলেন, 'এখনও বেঁচে আছে! গুচ, জলদি এসো। এখনও বেঁচে আছে ও।'

দোরগোড়া থেকে সরে গেলেন তিনি, দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন বারান্দা থেকে, এখনও চিৎকার করছেন, 'গুচ, জলদি এসো!'

সব শেষ, ভাবল আলি শাহ। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বেঁচে আছে সে। শরীরটা গড়িয়ে একপাশে কাত হলো, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল কাগজটা। এক হাতে সেটা চেপে ধরল মেঝেতে, বিচ্ছিন্ন রগটা ছেড়ে দিয়ে রক্তাক্ত হাতটা বের করে আনল ট্রাউজারের ভেতর থেকে। সাথে সাথে অনুভব করল, লাফাতে শুরু

করেছে রগ, ক্ষত থেকে হড় হড় করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত।

খালি কাগজটার ওপর তর্জনী দিয়ে লিখতে শুরু করল আলি শাহ, নিজের রক্তে। ইংরেজি সি অক্ষরটা লিখল প্রথমে, যদিও ত্যাড়াবাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ আচ্ছন্নবোধ করল সে, ভোঁতা হয়ে গেল বোধশক্তি। তারপর সি-র পাশে লিখল এম। সিএম: ঠিক বুঝতে পারল না এম-টা ঠিকমত লেখা হয়েছে কিনা। উল্টো হয়ে গেল নাকি-ডব্লিউ? মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, উল্টোই লিখেছে সে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুছল সেটা, পাশে লিখল এম। মুহূর্তের জন্যে আঠালো রক্ত ভরা হাতটা সেঁটে গেল কাগজের গায়ে। টেনে ছাড়িয়ে নিল আবার।

সিএম এর পাশে লিখল জি, কিন্তু অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেল সেটা। তার মাথার নির্দেশ অনুসরণ করছে না আঙুলটা। শুনতে পেল এখনও গুচকে ডাকছেন অ্যামব্যাসাডর। সাড়া দিল গুচ, তার চিৎকারটা কর্কশ ও ভীতিকর। সিএমজি…এরপর আলি শাহ লিখতে শুরু করল একটা ও, কিন্তু তার আঙুল বারবার পিছলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে।

বারান্দায় ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, সেই সঙ্গে গুচের গলা শুনতে পেল আলি শাহ।

'আমি তো ভেবেছিলাম মারা গেছে। দাঁড়ান, দিচ্ছি শেষ করে!'

কাগজটা বাম হাতের মুঠোয় ভরে মুঠোটা শক্ত করল আলি শাহ। তার এই হাতটায় রক্ত লাগেনি। মুঠোটা বুকের কাছে তুলে শরীরটা গড়িয়ে দিল সে, শরীরের নিচে চাপা পড়ল হাত।

গুচকে দরজায় আসতে দেখেনি সে, কংক্রিটের মেঝেতে সেঁটে রয়েছে তার মুখ। পোচার লোকটার বুটের আওয়াজ পেল, রক্তের ওপর পিছলে যাওয়ায় অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। রাইফেল থেকেও একটা শব্দ হলো, সেফটি ক্যাচ অফ করার।

চরম এই মুহূর্তে এতটুকু ভয় পেল না আলি শাহ, শুধু বিশাল একটা বেদনা গ্রাস করল তাকে। রাইফেলের মাজলটা তার মাথার পিছনে ঠেকতে রুমানা আর বাচ্চাদের কথা ভাবল সে। এই ভেবে স্বস্তিবোধ করল যে ওরা চলে যাবার পর একা তাকে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হবে না। খুশি লাগল এই ভেবে যে ওদের কপালে যা ঘটেছে তা তাকে কোনদিন দেখতে হবে না।

এ/কে ফরটিসেভেনের বুলেট তার খুলি গুঁড়িয়ে দেয়ার আগেই মারা যেতে শুরু করেছে আলি শাহ। খুলি ফুটো করে কপাল দিয়ে বেরুল বুলেটটা, গেঁথে গেল কংক্রিটের মেঝেতে।

'শিট!' ঘৃণা ও আক্রোশে মুখ বাঁকাল গুচ। পিছিয়ে এসে রাইফেলটা কাঁধে তুলল, মাজল থেকে এখনও সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে। 'শালা ত্যাদড় লোক, সহজে মরতে চায় না-একটা বুলেট বেশি খরচ করাল আমার!'

কামরার ভেতর পা দিলেন অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'ঠিক জানো, কাজটা শেষ করতে পেরেছ কিনা?'

'মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট।' ডেস্ক থেকে চাবি তুলে নিয়ে সেফটা খুলছে সে। 'তারপরও যদি বেঁচে থাকে, আমার কিছু করার নেই।' দ্রুত হাতে

সেফটা খালি করছে সে।

লাশটার আরও সামনে চলে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। যে-কোন হত্যাকাণ্ড সাংঘাতিক উত্তেজিত করে তাঁকে। তাঁর যৌন উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়েছে, লাশটা কোন বাচ্চা মেয়ের হলে যতটা উত্তেজিত হতেন ততটা অবশ্য নয়। কামরাটা ভরে আছে রক্তের গন্ধে। এই গন্ধটা তাঁর ভাল লাগে।

এতই মগ্ন হয়ে পড়েছেন যে খেয়াল নেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন রক্তের একটা ছোট্ট পুকুরে। তাঁর সংবিৎ ফিরল বারান্দার নিচে থেকে গুচের ডাক শুনে।

'সমস্ত আইভরি ট্রাকে তোলা হয়েছে। আমরা এখন রওনা হতে পারি।'

পিছিয়ে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, স্ল্যাকসের নিচের দিকে রক্ত লেগেছে দেখে প্রায় আঁতকে উঠলেন। 'চলে যাচ্ছি আমি,' গুচকে তিনি বললেন। 'তোমরা যাবার আগে আইভরি গোডাউনটা পোড়াও।'

অফিসের সেফে ব্যাংক থেকে পাঠানো ক্যানভাসের একটা ব্যাগ পেয়েছে গুচ, তাতে কর্মচারীদের বেতনের টাকা ছিল। ব্যাগের ভেতর চোখ রেখে জবাব দিল, 'ঠিক আছে। সমস্ত কিছুতে আগুন দেয়ার পর যাব আমরা।'

বারান্দা থেকে ধাপ বেয়ে নামলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, উঠে পড়লেন মার্সিডিজে। সংকেত দিলেন জামবুকে, একটু পরই রওনা হলো ট্রাক দুটো। ট্রাকের ফ্লোরে প্রথমে রাখা হয়েছে আইভরি, তার ওপর চাপানো হয়েছে হাতির মাংস। কেউ যদি উঁকি দেয়, ভেতরে কি আছে কিছুই বুঝতে পারবে না। তবে কনভয়টাকে থামাবে এমন কেউ নেই। ট্রাকের গায়ে ন্যাশনাল পার্কের ব্যাজ আঁকা আছে, ওটাই ওদেরকে রক্ষা করবে। জামবু আর দোরাদের পরনে রয়েছে খাকি ইউনিফর্ম। কোন কারণে কোথাও রোড-ব্লক থাকলে সেখানেও ওদেরকে দেরি করিয়ে দেয়া হবে না। এ-দেশের সিকিউরিটি ফোর্স রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে, আইভরি নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

গোটা ব্যাপারটা চাখার সিঙ-এর প্ল্যান মতই ঘটল। মার্সিডিজের রিয়ার-ভিউ মিররে তাকালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আইভরি গুদামে এরইমধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। ফিরতি পথ ধরার জন্যে এক লাইনে দাঁড়িয়েছে পোচাররা। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে হাতির দাঁত।

আপনমনে হাসলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গুচের লোভ হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর উপকারই করবে। সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তবু যদি ধরা পড়ে ওরা, গুদামে আগুন ও পোচারদের বোঝা দেখে আইভরি গায়েব হওয়ার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাবে পুলিস।

অ্যামব্যাসাডরের নির্দেশে আগুন ধরাবার আগে গুদামে চল্লিশটা আইভরি রাখা হয়েছে, পুলিসের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে ছাই পরীক্ষা করা হতে পারে ভেবে।

আপনমনে এবার সশব্দে হেসে উঠলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। উল্লাস বোধ করছেন তিনি। হামলার সাফল্য, মৃত্যু ও রক্ত দর্শন, গরম করে তুলেছে তাঁকে; নিজেকে অসাধারণ শক্তিশালী লাগছে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, পরের বার খুনের কাজগুলো তিনি নিজে করবেন। এরকম বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক যে পরের বার বলে একটা ব্যাপার থাকবে। পরের বার, তার পরের বার, তারও পরের বার। মৃত্যু ঘটাবার শক্তি তাঁকে বেপরোয়া ও দুঃসাহসী করে তুলেছে।

চার

'আলি। হায় আল্লাহ। আলি।' পাশে বসে হাত বাড়াল রানা, কানের নিচে গলায় ক্যারটিড-এর স্পন্দন অনুভব করবে। দেখতে হয় তাই দেখা, কোন লাভ নেই জেনেও পুরানো অভ্যেসের পুনরাবৃত্তি মাত্র, কারণ আলি শাহের খুলির পিছনে বুলেটের গর্তটাই যা জানাবার জানিয়ে দিচ্ছে।

আলি শাহের চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে ক্ষতের দ্বিতীয় মুখ দেখতে চায় রানা, কিন্তু পারছে না। কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকল, প্রবল যন্ত্রণাকর শোককে হটিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিতে দিল ক্রোধ আর আক্রোশকে। রাগটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও, লালন করছে, ওটা যেন অন্ধকার রাতে মোমের শিখা। ওর আত্মার একটা অংশ ঠাণ্ডা ও খালি করে দিয়ে গেছে আলি শাহ, জায়গাটা গরম হবার সুযোগ পেল।

এক সময় উঠে দাঁড়াল রানা। সামনের মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল, আলির জমাট বাঁধা পুরু রক্ত পেরিয়ে ঢুকল আর্মারিতে।

দরজার পাশে মেইন প্যানেলে জেনারেটরের রিমোট কন্ট্রোল। সুইচ অন করল রানা, দূর পাওয়ার হাউস থেকে ভেসে এল ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ। ধীরে গতি সঞ্চার হলো এঞ্জিনে, তারপর সচল হলো জেনারেটর, জ্বলে উঠল আলোগুলো। জানালা দিয়ে দেখল, গাড়ি-পথের দু'পাশের স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো আলো ছড়াচ্ছে, উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছে ভিজে কাসিয়া গাছগুলোকে।

সেফের তালায় এখনও ঝুলছে চাবির গোছাটা, সেটা নিয়ে আবার আর্মারিতে ঢুকল রানা। .৩৭৫ কালিং রাইফেলের সঙ্গে র‍্যাকে পাঁচটা এ/কে ফরটিসেভেনও রয়েছে। এগুলো অ্যান্টি-পোচিং টহলে বেরনোর সময় দরকার হয়, ফায়ার-পাওয়ার পোচারদের চেয়ে কম হলে চলে না। গানর‍্যাকের নিচে একটা কাবার্ডে রাখা হয় অ্যামুনিশন। ইস্পাতের দরজাটা খুলল রানা। হুকের সঙ্গে ঝুলন্ত ওয়েবিং বেল্টে এ/কে অ্যামুনিশনের চারটে ম্যাগাজিন রয়েছে।

একটা ওয়েবিং বেল্ট কাঁধে তুলল রানা, তারপর র‍্যাক থেকে হাতে নিল একটা অটোমেটিক রাইফেল। অভ্যস্ত হাতে লোড করল রাইফেলটা। সশস্ত্র ও রাগে অস্থির, ছুটে নেমে এল বারান্দা থেকে।

প্রথমে আইভরি গোডাউনটা দেখা দরকার। ওখানে তারা নির্ঘাত গিয়েছিল।

পোড়া বিল্ডিংটা চক্কর দিল রানা, স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা দেখছে, কোন জিনিস দৃষ্টি কাড়লেই টর্চের আলো ফেলছে সেদিকে।

নিজেকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ দিলে বুঝতে পারত, অযথা সময় নষ্ট
করছে ও। বৃষ্টির পর খোলা আকাশের নিচে কোন ছাপ বা চিহ্ন থাকার কথা নয়,
থাকলে আছে বারান্দার বাড়তি ছাদের নিচে। আর আছে ভারি টায়ারের দাগ,
আইভরি গুদামের প্রবেশপথের সামনে।

ওগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিল না রানা, ও জানতে চায় পোচারদের সম্পর্কে,
তারা গাড়ি ব্যবহার করবে না। ধীরে ধীরে আরও বড় বৃত্ত ধরে তল্লাশি চালাল ও,
ক্যাম্প থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাওয়া পায়ের ছাপ খুঁজছে। সবশেষে
মনোযোগ দিল ক্যাম্পের উত্তর প্রান্তে, কারণ প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে
পোচাররা জাম্বেজি নদীর দিকে ফিরে গেছে।

পরিশ্রমটুকু বৃথা গেল। বৃথা যে যাবে, মনে মনে জানত রানা। বিশ মিনিট
পর হাল ছেড়ে দিল ও। অনুসরণ করার মত কোন ছাপই নেই। গাছের গাঢ়
ছায়ায় দাঁড়িয়ে হতাশা ও অসহায় রাগে ফুঁসতে লাগল।

গুলি করার জন্যে শত্রুদের খুঁজছে রানা, একবারও ভেবে দেখল না বিশ বা
তারও বেশি পেশাদার খুনীর বিরুদ্ধে একা কতটুকু কি করতে পারবে। পল
নিউম্যান একজন ক্যামেরাম্যান, সৈনিক নয়। যুদ্ধে তার কোন সাহায্য পাওয়া
যাবে না। বাংলোর বেডরুমে ক্ষত-বিক্ষত শরীরগুলো, আলি শাহের ফুটো খুলি
বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে, ব্যাহত করছে ওর যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারাকে।
অনুভব করল, থরথর করে কাঁপছে ও।

কাঁপুনিটাই ওকে মাথা ঠাণ্ডা করতে সাহায্য করল। বুঝতে পারল এখানে
সময় নষ্ট করছে, সেই সুযোগে আরও দূরে সরে যাচ্ছে খুনীরা। নদীর দিকে গেছে
ওরা, কাজেই ওদেরকে নদীপথে বাধা দিতে হবে।

ওর সাহায্য দরকার।

মানা পুল পার্ক ক্যাম্পের কথা ভাবল রানা। ওখানকার ওয়ার্ডেন একজন ভাল
মানুষ। ওর সঙ্গে পরিচয়ও আছে। ওখানে পৌঁছুতে পারলে অ্যান্টি-পোচিং টিমের
সাহায্য পাওয়া যাবে। দ্রুতগামী একটা বোট আছে ওখানে। বোট নিয়ে ভাটির
দিকে চলে যাবে ওরা, টহল দেবে নদী পেরোবার জায়গায়, জাম্বিয়ান দিকটায়
পৌঁছুবার সময় ধরে ফেলবে পোচারদের দলটাকে। ওয়ার্ডেনের অফিসের দিকে
ছুটছে রানা, স্বাভাবিক যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারছে। মানা পুল থেকে হারারেতে
ফোন করা যাবে, পুলিসকে বলবে একটা স্পটার প্লেন পাঠাতে।

যা কিছু করার দ্রুত করতে হবে এখন। দশ ঘণ্টার মধ্যে নদী পেরিয়ে
নাগালের বাইরে চলে যাবে দলটা। তবে আলিকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া
সম্ভব নয়। মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গেলেও কিছু করার নেই, প্রিয় বন্ধুর প্রতি
শেষ দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে ওকে। অন্তত কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে যাবে
তাকে।

অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়াল রানা। মাথার ওপর আলোটা অসম্ভব উজ্জ্বল,
বীভৎস দৃশ্যটার কিছুই গোপন থাকতে দেয়নি। এ/কে রাইফেলটা নামিয়ে রেখে
চারদিকে তাকাল একটা কাপড়ের খোঁজে। সামনের জানালায় সবুজ পর্দা রয়েছে,
সরকারী বরাদ্দ, রোদ লেগে কালচে হয়ে গেছে, তবে লাশ ঢাকার কাজ চলে।

পর্দাটা খুলে ওয়ার্ডেনের কাছে হেঁটে এল রানা।

লাশটা অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে পড়ে আছে। মোচড়ানো একটা হাত তার বুকের
নিচে চাপা পড়েছে, মুখটা ডুবে আছে জমাট বাঁধা রক্তে। ধীরে ধীরে তাকে সিধে
করল রানা। লাশটা এখনও শক্ত হয়নি। মুখটা দেখে শিউরে উঠল ও, বুলেটটা
বেরিয়ে এসেছে ডান চোখের ওপর ফুটো করে। পর্দার একটা কোণ দিয়ে
মুখ থেকে রক্ত মুছে দিল ও। সযত্নে চিৎ করে শোয়াল, যেন আরাম দেয়ার চেষ্টা
করছে।

ওয়ার্ডেনের বাম হাতটা শক্ত মুঠো হয়ে রয়েছে। মুঠোর ভেতর থেকে
কাগজের একটা বল উঁকি দিচ্ছে দেখে আগ্রহ বেড়ে গেল রানার। আঙুলগুলো
সিধে করল ও, মুঠো থেকে বের করে নিল কাগজটা।

দাঁড়াল রানা, হেঁটে এল ডেস্কের সামনে, ভাঁজ খুলে কাগজটা রাখল ওটার
ওপর। দেখেই বুঝতে পারল, কিছু লেখার চেষ্টা করেছে আলি শাহ। লিখেছে
নিজের রক্তে। অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে শিউরে উঠল আরেকবার।

সিএমজিও। হরফগুলো বাচ্চা ছেলের আঁকিবুকির মত, পাঠযোগ্য নয়
বললেই চলে। সি-র পর অন্য একটা অক্ষর ছিল, সেটা রক্ত লেগে চাপা পড়ে
গেছে, তার পাশে লেখা হয়েছে এম। প্রতিটি অক্ষর বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল
রানা। কোন অর্থ খুঁজে পেল না। সিএমজিও। উঁহুঁ, এটা কোন মেসেজ হয়
কিভাবে! হয় এটা কিছুই নয়, নয়ত এর অর্থ জানা ছিল শুধু মৃত্যুপথযাত্রী একজন
লোকের।

হঠাৎ অবচেতন মনে কি যেন একটা নড়ে উঠল, কি যেন একটা চেতন মনে
উঠে আসার চেষ্টা করছে। ওটাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে
থাকল রানা। কোন আইডিয়া বা স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে মনটাকে খালি করে
দিলে কাজ হয়, বেশি চেষ্টা করলে বা তাড়াহুড়ো করলে উল্টোটা ঘটে। খুব
কাছাকাছি এখন, মনে পড়তে যাচ্ছে, চেতন মনের ঠিক নিচেই একটা ছায়ার মত।

সিএমজিও।

চোখ খুলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। রক্তাক্ত পায়ের ছাপ রয়েছে
মেঝেতে, ওর আর খুনীদের। যদিও ছাপগুলোর কথা ভাবছে না রানা, ভাবছে ওর
জন্যে রেখে যাওয়া মেসেজে কি বলেছে আলি শাহ।

হঠাৎ খেয়াল হলো, বিশেষ ও নির্দিষ্ট একটা পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে
রয়েছে ও। হঠাৎ বেহালার তারে টান দিলে যেমন হয়, ওর শরীরের ভেতর
সেরকম হতে থাকল, যেন নার্ভগুলোয় হঠাৎ কেউ তীব্র খোঁচা মেরেছে। পায়ের
ছাপটায় মাছের আঁশ।

সিএমজিও। মাথার ভেতর প্রতিধ্বনি তুলছে শব্দগুলো। পায়ের ছাপে মাছের
আঁশ, অর্থবহ করে তুলছে শব্দগুলোকে। সিএমজিও। আলি শাহ লেখার চেষ্টা
করেছে চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আবিষ্কারটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রানাকে, শীত লাগছে ওর,
কাঁপুনি ধরে গেছে শরীরে।

অ্যামব্যাসাডর গণ্ড–চণ্ডমণ্ড গণ্ড। হায় আল্লাহ, কিভাবে তা সম্ভব! অথচ
অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করানোর জন্যে রক্তে লেখা হরফগুলো চোখের সামনেই

রয়েছে। আলি শাহ গুলি খাবার পর চণ্ডমণ্ড গণ্ড এখানে ছিলেন। রানাকে তিনি বলেছেন, রওনা হবার সময় সব ঠিক ছিল···মিথ্যে কথা বলেছেন তিনি। আরেকটা কথা মনে পড়ে যেতে আবার প্রচণ্ড ধাক্কা খেল রানা।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের নীল সুতী স্ন্যাকস ও জুতোয় রক্তের দাগ—আলি শাহের রক্ত। ওর ক্রোধ অবশেষে একটা লক্ষ্যস্থল পেয়ে গেছে, তবে এটার প্রকৃতি ঠাণ্ডা ও সতর্ক। রক্তাক্ত কাগজটা ওয়ার্ডেনের হাতে গুঁজে দিল রানা, আঙুলগুলো ভাজ করল ওটার চারধারে, পুলিস যাতে দেখতে পায়। তারপর সবুজ পর্দা দিয়ে লাশটা ঢাকল মাথা পর্যন্ত। দাঁড়াল রানা, কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। বন্ধুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

'ওদের রেহাই নেই, আলি। আমি যদি বেঁচে থাকি, প্রতিশোধ নেবই। তোমাকে, রুমানাকে, তোমাদের বাচ্চাদের কোনদিন আমি ভুলব না।'

রাইফেলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল রানা, ধাপ টপকে নেমে ল্যাণ্ডক্রুজারের পাশে এসে দাঁড়াল। ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করছে পল।

ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে যে সময়টুকু লাগল, তার মধ্যেই বাকি সব খুঁটিনাটি ঘটনা খাপে খাপে মিলে গেল ওর মনে। মনে পড়ল, চিউইউইয়ে ও আরও ক'টা দিন থাকতে পারে ধরে নিয়ে কি রকম অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তারপর যখন শুনলেন যে রানা চলে যাচ্ছে, স্বস্তির ভাবটুকুও গোপন করতে পারেননি।

বিধ্বস্ত আইভরি গোডাউনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। কাদায় এখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে ভারি টায়ারের দাগ। প্ল্যানটা সহজ, অথচ বুদ্ধির ছোঁয়া আছে। সন্দেহ করা হোক পোচারদের, কেউ যদি পিছু নেয় তো তাদের পিছু নিক, এই ফাঁকে পার্ক ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ট্রাকে করে পাচার করা হবে আইভরি। রানার মনে পড়ল, রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হতে জামবু ও অপর ড্রাইভার কি রকম অদ্ভুত ব্যবহার করেছে। কারণটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চুরি করা আইভরি বহন করছিল ওরা। অদ্ভুত আচরণ তো করবেই।

ল্যাণ্ডক্রুজারে বসে হাত ঘড়ির ওপর চোখ রাখল রানা। প্রায় দশটা বাজে, রাস্তায় চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও ট্রাকগুলোকে পাশ কাটাবার পর কমবেশি চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মেইন হাইওয়েতে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে ওদেরকে কি ধরতে পারবে ও? রানা উপলব্ধি করল, এত সতর্কতার সঙ্গে প্ল্যানটা করা হয়েছে, নিরাপদ এস্কেপ রুট ও আইভরি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা না থেকেই পারে না। ল্যাণ্ডক্রুজার স্টার্ট দিল ও। 'পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না, বেজন্মা কুকুর,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিসহিস করে উঠল।

বৃষ্টির পানিতে রাস্তার অনেক জায়গা ডুবে আছে। সামনে খানা-খন্দ দেখেও স্পীড কমাল না রানা। ড্যাশবোর্ডের হাতল ধরে নিজেকে সামলাচ্ছে পল, তা না হলে ছিটকে পড়বে। প্রতি মুহূর্তে অসম্ভব ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রাক।

'আস্তে চালাও, রানা—ধুত্তোরি ছাই! মরতে চাও নাকি? কোথায় যাচ্ছি বলো তো আমরা? এত ব্যস্ততা কিসের?'

যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল রানা।

'একজন অ্যামব্যাসাডরকে তুমি ছুঁতে পারবে না,' ঝাঁকি খাচ্ছে পল, শব্দগুলো কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। 'তোমার যদি ভুল হয়, ওরা তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

'আমার ভুল হচ্ছে না,' পলকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আলির মেসেজ বাদ দিলেও, ব্যাপারটা আমি অনুভব করতে পারছি।'

উপত্যকার নিচে নামার পর ট্রাক থামাতে বাধ্য হলো রানা। আশপাশের সবগুলো ঢাল বেয়ে এখনও সবেগে নেমে আসছে পানি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে শুকনো একটা নদীর তলা পেরিয়েছে ও, সেখানে এখন তীব্র স্রোত বইছে।

'এটা পেরোনো অসম্ভব,' ভয় পেয়ে গেল পল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, কাদায় ডুবে গেল গোড়ালি পর্যন্ত। তীব্র স্রোতের কিনারায় এসে দাঁড়াল ও। ক্রীম ঢালা কফির মত রঙ, কল কল শব্দে সবেগে ছুটে চলেছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাছের গুঁড়ি, ডালপালা ও ঝোপ-ঝাড়। প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া নদীটা।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাছ, শাখাগুলো পানির ওপর, কোন কোনটা আলোড়িত পানিকে ছুঁয়ে দিতে চাইছে। মোটা একটা ডাল ধরল রানা, তারপর নদীতে নামল। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে ও, বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখতে হলো ডালটাকে, তা না হলে তীব্র স্রোত ছিনিয়ে নেবে ওকে। পানির টান এত বেশি যে নদীর মেঝেতে পা রাখতেই পারা যাচ্ছে না, উঠে আসছে বারবার। তবু ধীরে ধীরে নদীর গভীরতম অংশে পৌঁছে গেল রানা।

পানি এখানে ওর নিচের পাঁজর পর্যন্ত গভীর। হাতের ডালটা টান পড়া ফিশিং-রডের মত বাঁকা হয়ে আছে, ধীরে ধীরে নদীর কিনারায় উঠে এল রানা। শরীরের নিচের অংশ ভিজে গেছে, ভেজা কাপড় সেঁটে আছে গায়ে।

'যাওয়া যাবে,' পলকে বলল রানা, উঠে বসল ট্রাকের ক্যাবে।

'তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ!' বিস্ফোরিত হলো পল। 'ওখানে আমি মরতে যাব নাকি?'

'বেশ। চমৎকার। নেমে যাবার জন্যে দু'সেকেণ্ড সময় দেয়া হলো তোমাকে।' রানা গম্ভীর, টয়োটার গিয়ার বদলে ফোর-হুইল ড্রাইভে আনল।

'এখানে আমাকে ফেলে যাবে নাকি?' আতঙ্কে উঠল পল। 'এদিকে গিজ গিজ করছে সিংহ। আমার কি হবে?'

'সেটা তোমার সমস্যা, বন্ধু। তুমি যাচ্ছ, নাকি যাচ্ছ না?'

'ঠিক আছে, চলো। নিজেও ডোবো, আমাকেও ডোবাও।' হাত-পা গুটিয়ে নিজেকে ছোট করে আনল পল, সীটের একটা পাশ আঁকড়ে ধরল।

ঢালের ওপর দিয়ে ল্যাণ্ডক্রুজারকে নদীর দিকে গড়িয়ে দিল রানা, তারপর বাদামি পানিতে নামাল। ট্রাকটাকে খুব ধীরে গড়াচ্ছে ও। কয়েক গজ এগোতেই হুইলের লেভেল ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এল পানি, তারপরও ট্রাকের নাক খাড়াভাবে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে।

হুস হুস শব্দে বাষ্প উঠল, উত্তপ্ত এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে পানি।

হেডলাইট ডুবে যেতে ম্লান হয়ে গেল আলো, ঘোলা পানিতে একজোড়া অনুজ্জ্বল আভার মত লাগল দেখতে। বনেটের সামনে একটা ঢেউ তৈরি হলো, উইণ্ডশীল্ডের লেভেল ছুঁয়ে দিয়েছে পানি। পেট্রল এঞ্জিন হলে ইতস্তত করত, বন্ধ হবার পায়তারা কষত, কিন্তু বড়সড় ডিজেল এঞ্জিনটা একরোখা ভঙ্গিতে বন্যার ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। দরজা দিয়ে ভেতরে পানি ঢুকছে। অনেকটা ডুবে গেছে ওদের পা।

'তুমি সত্যি একটা পাগল!' চিৎকার করল পল, পা দুটো ড্যাশবোর্ডে তুলে ফেলল। 'আমি মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই।'

ট্রাকের শরীরে বাতাস আটকা পড়ায় পানির ওপর ভেসে থাকছে ট্রাক, ঘুরন্ত চাকা নদীর পাথুরে মেঝেতে কামড় বসাতে পারছে না। এবার ডিজেল এঞ্জিন খক খক করে উঠল।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল পল, অন্ধকার থেকে ওদের দিকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল একটা গাছ। ট্রাকের পাশে ধাক্কা খেল গাছটা, জানালার কাচ ভেঙে গেল, ঘষা খেল ট্রাকের পুরো একটা দিক।

কাত হয়ে যাচ্ছে ট্রাক, তারপর দোল খেতে খেতে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে শুরু করল। তবে আটকা পড়া বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় ডুবছে টয়োটা। ভেতরে সবেগে পানি ঢুকছে। দেখতে দেখতে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল ওদের।

'বেরিয়ে যাচ্ছি আমি!' চিৎকার করল পল, লাফ দিল দরজার ওপর। 'দরজা খুলছে না!' আতঙ্কে প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হয়েছে তার। পানির চাপে শক্তভাবে বন্ধ হয়ে আছে দরজা।

তারপর হঠাৎ রানা অনুভব করল টায়ারগুলো আবার নদীর তলা স্পর্শ করছে। ইতিমধ্যে স্রোতের টানে নদীর বাঁকে চলে এসেছে ওরা, ঠেলে নিয়ে চলেছে অপর পারের দিকে। এঞ্জিন এখনও সচল। মডিফায়েড এয়ার-ইনটেক পাইপ আর ফিল্টার প্রায় ক্যাবের ছাদ সমান ওপরে উঠে এল। ঠিক এ-ধরনের জরুরী অবস্থার কথা ভেবেই ওগুলো লাগিয়েছিল রানা। অগভীর পানিতে পৌঁছে উঁচু-নিচু পাথরে দাঁত বসাতে পারল হুইল, হেলেদুলে তীরের দিকে এগোল ল্যাণ্ডক্রুজার।

তীরে উঠে এল ট্রাক।

'বেঁচে আছি!' বিড় বিড় করল পল। 'ফর গডস সেক, বেঁচে আছি আমি!'

গাছপালার ভেতর দিয়ে, এঁকেবেঁকে এগোল ট্রাক, তারপর উঠে এল রাস্তায়। স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা।

'এরকম আর ক'টা আছে?' ঢোক গিলে জানতে চাইল পল। করুণ মৃত্যুগুলো দেখার পর এই প্রথম ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, যদিও তাতে প্রাণ থাকল না।

'মাত্র চার কি পাঁচটা,' জবাব দিল ও। 'সান্ধ্যভ্রমণ, কোন ব্যাপারই না।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। চণ্ডমণ্ড গণ্ড আর রিফ্রিজারেটর ট্রাক ওদের চেয়ে চার ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে। নদীটা পার হয়েছে তারা পানিতে ভরে ওঠার আগেই। গরম চকলেটের মত গলে গেছে এদিকের মাটি। কালো এই মাটির

কুখ্যাতি আছে, ভিজে গেলে গাড়ির চাকা আটকে দেয়। স্পীড কমাতে বাধ্য হলে বিপদে পড়তে হতে পারে।

'সামনে নদী,' সাবধান করল রানা। সরু হয়ে গেছে সামনের রাস্তা, দু'পাশের ঝোপ ঘন হয়ে সরে এসেছে। 'তোমার লাইফ জ্যাকেটটা পরে নাও।'

'এবার আমি ভয়েই মরে যাব।' রানার দিকে ফিরল পল, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আড়ায় [illegible] তাকে। 'কথা দিচ্ছি রোববারে [illegible] যাব, শিরনি দেব মসজিদে···।

'যেভাবে ধরনা দিচ্ছ···,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করল রানা।

আফ্রিকার আকস্মিক বন্যা যেমন হঠাৎ শুরু হয় তেমনি হঠাৎই শেষ হয়। বৃষ্টি থেমেছে প্রায় দু'ঘণ্টা আগে, উপত্যকার ঢালগুলো ইতিমধ্যে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। নদীর কিনারায় এসে ওরা দেখল, এখন যেখানে পানি রয়েছে তার ছ'ফুট ওপরে ভেজা দাগ। এবার নদী পেরুতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না। অপর পারে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল পল।

'কে বলে প্রার্থনায় কাজ হয় না? চালিয়ে যাও, পল।'

পরবর্তী নদীটা পেরুতেও কোন অসুবিধে হলো না।

চল্লিশ মিনিট পর মানা পুল ক্যাম্পে পৌঁছে গেল ওরা, ওয়ার্ডেনের বাংলোর সামনে ট্রাক থামাল রানা। গাড়িতে বসে হর্নের বোতামে চাপ দিয়ে রাখল পল, আর রানা দু'হাতে ঘুসি মারল দরজায়।

জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় বেরিয়ে এল ওয়ার্ডেন, পরনে শুধু আণ্ডারপ্যান্ট। 'কে? কারা?' শোনা ভাষায় জানতে চাইল সে। 'কি ঘটছে কি এখানে?' রোগা-পাতলা গড়ন, পাকানো রশির মত পেশী, বয়েস চল্লিশ। কাচা ঘুম ভাঙানোয় এই মুহূর্তে রেগে থাকলেও আব্বাস উলুম্বু এমনিতে শান্ত মেজাজের হাসি খুশি লোক।

'আব্বাস? আমি রানা,' গলা চড়াল রানা। 'সাংঘাতিক একটা বিপদ ঘটেছে হে। বেরিয়ে এসো, কাজ আছে।'

আব্বাস উলুম্বু রানার মুখে টর্চের আলো ফেলল। 'কি ব্যাপার, রানা সাহেব? কি বিপদ ঘটল আবার?'

অনর্গল শোনায় জবাব দিল রানা, 'সশস্ত্র পোচারদের বড় একটা দল চিউইউই ক্যাম্পে হামলা করেছে। আলি শাহ আর তার পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে তারা। স্টাফদেরও কেউ বেঁচে নেই।'

'হায় আল্লাহ!' চোখ থেকে ঘুমের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে গেল, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আব্বাস উলুম্বু।

'আমার ধারণা, ওরা জাম্বিয়া থেকে এসেছিল,' বলে চলেছে রানা। 'আমার হিসেবে, জাম্বেজি নদী পেরোবার জন্যে এখান থেকে বিশ মাইল ভাটির দিকে যাবে ওরা। ওদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার অ্যান্টি-পোচিং টিমকে পাঠাতে হবে।'

সমস্ত তথ্য দ্রুত বলে গেল রানা–দলের আনুমানিক লোক সংখ্যা, কি ধরনের অস্ত্র বহন করছে, চিউইউই থেকে কখন রওনা হয়ে কোনদিকে যাচ্ছে। তারপর

জানতে চাইল, 'হারারেতে ফিরে যাবার পথে রিফ্রিজারেটর ট্রাকগুলো এদিক দিয়ে গেছে কিনা জানো তুমি?'

'আটটার দিকে,' নিশ্চিত করল আব্বাস উলুম্বু। 'ঢল নামার ঠিক আগে নদী পেরিয়েছে ওরা। ওদের সঙ্গে একজন সিভিলিয়ান ছিলেন, নীল মার্সিডিজ নিয়ে এক টীনা সাহেব। একটা ট্রাক মার্সিডিজটাকে টো করছিল—এত দামি গাড়ি অথচ কাদায় কোন কাজের না।' কাপড় পরতে পরতে কথা বলছে সে। 'এখন আপনি কি করতে চান, রানা সাহেব? আলির সঙ্গে আপনার যে কী সম্পর্ক ছিল সে তো আমি জানি। আমাদের সঙ্গে গেলে বুড়বাকদের গুলি করার একটা সুযোগ পেতে পারেন।' আফ্রিকায় রানার অতীত ও বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় সবই জানে সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি মার্সিডিজ আর ট্রাকগুলোকে ধরতে চাই,' বলল ও।

'বুঝলাম না, রানা সাহেব।' জুতোর ফিতে বাঁধছিল, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল আব্বাসের, অবাক হয়ে মুখ তুলল।

'এখন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, উলুম্বু। শুধু জেনে রাখো, গোটা ব্যাপারটাই আলিকে নিয়ে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।' আইভরি আর অ্যামব্যাসাডর সম্পর্কে আব্বাস উলুম্বুকে এখুনি কিছু বলা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না রানার হাতে প্রমাণ আসছে।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা ঝাঁকাল আব্বাস উলুম্বু। 'ঠিক আছে, রানা সাহেব। আপনার হয়ে কাজটা করব আমি, নদী পেরোবার আগেই বুড়বাক খুনীদের ধরব,' প্রতিশ্রুতি দিল সে। 'আপনি আপনার পথে যান, যা করতে চান করুন।'

জাম্বেজি নদীর তীর থেকে বিদায় নিল রানা। মানা পুল-এর ওয়ার্ডেন তার রেঞ্জারদের নিয়ে অ্যাসল্ট বোটে উঠছে।

কাদায় কনভয়ের দাগ এবার আরও স্পষ্ট দেখল রানা। হেডলাইটের আলোয় এত তাজা মনে হলো, যেন কয়েক মিনিট আগে এখান দিয়ে গেছে ওরা। সন্দেহ নেই তুমুল বর্ষণের পর তৈরি হয়েছে দাগগুলো।

একটা ট্রাক যে মার্সিডিজটাকে টো করে নিয়ে যাচ্ছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে গাড়ি দুটোর মাঝখানের রশি কাদা স্পর্শ করেছে। মার্সিডিজকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, কাজেই গতি খুব মন্থর হবে ওদের। খানিকটা সন্তুষ্টবোধ করল রানা। কনভয়ের সঙ্গে ওর দূরত্ব নিশ্চয়ই দ্রুত কমে আসছে। ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, আশা করছে অন্ধকারের ভেতর মার্সিডিজের টেইল-লাইটের লালচে আভা দেখতে পাবে। তাকিয়ে আছে, নিজের অজান্তেই হাতটা চলে গেল দুই সীটের মাঝখানে রাখা এ/কে ফরটিসেভেনের ওপর।

ব্যাপারটা লক্ষ করল পল, নরম গলায় সাবধান করে দিল ওকে। 'বোকার মত কিছু করে বোসো না, রানা। তোমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। সন্দেহের বশে তুমি একজন অ্যামব্যাসাডরের খুলি উড়িয়ে দিতে পারো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

একসময় সন্দেহ হলো, যতটা মনে করেছে কনভয়ের কাছ থেকে তারচেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে ওরা। মাঝরাতের পর গ্রেট নর্থ রোড-এ এসে পৌঁছুল টয়োটা। এই হাইওয়ে উত্তর দিকে জাম্বেজি নদীর ওপর চিরাণ্ডু ব্রিজ পেরিয়েছে, আর দক্ষিণে ঢালগুলোর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে হারারে পর্যন্ত।

রাস্তার মোড়ে ট্রাক থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল রানা, হাতে টর্চ। ধরে নিতে হয় কনভয়টা দক্ষিণে ঘুরে হারারের দিকে চলে গেছে। তাজা হাতির মাংস ও আইভরি ভরা বিশাল দুটো সরকারী ট্রাক নিয়ে জিম্বাবুই ও জাম্বিয়ান কাস্টমস পোস্ট পেরোবার ঝুঁকি কেউ নেবে না।

প্রায় সাথে সাথে নিজের ধারণার পক্ষে প্রমাণ পেয়ে গেল রানা। ট্রাক আর মার্সিডিজের চাকায় লেগে থাকা কালো কাদা শক্ত হয়ে গিয়েছিল, হাইওয়ের পরিচ্ছন্ন মেঝেতে কিছু কিছু ঝরে পড়েছে।

'দক্ষিণে,' বলল রানা, আবার উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। 'ওরা দক্ষিণে গেছে।'

'কিন্তু কতক্ষণ আগে গেছে? এখন তারা কতদূরে?'

'বেশি দূরে হতে পারে না। দূরত্ব প্রতি মিনিটে কমে আসছে।'

'আচ্ছা, ধরো, ওদেরকে আমরা পেলাম। তারপর কি হবে?'

ল্যাণ্ডক্রুজারের স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা, প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

পলও নাছোড় বান্দা, আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'আগে ওদের ধরি, তারপর দেখতে পাবে কি হয়,' জবাব দিল রানা।

স্পীডমিটারের কাঁটা নব্বুই-এ পৌঁছুল। হাইওয়ের কালো মেঝেতে ভারি চাকাগুলো শোঁ শোঁ আওয়াজ করছে।

'সামনেই পাব ওদের, কাছে চলে এসেছি,' বিড়বিড় করল রানা। কথাটা শেষ হতেই হেডলাইটের আভা দেখতে পেল সামনে।

রানার হাত চলে গেল রাইফেলে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল পল। 'ফর গডস্ সেক, রানা। তোমাকে আমার উন্মাদ লাগছে। তুমি কিছু করে বসলে আমিও ফেঁসে যাব। আগেই বলে রাখছি, আমি ভাই খুন-খারাবির মধ্যে নেই। যতটুকু শুনেছি, চিকুরুবি জেলখানাকে ঠিক ফাইভ-স্টার হোটেল বলা যায় না।'

সামনের আলোটা আরও কাছে চলে এল। ল্যাণ্ডক্রুজারের শক্তিশালী স্পটলাইট অন করল রানা। পরমুহূর্তে হতাশায় প্রায় ককিয়ে উঠল। সাদা ও উঁচু রিফ্রিজারেটর ট্রাকের কাঠামো দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল, তার বদলে দেখল দৈত্যাকার একটা ম্যাক ট্রাক—বিশ টনী, পিছনে বাঁধা প্রায় সমান আকৃতির আট টনী একটা ট্রেইলর। ট্রাকের খোল আর ট্রেইলরের শরীর, দুটোই হেভী-ডিউটি সবুজ নাইলন তারপুলিন দিয়ে ঢাকা ও আষ্টেপৃষ্ঠে রশি দিয়ে বাঁধা—ভেতরের কার্গো যাতে নড়াচড়া না করে। হাইওয়ে থেকে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকটা, মুখ করে আছে চিরুণ্ডু ব্রিজের দিকে।

টেইলরটাকে ঘিরে তিনজন লোক কাজ করছে। মনে হলো রশিগুলো টেনে-

টুনে বসাচ্ছে, তারপুলিন যাতে জায়গামত থাকে। স্পটলাইটের আকস্মিক উজ্জ্বলতা স্থির পাথর করে দিল ওদেরকে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল দ্রুতগতি ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে।

দু'জন লোক কালো আফ্রিকান, রঙচটা ওভারঅল পরে আছে। তৃতীয় জনকে অভিজাত শ্রেণীর কেউ বলে মনে হলো, খাকি সাফারি সুটে দারুণ মানিয়েছে। তাকেও কালো বলা চলে, তবে শ্যামলা বলাই ঠিক। মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। সম্ভবত ভারতীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকান। আরও কাছে আসার পর লোকটাকে শিখ বলে চিনতে পারল রানা। তার দাড়ি সযত্নে পাক খাইয়ে ওপর দিকে তোলা হয়েছে, ঢুকে গেছে পাগড়ির ভাঁজে।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সামনে যেই ল্যাণ্ডক্রুজার থামাল রানা, আফ্রিকান দু'জনের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথা বলে উঠল শিখ লোকটা। তিনজনই তারা তাড়াহুড়ো করে ট্রাকের সামনে চলে এসে ওপরে উঠে পড়ল।

'এক মিনিট দাঁড়ান!' চিৎকার করল রানা, লাফ দিয়ে নামল ল্যাণ্ডক্রুজার থেকে। 'আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' শিখ লোকটা এরইমধ্যে হুইলের পিছনে বসে পড়েছে।

'থামুন!' আবার অনুরোধ করল রানা, ক্যাব-এর পাশে চলে এল।

ওর মাথা থেকে পাঁচ ফুট ওপরে রয়েছে শিখ লোকটা, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে, রানার ওপর চোখ। 'বলুন, কি ব্যাপার?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা। 'আপনারা কি বড় এক জোড়া ট্রাককে পাশ কাটিয়েছেন?'

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে থাকল শিখ লোকটা।

রানা আবার বলল, 'খুব বড় ট্রাক—দেখতে না পাবার কথা নয়। তিনটে গাড়ির একটা কনভয়, সঙ্গে একটা নীল মার্সিডিজ সেলুনও আছে।'

মাথাটা ভেতরে গলিয়ে নিয়ে আফ্রিকান দু'জনের সঙ্গে কথা বলল শিখ। এমন একটা আঞ্চলিক ভাষা, বুঝতে পারল না রানা। জবাব পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার অবস্থা, লক্ষ করল ট্রাকের সামনের ডোর প্যানেলে একটা কোম্পানীর লোগো আঁকা রয়েছে।

চাখার সিং লিমিটেড
ইমপোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট
পি.ও. বক্স জিরোফাইভনাইন লিলঙ্গুয়ে
মালাবি

জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া আর মোজাম্বিক, এই তিনটে বড় দেশের মাঝখানে মালাবি একটি ছোট্ট সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাহাড় নদী আর লেক নিয়ে ভারি সুন্দর একটা দেশ। দারিদ্র্যপীড়িত ও স্বৈরশাসনাধীন আফ্রিকা মহাদেশের যে-কোন রাষ্ট্রের মানুষ যতটা সচ্ছল ও সুখী হতে পারে, একনায়ক অশীতিপর বৃদ্ধ হেস্টিং বান্দা-র অধীনে মালাবির নাগরিকরাও ঠিক ততটা সচ্ছল ও সুখী।

'মি. সিং, সাংঘাতিক তাড়া আছে আমার,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'ট্রাকগুলো দেখে থাকলে বলুন আমাকে, প্লীজ।'

জানালা দিয়ে ঝট করে মাথা বের করল আবার শিখ লোকটা, চেহারায় বিস্ময় ও সতর্কতা। 'আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?' কর্কশস্বরে জানতে চাইল সে, ইংরেজিতে।

ইঙ্গিতে লোগোটা দেখিয়ে দিল রানা।

'বাহ্! আপনার দেখছি ঈগল পাখির চোখ, নেতার মাইণ্ড।' মনে হলো স্বস্তি ফিরে পেয়েছে শিখ লোকটা। 'হ্যাঁ, আমার লোকেরা মনে করিয়ে দিল যে এক ঘণ্টা আগে দুটো ট্রাক আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে গেছে। দক্ষিণে যাচ্ছে ওগুলো। তবে ওগুলোর সঙ্গে আমরা কোন মার্সিডিজ দেখিনি। এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমরা। ছিল না, কোন মার্সিডিজ ছিলই না।'

ম্যাক ট্রাক স্টার্ট দিল চাখার সিং। 'আপনার উপকারে লাগতে পেরে খুশি আমি। আপনার মত আমারও খুব তাড়া আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে, লিলঙ্গুয়েতে ফিরতে হবে আমাকে। ফেয়ারওয়েল, মাইফ্রেণ্ড—সেফ জার্নি অ্যাণ্ড হ্যাপি ল্যাণ্ডিংস।' চকচকে হাসি উপহার দিল রানাকে, হাত নাড়ল, তারপর ছেড়ে দিল ট্রাক।

লোকটার আচরণে ও রসিকতার ভেতর ফাঁপা কি যেন আছে বলে সন্দেহ হলো রানার। ভারি কার্গো ঠাসা ট্রেইলরটা সগর্জনে পাশ কাটাচ্ছে ওকে, ইস্পাতের একটা রড ধরে টেইলগেইটের নিচের পাদানিতে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাণ্ডক্রুজারের হেডলাইট থেকে যথেষ্ট আলো পাওয়া গেল, এক জোড়া রডের মাঝখানে হাত গলিয়ে তারপুলিনের কিনারা উঁচু করে দেখে নিল ভেতরে কি আছে।

ভেতরে মনে হলো শুধু চটের বস্তা। একটা বস্তায় স্টেনসিল করা, লেখাগুলো পড়া গেল—শুকনো মাছ। কোন দেশের প্রডাক্ট পড়া গেল না, নামটা অস্পষ্ট। বস্তার ভেতর যে শুকনো মাছ আছে, সাক্ষি দিল রানার নাক। আধ পচা মাছের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

ট্রাকের গতি দ্রুত বাড়ছে, ট্রেইলরের পাদানি থেকে লাফ দিল রানা, ঝোঁকটা সামলাবার জন্যে কয়েক গজ দৌড়াল, তারপর ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া টেইললাইটের দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে।

ওর খুঁতখুঁতে মন বলছে, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে পচা মাছের মতই দুর্গন্ধময় কি যেন একটা আছে। কিন্তু কি করতে পারে ও? ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে চেষ্টা করল। ওর আসল টার্গেট হলো রিফ্রিজারেটর ট্রাক আর মার্সিডিজ। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ওগুলো। আর ম্যাক ট্রাক ও টেইলর নিয়ে শিখ লোকটা যাচ্ছে উল্টোদিকে। দুটো কনভয়ের মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারেও, একই সঙ্গে দুটোকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। প্রমাণই বা কই?

'চাখার সিং,' নামটা মুখস্থ করে নিচ্ছে রানা, নাম আর বক্স নম্বর। তারপর ছুটে ফিরে এল ল্যাণ্ডক্রুজারের কাছে।

'কে লোকটা? কি বলল তোমাকে?' জানতে চাইল পল।

'বলল, ঘণ্টাখানেক আগে রিফ্রিজারেটর ট্রাকগুলোকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। ওগুলোর পিছু নিচ্ছি আমরা।' ড্রাইভিং সীটে বসে ফুলস্পীডে

ল্যাণ্ডক্রুজার ছোটাল রানা।

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল হাইওয়ে, উঁচু মধ্য মালভূমিতে পৌঁছুবে। ধীরে ধীরে কমে গেল ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি, তবু ঘণ্টায় সত্তর মাইল ছুটছে। প্রায় কোন কথাই বলছে না পল, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ম্লান আলোয় তাকে খুব গম্ভীর ও নার্ভাস দেখাচ্ছে। বারবার আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে, যেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে সামলে নিচ্ছে নিজেকে।

একের পর এক কয়েকটা বাঁক পড়ল সামনে। শেষ বাঁকটা ঘোরার পর, অকস্মাৎ, দেখা গেল রাস্তাটা আগলে রেখেছে সাদা একটা রিফ্রিজারেটর ট্রাক। ল্যাণ্ডক্রুজারের তুলনায় অনেক মন্থরবেগে ছুটছে ওটা, এগজস্ট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। হাইওয়ের মাঝখানটা দখলে রেখেছে ড্রাইভার, পাশ কাটাবার জন্যে রানাকে কোন জায়গা দিচ্ছে না।

বারবার হর্ন বাজাল রানা, স্পটলাইটটা ঘন ঘন জ্বালল আর নেভাল। কিন্তু কাজ হলো না তাতে।

'কুত্তার বাচ্চা, জায়গা ছাড়!' দাঁতে দাঁত পিষল রানা, আবার চেপে ধরল হর্নের বোতাম।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, রানা,' আবেদন জানাল পল। 'নিজেকে সামলাও। তুমি পাগলামি শুরু করলে দু'জনেই বিপদে পড়ব...।'

ল্যাণ্ডক্রুজারকে রাস্তার পাশে নামিয়ে আনল রানা, ওভারটেক করার আগে আবার হর্ন বাজাল। ট্রাক ক্যাবের উইং মিররটা এখন দেখতে পাচ্ছে ও। আয়নায় ড্রাইভারের মুখ দেখা গেল।

ড্রাইভার আর কেউ নয়, জামবু। আয়নায় চোখ রেখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু ওকে সাইড দেয়ার কোন চেষ্টা করছে না। তার চেহারায় ভীতি, হিংস্রতা, অপরাধবোধ, তিক্ততা ইত্যাদি ভাব মিশে রয়েছে। ইচ্ছা করে রাস্তা আটকে রেখেছে সে, যেদিক থেকেই ওভারটেক করার চেষ্টা করছে রানা সেদিকে সরিয়ে আনছে ট্রাক।

'কুত্তাটা জানে টয়োটায় কারা আছে,' খেপে গিয়ে পলকে বলল রানা। 'জানে চিউইউই থেকে ফিরে আসছি আমরা, ওখানে কি ঘটেছে জানি। খুনের জন্যে তাকেও যে আমরা দায়ি ভাবছি, বুঝতে পেরেছে। সেজন্যেই...।'

'থামো তো তুমি, রানা। এ-সব তোমার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। কেন এরকম আচরণ করছে তার এক ডজন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। তোমার এই পাগলামিতে আর আমাকে টেনো না তো, আমি এ-সবের মধ্যে থাকতে চাই না।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বন্ধু,' বলল রানা। 'পছন্দ করো আর না-ই করো, এখন তুমি এটার একটা অংশ।'

হঠাৎ দ্রুতবেগে রাস্তার উল্টোদিকে নিয়ে এল রানা ল্যাণ্ডক্রুজারকে। এবার দেরি করে ফেলল জামবু। ল্যাণ্ডক্রুজারের সরাসরি সামনে ট্রাক সরিয়ে আনতে দেরি করে ফেলল সে, এই সুযোগে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল টয়োটা, ট্রাকের পাশে জায়গা করে নিল। টয়োটার মেঝেতে পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরেছে রানা, ক্যাব-এর পাশে চলে এল দ্রুত।

শুধু ল্যাণ্ডক্রুজারের একপাশের চাকা হাইওয়েতে রয়েছে, অপর দিকের চাকাগুলো হাইওয়ে ছেড়ে নিচে নেমে গেছে, তীরবেগে ছুঁড়ে দিচ্ছে আলগা নুড়ি পাথর আর কাঁকর–বিপজ্জনক কিনারায় চলে এসেছে চাকাগুলো, কিনারা থেকে খাড়া নেমে গেছে খাদ, নিচে জাম্বেজি উপত্যকা।

'রানা, ইউ ম্যাড বাস্টার্ড!' আর্তনাদ করে উঠল পল। 'তুমি আমাকে খুন করবে!'

কংক্রিটের একটা রোড-মার্কারে ধাক্কা খেল ল্যাণ্ডক্রুজার। সংঘর্ষের প্রচণ্ড শব্দ হলো, রোড সাইন উপড়ে ছুটে চলেছে ল্যাণ্ডক্রুজার, কাত হয়ে আছে একদিকে–যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। কিন্তু তবু রানা পিছু হটতে রাজি নয়, মাথার ওপর ঝুলে থাকা প্রকাণ্ড ট্রাকটার পাশে আঠার মত লেগে থাকল, ক্যাবকে ছাড়িয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে আগে বাড়ছে।

উঁচু ক্যাব থেকে কাত হয়ে ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে তাকাল জামবু। তাকে দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, হুইল থেকে একটা হাত তুলে ট্রাক সরিয়ে নিয়ে থামার ইঙ্গিত করল। মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো জামবু। বাম দিকে সরিয়ে নিল ট্রাক, পথ ছেড়ে দিল ল্যাণ্ডক্রুজারকে।

'এই তো বাছাধন, পথে এসেছ,' বলে জামবুর ছেড়ে যাওয়া জায়গায় ঢুকিয়ে দিল রানা টয়োটাকে। নিজেকে ফাঁদে পড়তে দিয়েছে ও, সতর্ক থাকার কথাও মনে নেই।

এখনও দুটো গাড়ি সবেগে পাশাপাশি ছুটছে, আচমকা ড্রাইভিং হুইল বন বন করে উল্টোদিকে ঘোরাল জামবু। রানা কিছু করার আগেই ল্যাণ্ডক্রুজারের গায়ে আছড়ে পড়ল ট্রাকটা, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষে ঝাঁক ঝাঁক আগুনের ফুলকি ছুটল। প্রকাণ্ড ট্রাকের চাপে হাইওয়ের পাশে ঘাসের ওপর ফিরে এল ল্যাণ্ডক্রুজার।

হুইলটা অসম্ভব ঝাঁকি খাচ্ছে, সেটাকে বাগে আনতে ব্যর্থ হলো রানা। বাম হাতের একটা আঙুলের হাড় যেন সরে গেছে বলে মনে হলো। কনুই পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল ব্যথায়। কষে ব্রেক করল ও, গতি হারিয়ে পিছিয়ে পড়ল ল্যাণ্ডক্রুজার, সগর্জনে এগিয়ে গেল রিফ্রিজারেটর ট্রাক, জোড়া লাগা দুটো গাড়ি বিচ্ছিন্ন হলো ধাতব আর্তনাদ তুলে। থামল ল্যাণ্ডক্রুজার, খাদের কিনারা ছাড়িয়ে সামনের একটা চাকা ঝুলছে।

আহত হাতটা ঘন ঘন ঝাড়ল রানা, ব্যথায় পানি বেরিয়ে এসেছে চোখে। ধীরে ধীরে আঙুলটায় সাড়া ফিরে এল, সেই সঙ্গে বাড়তে শুরু করল রাগ আর আক্রোশ। ইতিমধ্যে রিফ্রিজারেটর ট্রাক পাঁচশো গজ এগিয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

ফোর-হুইল ড্রাইভে রয়েছে ল্যাণ্ডক্রুজার, রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা। মাত্র তিনটে চাকা মাটি ছুঁয়ে আছে, তবে সহজেই খাদের কিনারা থেকে সরে এল। টয়োটার এক পাশে রঙ উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চকচকে ইস্পাত।

'বলো,' পলের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল রানা, 'আর কি প্রমাণ চাই

তোমার?' রাগে হাঁপাচ্ছে ও। 'খাদে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। খুনগুলোর জন্যে ওই শালা জামবুও দায়ী।'

হাইওয়ের পরবর্তী বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে রিফ্রিজারেটর ট্রাক, সেটাকে ধাওয়া শুরু করল রানা।

'এখন আবার কি করতে চাইছ তুমি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল পল।

'জামবু আমাদেরকে সামনে যেতে দেবে না,' বলল রানা। 'ওর ট্রাকে উঠব আমি, টেনে বের করে আনব ওকে।'

'তোমার এই পাগলামির মধ্যে আমি নেই,' নিচু গলায় বিড় বিড় করল পল। 'অপরাধীকে ধরার জন্যে পুলিস আছে, আইন আছে, তাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

তার প্রতিবাদে কান না দিয়ে ফুলস্পীডে টয়োটা ছোটাল রানা। পরবর্তী বাঁক ঘুরতে দেখা গেল ট্রাকটা মাত্র কয়েকশো গজ সামনে। মাঝখানের ব্যবধান দ্রুত কমে এল।

ট্রাকটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা। সংঘর্ষে ল্যাণ্ডক্রুজারের যতটা ক্ষতি হয়েছে ততটা ক্ষতি হয়নি ওটার। রাস্তাটা পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি উঠে আসায় আগের চেয়ে অনেক কম খাড়া, ফলে ট্রাকের গতি বেড়েছে। পিছনের জোড়া দরজা কার্গো হোল্ডে ঢোকার জন্যে, খাড়া বার-এর সাহায্যে তালা মারা রয়েছে। দরজার চার ধারের কিনারায় এয়ার-টাইট সীল কালো রাবার। এক পাশ থেকে সমতল ছাদে উঠে গেছে ইস্পাতের মই–ওখানে কুলিং ফ্যান আর রিফ্রিজারেটিং ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে ফাইবার গ্লাস পড-এ।

'আমি ওই মই বেয়ে উঠব,' পলকে বলল রানা। 'আমি বেরিয়ে গেলেই ড্রাইভিং সীটে চলে আসবে তুমি, হুইলটা ধরবে।'

'আমাকে মাফ করতে হবে, ভাই। তোমাকে আগেই বলেছি, এর মধ্যে আমি নেই।'

'বেশ।' রানা এমনকি তার দিকে তাকালও না। 'ধরো না হুইল। যাও, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে দু'জনেই চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরো–দু'জনেই মানে, তুমি আর আমার প্রিয়তমা ল্যাণ্ডক্রুজার, আমি নই। যদি ভেবে থাকো, তোমার মত একটা হাঁদারাম দুনিয়াতে না থাকলে কি আসে যায়, তাহলে কার কি করার আছে।'

দুটো ট্রাক ক্রমশ কাছে চলে আসছে, দুটোর দূরত্ব আর গতি হিসেব করছে রানা। ওর দিকের দরজাটা খুলল। এক হাত হুইলে, খোলা দরজা দিয়ে বাইরে কাত হলো ও। 'তোমার হাতে ছেড়ে যাচ্ছি ওকে, দেখেশুনে রেখো,' চিৎকার করল রানা। হাতের ব্যথার কথা মনে নেই, হুইল ছেড়ে দিয়ে টয়োটার বাইরে সিধে হলো, আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে পড়ল ছাদে। সেই মুহূর্তে ল্যাণ্ডক্রুজারকে বাধা দেয়ার জন্যে ট্রাকটাকে সরিয়ে আনছে জামবু।

দুটো গাড়ি কাছাকাছি হচ্ছে, লাফ দিয়ে মাঝখানের সরু ফাঁকটা পেরিয়ে এল রানা, খপ করে ধরে ফেলল মইয়ের একটা ধাপ, দুই গাড়ির ইস্পাত আবার ঘষা খেতে যাচ্ছে দেখে শরীরের নিচের অংশ ওগুলোর মাঝখান থেকে ওপরে তুলে নিল।

ল্যাণ্ডক্রুজারের ড্রাইভিং হুইলে এক পলকের জন্যে পলকে দেখতে পেল রানা। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো, ঘামে চকচক করছে মুখ। কাত হয়ে পিছিয়ে পড়ল টয়োটা, ট্রাকের পিছনে চলে গেল। আতঙ্কিত হলেও, খুব সাবধানে চালাচ্ছে পল। এতই সাবধানে, রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ফেলল।

মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে রানা। পৌঁছে গেল সমতল ছাদে। ছাদের মাঝখানে ফ্যান হাউজিং, পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে নিচু রেইলিং। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল রানা। ট্রাক বাঁক ঘোরার সময় রেইলিং ধরে চুপচাপ পড়ে থাকল, তারপরও মনে হলো রেইল থেকে খসে যাবে হাত, ছিটকে পড়ে যাবে নিচে।

ক্যাবের মাথায় আসতে পুরো পাঁচ মিনিট লাগল। প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে রানা, জামবু তাকে ওপরে উঠতে দেখেনি। কার্গো হোল্ড-এর মোটাসোটা শরীর পিছন দিকটা দেখার জন্যে একটা বাধা। ইতিমধ্যে ধরে নিয়েছে সে, হতাশ ল্যাণ্ডক্রুজারের ড্রাইভার হাল ছেড়ে দিয়েছে, কারণ ট্রাকের পিছনে খালি রাস্তায় ওটার হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে না।

হামাগুড়ি দিয়ে কিনারায় সরে এল রানা, উঁকি দিল যে দিকটায় প্যাসেঞ্জার বসে। দরজার নিচে একটা রানিং বোর্ড রয়েছে, আর ক্যাব-এর পাশ থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা উইং মিরর হাতল হিসেবে কাজ দেবে। এখন শুধু জানতে বাকি থাকল এদিকের দরজায় জামবু তালা দিয়েছে কিনা। তালা লাগানোর কোন কারণ নেই, নিজেকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করল রানা। ট্রাকের হেডলাইট আলোর এক জোড়া টানেল তৈরি করেছে সামনের রাস্তায়, সেদিকে তাকাল ও।

রাস্তাটা বাম দিকে বাঁকা হতে শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। টানটা এখন ওকে ক্যাব-এর গায়ের সঙ্গে সাঁটিয়ে রাখবে, ছুঁড়ে বাইরের দিকে ফেলে দেবে না। কিনারা থেকে হড়কে নামল ও, আঁকড়ে ধরল উইং মিরর। মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ঘন ঘন লাথি মারল পা দুটো, তারপর ধাক্কা খেল চওড়া ইস্পাতের রানিং বোর্ড-এ। ভেতর দিকে মুখ করে রয়েছে ও, ঝুলে আছে আয়নার হাতল ধরে, ক্যাব-এর জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ভেতরে।

হকচকিয়ে রানার দিকে তাকাল জামবু, কি যেন বলল চিৎকার করে। দরজার লকিং হ্যাণ্ডেল ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার সীটের পুরোটা দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের বেশি নাগাল পেল না। মাতালের মত এদিক ওদিক করছে ট্রাক, আবার হুইল ধরতে বাধ্য হলো সে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ক্যাবের ভেতর লাফ দিল রানা। সীটের অর্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর শরীর। ওর মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারল জামবু। বাম চোখের নিচে লাগল সেটা। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখে সর্ষে ফুল দেখল রানা, তারপরই ভ্যাকুম ব্রেক কন্ট্রোল-এর হাতল ধরে পুরোটা টেনে দিল।

ট্রাকের প্রতিটি দৈত্যাকার চাকা একযোগে লক হয়ে গেল। বিস্ফোরিত হলো নীল ধোঁয়া, আর্তনাদ শুরু করল রাবার, হাইওয়ের ওপর হড়কাতে শুরু করেছে

ট্রাক। সীট থেকে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল জামবু। স্টিয়ারিং হুইলটা ধাক্কা খেল তার বুকে, উইণ্ডশীল্ডের সঙ্গে কপাল ঠুকে গেল—এত জোরে যে মাকড়সার জাল হয়ে গেল কাচটা। সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে, তার দিকে হাত লম্বা করে স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে ফেলল রানা। স্থির হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ট্রাকটাকে সোজা রাখল ও—হাইওয়ে থেকে অর্ধেক বেরিয়ে গেছে, অফসাইডের হুইলগুলো অগভীর নালায় পড়েছে।

ইগনিশন-এর সুইচ অফ করে আবার জামবুর ওপর দিয়ে হাত বাড়াল রানা, ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে ফেলল। জামবুর কাঁধ খামচে ধরে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, ফেলে দিল ক্যাব থেকে। ছ'ফুট ওপর থেকে মাটিতে পড়ল সে, তারপর ধীরে ধীরে হাঁটুর ওপর সিধে হলো। পাকা আপেলের রঙ ও আকার নিয়ে ফুলে উঠেছে তার কপাল।

লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, তার ইউনিফর্ম টিউনিকের কলারটা ধরার জন্যে ঝুঁকল।

'কুত্তার বাচ্চা।' জামবুর গলায় কলারটা ফাঁসের মত পাকিয়ে মোচড়াল ও। 'আলি শাহ আর তার পরিবারকে খুন করেছিস তুই।'

হেডলাইটের আভায় দেখা গেল জামবুর মুখ ফুলে বেগুনি হয়ে উঠছে। 'প্লীজ, মি. রানা, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। এ-সব আপনি কেন করছেন?' কলারটা চেপে বসেছে গলায়, রুদ্ধশ্বাসে চি-চি আওয়াজ করল সে।

'বেজন্মা শুয়োর, ভেবেছিস মিথ্যেকথা বলে পার পাবি...?'

টিউনিকের হেমের নিচে হাত গলাল জামবু। তার বেল্টে একটা স্কিনিং নাইফ রয়েছে, চামড়ার খাপে। স্ট্র্যাপ খোলার আওয়াজ ঢুকল রানার কানে, খাপ থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ঝিক করে উঠল ফলাটা।

কলার ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে লাফ দিল রানা, ওপর দিকে ছুরি চালিয়েছে জামবু। দ্রুতই চালিয়েছে ছুরিটা, তবে যথেষ্ট দ্রুত নয়, রানার শার্টের আলগা একটা ভাঁজে লাগল ফলা, ক্ষুরের মত চিরে দিল। ছুরির ডগা রানার নিচের পাঁজরের স্পর্শ পায়নি, শুধু চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, রেখে গেছে অগভীর একটা রেখা।

নিজের পায়ে দাঁড়াল জামবু, বাগিয়ে ধরে আছে ছুরিটা। 'আপনাকে আমি খুন করে ফেলব,' সাবধান করল সে, পরিষ্কার করার জন্যে মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ছে, ছুরি ধরা হাতটা একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাচ্ছে, লক্ষ্যস্থির করতে চায় রানার তলপেটে।

'হুস!' লাফ দেয়ার ভঙ্গি করেও লাফ দিচ্ছে না সে, মুখ থেকে এমন সব শব্দ করছে যেন শিয়াল বা কুকুর তাড়াচ্ছে। 'ভাগো, বিদেশী হনুমান! লেজ তোলো, পালাও!' এবার লাফ দিল সে, ছুরি চালাল সবেগে, রানা বাধ্য হলো পিছু হটতে। তারপরই দীর্ঘ মেয়াদী হামলায় নাচতে নাচতে এগোল জামবু, প্রতি মুহূর্তে পোচ মারার ভঙ্গিতে বাতাস কাটছে ফলাটা। তার সঙ্গে হোঁচট খেতে ও নাচতে বাধ্য করছে রানাকে।

হঠাৎ আক্রমণের ধরনটা বদলে ফেলল জামবু। নিচের দিকে কোপ মারল

সে, উরু জখম করে রানাকে অচল করে দিতে চায়—তবে ছুরিটা সারাক্ষণ নিরাপদ দূরত্বে রাখল, রানা যাতে তার কব্জি ধরতে না পারে। পিছু হটার সময় হোঁচট খাওয়ার ভান করল রানা। একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে ঠেকল, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় একটা হাতও রাখল মাটিতে।

'ইয়াহ!' হুংকার ছাড়ল জামবু, এটাই তার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কাজটা শেষ করার জন্যে লাফ দিল সামনে। রানার ভঙ্গিটা বদলায়নি, নড়ে উঠল শুধু মাটিতে রাখা হাতটা। ছুরি নিয়ে যারা লড়ে, এটা তাদের একটা কৌশল। জামবুর চোখে এক মুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছে ও।

লাফ দিয়ে শূন্যে রয়েছে জামবু, হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। ঝট করে এক পাশে সরে গিয়ে তার ছুরি ধরা হাতের কব্জিটা খপ করে ধরে ফেলল রানা, কঠিন মোচড় দিয়ে ছুরির ডগা তুলে দিল ওপর দিকে।

দুটো বুক এক হয়ে আছে এই মুহূর্তে, ছুরিটা মাথার ওপর সবটুকু লম্বা করা ওদের হাতে। মুখটা ঝট করে সামনে বাড়াল রানা, হাতুড়ির মত। ওর শক্ত কপাল থেঁতলে দিল জামবুর নাক। হাঁপিয়ে উঠল জামবু, হেলান দিল পিছন দিকে। রানার ভাঁজ করা হাঁটু সবেগে গুঁতো দিল তার উরুসন্ধিতে—ওখানে নরম যা কিছু আছে সব প্রায় ভর্তা হয়ে যাবার কথা। এবার আর্তনাদ করে উঠল জামবু, তার ডান হাত শক্তি হারিয়ে ফেলল।

হ্যাঁচকা টানে সেটাকে নিচে নামাল রানা, ছুরি ধরা মুঠো ট্রাকের কঠিন ইস্পাতে আছড়াল। জামবুর অসাড় আঙুল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। তার গোড়ালির পিছনটায় হুকের মত একটা পা আটকাল রানা, তারপর ধাক্কা দিল বুকে। হাত-পা ছড়িয়ে হাইওয়ের পাশে গর্তের মধ্যে পড়ে গেল সে।

জামবু নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়াবার আগেই ছোঁ দিয়ে ছুরিটা তুলে নিল রানা, এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। ফলার ডগাটা তার চিবুকের তলায় ঠেকাল ও, রূপালি ফলায় রক্তের ছোট্ট একটা ফোঁটা দেখা গেল, উজ্জ্বল একটা রুবি পাথর যেন।

'নোড়ো না,' দাঁতে দাঁত পিষল রানা। 'নড়লেই কতল হয়ে যাবে।' স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল ও। 'ঠিক আছে, এবার সিধে হও—ধীরে ধীরে।'

পাঁচ

ধীরে ধীরে সিধে হলো জামবু, আহত উরুসন্ধি দু'হাতে চেপে ধরে আছে। পিছু হটে ট্রাকের গায়ে পিঠ ঠেকাতে বাধ্য করল রানা তাকে, গলায় এখনও লেগে রয়েছে ছুরির ফলা।

'ট্রাকে আইভরি আছে,' বলল রানা। 'চলো, দেখাও আমাকে।'

'না।' ফিসফিস করল জামবু। 'নেই। আপনি কি চান আমি জানি না। আপনি

পাগল হয়ে গেছেন।'

'হোল্ডের চাবি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা না ঘুরিয়ে চোখ ঘোরাল জামবু। 'আমার পকেটে।'

'ঘুরে দাঁড়াও, ধীরে ধীরে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ট্রাকের দিকে মুখ করো।'

নির্দেশ পালন করল জামবু, পরমুহূর্তে তার মাথায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রানা। ইস্পাতের গায়ে ঝুলে থাকা কপালটা থেঁতলে গেল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল জামবু।

'আবার ওরকম করার একটা অজুহাত দরকার আমার,' তার কানে কানে ফিসফিস করল রানা। 'শুয়োরের মত চি-চি আওয়াজ আমার কানে মধু ঢালছে।'

তার কিডনির লেভেলে ছুরির ফলা ঠেকাল রানা, শুধু কাপড় ভেদ করল ডগাটা, চামড়া নয়।

'এবার চাবি বের করো,' নির্দেশ দিল ও।

পকেটে হাত ঢোকাল জামবু। বের করার সময় মৃদু আওয়াজ করল চাবিগুলো।

'হাঁটো, ধীরে ধীরে,' বলল রানা, জামবুকে সামনে নিয়ে ট্রাকের পিছনে চলে এল। 'তালা খোলো।'

কী হোলে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল জামবু।

'বেশ। এবার তোমার বেল্ট থেকে হাতকড়া দুটো বের করো,' বলল রানা। অ্যান্টি-পোচিং ডিউটি দেয়ার সময় সব রেঞ্জারদের কাছেই থাকে ওগুলো।

হাতকড়া বের করল জামবু।

'একটা তোমার হাতে পরো,' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর চাবিটা দাও আমাকে।'

একটা হ্যাণ্ডকাফ কব্জি থেকে ঝুলছে, কাঁধের ওপর দিয়ে চাবিটা বাড়িয়ে দিল জামবু। চাবির গোছাটা পকেটে ভরল রানা, তারপর হ্যাণ্ডকাফের দ্বিতীয় লিঙ্কটা ট্রাকের স্টীল ব্রেসিং-এর সঙ্গে আটকে দিল।

পিছনের জোড়া দরজার লকিং হাতল ঘোরাল রানা। দরজা খুলতেই রিফ্রিজারেটরের ভেতর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়ে এল, নাকে ধাক্কা মারল মাংসের গন্ধ। হোল্ডের ভেতরটা অন্ধকার, লাফ দিয়ে টেইলগেইটে উঠে পড়ল ও, সুইচের খোঁজে হাতড়াচ্ছে। সুইচ অন করতেই ঠাণ্ডা নীল আভায় ভরে গেল হোল্ডের ভেতরটা। ছাদের কাছাকাছি রেইল থেকে সারি সারি হুকের সঙ্গে ঝুলছে মার্বেল পাথরের মত সাদা চর্বিঅলা হাতির মাংস। টন টন মাংস, এমন গায়ে গায়ে লেগে আছে যে রানা শুধু প্রথম সারির ধড়গুলো দেখতে পেল। হাঁটু গাড়ল, ওগুলোর নিচে সরু প্যাসেজের ভেতরটা দেখতে চায়। ইস্পাতের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তাছাড়া দেখার কিছু নেই।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। ঝুলন্ত ধড়গুলোর নিচে আইভরির স্তূপ দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ও। মাথা নিচু করে সামনে এগোল, কমপার্টমেন্টের আরও খানিক ভেতরে ঢুকতে চায়। কিছুটা এগোতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দম আটকে এল ওর। কাঁচা মাংস শক্ত পাথর হয়ে গেছে, ওগুলোর ধাক্কা খেয়ে

বমি পেল। বহুকষ্টে এগোচ্ছে তবু, জেদ চেপেছে, জানবে কোথায় লুকিয়েছে আইভরি।

দশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল রানা। হোল্ডের ভেতর কোন আইভরি নেই। লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নিচে নামল ও। কাঁচা মাংসের সংস্পর্শে কাপড়ে দাগ লেগেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ট্রাক চেসিসের নিচে, গোপন কমপার্টমেন্ট আছে কিনা দেখছে।

আবার হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে জামবু, চোখে নীরব উল্লাস। 'আপনাকে বললাম না? আইভরি নেই। আপনি সরকারী ট্রাক ভেঙেছেন। আমাকে জখম করেছেন। আপনার জন্যে নানারকম বিপদ অপেক্ষা করছে, বিদেশী বাবু। জানেন তো না, বিদেশীদের জন্যে আমাদের আইন খুব কড়া।'

'তোমাকে শাস্তি দেয়ার কাজটা এখনও শেষ করিনি আমি,' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বলল রানা। 'তুমি একটা মিষ্টি গান না ধরা পর্যন্ত শাস্তিটা চলতেই থাকবে-গানের কথাগুলোয় থাকবে তুমি আর চীনা ভদ্রলোক আইভরি নিয়ে কি করেছ।'

'আইভরি নেই,' আবার বলল জামবু। তার কাঁধ দুটো শক্ত করে ধরে ঘোরাল রানা, ট্রাকের দিকে মুখ করাল তাকে।

ট্রাকের রড থেকে হ্যাণ্ডকাফের লিঙ্ক খুলে নিল ও, জামবুর দুটো কব্জিই তুলে আনল তার পিঠের ওপর দিকে, তারপর এক করে আটকাল। 'চলো এবার,' হিসহিস করে বলল ও। 'আলোয় চলো, তোমার ওপর কাজ শুরু করব।'

ব্যথায় কাতরাচ্ছে জামবু, রানা তাকে ট্রাকের সামনে নিয়ে এল। জোড়া হেডলাইটের মাঝখানে, সামনের ফেণ্ডারের সঙ্গে হাতকড়া পরাল তাকে। হাত দুটো এখনও তার পিছনে। সম্পূর্ণ অসহায় সে।

'আলি শাহ আমার বন্ধু ছিল,' নরম গলায় বলল রানা। 'তুমি তার স্ত্রী ও নাবালিকা দুটো মেয়েকে রেপ করেছ। তুমি আছাড় মেরে তার ছেলের খুলি ফাটিয়েছ। গুলি করেছ আলিকে…।'

'না, আমি নই! আমি কিছুই জানি না!' চিৎকার করছে জামবু। 'আমি কাউকে খুন করিনি! আইভরি নিইনি, খুন করিনি…!'

শান্ত গলায় বলে চলেছে রানা, যেন জামবু ওকে বাধা দেয়নি। 'কাজটা করে আমি মজা পাচ্ছি, এটা বিশ্বাস করলে নিজের উপকার করবে। যতবার চিৎকার করবে, আলির কথা মনে পড়বে আমার, সন্তুষ্টবোধ করব আমি।'

'কিছুই আমি জানি না…আপনি পাগল…!'

জামবুর বেল্টের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে চামড়াটা কেটে ফেলল রানা। কোমরে ঢিলে হয়ে পড়ল খাকি ইউনিফর্ম। টান দিয়ে ওয়েস্টব্যাণ্ড খুলল রানা, ট্রাউজারের ওপর দিকে ঠেলে দিল ফলাটা। 'ক'টা যেন বউ তোমার, জামবু? চার? পাঁচ? ক'টা?' ওয়েস্টব্যাণ্ডটা কেটে ফেলল ও, কোমর থেকে খসে পড়ল ট্রাউজার। 'আমার ধারণা, তোমার স্ত্রীরা চাইছে তুমি আমাকে আইভরি সম্পর্কে সব কথা বলে দাও। তারা চাইছে তুমি আমাকে আলি শাহ সম্পর্কে সব বলবে, বলবে কিভাবে সে মারা গেল।'

ঠকঠক করে কাঁপছে জামবু, রানার সন্দেহ হলো ভয় পাবার মিথ্যে ভান করছে সে। তার আণ্ডারপ্যান্ট হাঁটুর কাছে নামিয়ে আনল ও। 'দেখা যাক কি ধন-সম্পদ আছে তোমার।' হিংস্র, ঠাণ্ডা হাসি ওর ঠোঁটে। 'আমার ধারণা, তোমার স্ত্রীরা অত্যন্ত অসুখী হতে যাচ্ছে, জামবু।'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে জামবুর টিউনিক খুলে ফেলল, ছেঁড়া বোতামগুলো হেডলাইটের পিছনে অন্ধকারে উড়ে গেল। টিউনিক খুলে নেয়ায় হাঁটু থেকে গলা পর্যন্ত নগ্ন হয়ে পড়ল জামবু। কালো চুলের গোল আকৃতির বল তার বুক ও পেট ঢেকে রেখেছে। নাভির নিচেও ঘন জঙ্গল। 'আইভরি আর গণ্ডের গানটা শোনাও আমাকে, জামবু,' বলল রানা, নাভির নিচে তাক করল ছুরির ফলা।

হাঁপিয়ে উঠল জামবু, চামড়ার ফলার ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

'মুখ খোলো, জামবু। তা না হলে তোমার ওটা সত্যি আমি কেটে নেব।'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন!' ফোঁপাচ্ছে জামবু। 'আমি জানি না কি চান আপনি।'

'আমি চাই তোমার এটা গোড়া থেকে কেটে ফেলি।'

'আলি শাহকে আমি খুন করিনি!' গলা ভেঙে গেছে জামবুর। 'আল্লাহর কিরে, আমি না!'

'আর তার স্ত্রী ও বাচ্চাগুলোকে, জামবু? তোমার এই কুৎসিত রড ওদের ওপর কাজে লাগাওনি?' ছুরির ফলা দিয়ে খোঁচা দিল রানা।

'না! না! আমি নই! সত্যি···থামুন, বলছি···ঠিক আছে, বলছি সব–ছুরিটা ওখান থেকে সরান!'

'গুড!' উৎসাহ দিল রানা। 'প্রথমে তুমি আমাকে চাথার সিং সম্পর্কে বলো···,' অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ল ও, লেগে গেল।

'বলব, তার কথা বলব আপনাকে···আমার ওপর দয়া করুন, ওটা কাটবেন না···প্লীজ···প্লীজ···।'

'রানা,' অন্য একটা কণ্ঠস্বর চমকে দিল রানাকে। ল্যাণ্ডক্রুজারের কোন শব্দই পায়নি ও। নিশ্চয়ই ট্রাকের হোল্ডে তল্লাশি চালাবার সময় এসেছে। এই মুহূর্তে হেডলাইটের পাশে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পল নিউম্যান।

'লোকটাকে ছেড়ে দাও, রানা,' তার কণ্ঠস্বর কঠিন ও কর্কশ। 'ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল সে।

'তুমি এর মধ্যে নাক গলিয়ো না তো,' ধমক দিল রানা।

কিন্তু আরও কাছে সরে এল পল, তার হাতে একটা এ/কে ফরটিসেভেন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা। তার অস্ত্র ধরার ভঙ্গিটায় বিস্ময়কর কর্তৃত্ব ও দক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে।

'মানে?'

'ছেড়ে দাও ওকে,' আরও কঠিন হলো পলের গলা। 'অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছ তুমি।'

'লোকটা ক্রিমিন্যাল, খুন করেছে,' প্রতিবাদ করল রানা, কিন্তু রাইফেলটা ওর

তলপেটে তাক করে ট্রিগারে চাপ বাড়াল পল, কাজেই খানিকটা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ও।

'তোমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। ট্রাকে তুমি আইভরি পাওনি,' বলল পল।

'অপরাধ স্বীকার করতে যাচ্ছিল ও,' রাগে গরম ও লালচে হয়ে উঠল রানার মুখ। 'তুমি নাক না গলালে···।'

'তুমি ওর ওপর টর্চার করছিলে,' পলও রাগে চেঁচাচ্ছে। 'তুমি একটা অসভ্য, রানা। আমার ধারণা ছিল না কেউ কারও ওপর এরকম জঘন্য নির্যাতন চালাতে পারে। এরকম অত্যাচার চালালে ওকে দিয়ে স্বীকার করানো যাবে দুনিয়ার সমস্ত পাপ ওর দ্বারাই হয়েছে। তুমি ভুলে গেছ, ওরও অধিকার আছে। ওর অধিকার তুমি কেড়ে নিতে পারো না। হাতকড়া খুলে দাও, যেতে দাও ওকে।'

'দয়ার সাগর, কোমল হৃদয়,' ফুঁসছে রানা। 'কিন্তু কার ওপর দয়া দেখাচ্ছ? ও তো একটা হিংস্র জানোয়ার!'

'ও একটা মানুষ,' নিজের যুক্তিতে অটল পল। 'ওর ওপর নির্যাতন হচ্ছে দেখলে আমাকে বাধা দিতে হবে, তা না হলে আমি তোমার মত অপরাধী হব। দশ বছর জেলে পচার কোন ইচ্ছে আমার নেই। যেতে দাও ওকে।'

'প্রথমে সব কথা স্বীকার করুক ও!' এক পা এগিয়ে আবার জামবুর তলপেটের নিচে ছুরি ঠেকাল রানা।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল জামবুর গলা চিরে।

রাইফেল তুলে গুলি করল পল।

গুলিটা রানার মাথার এক ফুট ওপর দিয়ে ছুটে গেল। মাজল ব্লাস্ট রানার ঘামে ভেজা চুল এলোমেলো করে দিল, ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে হেলান দিল ও, হাত দুটো উঠে চেপে ধরেছে কান।

'ওটা ওয়ার্নিং ছিল, রানা।' থমথম করছে পলের চেহারা। 'ভেবো না আমি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছি। দাও, হাতকড়ার চাবি দাও আমাকে।'

বিস্ফোরণের ধাক্কায় আচ্ছন্নবোধ করছে রানা, আবার গুলি করল পল। রানার জোড়া বুটের মাঝখানের মাটিতে গর্ত তৈরি করল বুলেটটা।

'আমি সিরিয়াস, রানা। কসম খেয়ে বলছি। তোমার সঙ্গে বিপদে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে বরং তোমাকে আমি খুন করব।'

'আলিকে দেখেছ তুমি···,' মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে রানা, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান দুটো।

'আমি আরও দেখেছি এই লোকটাকে তুমি পুরুষত্বহীন করার হুমকি দিচ্ছিলে। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। ভালোয় ভালোয় চাবিটা আমাকে দাও, তা না হলে পরের গুলিটা তোমার একটা হাঁটু গুঁড়িয়ে দেবে।'

পলের চোখ দেখে বোঝা গেল, সত্যি তাই করবে সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাবিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

'ঠিক আছে, এবার তুমি পিছিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল পল। রানার দিকে রাইফেল ধরে রেখে জামবুর একটা কব্জি থেকে হাতকড়া খুলল সে, তারপর চাবিটা তার হাতে ধরিয়ে দিল।

'ইউ ব্লাডি ইডিয়ট!' অসহায় রাগে এখনও ফুঁসছে রানা। 'কি ক্ষতি করলে নিজেও জানো না। আর এক মিনিট সময় পেলে সব কথা জানা যেত। জানা যেত আলিকে কে মেরেছে, আইভরিগুলো কোথায়…।'

বাকি কব্জিটা মুক্ত করল জামবু, দ্রুত কোমরে ট্রাউজার আটকাল, গায়ে জড়াল টিউনিক। সে তার সাহস ফিরে পেয়েছে। 'প্রলাপ বকছেন উনি!' জোর গলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করল। 'কিছুই আমি স্বীকার যাইনি। কেন স্বীকার যাব, কি স্বীকার যাব? আলি শাহ সম্পর্কে আমি কিছু জানলে তো! আমরা চিউইউই ছাড়ার সময় ওয়ার্ডেন বেঁচে ছিলেন…।'

'ঠিক আছে। এ-সব তুমি পুলিসকে বলতে পারবে,' জামবুকে থামিয়ে দিল পল। 'ট্রাকে করে আমি তোমাকে হারারে নিয়ে যাচ্ছি। যাও, ল্যাণ্ডক্রুজার থেকে আমার ক্যামেরা আর ব্যাগটা নিয়ে এসো। সামনের সীটে পাবে।'

পার্ক করা ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে হন হন করে এগোল জামবু।

'শোনো, পল। মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় দাও আমাকে তুমি,' আবেদন জানাল রানা।

ওর দিকে রাইফেল নাড়ল পল। 'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ, রানা। হারারে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হবে পুলিসকে সব কথা জানানো।'

ফিরে এলো জামবু, কাঁধে সনি ভিডিও ক্যামেরা, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ। 'হ্যাঁ, পুলিসকে আপনি বলবেন, এই উন্মাদ ভদ্রলোক আমার লাঠি আর ডিম কেটে নিচ্ছিল,' চিৎকার করছে সে। 'বলবেন, আইভরি পাওয়া যায়নি…।'

'যাও, ট্রাকে ওঠো,' তাকে নির্দেশ দিল পল। 'স্টার্ট দাও।' জামবু নির্দেশ পালন করার পর রানার দিকে ফিরল সে। 'আমি দুঃখিত, রানা। তুমি একা হয়ে গেলে। আমি আর তোমার কোন সাহায্যে আসব না। ওরা চাইলে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেব আমি। নিজেকে আমার কাভার দিতে হবে, রানা।'

'এমন কাপুরুষ আর স্বার্থপর লোক জীবনে আমি দেখিনি,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু, তুমিই না সুবিচার আর ন্যায়নীতি সম্পর্কে প্রায়ই ভাষণ দিতে? আলি আর রুক্সানার ব্যাপারটা তোমাকে স্পর্শ করল না?'

'তুমি যা করছিলে তার সঙ্গে সুবিচারের কোন সম্পর্ক নেই,' ট্রাকের ডিজেল এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল পলের গলা। 'তুমি একাধারে পুলিস, বিচারক ও জল্লাদের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছিলে, রানা। একে সুবিচার বলে না, বলে উন্মত্ততা বা স্বেচ্ছাচার। আমি কেন এ-ধরনের একটা অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাব! তুমি আমার ঠিকানা জানো, ইচ্ছে হলে আমার পাওনা টাকা ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারো। বিদায়, রানা। সম্পর্কটা এভাবে শেষ হওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত।'

ক্যাবে উঠে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল সে। 'সাবধান, আমাদের থামাবার চেষ্টা করো না,' বলে হাতের রাইফেলটা রানাকে দেখাল সে। 'এটা কিভাবে চালাতে হয় আমি জানি।'

দরজা বন্ধ করে দিল পল, ট্রাক নিয়ে হাইওয়েতে উঠে পড়ল জামবু।

অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকল রানা, লাল টেইললাইটের দিকে তাকিয়ে

থাকল, যতক্ষণ না ওটা পরবর্তী বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলো। বিস্ফোরণের ধাক্কা খেয়ে এখনও কানের ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে ওর। সেই সঙ্গে আচ্ছন্নবোধ করছে, বমির একটা ভাবও আছে। পার্ক করা ল্যাণ্ডক্রুজারের দিকে এগোল ও, পা ফেলছে এলোমেলো।

ড্রাইভিং সীটে এসে বসল। প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা এখনও অস্থির করে তুলছে ওকে। রাগ হচ্ছে গণ্ড আর তার সহকারীদের ওপর, জামবুর কথা মনে পড়লেই আক্রোশে দাঁত পিষছে। সবচেয়ে বেশি রাগ ওর পলের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলো ও, দূর হয়ে গেল রাগ। সত্যি যে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, উপলব্ধি করতে পারল। আচরণটাকে উন্মত্ততাই বলতে হয়। এমন সব অভিযোগ তুলছে সে যেগুলো প্রমাণ করতে পারবে না। সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করেছে ও। সরকারী কর্মচারীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, গুরুতরভাবে আহত না করলেও। তারা ওর বিরুদ্ধে অন্তত গোটা পাঁচেক অভিযোগ আনতে পারবে।

তারপর আবার যখন আলি আর তার পরিবারের কথা ভাবল রানা, নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোন গুরুত্ব থাকল না। গোটা ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হতে যাচ্ছিল, ভাবতেই তিক্ততায় ভরে গেল মন। জামবুকে আর পাঁচ মিনিট কথা বলাতে পারলে সব ক'টা অপরাধীর নাম জানা যেত। দুঃখিত, আলি। প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছি আমি।

এরপর কি করা উচিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাথাটা ব্যথা করছে, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে পারছে না। জামবুকে ধাওয়া করে কোন লাভ নেই। পল একটা বাধা, সে-ও সতর্ক হয়ে গেছে। তাছাড়া, যেভাবেই হোক, আইভরিগুলো অন্য কোথায় সরিয়ে ফেলেছে ওরা।

আর কি করার আছে ওর? অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড, হ্যাঁ। মূল ষড়যন্ত্রের তিনিই হোতা। তবে আইভরি গায়েব হয়ে যাবার পর তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে শুধু থাকছে আলির রেখে যাওয়া দুর্বোধ্য মেসেজ আর অকুস্থলে তাঁর জুতোর ছাপ।

আর চাখার সিং। জামবু স্বীকার করেছে, চাখার সিংকে চেনে সে।

আর আছে পোচারদের একটা দল। জাম্বেজি নদীতে তাদেরকে আব্বাস উলুম্বু বাধা দিতে পেরেছে কিনা কে জানে। আব্বাস ওদের ক'জনকে আটক করতে পারলে কাজ হয়। সে অন্তত পলের মত নরম নয়। তাছাড়া, আব্বাসেরও বন্ধু ছিল আলি। বন্দী পোচারদের কাছ থেকে কিভাবে তথ্য বের করতে হয় জানা আছে তার।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, চিরুণ্ডু পুলিস পোস্ট থেকে মানা পুল-এ ফোন করবে। স্টার্ট দিয়ে ল্যাণ্ডক্রুজার ছেড়ে দিল ও। চিরুণ্ডু ব্রিজ পুলিস স্টেশন কারোই-এর চেয়ে কাছে। পুলিসের কাছে রিপোর্ট করবে ও, লক্ষ রাখবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত শুরু হয়। আলির মেসেজ আর জুতোর দাগ সম্পর্কে পুলিসকে জানানো দরকার।

মাথার ব্যথাটা অসম্ভব বেড়ে গেল। রাস্তার পাশে টয়োটা থামিয়ে ফার্স্ট-এইড কিট থেকে দুটো পেইন কিলার ট্যাবলেট বের করল, ভ্যাকুম ফ্লাস্ক থেকে এক মগ

কফি ঢেলে গিলে ফেলল। ল্যাণ্ডক্রুজার ছুটে চলল আবার, একটু পরই কমতে শুরু করল মাথার ব্যথা।

ভোর চারটের দিকে চিরুণ্ডু ব্রিজে পৌঁছুল রানা। পুলিস স্টেশনে একজন মাত্র করপোরালকে পাওয়া গেল, ডেস্কে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ডাকাডাকিতে কাজ হলো না, রীতিমত ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙাতে হলো। টকটকে লাল চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'আমি একটা খুন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে চাই, অনেকগুলো খুন সম্পর্কে।'

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে করপোরাল জানাল, হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় জানা নেই তার। থানার পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, সেখান থেকে সার্জেন্টকে ডেকে আনতে বলল রানা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর এলো সার্জেন্ট, তার চোখও লাল হয়ে আছে, তবে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে এসেছে।

'হারারের সিআইডি হেডকোয়ার্টারে ফোন করুন,' তাগাদা দিল রানা। 'চিউইউইয়ে একটা ইউনিট পাঠাতে বলুন ওদেরকে।'

'আপনাকে প্রথমে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে,' শর্ত দিল সার্জেন্ট।

থানায় কোন টাইপরাইটার নেই। বাচ্চা ছেলের মত থেমে থেমে রানার স্টেটমেন্ট লিখতে শুরু করল সার্জেন্ট। প্রতিটি শব্দ নিঃশব্দে বানান করার সময় তার ঠোঁট নড়ছে। রানার ইচ্ছে হলো বল পয়েন্টটা কেড়ে নিয়ে নিজেই লেখে।

'সময় নষ্ট করছেন, সার্জেন্ট। লাশগুলো ওখানে পড়ে রয়েছে। এখানে আমরা বসে আছি, আর খুনীগুলো পালিয়ে যাচ্ছে।'

কোন প্রতিক্রিয়া নেই, বানান করে লিখে যাচ্ছে সার্জেন্ট। প্রায় প্রতিটি শব্দের বানান বলে দিতে হলো রানাকে। হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলেও কিছু করার নেই। তবে লিখতে প্রচুর সময় লাগায় স্টেটমেন্টটা খুব সতর্কতার সঙ্গে দিতে পারল। গতকালের প্রতিটি ঘটনার সময়সূচী দিল ও। চিউইউই ওয়ার্ডেন আলি শাহের কাছ থেকে কখন বিদায় নিয়েছে, হানাদার বাহিনীর ছাপ দেখতে পেয়ে কখন সিদ্ধান্ত নিল চিউইউইয়ে ফিরে যাবার, ফেরার পথে রাস্তার ঠিক কোন জায়গায় দেখল রিফ্রিজারেটর ট্রাক আর মার্সিডিজ।

অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সঙ্গে ওর আলাপের বর্ণনা দেয়ার পর ইতস্তত করল রানা। গণ্ডের জুতো আর স্ল্যাকসে রক্ত দেখেছে, কথাটা বলবে কিনা ভাবছে। বললে অভিযোগের মত শোনাবে।

জাহান্নামে যাক প্রটোকল, রানা সিদ্ধান্ত নিল বলবে। নীল স্ল্যাকসের বর্ণনা দিল ও, বর্ণনা দিল জুতোর-সোলের নিচে মাছের আঁশ আকৃতির নকশা আছে। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে জেরা করতে বাধ্য হবে পুলিস।

খানিকটা হালকা হলো রানার মন। ধীরে ধীরে বর্ণনা করল চিউইউইয়ে ফেরার পর কি দেখেছে। আলি শাহের মুঠোয় পাওয়া কাগজটার কথা বলল, তাইওয়ানিজ অ্যামব্যাসাডরের নাম উচ্চারণ না করে জানাল অফিস কামরার মেঝেতে দেখা জুতোর ছাপে মাছের আঁশ আকৃতির নকশা আছে।

রিফ্রিজারেটর ট্রাক ও মার্সিডিজকে অনুসরণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিপদে পড়ল রানা। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে ষড়যন্ত্রকারী ও খুনী হিসেবে সন্দেহ করছে ও,

এটা বলা যাবে না। সরাসরি কোন অভিযোগ করা উচিত হবে না। অভিযোগ করলে প্রমাণ সহ করতে হবে। 'ওদেরকে আমি অনুসরণ করি, চুরি যাওয়া আইভরি সম্পর্কে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করার জন্যে,' বলল ও। 'প্রথম ট্রাক, মার্সিডিজ ও অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে আমি ধরতে পারিনি, তবে দ্বিতীয় ট্রাকটাকে ধরে ফেলি। জামবু নামে চিউইউইয়ের একজন রেঞ্জার চালাচ্ছিল ওটা। আমার সঙ্গে তার দেখা হয় কারোই রোডে। এ-সব ঘটনার কিছুই সে জানে না বলে দাবি করল। ট্রাকের ভেতরটা দেখলাম আমি, কোন আইভরি পেলাম না।' জামবু ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে ভেবেই শেষ কথাটা বলা। 'তারপর আমি ভাবলাম, পুলিসকে সব জানানো আমার দায়িত্ব।'

হাতে লেখা স্টেটমেন্ট যখন সই করল রানা তখন চারদিকে রোদ উঠে পড়েছে। এতক্ষণে হারারেতে, সিআইডি হেডকোয়ার্টারে ফোন করল সার্জেন্ট। রিসিভার একবার তোলার পর সহজে নামাতে পারল না সে। একের পর এক অফিসার এলো লাইনে, কেউ কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। অবশেষে কর্মকর্তা গোছের এক অফিসার সার্জেন্টকে ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে চিউইউই যাবার নির্দেশ দিলেন, জানলেন আকাশ-পথেও রওনা হচ্ছে ডিটেকটিভদের একটা টীম, পার্কের এয়ারস্ট্রিপে নামবে তারা।

'আপনি চান আপনার সঙ্গে চিউইউই যাই আমি?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল রানা।

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। সিআইডি থেকে সাক্ষি সম্পর্কে কোন নির্দেশ পায়নি সে। 'আপনি বরং ঠিকানা আর ফোন নাম্বার রেখে যান, পরে দরকার হলে আমরা যোগাযোগ করব,' অনেক চিন্তা করার পর সিদ্ধান্ত নিল সে।

মুক্তির একটা স্বাদ অনুভব করল রানা। থানা যদি ওকে আটকে রাখতে চাইত, কিছুই করার ছিল না। চিরুণ্ডু আসার পর চিন্তা-ভাবনার প্রচুর সময় পেয়েছে ও, এরপর কি করা যায় ভেবে রেখেছে। আব্বাস উলুম্বু যদি পোচারদের দু'চারজনকে আটক করতে পারে, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে নাগালে পাবার পথটা সহজ হয়ে যায়। আটক করা পোচারদের পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার আগে আব্বাসের সঙ্গে ওর কথা হওয়া দরকার।

'ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'থানার টেলিফোন, শুধু পুলিসী কাজে ব্যবহার করা যায়।' মাথা নাড়ল সার্জেন্ট।

পকেট থেকে জিম্বাবুইয়ান দশ ডলারের একটা নোট বের করে ডেস্কের ওপর রাখল রানা, অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

কারোই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মানা পুল-এর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেই অপরপ্রান্তে সাড়া পাওয়া গেল আব্বাস উলুম্বুর।

'আব্বাস,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রানা, 'কখন ফিরেছ তুমি?'

'এইমাত্র অফিসে পা রাখলাম, রানা সাহেব,' বলল আব্বাস উলুম্বু। 'আমার এক লোক আহত হয়েছে। এখুনি তাকে আমার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

'তারমানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। আপনি যেমন বলেছিলেন, রানা সাহেব–বিরাট একটা গ্যাঙ। মন্দ লোক।'

'কাউকে আটক করতে পেরেছ, উলুম্বু?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। 'ব্যাপারটা খুব জরুরী, অন্তত দু'জনকে যদি আটক করতে পেরে থাকো...।'

ছয়

একটা হাত হুইলে, বিশ ফুট লম্বা অ্যাসল্ট বোটে দাঁড়িয়ে রয়েছে আব্বাস উলুম্বু। রাতের অন্ধকারে ভাটির দিকে ছুটছে বোট।

ডেকের নিচে গ্রেটকোট পরা রেঞ্জাররা জড়সড় হয়ে বসে আছে, নদীতে যেমন কুয়াশা, তেমনি ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝেই খক খক করে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে আউটবোর্ড মোটর। দু'বার বোটটাকে স্রোতের টানে ভেসে যেতে দিয়েছে আব্বাস উলুম্বু, কাজ চালাবার মত মেরামত করে নিয়েছে। তারপর আবার গন্তব্যের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে বোটের।

বেশ স্বাস্থ্যবান চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাম্বেজির তীরে গাঢ় ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সারিগুলো দেখা যাচ্ছে। উলুম্বুর জন্যে এই আলোই যথেষ্ট, ফুলস্পীডে বোট চালাচ্ছে সে। সামনের পঞ্চাশ মাইল, সেই মোজাম্বিক সীমান্ত পর্যন্ত, নদীর প্রতিটি বাঁক তার চেনা।

মোটর খুব একটা শব্দ করছে না। নদীর কিনারায় নলখাগড়ার বনে সতর্ক হবার সুযোগ পেল না প্রকাণ্ডদেহী একদল জলহস্তী, ওগুলোর পাশে চলে এল তারা। পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে তাড়াহুড়ো করে পানিতে নামতে গিয়ে কয়েকটা হড়কে গেল, আছাড়ও খেল দু'একটা। বুনো হাঁসগুলো, লেগুনের শান্ত পানিতে ছিল, জলহস্তীর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক–অ্যাসল্ট বোটের আগমন টের পেয়ে আকাশে উঠে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে, প্রায় ঢাকা পড়ে গেল চাঁদটা।

ঠিক কোথায় যাচ্ছে পরিষ্কার ধারণা আছে আব্বাস উলুম্বুর। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সে, এই নদী পথে কয়েকশো বার আসা-যাওয়া করেছে। পোচাররা কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে জানা আছে তার। তাদের মধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে ছিল, যদিও এখন তারা দেশ ও জাতির শত্রু।

মানা পুল আর চিরুণ্ডুর নিচে জাম্বেজি এখানে প্রায় আধ মাইল চওড়া। তীব্র স্রোতের মধ্যে নদী পেরোবার জন্যে পোচারদের জলযান দরকার হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলারা যেভাবে ক্যানু যোগাড় করত, এখন ওরাও সেভাবে যোগাড় করে–জেলেদের কাছ থেকে।

জাম্বেজি তার তীরে বিপুলসংখ্যক জেলে পরিবারকে ঠাঁই দিয়েছে, ব্যবস্থা রেখেছে তাদের ভরণপোষণের। জেলেদের গ্রামগুলো অস্থায়ী, দায়ী হলো জাম্বেজির মেজাজ। নদী যখন তার তীর ভাসিয়ে দেয়, উঁচু জমিতে উঠে যেতে হয়

জেলেদের। সেখানেও মাছ পাওয়া যায়, জাম্বেজির তীরেই আবার তৈরি হয় নতুন গ্রাম।

জেলেরা কখন কোনদিকে যাচ্ছে তার খোঁজখবর রাখা আব্বাস উলুম্বুর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ নদীটাকে তারা কিভাবে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করে নদীর ইকোলজি।

রাতের বাতাসে শুকনো মাছ আর ধোঁয়ার গন্ধ পেল সে। এঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে এগোল উত্তর পারের দিকে। পোচাররা যদি জাম্বিয়া থেকে এসে থাকে, ওই জায়গাতেই ফিরে যেতে হবে তাদের।

তীরে চারটে কুঁড়ে আর একটা দোচালা দেখা গেল। ওগুলোর নিচে অপ্রশস্ত সৈকতে চারটে ক্যানু। তীরে নেমে রেঞ্জারদের নিয়ে এগোল উলুম্বু, বোটের পাহারায় থাকল একজন রেঞ্জার। একটা কুঁড়ের নিচু দরজা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধা আদিবাসী। তার কোমরে হরিণের চামড়া জড়ানো, ওপরে আর কিছু নেই।

'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বুড়ি মা,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল উলুম্বু। জেলেদের সবার সঙ্গেই তার সম্পর্ক ভাল।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্মী সোনা।' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হেসে উঠল বুড়ি। নাক কোঁচকাল উলুম্বু, বুড়ির গা থেকে ভাং-এর গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাতোনকা আদিবাসীর লোকেরা ভাং-এর সঙ্গে গোবর মিশিয়ে রোদে শুকায়, তারপর মাটির তৈরি পাইপে ভরে ধূমপান করে।

'পুরুষরা সবাই কি কুঁড়েতে আছে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল আব্বাস উলুম্বু। 'তোমাদের সব ক্যানু সৈকতে?'

জবাব দেয়ার আগে নাক ঝাড়ল বুড়ি। 'আমার সব ছেলে আর তাদের বউরা ঘরের ভেতর ঘুমাচ্ছে। ওদের সঙ্গে বাচ্চারাও ঘুমাচ্ছে।'

'বন্দুক হাতে কোন অচেনা লোকদের তাহলে দেখোনি তুমি, বুড়ি মা? নদী পেরোবার জন্যে ক্যানু চাইছিল?'

'না রে, সোনা।'

'তোমাকে সালাম জানাই, বুড়ি মা,' বলে বুড়ির হাতে চিনি ভর্তি ছোট একটা প্যাকেট গুঁজে দিল উলুম্বু। 'শান্তিতে থাকো গো!'

আবার রওনা হলো বোট। পরবর্তী গ্রাম আরও তিন মাইল ভাটিতে। গ্রামের সর্দারকে চেনে উলুম্বু, মাছ শুকানোর আগুনের পাশে একা বসে থাকতে দেখল তাকে। কোরাসরত কালো মেঘ অর্থাৎ মশা তাড়াচ্ছে আর পাইপ টানছে। বিশ বছর আগে সর্দার একটা পা ফেলে এসেছে এক কুমীরের পেটে, তবে আজও নদীর এদিকটায় সেরা মাঝি সে। সালাম দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল সে, হাতে গুঁজে দিল এক প্যাকেট সিগারেট, তারপর পাশে বসে পড়ল। 'তুমি একা কেন বসে আছ, বাবা? আমাকে বলো কেন তুমি ঘুমাতে পারছ না। কিছু ঘটেছে বুঝি?'

'দুশ্চিন্তা ছাড়া বুড়োদের আর কি-ই বা করার থাকে রে বাপ!'

'দুশ্চিন্তা তো এই কারণে–একদল লোক, হাতে বন্দুক, তোমার কাছে ক্যানু

চেয়েছে?' জানতে চাইল উলুম্বু। 'ওদের দাবি তুমি মিটিয়েছ তাহলে?'

মাথা নাড়ল বুড়ো সর্দার। 'আমাদের এক বাচ্চা দেখে ফেলে জলা পেরুচ্ছে ওরা, ছুটে এসে খবর দেয় গ্রামে। নলখাগড়ার বনে ক্যানূগুলো লুকিয়ে ফেলার সময় পাই আমরা, তারপর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ি।'

'কতজন ছিল তারা? কখনকার ঘটনা, বাবা?

দুটো হাতের সবগুলো আঙুল দু'বার দেখাল সর্দার। 'সিংহের মুখ তাদের, হাতে বজ্র,' ফিসফিস করল সে। 'আমরা ভয় পেয়ে যাই। ঘটনা কাল রাতের আগের রাতের।'

'ক্যানূ পেল না, তারপর তারা কি করল?'

'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করল, তারপর চলে গেল ওদিকে,' বলে পুব দিকটা দেখিয়ে দিল সর্দার। 'কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে আবার না তারা ফিরে আসে। সেজন্যেই একা জেগে বসে আছি, বাপ।'

'মবেপুরার লোকেরা কি এখনও লাল পাখির আস্তানায় আছে?' জানতে চাইল আব্বাস উলুম্বু।

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'আমারও ধারণা, এখান থেকে মবেপুরাদের গ্রামেই গেছে তারা।'

'তোমাকে সালাম জানাই, বুড়ো বাপ।'

মবেপুরাদের গ্রাম নদীর উত্তর পারে। মাটির একটা চওড়া পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে, ওখানে ডিম পাড়ে যাযাবর পাখিরা। এঞ্জিন বন্ধ রাখল উলুম্বু, বৈঠা চালিয়ে এগোল। রেঞ্জাররা সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। গ্রেটকোট খুলে অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে।

এ গ্রামটাও পানির কিনারায়। দেখে মনে হলো খালি পড়ে আছে। মাছের র‍্যাকগুলোর নিচে নিভে গেছে আগুন। চাঁদের আলোয় দেখা গেল কাদাময় সৈকতে ক্যানূ বাঁধার পোলগুলো রয়েছে, কিন্তু কোন ক্যানূ নেই। জেলেরা বেঁচেই থাকে ক্যানূর ওপর নির্ভর করে, ওগুলো তাদের অমূল্য সম্পদ।

গ্রামটাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসে এঞ্জিন স্টার্ট দিল উলুম্বু। খোলা আধ মাইল নদী পেরিয়ে দক্ষিণ পারের দিকে যাচ্ছে ওরা। পোচাররা যদি এখানে নদী পেরিয়ে থাকে, ফিরতি পথেও এখান দিয়ে যাবে তারা।

সময়ের একটা হিসেব করল উলুম্বু। হিসেব করল এই জায়গা থেকে চিউইউইয়ের দূরত্ব, দূরত্বটুকু পেরোতে কতক্ষণ সময় নেবে পোচাররা। লোকগুলো সম্ভবত অত্যন্ত ভারি আইভরি বহন করছে। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল সে। ভোর এগিয়ে আসার সাথে সাথে ম্লান হয়ে আসছে ওটা। তার ধারণা হলো, নদী পেরোবার জন্যে আগামী দুই কি তিন ঘণ্টার মধ্যে এখানে ফিরে আসবে পোচাররা।

মবেপুরায় ক্যানূ থাকার কথা সাত কি আটটা, প্রতিটি কাইজেলিয়া গাছের বিশাল লগ দিয়ে তৈরি। নদী পেরোবার সময় এক একটায় বসতে পারবে ছয় কি সাতজন। মাঝি হিসেবে গ্রাম থেকে কিছু লোককে ধরে নিয়ে গেছে পোচাররা, ধারণা করল উলুম্বু। ক্যানূ সামলানো সহজ কাজ নয়, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাগে।

আন্দাজ করল, নদীর দক্ষিণ তীরে মাঝিদেরকে রেখে চিউইউইয়ে গেছে তারা। মাঝিদের পাহারা দেয়ার জন্যে নিজেদের একজনকে রেখে গেছে।

ক্যানূগুলোর সন্ধান পেলে একটা কাজ হয়। বোটের নাক সামান্য ঘোরাল সে, একটা লেগুনে ঢোকার পথ দেখতে পেয়ে প্যাপিরাসের ঘন বনে ঢুকে পড়ল।

লেগুনের বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়ল বোট। এঞ্জিন বন্ধ রাখা হয়েছে। প্যাপিরাসের ডাঁটা মুঠোয় ধরে টান দিচ্ছে রেঞ্জাররা, তাতেই ধীরগতিতে এগোচ্ছে বোট। হাতে একটা বৈঠা নিয়ে পানির গভীরতা মাপছে উলুম্বু।

অগভীর পানিতে পৌঁছে একজন রেঞ্জারকে নিয়ে তীরে উঠল সে, বাকি সবাই বোটের পাহারায় থাকল। শুকনো মাটিতে উঠে ফিসফিস করে নির্দেশ দিল উলুম্বু, ক্যানূর খোঁজে রেঞ্জারকে পাঠিয়ে দিল ভাটির দিকে। নিজে গেল উল্টো অর্থাৎ উজানের দিকে। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল সে।

নিজের বুদ্ধির তারিফ করল আব্বাস উলুম্বু। আধ মাইলও এগোয়নি, ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকল নাকে। এদিকের তীরে কোন লোকবসতি নেই, আর নদীর ওপার এত দূর যে ধোঁয়ার গন্ধ পৌঁছুবে না।

ধীর, নিঃশব্দ পায়ে এগোল উলুম্বু। এদিকটায় নদীর তীর লাল মাটির প্রাচীর বিশেষ। সামনে সরু একটা নালা দেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে।

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় নিচের নালায় উঁকি দিল উলুম্বু। ক্যানূগুলো পানি থেকে যথেষ্ট দূরে তুলে আনা হয়েছে, বোট নিয়ে কেউ খোঁজ করলে যাতে দেখতে না পায়। মোট সাতটা ক্যানূ।

কাছাকাছি দু'জায়গায় আগুন জ্বলছে, আগুনের পাশে শুয়ে রয়েছে মাঝিরা। দেখে মনে হলো লাশ–হরিণের চামড়া দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা। দুটো আগুনের ধারে একজন করে সশস্ত্র পোচার বসে আছে, কোলের ওপর এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল।

রানা সাহেব ঠিকই আন্দাজ করেছেন, ভাবল উলুম্বু, হানাদার বাহিনী ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। নালার কিনারা থেকে পিছিয়ে এল সে, তারপর ঘুরপথে এগোল। দুশো গজ এগোবার পর সরু একটা পথ পেল সে, পশুরা চলাচল করে। পথটা দক্ষিণ অর্থাৎ চিউইউই হেডকোয়ার্টার ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে।

পথটা ধরে খানিক দূর এগোল উলুম্বু। শুকনো একটা নালায় নেমে গেছে পথ, নালার মেঝেতে সাদা বালির ওপর দাগগুলো যে পায়ের ছাপ ভোরের অনিশ্চিত আলোতেও পরিষ্কার বোঝা গেল। লাইন বন্দী হয়ে অনেকগুলো লোক হেঁটে গেছে এই পথে। চ্যাপ্টা, ভোঁতা হয়ে গেছে দাগগুলো, লোকগুলো যাবার পর এইপথে পশুরাও চলাচল করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগের ছাপ, আন্দাজ করল সে। জানা কথা, এই পথ ধরেই ফিরে আসবে তারা। নদী পেরুতে হলে ক্যানূগুলো দরকার হবে তাদের।

ঝোপের ভেতর ভাল একটা আড়াল খুঁজে নিল সে, এখান থেকে পথটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার পিছন দিকে অগভীর একটা নালা রয়েছে, শুকনো, প্রয়োজনে পালাবার পথ হিসেবে কাজ দেবে, দু'পাশে লম্বা ঘাস।

ভোর হয়ে গেল। চারদিক থেকে ভেসে আসছে পাখির ডাক। মাথার ওপর ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। দিনের আলোয় পথটার আরও অনেক দূর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে উলুম্বু।

দূরে কোথাও একটা বেবুন ডেকে উঠল। একজনের ডাকে সাড়া দিল বাকি সবাই। সতর্ক হবার সংকেত। এক সময় থামল তারা, জঙ্গলের আরও ভেতর দিকে সরে গেল। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে উলুম্বুর স্নায়ু।

পনেরো মিনিট পর পথের ওপর লোকগুলোকে দেখতে পেল সে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে হাতির দাঁত আর এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল। লোকগুলোর কাপড়চোপড় ছেঁড়া ও নোংরা। প্রায় সবার মাথায় ক্যাপ। হাতির দাঁত কেউ মাথায় নিয়েছে, কেউ কাঁধে। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসছে দলটা, দর দর করে ঘামছে।

লাইনের সামনের লোকটা একটু খাটো, তবে চওড়া ও শক্ত-সমর্থ। তাকে দেখেই চিনতে পারল উলুম্বু। ওর নাম পিটার গুচ, জাম্বিয়ান পোচারদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত। এর আগেও দু'বার মুখোমুখি হয়েছে তারা, প্রতিবার কিছু ভাল মানুষ মারা গেছে।

উলুম্বু যেখানে শুয়ে আছে তার কাছাকাছি মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গেল গুচ। ঠিক হাঁটা বলে না, ঘোড়ার মত দুলকি চালে দৌড়াচ্ছে। গোটা দলের মধ্যে একা তার চেহারাতেই ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পোচাররা, গুণল উলুম্বু। দুর্বল লোকগুলো পিছিয়ে পড়েছে, সবগুলো লোককে গুণতে প্রায় সাত মিনিট লাগল তার। উনিশ জন।

বোটের কাছে ফিরে এসে উলুম্বু দেখল ভাটির দিকে পাঠানো তার লোকটা ফিরে এসেছে। কি দেখেছে, এখন কি করতে হবে, সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল সে তার রেঞ্জারদের। পোচারদের কাছে আইভরি আছে, আর জিম্বাবুইয়ের আইন হলো পোচারদের দেখামাত্র গুলি করা যাবে।

খোলা পানিতে বেরিয়ে এসেই মোটর স্টার্ট দিল আব্বাস উলুম্বু। খক খক করে উঠল এঞ্জিন, স্টার্ট নিলেও বন্ধ হয়ে গেল আবার। বারবার চেষ্টা করল সে, কোন লাভ হচ্ছে না। এদিকে ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছে বোট।

রেগেমেগে এঞ্জিনের কাভার খুলে কাজ শুরু করল সে। অস্থিরতা অনুভব করছে, জানে ক্যানুতে আইভরি তুলে নদীর ওপারে পৌঁছুনোর আয়োজন করছে পোচাররা। হয়তো এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে তারা।

এঞ্জিনে কাভার না লাগিয়েই সামনে, কন্ট্রোলে চলে এল সে। এবার স্টার্ট নেয়ার পর আর বন্ধ হলো না মোটর।

কাভারবিহীন মোটরের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, সাবধান হবার সুযোগ করে দিচ্ছে পোচারদের। পরবর্তী বাঁকটা ঘুরতেই উলুম্বু দেখল, নদীর ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ক্যানুগুলো, দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে নদীর অপর পারে।

উলুম্বুর পিছনে সূর্য উঠছে, সামনে নদীর বিস্তৃতি থিয়েটার স্টেজ-এর মত। জাম্বেজির পানি উজ্জ্বল পান্না সবুজ, রোদ লেগে সোনালি হয়ে আছে প্যাপিরাস বন।

প্রতিটি ক্যানুতে একজন করে মাঝি, তিনজন করে আরোহী, তিনটে করে হাতির দাঁত। সামনের ক্যানুটা জাম্বিয়ান তীরের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে এরইমধ্যে।

ওটার পথে বাধা দেয়ার জন্যে বোটটাকে তির্যকভাবে ছোটাল উলুম্বু। দুটো জলযান এক হতে যাচ্ছে, গুচকে দেখতে পেল সে। ক্যানুর বো'র কাছ থেকে আড়ষ্টভঙ্গিতে পিছন ফিরে আছে সে, কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কিন্তু নড়তে পারছে না গুচ, নড়লেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে ক্যানু।

'এবার তোমাকে আমরা পেয়েছি,' বিড় বিড় করল উলুম্বু, সামনের দিকে ঠেলে দিল থ্রটল।

হঠাৎ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল গুচ, পায়ের নিচে দোল খেতে শুরু করল ক্যানু। কিনারা দিয়ে পানি উঠছে হুহু করে, ডেবে যাচ্ছে নিচের দিকে। উলুম্বুর উদ্দেশে গর্জে উঠল সে, হুমকি দিয়ে কি যেন বলছে। তারপর রাইফেল তুলে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করল অ্যাসল্ট বোটের দিকে।

ফাইবার গ্লাস খোলে বৃষ্টির মত আঘাত করল বুলেট। উলুম্বুর সামনে, কন্ট্রোল কনসোল-এর একটা ইন্সট্রুমেন্ট গজ বিস্ফোরিত হলো। ঝট করে মাথা নামাল সে, তবে বোটের কোর্স ঠিক রাখল, ক্যানুটাকে ধাক্কা দেবে।

খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা ভরল গুচ, গুলি করল আবার। ব্রীচ থেকে ছিটকে বেরুনো তামার কেসগুলো রোদ লেগে ঝিক ঝিক করছে। একজন রেঞ্জার আর্তনাদ করে উঠল, পেট চেপে ধরে পড়ে গেল ডেকের ওপর, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রিশ নট গতিতে ক্যানুর গায়ে ধাক্কা দিল অ্যাসল্ট বোট। কাইজেলিয়া কাঠ ফেটে গেল, আরোহীরা ছিটকে পড়ল পানিতে।

সংঘর্ষের আগের মুহূর্তে রাইফেল ফেলে দিয়ে নদীতে লাফ দিল গুচ। দ্রুতগতি খোলটাকে এড়াবার জন্যে পানির গভীরে ডুব দিতে চেষ্টা করল সে। আশা, পানির ওপর মাথা না তুলেই নলখাগড়া বনের কিনারায় পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু বাতাসে ভরে রয়েছে তার ফুসফুস, যথেষ্ট গভীরে ডুব দিতে পারল না। মাথা নিচের দিকে তাক করা, পা দুটো পানির মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীরে। অ্যাসল্ট বোটের ইয়ামাহা প্রপেলার সবটুকু শক্তিতে ঘুরছে, নাগালে পেয়ে গেল তার বাম পা। রুটি কাটার ছুরির মত নিখুঁতভাবে প্রপেলার গোড়ালি থেকে কেটে নিল পা-টা, হাঁটুর পিছন পর্যন্ত হাড় বাদ দিয়ে সমস্ত মাংস ছিন্নভিন্ন করে দিল।

তাকে পিছনে রেখে সামনে চলে এল অ্যাসল্ট বোট, হুইল ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে উলুম্বু। আরেকটা ক্যানুকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে ছুটছে বোট, কাত হয়ে আছে একদিকে। গতি এতটুকু না কমিয়ে ক্যানুটার ওপর লাফিয়ে পড়ল বোট, চুরমার করে দিল খোলটা, আরোহীরা নিক্ষিপ্ত হলো নদীতে। আবার তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে বোট।

তৃতীয় ক্যানুর আরোহীরা বোটটাকে আসতে দেখে সংঘর্ষের এক মুহূর্ত আগে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। তীব্র স্রোতে ভেসে গেল তারা।

বোট ঘুরিয়ে নিল উলুম্বু। পরের ক্যানুটা সরাসরি সামনে চলে এল।

আরোহীরা আর্তনাদ করছে, দয়া ভিক্ষা চাইছে, গুলি করছে এলোপাতাড়ি। অ্যাসল্ট বোটের চার ধারে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে, ঝর্ণার মত লাফিয়ে উঠছে পানি। ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল ক্যানূটা, সেটাকে পিষে ছুটে গেল বোট।

বাকি ক্যানুগুলো মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছে দক্ষিণ তীরে, মরিয়া হয়ে বৈঠা চালাচ্ছে আরোহীরা। অনায়াসে সেগুলোকে পাশ কাটাল উলুম্বু, সবচেয়ে কাছের ক্যানুটার পিছনে বোট তুলে দিল। ইতস্তত করল এঞ্জিন, কেঁপে উঠল বোট, কারণ জ্যান্ত মানুষের মাংসে কামড় বসাচ্ছে প্রপেলার। পরমুহূর্তে এগিয়ে গেল বোট।

শেষ ক্যানুগুলো দক্ষিণ তীরে পৌঁছে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পোচাররা, চেষ্টা করছে খাড়া প্রাচীর বেয়ে ওপরে ওঠার। তাদের আঙুলের ফাঁক গলে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে লাল মাটি।

থ্রটল পিছিয়ে আনল উলুম্বু, বো ঘোরাল উজানের দিকে, স্রোতের মধ্যে স্থির রাখল বোটটাকে। 'আমি পার্কের একজন ওয়ার্ডেন,' পোচারদের উদ্দেশে চিৎকার করল সে। 'তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। পালাবার চেষ্টা করো না, তাহলে গুলি খেয়ে মরবে।'

প্রাচীর বেয়ে উঠতে না পেরে বোটের দিকে ঘুরে গুলি করল একজন পোচার।

'কিল!' নির্দেশ দিল উলুম্বু, দেখতে পেল পোচাররা সবাই গুলি করতে যাচ্ছে।

তৈরি হয়েই ছিল রেঞ্জাররা। নদীর তীর ঝাঁঝরা করে দিল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। অ্যান্টি-পোচিং ইউনিটের ট্রেনিং পাওয়া লোক, প্রত্যেকে দক্ষ মার্কসম্যান। শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল টার্গেট প্র্যাকটিস।

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর অপর পারের দিকে এগোল আবার উলুম্বু।

মুখে কাটা দাগ, পিটার গুচ, সেই হলো দলনেতা। মাথা পিছু অল্প কয়েক ডলার দিলেই নতুন দল গড়ে নেবে সে। তাকে যদি অচল করা না যায়, আগামী হপ্তায় বা আগামী মাসে আরেক দল পোচার সীমান্ত পেরোবে। সাপের মাথা কাটতে হবে, তা না হলে আবার ছোবল দেবে সে।

উত্তর তীর, নলখাগড়ার বনরেখা লক্ষ্য করে ছুটছে উলুম্বুর বোট, যেখানে প্রথম ক্যানূটাকে ডুবিয়েছে। কাছাকাছি এসে থ্রটল টেনে ধরল সে, স্রোতের টানে বোটকে ভেসে যেতে দিল ভাটির দিকে। তার কয়েক গজ পাশে নলখাগড়ার বন।

পোর্ট রেইলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন রেঞ্জার, কড়া নজর রাখছে নলখাগড়ার ওপর।

প্যাপিরাসের আশ্রয় পাবার আগে জাম্বেজির স্রোত কতদূরে টেনে নিয়ে গেছে গুচকে বলা কঠিন। বোট নিয়ে ভাটির দিকে মাইলখানেক দেখবে উলুম্বু, তারপর লোক নিয়ে তীরে উঠবে। আহত হয়েছে গুচ, বেশিদূর পালাতে পারেনি সে। যত দূরেই পালাক, আজ তাকে ছাড়া হবে না।

নদীর জাম্বিয়ান দিকটায় কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার নেই উলুম্বুর। তবে সে একজন খুনী ও কুখ্যাত ডাকাতকে ধাওয়া করছে। চ্যালেঞ্জ করা হলে যুদ্ধ

করার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে আছে সে। জাম্বিয়ান পুলিস যদি নাক গলায়, যদি গুচকে ফেরত চায়, বন্দীর মাথায় গুলি করবে সে।

চোখের কোণে কি যেন ধরা পড়ল। বোট দাঁড় করাল উলুম্বু। নলখাগড়ার বন এক জায়গায় ভেঙে মত গেছে, যেন কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জায়গাটার ওপর দিয়ে। সম্ভবত কোন কুমীর নেমে গেছে পানিতে। কিন্তু না, কুমীর হলে নলখাগড়ার ডাঁটিগুলো ওভাবে মোচড়াত না। দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন মুঠোর ভেতর ধরেছিল একটা।

'কুমীরের হাত থাকে না,' বিড়বিড় করল উলুম্বু, আরও কাছে নিয়ে এল বোট। ব্যাপারটা ঘটেছে মাত্র কয়েক মিনিট আগে, কারণ তার চোখের সামনে নুয়ে পড়া নলখাগড়া ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে নিজেদের খাড়া ভঙ্গিতে। তারপর আপনমনে হাসল উলুম্বু। নলখাগড়ায় রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে সে।

'রক্ত! শুয়োরটা পালাতে পারেনি…!'

শেষ হলো না কথাটা, ওদের সামনে নলখাগড়ার বনে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। রক্ত হিম করা আর্ত চিৎকার, মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল সবাই।

সবার আগে সংবিৎ ফিরল উলুম্বুর। থ্রটলে সামান্য টান দিল সে, ঘন বনে জোর করে ঢুকে পড়ল বোটের নাক। ওদের সামনে কোথাও এক লোক বিরতিহীন চিৎকার করছে।

নলখাগড়ার ভেতর ধীরে ধীরে ঢুকছে বোট। হঠাৎ করে সামনে খানিকটা খোলা পানি দেখা গেল। বো-র সরাসরি সামনে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে পানি, ছিটকে ঝর্ণার মত ওপরে উঠছে, তারপর ওদের মাথার ওপর রোদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

ফেনার ভেতর কর্কশ আঁশঅলা একটা প্রকাণ্ড দেহ গড়াগড়ি খাচ্ছে, ঘোলা করছে পানি। মাখনের মত হলুদ তার পেট। লম্বা লেজে তীক্ষ্ণ আঁশ, ঘন ঘন আছাড় মেরে সাদা করে ফেলছে পানি।

হঠাৎ মানুষের একটা হাত পানির ওপর উঠে এল। চরম আতঙ্কে অস্থির একটা হাত। সামনের দিকে ঝুঁকে খপ করে কজিটা ধরে ফেলল উলুম্বু। ভিজে চামড়া পিচ্ছিল হয়ে আছে, দু'হাতে ধরে পিছন দিকে হেলান দিল সে, লোকটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে পানির নিচে থেকে।

একদিকে গুচ আর কুমীর, আরেক দিকে একা উলুম্বু। কজিটা মুঠোর ভেতর থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে এসে একজন রেঞ্জার গুচের বাহু ধরে ফেলল, কনুইয়ের কাছটায়।

দু'জন মিলে লোকটাকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পানির ওপর তুলল ওরা। ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার গুচ। পানির ওপর রেঞ্জাররা আর পানির নিচে কুমীর, দু'দলের মাঝখানে লম্বা হয়ে আছে সে, টেনে আরও লম্বা করা হচ্ছে।

অপর রেঞ্জার বোটের কিনারা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পানিতে এক পশলা গুলি করল। পানির সারফেসে হাই-ভেলোসিটি বুলেট এমনভাবে বিস্ফোরিত হলো যেন ইস্পাতের মোটা পাতে বাধা পেয়েছে। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু পানির

ছিটা এসে তীরের মত বিঁধল রেঞ্জার আর উলুম্বুর মুখে।

'স্টপ!' চিৎকার করল উলুম্বু। 'আমাদের লোক আহত হবে!'

রাইফেল ফেলে দিয়ে আবার গুচের বাহু আঁকড়ে ধরল রেঞ্জার। টাগ-অভ-ওঅর চলছে, উলুম্বুর দলে এখন তিনজন লোক। ধীরে ধীরে গুচের শরীরটা পানির ওপর তুলে আনছে তারা, যতক্ষণ না কুমীরটার প্রকাণ্ড মাথা পানির ওপর দেখা গেল।

কুমীরের দাঁত গুচের পেটের ভেতর ডুবে গেছে। দাঁতগুলো ধারাল হয় না, ওগুলো ব্যবহার করে শিকারকে আটকে ধরার জন্যে, তারপর পানিতে গোটা শরীর পাক খাইয়ে মুচড়ে ছিঁড়ে আনে একটা পা বা হাত, কিংবা বড় এক টুকরো মাংস। ওরা ধরে আছে, বোটের কিনারায় ছড়িয়ে পড়ল গুচ, পানিতে লেজ আছড়ে পাক খেলো কুমীর। ফড়ফড় করে ফেড়ে গেল গুচের পেট। দাঁতগুলো এখনও ডুবে আছে গুচের পেটে, পিছু হটল কুমীর, গুচের শরীর থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে নিয়ে গেল।

প্রতিপক্ষ ঢিল দিতে ওরা তিনজন গুচকে বোটের ওপরে টেনে আনল। তবে এখনও কুমীরটা ছাড়েনি তাকে। ডেকের ওপর মোচড় খাচ্ছে গুচের শরীর, বোটের কিনারা থেকে বেশ অনেকটা দূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে তার নাড়িগুলো, যেন ঝুলে রয়েছে গোছা গোছা টিউব আর রিবন।

লেজের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার ঝাঁকি মারল কুমীর। রিবন আর টিউবগুলো একটানে ছিঁড়ে গেল সব, শেষবারের মত চিৎকার করে উঠল গুচ, মরে গেল রক্তাক্ত ডেকে একবার পা ছুঁড়ে।

কিছুক্ষণ শুধু ওদের তিনজনের দ্রুত নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা গেল। সবাই বীভৎস লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল উলুম্বু, ফিসফিস করে শোনা ভাষায় বলল, 'আমার হাতে তোমার মৃত্যু এরচেয়ে কষ্টকর হত না। প্রার্থনা করি তোমার ওপর যেন শান্তি বর্ষিত না হয়। পরপারের দীর্ঘ যাত্রায় তোমার অন্যায় আর পাপ যেন তোমার সঙ্গেই থাকে।'

সাত

'না, রানা সাহেব, পোচারদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি,' রানাকে টেলিফোনে বলল আব্বাস উলুম্বু।

'কি বললে? আটকাতে পারোনি?' চিৎকার করছে রানা, বৃষ্টির পর লাইনটা ঠিকমত কাজ করছে না।

'না, রানা সাহেব,' গলা চড়াল উলুম্বু। 'মারা গেছে আটজন, বাকি সবাই হয় কুমীরের পেটে গেছে নয়তো ফিরে গেছে জাম্বিয়ায়।'

'আর আইভরি? ওদের সঙ্গে আইভরি ছিল না?'

'হ্যাঁ, সবার কাছেই ছিল, কিন্তু ক্যানূর সঙ্গে সব ডুবে গেছে নদীতে।'

'যাহ্,' রানার গলায় খেদ। কর্তৃপক্ষকে এখন বোঝানো আরও কঠিন হবে যে চিউইউই থেকে প্রায় সবগুলো আইভরি রিফ্রিজারেটর ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড দায়ী, এটা প্রমাণ করার সুযোগ প্রতি ঘণ্টায় একটু একটু করে কমে যাচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'এখান থেকে একটা পুলিস ইউনিট রওনা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, রানা সাহেব। ওরা এই মুহূর্তে মানা পুলে, আমাদের এখানে রয়েছে। আমার আহত রেঞ্জারকে হারারেতে পাঠিয়ে দিয়েই ওদের সঙ্গে যোগ দেব আমি। দেখতে চাই বেজন্মা কুত্তাগুলো কি করেছে আলি শাহের।'

'শোনো, উলুম্বু। একটা মাত্র ক্লু আছে আমার হাতে, যারা দায়ী তাদের একজনকে ধরতে যাচ্ছি আমি। তুমি...।'

'খুব সাবধানে, রানা সাহেব। এরা ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার। আপনি মারাত্মক বিপদে পড়তে পারেন। কোথায় যাচ্ছেন আপনি, কার খোঁজে?'

'দেখা হলে সব বলব, উলুম্বু,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা, ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে ল্যাণ্ডক্রুজারে চড়ল।

চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ও। উপলব্ধি করতে পারছে, এই সময়টা আসলে মধ্যবর্তী অবসর, সাময়িক বিরতি। খুব তাড়াতাড়ি আবার ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে জিম্বাবুই পুলিস, আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব নিয়ে। বিপদ ও ঝামেলা এড়াতে হলে জিম্বাবুই থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। সূত্রটাও ওকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইছে।

কাস্টমস অ্যাণ্ড ইমিগ্রেশন পোস্ট-এ চলে এল রানা, ব্যারিয়ারের সামনে পার্কিং এরিয়ায় ল্যাণ্ডক্রুজার থামাল। দেশ ত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা সারতে আধ ঘণ্টারও কম লাগল, আফ্রিকার মান অনুসারে প্রায় একটা রেকর্ড সময় বলা যায়।

জাম্বেজির ওপর লোহার পাত দিয়ে ঘেরা ব্রিজটা পেরিয়ে এল রানা। জানে, এটাও কোন স্বর্গে ঢুকছে না ও। ইউগাণ্ডা আর ইথিওপিয়ার পর জাম্বিয়া হলো আফ্রিকা মহাদেশের দরিদ্রতম দেশ। দুর্নীতি দখল করে আছে দেশটাকে, আর বিশৃঙ্খলা পেছন দিকে টেনে রেখেছে।

জাম্বিয়ান দিকটায় এসে এক অফিসারের মুখোমুখি হলো রানা। জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, কাল রাতে আমার এক বন্ধু এই পথ দিয়ে মালাবিতে ফিরে গেছে কিনা?' ইউনিফর্ম পরা অফিসার ল্যাণ্ডক্রুজারে তল্লাশি চালিয়ে সিধে হলো এইমাত্র।

চোখ গরম করে প্রতিবাদ জানাল অফিসার, সরকারী তথ্য ফাঁস করার নিয়ম নেই। পকেট থেকে মার্কিন দশ ডলারের একটা নোট বের করল রানা, চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। এক সময় জাম্বিয়ান মুদ্রার মান ছিল মার্কিন ডলারের সমান। বহুবার অবমূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন ঘটিয়ে সরকারী বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৩০:১। ব্ল্যাক মার্কেটে ৩০০:১, বা কাছাকাছি। কাস্টমস অফিসার রানার হাতে তার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা দেখতে পাচ্ছে।

'আপনার বন্ধুর নাম কি?' হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল কাস্টমস অফিসার।

'মি. চাখার সিং। বড় একটা ট্রাক চালাচ্ছেন তিনি, শুকনো মাছ আছে ট্রাকে।'

'দাঁড়ান।' অফিসের ভেতর ঢুকল অফিসার, কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, আপনার বন্ধু মাঝরাতের খানিক পর এখান দিয়ে গেছেন।' রানার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পোস্ট-এ ফিরে গেল সে।

বর্ডার পোস্ট পিছনে রেখে উত্তর অর্থাৎ লুসাকার দিকে যাচ্ছে রানা, বুকের ভেতর ঠাণ্ডা একটা অস্বস্তি। জাম্বিয়ায় আইন-শৃংলা বলতে যে-টুকু অবশিষ্ট আছে তা শুধু শহরগুলোর সীমানার ভেতর। অথচ দেশটার বেশিরভাগ জায়গা এখনও জঙ্গল বা গ্রাম। রোড-ব্লকগুলোয় পুলিস আছে, কিন্তু নির্জন পথে বিপদে পড়লেও তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পুলিসের সম্পর্কে অভিযোগ আছে, একা কোন বিদেশীকে দেখলে চোর-ডাকাতদের সুযোগ নিতে দেয় না, নিজেরাই সব কেড়ে নেয়।

স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে, মেরামতের অভাবে রাস্তাগুলোর অবস্থা করুণ। গর্তগুলো কোন কোন জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত গভীর। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলের বেশি গাড়ি চালাতে পারছে না রানা।

দেশটা কিন্তু ভারি সুন্দর। পাতলা, প্রায় খোলা বনভূমির ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা, ঢালগুলো ঢাকা পড়ে আছে সোনালি ঘাসে। পাহাড়গুলো যেন অলঙ্কার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, বিভিন্ন চোখ জুড়ানো রঙ পাথরগুলোর, দেখে খুব দামী বলে মনে হয়, কেউ যেন মনের আনন্দে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। গভীর ও স্বচ্ছ সব ক'টা নদী।

প্রথম রোড-ব্লকে এসে থামল রানা।

ব্যারিয়ার একশো গজ দূরে থাকতেই ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি কমিয়ে ফেলল ও, দুটো হাতই হুইলের ওপর রাখল, পুলিস যাতে দেখতে পায়। রোড-ব্লকের পুলিসরা কেন কে জানে সাংঘাতিক নার্ভাস থাকে, ভুল করে বা সন্দেহ করে গুলিবর্ষণ কোন দুর্লভ ঘটনা নয়। ল্যাণ্ডক্রুজার থামতেই একজন ইউনিফর্ম পরা কনস্টেবল, চোখে সানগ্লাস, জানালা দিয়ে সবমেশিনগান ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'হ্যালো, মাই ফ্রেণ্ড।' ট্রিগারে আঙুল, মাজল তাক করা হয়েছে রানার পেটে। 'গেট আউট!'

'তুমি সিগারেট খাও?' জানতে চাইল রানা। টয়োটা থেকে নামার সময় পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের একটা প্যাকেট বের করে গুঁজে দিল লোকটার হাতে।

মেশিন পিস্তলের ব্যারেল সরিয়ে নিল কনস্টেবল, পরীক্ষা করে দেখল প্যাকেটটা খোলা নয়। নিঃশব্দে হাসল সে, সামান্য ঢিল পড়ল রানার পেশীতে।

'লাইনে চলে যান,' হাত তুলে ট্রাক আর প্রাইভেট কারের লাইনটা দেখিয়ে দিল কনস্টেবল। 'এক ঘণ্টা পর তল্লাশি শুরু হবে।'

'এক ঘণ্টা পর কেন?'

'কোন প্রশ্ন নয়, আমাদের সময়মত আমরা তল্লাশি চালাব।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। লুসাকা পর্যন্ত এরকম সাত-আটটা রোড-ব্লক আছে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলবে, এই সময় হৈ হৈ করে পৌছুল একদল স্থানীয় শিকারী। একটা হান্টিং সাফারি কোম্পানীর ট্রাক নিয়ে এল তারা, ট্রাকটা থামল ল্যাণ্ডক্রুজারের পিছনে। ট্রাকের পিছনে স্তূপ হয়ে আছে ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, তার ওপর বসে আছে গানবেয়ারার আর ট্র্যাকাররা।

ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে দাড়িওলা এক পেশাদার শিকারী। আলকাতরার মত কুচকুচে কালো, পরনে বাদামী সাফারি জ্যাকেট, মাথায় জেব্রার চামড়া দিয়ে তৈরি হ্যাট। 'মি. রানা!' জানালা দিয়ে মাথা বের করল সে। 'মি. মাসুদ রানা!' দু'কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তার হাসি।

এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল রানা। বছরখানেক আগের কথা, আফ্রিকার হান্টিং সাফারি সম্পর্কে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করছিল ও-ম্যান ইজ দা হান্টার-তখন ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, নামটা মনে করতে পারল না রানা। তবে মনে পড়ল, দু'জন মিলে হেইগ-এর একটা বোতল সাবাড় করেছিল লুয়াঙ্গা উপত্যকায়, একটা ক্যাম্পফায়ারে। বোতলের বেশিরভাগই একা খেয়ে ফেলে সে, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে, 'আমার সুখ্যাতি যতটা না শিকারী হিসেবে, তারচেয়ে বেশি মদ্যপ হিসেবে।'

'ইসমাইল!' নামটা মনে পড়তে স্বস্তিবোধ করল রানা। একজন মিত্র এখন খুবই দরকার ওর। জাম্বিয়ায় সাফারি কোম্পানীর শিকারীদের অত্যন্ত দাম দেয়া হয়। 'বাবা ইসমাইল,' গলা চড়িয়ে জবাব দিল ও।

ট্রাক থেকে নামল মানুষ নয়, যেন একটা দৈত্য। 'হেল, ম্যান, ইট'স গুড টু সী ইউ এগেন।' লোমশ থাবা দিয়ে রানার হাত ঢেকে ফেলল সে। 'আপনার কোন অসুবিধে করছে এরা?' সরাসরি জানতে চাইল, এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সবই জানা তার।

'ইয়ে, মানে...,' কথাটা শেষ করল না রানা।

ঝট করে পুলিস কনস্টেবলের দিকে ফিরল বাবা ইসমাইল। 'ওহে, টিটো, এই ভদ্রলোক আমার বন্ধু। শুনলাম তুমি নাকি ওঁকে সমস্যায় ফেলতে চেষ্টা করছ? তারমানে তোমার আসলে মাংস দরকার নেই?'

এগিয়ে এসে রানাকে স্যালুট করল টিটো। আড়ষ্ট হেসে বলল, 'একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে গেছে, স্যার। আপনি যেহেতু জনাব বাবা ইসমাইলের বন্ধু, আপনার ট্রাক সার্চ করার কোন দরকারই নেই।'

'অ্যাই, দে তো, টিটোকে বড় দেখে একটা মোষের রান বের করে দে,' দরাজ গলায় নিজের লোকদের নির্দেশ দিল বাবা ইসমাইল। 'কোন দিকে যাচ্ছেন আপনি, মি. রানা?' জানতে চাইল সে। 'লুসাকা? আপনি বরং আগে থাকতে দিন আমাকে, তা না হলে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। লুসাকায় পৌছুতে সাতদিন বা অনন্তকাল লাগলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

তাড়াহুড়ো করে ব্যারিয়ার তুলে ফেলা হলো, আরেকবার স্যালুট করল পুলিস কনস্টেবল। প্রায় বিশ কেজি মাংস পেয়েছে সে। পরবর্তী রোড-ব্লকগুলোয় এমন খাতির করা হলো ওদেরকে, যেন রাজকীয় শোভাযাত্রা যাচ্ছে-প্রতিবার তারপুলিন

ঢাকা ট্রাক থেকে বেরিয়ে আসছে বড় আকারের মাংস খণ্ড।

অবশেষে লুসাকায় পৌঁছুল ওরা। অনুন্নত দেশগুলোর রাজধানীতে যা দেখা যায় এখানেও তা-ই দেখল রানা, কাজের সন্ধানে গ্রাম উজাড় করে শহরে চলে এসেছে মানুষ। রাজধানীর ঠিক বাইরে শুরু হয়েছে বস্তি এলাকা–দুর্গন্ধময় নর্দমা ও আবর্জনার স্তূপ, এই দুইয়ের মাঝখানে পাতা ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হাত দুয়েক উঁচু কুঁড়েঘরের সারি, সামনে খেলা করছে হাড্ডিসার উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা। পাশেই ড্রামে তৈরি হচ্ছে চোলাই মদ, আরেক পাশে জুয়ার আসর, চারপাশে ঘুরঘুর করছে নাবালিকা বেশ্যারা।

এরকম দৃশ্য, বলা উচিত এরচেয়েও ভয়ঙ্কর দৃশ্য, নিজের দেশেও দেখেছে রানা। নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করেছে ও, নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। এরকম একটা দৃশ্য, যারা দেখেনি, বললেও তারা বিশ্বাস করবে না। গোলাপ শাহ মাজারের সামনে সরকারী দল বিশাল মীটিং করছে, বিরোধী দলের জনসভা চলছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ জুড়ে, আর মৌলবাদীরা জমায়েত হয়েছে শাপলা চত্বরে। গুলিস্তান সিনেমা হলের ঠিক উল্টোদিকে, আগে যেখানটায় মীর জুমলার কামান ছিল, তার মাত্র বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে, চওড়া ও পাকা নর্দমার দু'দিকে পা রেখে প্রস্রাব করতে বসেছে তেরো কি চোদ্দ বছরের এক মেয়ে। জাঙ্গিয়াটা কোমর থেকে নামিয়ে পায়ের পাতার কাছে আনল, কোমরের ওপর তুলে ফেলল ছেঁড়া ও নোংরা ফ্রক, তারপর কোন রকম আড়াল না থাকা সত্ত্বেও বসে পড়ল। চারদিকে দুনিয়ার লোক, কেউ দেখল আবার কেউ দেখল না, তবে কারও কিছু এসে গেল বলে মনে হলো না। মেয়েটার চেহারায় কোমলতা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, দেখতেও সে কালো-খ্যাদা। তবে তার মুখে যে ভাবটা ছিল, এত বছর পর আজও সেটা পরিষ্কার মনে করতে পারে রানা। না, তার চেহারায় কোন লজ্জা ছিল না। এমনকি অশ্লীল হাসি বা নির্লজ্জ কৌতুকও ছিল না। মার খাওয়া কুকুরের মত সতর্ক দেখাচ্ছিল তাকে, যেন আবার কেউ মারতে এলেই খেঁকিয়ে উঠবে, প্রায় মারমুখো একটা ভাব।

কাজ সেরে মেয়েটা রাস্তা পেরোল, অপেক্ষারত তার অপর দুই সঙ্গিনীর সঙ্গে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। ফুটপাতের পাশে, রেইলিঙে হেলান দিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে রানা, তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায় ওর সংবেদনশীল মনে। কেউ যদি দাবি করে, ওখানে ওরা যারা মীটিং বা সভা করছে তারা আসলে সবাই ব্যবসা মানেই বেশ্যাবৃত্তি ধরে নিয়ে রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাহলে কি ভুল হবে? ওখানে যারা ভাষণ দিচ্ছে তারা পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজেদেরকে বিশেষ একটা শ্রেণীতে তুলে ফেলেছে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে সমস্ত ক্ষমতা–ইতিহাস বলে না ওদের কারও কোন নাবালিকা মেয়ে রমনা বা ভিক্টোরিয়া পার্ক, কমলাপুর রেলস্টেশন বা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিন্যালে খদ্দেরদের খোঁজে রাত কাটিয়েছে। তারা দেশের দূষিত বাতাস থেকে ছেলেমেয়েদের রক্ষার জন্যে বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখায়। কেউ যদি দাবি করে, গুলিস্তানের মোড়ে

প্রস্রাব করতে বসা কালো-খ্যাদা মেয়েটার আচরণ আসলে একটা প্রতিবাদ? যদি বলা হয়, প্রস্রাবটা করা হয়েছে বিশেষ একটা শ্রেণীর মুখে? আমরা, যারা দেশটাকে জাহান্নাম বানাতে কমবেশি কিছু না কিছু অবদান রাখছি, দু' এক ফোঁটা তাদের মুখেও?

ব্রিজওয়ে হোটেলের বার-এ [illegible] ইসমাইলকে বসাল রানা, তার জন্যে হুইস্কির অর্ডার দিয়ে রিসেপশন ডেস্কে চলে এল নাম লেখানোর জন্যে।

কামরাটা থেকে সুইমিং-পুল দেখা যায়। গত চব্বিশ ঘণ্টার ঘাম ও ক্লান্তি শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ধুয়ে ফেলল রানা। তরপর টেলিফোন তুলে ডায়াল করল ব্রিটিশ হাই কমিশন-এ। দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ওখানকার টেলিফোনিস্টকে ধরতে পারল ও। 'মি. মাইকেল ডাফ-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লীজ?' জানতে চেয়ে দম বন্ধ করল ও। মাইকেল ডাফ দু'বছর আগে লুসাকায় ছিল, তবে ইতিমধ্যে অন্য কোথাও বদলি হয়ে যেতে পারে সে।

'মি. মাইকেল ডাফের সঙ্গে কথা বলুন, লাইন জুড়ে দিচ্ছি,' মেয়েটা কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিতে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা।

'মাইকেল ডাফ বলছি।'

'মাইক, আমি মাসুদ রানা।'

'গুড লর্ড, রানা, তুমি কোথায়?'

'এখানে, লুসাকায়।'

'রূপকথার রাজ্যে স্বাগতম, দোস্ত। আছ কেমন?'

'মাইক, তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে? আবার তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'আজ রাতে আমাদের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছ না কেন? নোরাকে অন্তত মুগ্ধ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোরো না।'

নবস হিল-এ, ডিপ্লোম্যাটিক জোনের একটা বাড়িতে থাকে মাইকেল ডাফ, গভর্নমেন্ট হাউস-এর কাছাকাছি। এলাকার অন্যান্য বাড়ির মতই ওটাকে দেখেও একটা দুর্গ বলে মনে হয়। দশ ফুট উঁচু পাঁচিলের মাথায় পাকানো কাঁটাতারের বেড়া, গেটে পাহারা দেয় দু'জন নাইটগার্ড।

একজোড়া বুলডগকে শান্ত করল মাইকেল ডাফ, তারপর কোলাকুলি করল রানার সঙ্গে।

'তুমি দেখছি কোন ঝুঁকি নিচ্ছ না,' সশস্ত্র গার্ডদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল রানা।

'শুধু এই রাস্তাতেই প্রতি রাতে অন্তত একটা বাড়িতে চোর ঢোকে, কাঁটাতার ও কুকুর থাকা সত্ত্বেও।'

রানাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল মাইকেল ডাফ, বেডরূম থেকে বেরিয়ে এসে ইংলিশ ঢঙে আলতোভাবে রানার গালে গাল ও ঠোঁট ঘষল নোরা। এটা তার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। নোরা একটা গোলাপ কুঁড়ি, মাথায়

কোমল কালো রেশম, গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ। 'ভুলে গিয়েছিলাম যে টিভির চেয়ে রক্তমাংসের মাসুদ রানা আরও অনেক বেশি হ্যাণ্ডসাম।' রানার চোখে চোখ, হাসছে নোরা।

অক্সফোর্ড-এর একজন প্রফেসরের মত দেখতে হলেও, মাইকেল ডাফ আসলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট ছিল। বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর মাধ্যমে পরিচয়, ওদের দু'জনকে তিনি একটা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আইআরএ সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করে মাইকেল ডাফ, কিন্তু সন্ত্রাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় নিজে। সে ওদের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে, এই সময় নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে রানা তাকে বাঁচায়। সেই থেকে ডাফ পরিবারের সঙ্গে রানার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা। রানাকে কোনরকম সাহায্য করার সুযোগ পেলে বর্তে যায় মাইকেল। নোরার জীবনে স্বামীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই, কাজেই রানাকে এমন শ্রদ্ধা করে, ও যেন দেবদূত।

কুশলাদি বিনিময়ের পর কিচেনে চলে গেল নোরা, রানাকে নিয়ে সিটিংরুমে বসল মাইকেল ডাফ, ওর হাতে হুইস্কি ভরা একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল। পুরানো দিনের গল্প হলো কিছুক্ষণ, তারপর ডাইনিং রুম থেকে ওদেরকে ডিনার খেতে ডাকল নোরা। বাড়ির রান্না, কাজেই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হলো রানার। ও খেতে খুব মজা পাচ্ছে দেখে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল নোরার চেহারা।

ডিনার শেষে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে বসল ওরা। মাইকেল ডাফ জানতে চাইল, 'কি সাহায্য দরকার তোমার, রানা?'

'বলা উচিত উপকার। তা-ও একটা নয়, দুটো।'

'বলে ফেলো, দোস্ত।'

'আমার ফিল্ম টেপ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে লণ্ডনে পাঠানো সম্ভব হবে কি? আমার কাছে অত্যন্ত দামী জিনিস ওগুলো। জিম্বাবুই পোস্ট অফিসকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কোন ব্যাপারই না।' মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ডাফ। 'ওগুলো আমি কালকের ব্যাগে ভরে দেব। আর কি?'

'চণ্ডমণ্ড গণ্ড নামে এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার।'

'আমার তাঁকে চেনার কথা?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল ডাফ।

'চেনা উচিত। হারারেতে তাইওয়ানের অ্যামব্যাসাডর তিনি।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর একটা ফাইল আছে আমাদের কাছে। তিনি শত্রু না বন্ধু, রানা?'

'ঠিক জানি না–অন্তত এই পর্যায়ে বলা যাচ্ছে না।'

'তাহলে শুনতে চাই না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার গ্লাসটা আবার ভরে দিল মাইকেল ডাফ। 'কাল দুপুরের আগেই তোমাকে একটা কমপিউটর প্রিন্ট-আউট দিতে পারব বলে আশা করি। তুমি চাও, ব্রিজওয়েতে পাঠিয়ে দিই?'

'ধন্যবাদ, মাইকেল। এই সব উপকার ঠেকায় পড়লে একদিন তুমি ফিরে চেয়ো।'

হেসে উঠল মাইকেল ডাফ, তারপর বলল, 'আবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। কারণ আমি এসপিওনাজ জগৎ ছেড়ে এসেছি। এ-প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মনে, জিজ্ঞেস করব, দোস্ত? ভাবছি তুমি আবার কিছু মনে করবে কিনা...'

'প্রশ্নটা না শুনে বলা যাচ্ছে না।'

'আমার মত তুমিও কি এসপিওনাজ জগৎ ত্যাগ করেছ?' মৃদুকণ্ঠে, যদিও প্রায় ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে, জানতে চাইল মাইকেল ডাফ। 'প্রশ্নটা করছি এই জন্যে যে আজ প্রায় এক বছর হলো, মাঝে দু'চার মাস বিরতি দিয়ে, আফ্রিকায় রয়েছ তুমি ছবি তোলার কাজ নিয়ে। ব্যাপারটা কি? কৌতূহলটা যদি অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে, ক্ষমা চাই, দোস্ত।'

চিরতরুণ মাসুদ রানা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে, জীবনানন্দ দাশ ও জসিমউদ্দিনের রোদনক্লিষ্ট বাংলা মায়ের এক দামাল সন্তান। ওর বুক জুড়ে দেশপ্রেম আর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে রোমাঞ্চের নেশা। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনকে ব্রত হিসেবে নিয়ে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট রানা। দুনিয়ার যে-কোন দেশে, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ও। ছদ্মবেশ ধারণের সমস্ত কৌশল ওর জানা। সব ক'টা মহাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকায় যে-কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনায়াসে এক হয়ে মিশে যেতে পারে। সৎ সাহস, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, মহত্ত্ব ও উদারতা ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এগুলো ওকে এসপিওনাজ জগতে কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছে। বিসিআই ও মাসুদ রানা বাংলাদেশের জন্যে বয়ে এনেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। সিআইএ, কেজিবি ও বিএসএস ছাড়াও দুনিয়ার আরও অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বিপদে-আপদে বিসিআই তথা মাসুদ রানার সাহায্য ও পরামর্শ চায়।

মাইকেল ডাফের কথা শুনে ক্ষীণ হাসল রানা, বলল, 'না, প্রশ্নই ওঠে না, এসপিওনাজ জগৎ ত্যাগ করিনি আমি। এমনকি হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে ছুটিও দেয়া হয়নি।'

'তাহলে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মাইকেল ডাফ।

'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, এ-দুটো বিষয়ে সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করা আমার নতুন একটা শখ, এটা জানার পর আমার বস,' ওর বস মানে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, 'আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আফ্রিকায় পাঠিয়েছেন।'

'অ্যাসাইনমেন্ট?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল মাইকেল ডাফের। 'কি অ্যাসাইনমেন্ট?'

রানার চেহারা নির্লিপ্ত। 'পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, এ-দুটো সম্পর্কে সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করার অ্যাসাইনমেন্ট।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মাইকেল ডাফ। 'কিন্তু এ-সবের সাথে এসপিওনাজের সম্পর্ক কি?'

'কোন সম্পর্ক নেই, আবার সব রকম সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আফ্রিকায়। কারা নষ্ট করছে? কে দায়ী? তাদেরকে বাধা দেয়ার কি উপায়? এ-সব তথ্য সংগ্রহ করাও একজন এসপিওনাজ এজেন্টের দায়িত্ব বা কাজ হতে পারে, পারে না?'

'কি জানি।' তেমন উৎসাহ বোধ করছে না মাইকেল ডাফ। 'ইতিমধ্যে ঘাবড়ে যাবার মত কোন তথ্য পেয়েছ কি? কিংবা সন্ধান পেয়েছ মহাশক্তিশালী কোন শত্রুর, যে আফ্রিকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার জন্যে দায়ী?'

'বসের ধারণা, আন্দাজ করতে পারি, এ-ধরনের দু'একজন মহা শক্তিশালী ভিলেনের দেখা আমি পেয়ে যাব। তুমি জানো না, আমার বস ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তাঁর সন্দেহ বা ধারণা আগে কখনও মিথ্যে হতে দেখিনি। এবারও হয়তো সেরকম দু'একজন শত্রু আমি পেয়ে যাব।' একটু থেমে রানা আবার বলল, 'এ-প্রসঙ্গে তোমার আগ্রহ দেখছি না, কাজেই আলোচনাটা এখানেই ইতি হোক, কি বলো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ডাফ, তারপর বলল, 'তবে একটা কথা, কোন সাহায্য দরকার হলে আমাকে জানাতে ভুলো না।'

পল নিউম্যানের তোলা ফিল্ম টেপগুলো ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পেরে বিরাট স্বস্তিবোধ করল রানা। কাজটায় সময় লেগেছে ছ'মাসের বেশি, বিস্তর টাকাও খরচ হয়েছে। নতুন এই প্রজেক্টটার ওপর এত দৃঢ় ছিল ওর বিশ্বাস যে বাইরে থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার কোন চেষ্টাই করেনি ও। ব্যাংকে যা কিছু জমা ছিল ওর, প্রায় পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার, সব খরচ করে ফেলেছে। এই টাকাও অবশ্য বই লিখে ও টেলিভিশন প্রডিউসার হিসেবে কাজ করে আয় করেছে ও।

পরদিন সকালে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরা রানার টেপ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইটে চড়ে রওনা হয়ে গেল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে লণ্ডনে। নিজের স্টুডিওর ঠিকানায় পাঠিয়েছে রানা ওগুলো, ওখানেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে। পরে সম্পাদনা করার জন্যে সময় বের করবে ও।

কোন বাহকের ওপর বিশ্বাস না রেখে, মাইকেল ডাফ নিজেই কমপিউটর প্রিন্ট-আউট দিয়ে গেল রানাকে ব্রিজওয়ে হোটেলে। 'চণ্ডমণ্ড গণ্ড, ভাল এক লোককে বেছেছ হে,' মন্তব্য করল সে। 'সবটুকু আমি পড়িনি, তবে যে-টুকু পড়েছি তাতেই অন্তত এটুকু জ্ঞান হয়েছে যে গণ্ড পরিবারের সঙ্গে কেউ যেন লাগতে না যায়। দূরে থাকার সুযোগ পেলে হাতছাড়া কোরো না, রানা। এক একটা বিষাক্ত সাপ।'

সীল করা এনভেলাপটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'শুধু একটা শর্ত, দোস্ত। পড়া হয়ে গেলেই পুড়িয়ে ফেলো। কথা দিতে হবে তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শর্তটা মেনে নিল রানা।

'হাই কমিশন থেকে তোমার জন্যে একজন গার্ড নিয়ে এসেছি আমি,' বলল

মাইকেল ডাফ। 'তোমার জন্যে নয়, তোমার ল্যাণ্ডক্রুজারের জন্যে। সুস্থকায় কেউ তার গাড়ি রাস্তায় ফেলে রাখার মত বোকামি করে না।'

এনভেলাপটা নিয়ে ওপরতলায়, নিজের স্যুইটে চলে এল রানা, ফোনের রিসিভার তুলে চা চাইল। রুম-সার্ভিস চা দিয়ে যাবার পর দরজায় তালা লাগাল ও, কাপড়চোপড় খুলে উঠে পড়ল বিছানায়। বুকে বালিশ নিয়ে উপুড় হলো ও, পড়তে শুরু করল অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ডোশিয়ে।

এগারো পাতার প্রিন্ট-আউট, প্রতিটি পাতায় বিস্ময়কর সব তথ্য। গণ্ড পরিবারের ধন-সম্পদ ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলি শাহ রানাকে সামান্য একটু আভাস দিয়েছিল মাত্র।

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন চণ্ডকিণ্ড গণ্ড। পৃথিবীর এমন কোন দেশ খুব কমই আছে যেখানে তাঁর বিপুল স্থাবর সম্পত্তি নেই। সবই তাঁর নিজের নামে। আন্তর্জাতিক অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ শেয়ার কেনা আছে তাঁর। লুক্সেমবার্গ, জেনেভা, টোকিও, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, জোহানেসবার্গ, এরকম বহু শহরের নাম উল্লেখ করার পর রিপোর্টের লেখক হাল ছেড়ে দিয়ে লিখেছে, তালিকাটা অসম্পূর্ণ—এ-সব শহরে ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভূ-সম্পত্তি আছে তাঁর।

তথ্যগুলোর ওপর আরও বেশি খেয়াল দেয়ার পর রানার মনে হলো, চণ্ডমণ্ড গণ্ড আফ্রিকায় অ্যামব্যাসাডর হবার পর থেকে গণ্ড পরিবারের পুঁজি বিনিয়োগ ছকে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দেয়। ওদের বেশিরভাগ হোল্ডিং প্যাসিফিক রিম-এর চারধারে যেমন ছিল তেমনি আছে এখনও, তবে আফ্রিকায় ও আফ্রিকা-কেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ওদের পুঁজি বিনিয়োগ অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

পাতা উল্টে রানা আবিষ্কার করল, কমপিউটরও ব্যাপারটা ধরতে পেরে একটা হিসাব বের করেছে—ছ'মাস সময়সীমার মধ্যে শূন্য থেকে সমুদয় পুঁজির শতকরা বারো ভাগ আফ্রিকা সেকশনে বিনিয়োগ করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অসংখ্য পাহাড় নিয়ে গঠিত মাইনিং হোল্ডিং, আফ্রিকার বিভিন্ন বড় আকারের ফুড প্রডাকশন কোম্পানীর সর্ববৃহৎ শেয়ার, বনবিভাগের বিশাল সব এলাকা, পাল্প মিল, শীপ ব্যাঙ্ক, একের পর এক কিনে নিয়েছে ওরা—সবই আফ্রিকায়, সাহারার দক্ষিণে। বোঝা যায়, গণ্ড পরিবারের নজর পড়েছে এখানে।

কমপিউটর প্রিন্ট-আউটের চার নম্বর পাতায় দেখা গেল, চণ্ডমণ্ড গণ্ড আরেক ধনকুবের তাইওয়ানিজ পরিবারের এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। প্রেমের পরিণতি নয়, পারিবারিক উদ্যোগে হয় বিয়েটা। দুটো বাচ্চা ওদের—উনিশশো বিরাশি সালে জন্ম হয় ছেলেটার, এক বছর পর মেয়েটার।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের আগ্রহ ও দুর্বলতার একটা তালিকা দেয়া হয়েছে। প্রাচ্য দেশীয় গান-বাজনা, থিয়েটার, এশিয়ার চিত্রকর্ম আর বিশেষ করে আইভরির তৈরি দুর্লভ অলঙ্কার বা শিল্পকর্ম তাঁর বিশেষ পছন্দ। গলফ খেলেন তিনি, টেনিস খেলেন, ইয়ট নিয়ে সাগরে বেড়াতে ভালবাসেন। মার্শাল আর্টে তিনি একজন এক্সপার্ট। ধূমপান খুব কমই করেন, মদ খান সামাজিক অনুষ্ঠানে। জানামতে তিনি কোন নারকোটিক ব্যবহার করেন না। রিপোর্টে তাঁর একটাই

দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, তার এই দুর্বলতা তাকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাইপের প্রথম শ্রেণীর ব্রোথেলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, নিয়মিত। তাঁর যৌন রুচি স্যাডিস্টিক ধরনের। উনিশশো সাতাশি সালে তাঁর যৌন আচরণের শিকার হয়ে ব্রোথেলের এক মেয়ে মারা যায়। কেলেঙ্কারি ও অপরাধ চাপা দিতে গণ্ড পরিবারের কোন সমস্যা হয়নি, বোঝা যায় চণ্ডমণ্ডের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের না করা থেকে।

মাইকেল ঠিকই বলেছে, প্রিন্ট-আউট একপাশে সরিয়ে রেখে ভাবল রানা। চণ্ডমণ্ড গণ্ড বিষাক্ত সাপই বটে, বাসও করছে নিরাপদ একটা দুর্গে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রতিবার এগোতে হবে এক পা করে।

প্রথমে চাথার সিং। যোগাযোগটা প্রমাণ করতে হবে ওকে। চাথার সিং-এর সঙ্গে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সম্পর্ক আছে, এটা জানা গেলে দ্বিতীয় কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ওর জন্যে।

ডিনারের জন্যে কাপড় পরছে রানা, ড্রেসিং টেবিলে রেখে প্রিন্ট-আউটের পাতা ওল্টাচ্ছে, নিশ্চিত হতে চায় এমন কোন তথ্য ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে কিনা যা থেকে বোঝা যাবে গণ্ড পরিবারের সঙ্গে মালাবি বা চাথার সিং-এর যোগাযোগ আছে।

না, নেই।

হতাশ মন নিয়ে ডিনার খেতে নামল রানা। আলি শাহ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে ওকে, কিন্তু হাতে প্রমাণ ও সূত্র না থাকলে কিভাবে তা সম্ভব?

পাঁচ পাতার মেনু, স্মোকড স্কচ স্যামন থেকে শুরু করে স্যারলয়ন রোস্ট, সবই আছে। কিন্তু এ-দুটো অর্ডার দিতে মাথা নাড়ল ওয়েটার। সে তার নিজস্ব ইংরেজিতে বলল, 'সরি, নো গট।'

ব্যাপারটা দ্রুত একটা খেলা হয়ে উঠল। মেনুর যে আইটেমের ওপরই আঙুল রাখে রানা, দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ে ওয়েটার। 'নো গট।'

তারপর রানা লক্ষ করল, ডাইনিং রুমে সবাই ঝোলসমেত চিকেন রোস্ট আর ভাত খাচ্ছে।

'ইয়েস, গট চিকেন রোস্ট অ্যাণ্ড রাইস।' অনুমোদনের ভঙ্গিতে ঘন ঘন মাথা কাত করল ওয়েটার। 'হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ফর ডেজার্ট, স্যার?'

ইতিমধ্যে কৌশলটা শিখে ফেলেছে রানা। আশপাশের টেবিলগুলো দেখে নিল ও। 'হাউ অ্যাবাউট ব্যানানা ক্যাস্টারড?'

মাথা নাড়ল ওয়েটার। 'নো গট।' তবে তার চেহারা দেখে রানার মনে হলো, লোকটা উৎসাহবোধ করছে।

টেবিল ছেড়ে দাঁড়াল রানা, পাশের টেবিলে এসে নাইজেরিয়ান ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যার, কি খাচ্ছেন আপনি?'

নিজের টেবিলে ফিরে এল রানা। 'ব্যানানা ডিলাইট দিতে পারো আমাকে,' বলল ও, খুশিতে মাথা ঝাঁকাল ওয়েটার।

'ইয়েস, টুনাইট গট ব্যানানা ডিলাইট।'

বিব্রত ওয়েটারের চাতুরি ও ভান রানার হাসিখুশি মেজাজটা ফিরিয়ে আনল। 'এডব্লিউএ,' তাকে বলল ও। 'আফ্রিকা উইনস এগেইন।' বহুল প্রচলিত প্রশংসা বাক্যটি শুনে ওয়েটারের মুখে হাসি আর ধরে না।

পরদিন সকালে পুব অর্থাৎ চিপাটা ও মালাবি সীমান্তের দিকে রওনা হলো রানা। হোটেলটা থেকে লোভনীয় ব্রেকফাস্ট আশা করার কোন মানে হয় না, আর তাছাড়া কিচেন খোলার অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে ও। সূর্য উঠল প্রায় একশো মাইল পেরিয়ে আসার পর। সারাটা দিনই চলার মধ্যে থাকল ও, রাস্তার পাশে থামল শুধু খাবার জন্যে।

পরদিন সকালে সীমান্তে পৌঁছুল রানা, মালাবিতে ঢুকল দারুণ উৎসাহ নিয়ে। সদ্য ত্যাগ করে আসা দেশটার চেয়ে মালাবি যে শুধু দেখতে সুন্দর তা নয়, তুলনায় এখানকার মানুষ অনেক বেশি তৃপ্ত ও প্রাণচঞ্চল।

মালাবিকে তার বিশাল সব পাহাড়, উঁচু মালভূমি, পান্না সবুজ লেক আর স্রোতস্বিনী নদীর জন্যে আফ্রিকার সুইটজারল্যাণ্ড বলা হয়। মহাদেশের পুরোটা দক্ষিণ জুড়ে মালাবিয়ানদের প্রশংসা করা হয় খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে। বাড়ির চাকরবাকর থেকে শুরু করে মাইনার বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার হিসেবে ওদের বিপুল চাহিদা। উত্তোলনযোগ্য খনিজ ভাণ্ডারের অভাব মালাবি পুষিয়ে নিচ্ছে তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ জনবল রফতানি করে।

অশীতিপর স্বৈরাচারী বৃদ্ধ নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন, ফলে একটা দিকে লাভ হয়েছে মালাবির–রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই বললেই চলে। যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব, কাজেই মন দিয়ে ও দয়া-ধর্ম বজায় রেখে দেশ চালাচ্ছেন তিনি। তাঁর আমলে যুব-সম্প্রদায়কে সুযোগ দেয়া হয়েছে প্রতিভা বিকাশের। গ্রাম্য এলাকাকে অবহেলা করা হয় না, গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আসার প্রবণতাও রোধ করা গেছে। রাস্তার ধারে লোকজন সুবেশী, স্বাস্থ্যবান ও হাসিখুশি। নেতার নির্দেশ, প্রতিটি পরিবারকে নিজেদের জন্যে বাড়ি বানাতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে খাদ্য উৎপাদনে। ফসল হিসেবে তুলো আর বাদাম ফলায় ওরা। বড়সড় পাহাড়ী এস্টেটগুলোয় অতি উন্নতমানের চা পাতার চাষ করে।

রাজধানী লিলঙ্গুয়ের দিকে যতই এগোল রানা ততই মুগ্ধ হলো ও। প্রতিটি গ্রাম পরিচ্ছন্ন, সাজানো ছবির মত, প্রাচুর্যের না হলেও সচ্ছলতার চিহ্ন আনাচে-কানাচে। সুন্দরী মেয়ে ও মহিলারা বেশিরভাগই হাঁটু ঢাকা স্কার্ট পরে আছে, বহুরঙে রাঙানো এবং প্রেসিডেন্টের ছবি ছাপা। আইন জারি করে ছোট স্কার্ট পরা নিষিদ্ধ করেছেন হেস্টিংস বান্দা। পুরুষদের লম্বা চুল রাখার বিরুদ্ধেও আইন আছে।

রাস্তার ধারে খাবারদাবার আর কাঠের মূর্তি বিক্রি হচ্ছে। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে, আফ্রিকার কোন রাষ্ট্রে বাড়তি খাবার আছে। ডিম, কমলা, জবাই করা হাঁস, রসালো টমেটো আর বাদাম কেনার জন্যে টয়োটা থামাল রানা, হকারদের সঙ্গে

হাস্যরস বিনিময়ের একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

এক সঙ্গে এত সুখী মুখ দেখে রানার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। সুখী জীবন গড়ার একটা সুযোগ দাও, আফ্রিকার মত সদয়, সরল, হাসিখুশি ও প্রাণচঞ্চল মানুষ দুনিয়ার খুব কম জায়গাতেই পাবে তুমি। না, আরও এক জায়গায় এরকম মানুষ পাওয়া যাবে—বাংলাদেশে। যদিও ঠিক প্রাণচঞ্চল বা কর্মচঞ্চল হয়তো নয়। কেন নয় তা হয়তো বলতে পারবেন সমাজবিজ্ঞানীরা। কে জানে, হয়তো জলবায়ু দায়ী—মানুষকে অলস করে রাখার উপাদান আছে। তবে দুঃখজনক সত্যি হলো, সুখী জীবন গড়ার সুযোগ কোনদিনই পায়নি তারা। সোনার বাংলা বলা হয় বটে, আসলে নিজেদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই বলা। সোনার সঙ্গে তুলনা করার মত চেহারা কোনদিনই ছিল না বাংলার। রানার অন্তত তাই ধারণা।

রাজধানী লিলঙ্গুয়ে কিছুকাল আগে তৈরি করা হয়েছে। কোথাও বস্তির চিহ্নমাত্র নেই। আধুনিক ও সুশৃঙ্খল শহর বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। বছর কয়েক আগে একবার এসেছিল রানা, তখন এতটা সুন্দর লাগেনি। ক্যাপিটাল হোটেলটা শহরের মাঝখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, নিজের কামরায় একা হতেই বেডসাইড টেবিলের দেরাজ থেকে লোকাল টেলিফোন গাইড বের করে পাতা ওল্টাল ও।

চাখার সিং শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক, বোঝা গেল সে তার নাম ফাটাতে পছন্দ করে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ফোন নম্বর তার। প্রতিটি ঘি ও মধুর পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে রেখেছে লোকটা। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামগুলো পড়তে শুরু করল রানা। চাখার সিং ফিশারিজ, চাখার সিং সুপারমার্কেট, চাখার সিং ট্যানারি, চাখার সিং স মিল, চাখার সিং গ্যারেজ অ্যাণ্ড টয়োটা এজেন্সি—এর যেন কোন শেষ নেই। প্রায় পুরো একটা পাতা ভরা তালিকা।

এরকম একটা চিড়িয়াকে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, মনে মনে স্বীকার করল রানা। এখন দেখতে হবে নিজের চারধারে পরিবেশটা কেমন তৈরি করে রেখেছে সে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাচ্ছে ও, লণ্ড্রি থেকে ওর কাপড়চোপড় নিয়ে এল রুম-সার্ভিস। খুশি হলো রানা, বুশ জ্যাকেটটা কড়া মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে।

নিচে নেমে এসে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করল ও, 'চাখার সিং-এর সুপারমার্কেটটা কোন দিকে?'

'পার্ক ছাড়িয়ে,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল লোকটা।

পার্কের ভেতর দিয়ে ট্রাক চালাচ্ছে রানা। আশপাশের লোকজন লক্ষ করছে ওকে। কারণ হলো লণ্ডনে সেলাই করা বুশ জ্যাকেট, সিল্ক স্কার্ফ, ধুলোয় ঢাকা ও তোবড়ানো টয়োটা—মাসুদ রানা প্রডাকশনের লোগো। রানা ভাবছে, ওকে বা ওর ল্যাণ্ডক্রুজারকে দেখামাত্র চাখার সিং চিনতে পারবে কিনা। সময়টা ছিল রাত, সম্ভবত ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি।

রাস্তাটার নামই মেইন স্ট্রীট, তারই পাশে চারতলা বিল্ডিঙে চাখার সিং-এর সুপারমার্কেট। আধুনিক ভবন, মোজাইক করা পরিচ্ছন্ন মেঝে ও দেয়াল।

শেলফগুলোয় স্তূপ হয়ে আছে জিনিস-পত্র, প্রতিটির গায়ে যুক্তিসঙ্গত দাম লেখা। গোটা সুপার মার্কেটে গিজগিজ করছে খদ্দের। আফ্রিকায় সাধারণত এ-ধরনের দৃশ্য দেখা যায় না।

গৃহবধূরা শপিং ট্রলি ঠেলে এগোচ্ছে, মিছিলে সামিল হলো রানা। বিল্ডিং আর স্টাফদের লক্ষ করছে ও। খদ্দেরদের বেরিয়ে যাবার পথে ক্যাশ রেজিস্টার, ওখানে বসে আছে চারজন এশিয়ান তরুণী। খুবই চটপটে আর দক্ষ বলে মনে হলো। কাউন্টারের দেরাজ খুললে বা বন্ধ করলে মিষ্টি জলতরঙ্গের শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে আরও মিষ্টি চারবোনের কলকণ্ঠ। ওদের চেহারাই রানাকে আন্দাজ করতে সাহায্য করল, পরস্পরের বোন ওরা। পরস্পরের বোন এবং চাখার সিং-এর মেয়ে। সম্ভবত। সবাই তারা রঙচঙে শাড়ি পরে, কেউ কারও চেয়ে কম সুন্দর নয়।

বিশাল মেঝের মাঝখানে আরেক এশিয়ান মহিলা, মধ্যবয়স্কা, লম্বা এক মঞ্চে বসে আছে, ওখান থেকে দোকানটার প্রতিটি কোণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তার চুলের রঙ খয়েরি, বিনুনি করা। পরনের শাড়িটা হালকা রঙের, সোনালি পাড়। আট আঙুলে আটটা আঙটি, প্রতিটিতে হীরে বসানো।

চাখার সিং-এর স্ত্রী, সিদ্ধান্ত নিল রানা। নগদ টাকা নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পরিবারের বাইরের কাউকে সহজে সুযোগ দিতে চায় না, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসা করতে গিয়ে বোধহয় সেজন্যেই তারা সফল হয়। যথেষ্ট সময় নিয়ে এটা-সেটা কিনল রানা, আশা করল শিকারকে এক পলকের জন্যে হলেও দেখতে পাবে, কিন্তু পাগড়ি পরা চাখার সিং-এর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও।

অবশেষে মঞ্চ ছেড়ে উঠল চাখার সিং-এর স্ত্রী। ওঠার পর বোঝা গেল, তাকে হস্তিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেহটা প্রকাণ্ড হলেও, মহিলার হাঁটার মধ্যে ধীর আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য আছে, স্বীকার করতে হবে। দোকানের অপর প্রান্তে হেঁটে গেল সে, তারপর ফুড হল-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। সিঁড়িটা এক কোণে, আগে রানার চোখেই পড়েনি।

ধাপগুলো টপকে একটা দরজার ভেতর ঢুকল মহিলা। উঁচু দরজাটার পাশে এবার একটা আয়না লাগানো জানালা লক্ষ করল রানা। বোঝাই যায়, ওয়ান-ওয়ে গ্লাস। দরজার পিছনের কামরা থেকে সুপারমার্কেটের সবটুকু পরিষ্কার দেখা যাবে। কামরাটা যে চাখার সিং-এর অফিস, এ-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই।

আয়না লাগানো জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। এমন হতে পারে, হয়তো গত আধঘণ্টা ধরেই নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। এখন সাবধান হওয়া না হওয়া সমান, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্যাশ রেজিস্টার-এর দিকে এগোল রানা, দাঁড়াল একটা মেয়ের সামনে। কত দিতে হবে ওকে হিসেব করছে মেয়েটা, পিছনের দেয়ালে আয়না লাগানো জানালার দিকে ভুলেও রানা তাকাচ্ছে না।

জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাখার সিং, কামরায় ঢুকল তার স্ত্রী। একবার

তাকিয়েই বুঝতে পারল মহিলা, তার স্বামী উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সরু হয়ে উঠেছে চোখ দুটো, মুঠোয় নিয়ে টানাটানি করছে দাড়ি।

'বুশ জ্যাকেট পরা ওই লোকটাকে,' জানালার নিচে মোজাইক করা মেঝের দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল চাখার সিং, 'লক্ষ করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' স্বামীর পাশে চলে এল মহিলা। 'ঢোকার সময়ই লক্ষ করেছি। জানালাটায় বসেই মনে হলো। চলন আর ব্যবহার দেখে সন্দেহ হয় পুলিস বা মিলিটারি, তাই না?'

'কেন, তোমার এরকম সন্দেহ হলো কেন?'

'কেন আবার!' হাত দুটো উঁচু করে নাচাল মহিলা। দেহটা স্থূল হলেও, হাত দুটো ভারি সুন্দর তার, আঙুল নাচানোর ভঙ্গিটা আরও সুন্দর ও অভিজাত। তরুণী যে মেয়েটাকে ত্রিশ বছর আগে বিয়ে করেছিল চাখার সিং, এ হাত দুটো তারই। তালু আর আঙুলে মেহেদির লাল রঙ। 'দাঁড়ানোর ঋজু ভঙ্গি দেখে। হাঁটার ধরনটা...গর্বিত। ঠিক যেন একজন সৈনিক।'

'ওকে বোধহয় চিনি আমি,' বলল চাখার সিং। 'অল্প ক'দিন আগে দেখেছি, কিন্তু রাতে দেখায় ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না।' ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার তুলে দুটো সংখ্যা ডায়াল করল সে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, তার মেজো মেয়ে রিসিভার তুলল।

'সোনা,' হিন্দীতে কথা বলছে চাখার সিং। 'তোমার সামনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উনি কি দাম মেটাচ্ছেন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে?'

'হ্যাঁ, বাবা।' সবগুলো মেয়ের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, তাকে প্রায় পুত্রসন্তান হিসেবে মূল্য দেয় চাখার সিং।

'ওর নামটা জেনে নাও, জিজ্ঞেস করো শহরে কোথায় উঠেছেন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল চাখার সিং, দেখল একগাদা জিনিস-পত্র নিয়ে সুপারমার্কেট থেকে বেরিয়ে গেল রানা। ও চলে যেতেই আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে।

'ভদ্রলোকের নাম মাসুদ রানা,' মেয়ে তাকে জানাল। 'বললেন ক্যাপিটাল হোটেলে উঠেছেন।'

'গুড। চেরিসকে ডাকো, জলদি।'

চেয়ারের ওপর দ্রুত ঘুরে বসল মেয়ে, প্রধান গেটে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডদের একজনকে ডাকল। ফোনের রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকাল চেরিস।

'চেরিস, এইমাত্র যে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, ওকে তুমি চিনতে পেরেছ? লম্বা, ব্যাকব্রাশ করা চুল?' অ্যাঙ্গোনি ভাষায় জিজ্ঞেস করল চাখার সিং।

'দেখেছি, বস,' একই ভাষায় জবাব দিল চেরিস। 'কিন্তু কে, চিনলাম না তো।'

'চার রাত আগে,' মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল চাখার সিং। 'চিরুগুর কাছাকাছি রাস্তার ওপর আমরা ট্রাক লোড করার পরপরই। গাড়ি থামিয়ে কথা বললেন আমাদের সঙ্গে। মনে পড়ে?'

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবছে চেরিস, চাখার সিং দেখল নাকে আঙুল ঢুকিয়ে ময়লা পরিষ্কার করছে সে—অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করার লক্ষণ। 'হয়তো,' অবশেষে বলল চেরিস। 'ঠিক মনে পড়ছে না।' নাকের ফুটো থেকে বের করে আঙুলটা চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। অ্যাঙ্গোনি সম্প্রদায়ের লোক সে, তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজবংশ ডোগরাদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা আছে। রাজা চাকা-র আমলে, প্রায় দুশো বছর আগে, এতটা উত্তরে চলে আসে ওরা। সে একজন যোদ্ধা, মাথা ঘামানো বা বুদ্ধির চর্চা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

'পিছু নাও,' নির্দেশ দিল চাখার সিং। 'সাবধান, তোমাকে যেন দেখতে না পায়। কি বললাম?'

'পিছু নেব, বস্।' হুকুম পেয়ে স্বস্তিবোধ করল চেরিস, লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল সুপারমার্কেট থেকে।

আধঘণ্টা পর ফিরল চেরিস, ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবর। তাকে প্রধান গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেই মেজ মেয়েকে ফোন করল চাখার সিং। 'চেরিসকে এখুনি আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও।'

সিঁড়ির মাথায়, দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল যেন একটা দৈত্য।

চাখার সিং কর্কশ গলায় প্রশ্ন করল, 'পিছু নিয়েছিলে?'

'বস্, এ সে-ই লোকই।' হাত দুটোকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে চেরিসের, কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না—একবার শরীরের পাশে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণে তুলে আনছে বুকের ওপর। শরীরটা প্রকাণ্ড হলে কি হবে, চাখার সিংকে সাংঘাতিক ভয় করে সে। বসকে অসন্তুষ্ট করার ফলে কার কপালে কি ঘটেছে সবই তার জানা। বসের জারি করা নিয়ম ও শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব সাধারণত তাকেই পালন করতে হয়। কথা বলার সময় বসের চোখে তাকাল না সে। 'সেদিন রাতে এই লোকই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, বস্,' বলল সে।

ভুরু কুঁচকে চাখার সিং জানতে চাইল, 'খানিক আগে চিনতে পারোনি, এখন বলছ পেরেছ—কারণ?'

'ট্রাকটা দেখে,' ব্যাখ্যা করল চেরিস। 'এখান থেকে কেনা জিনিসপত্রগুলো ট্রাকে তুলল সে। সেই ট্রাকটাই, গায়ে মানুষের হাত আঁকা।'

'গুড।' অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল চাখার সিং। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ। ভদ্রলোক এখন কোথায়?'

'ট্রাক নিয়ে চলে গেল, বস্।' মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে মাথা নাড়ল চেরিস। 'আমি তার পিছু নিতে পারিনি। আমার দোষ হয়েছে, বস্।'

'নেভার মাইণ্ড। যথেষ্ট করেছ তুমি।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করল চাখার সিং। 'আজ রাতে ওয়্যারহাউসে কার ডিউটি?'

'আমার, বস্...,' হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেরিসের চেহারা। তার দাঁতগুলো কোদাল আকৃতির, প্রতিটি একই মাপের, ধবধবে সাদা। 'আমার আর চণ্ডীর, বস্।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' দাঁড়াল চাখার সিং। 'দোকান বন্ধ হবার পর আজ সন্ধ্যায় ওয়্যারহাউসে আসছি আমি। নিশ্চিত হতে চাই চণ্ডী তার কাজ করার জন্যে তৈরি

থাকবে। আমি দেখতে চাই সমস্ত আয়োজন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ছোট খাঁচায় ভরে রাখো চণ্ডীকে। কোন ভুল বা গাফলতি আমি মানব না। কি বললাম, চেরিস?'

চাখার সিং-এর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল চেরিস, বলল, 'সব পরিষ্কার, বস্।'

'ছ'টার সময়, ওয়্যারহাউসে,' আবার একবার মনে করিয়ে দিল চাখার সিং, চেরিসের বেলায় তার দরকার আছে।

'জ্বী, বস্।' মাথা নিচু করে দোরগোড়া থেকে সরে গেল চেরিস, সরাসরি বসের দিকে একবারও তাকায়নি সে।

চেরিস চলে যাবার পর দীর্ঘ কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল চাখার সিং, বন্ধ দরজার ওপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। তারপর ফোনের রিসিভার তুলল।

আন্তর্জাতিক একচেঞ্জে সরাসরি ডায়াল করে লাইন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আফ্রিকায়। জিম্বাবুইকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রই বলা যায়, শুধু মোজাম্বিকের সরু টেইট করিডর আলাদা করে রেখেছে। তাসত্ত্বেও বিশ মিনিট ধরে পাঁচ-সাতবার চেষ্টা করার পর অপরপ্রান্তে রিঙ হবার শব্দ শুনতে পেল সে, তারপর হারারের নম্বর পেল।

'গুড আফটারনুন। এটা রিপাবলিক অভ তাইওয়ান-এর দূতাবাস।'

'আমি কি মহামান্য অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'দুঃখিত। হিজ এক্সেলেন্সীকে এই মুহূর্তে পাওয়া যাবে না। আপনি কি আমাকে কোন মেসেজ দেবেন, কিংবা অন্য কোন স্টাফের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'আমি চাখার সিং কথা বলছি। আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'প্লীজ, অপেক্ষা করুন, স্যার।'

এক মিনিট পর অ্যামব্যাসাডর চণ্ডমণ্ড গণ্ড লাইনে এলেন। 'এই নম্বরে আপনি ফোন করবেন না। এ-ব্যাপারে আগেই আমাদের কথা হয়েছে।'

চাখার সিং দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারটা জরুরী। সাংঘাতিক!'

'এ-লাইনে কথা বলা সম্ভব নয়। এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে আমি রিঙ করব। আপনার নম্বর দিন, তারপর অপেক্ষা করুন।'

চাখার সিং-এর ডেস্কে প্রাইভেট ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল চল্লিশ মিনিট পর। এই ফোনের নম্বর তালিকায় নেই।

'এটা নিরাপদ লাইন,' চাখার সিংকে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তবু সাবধানে কথা বলবেন।'

'মাসুদ রানা নামে কাউকে চেনেন আপনি?' সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এল চাখার সিং।

'মাসুদ রানা? হ্যাঁ, চিনি।'

'এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই চিউইউইয়ে দেখা হয়েছিল আপনার, তাই না? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইনিই তো অভিযোগ করেছিলেন যে আপনার কাপড়ে বিশেষ একটা দাগ দেখা যাচ্ছে, কি?'

'হ্যাঁ।' ভাবাবেগ বর্জিত কণ্ঠস্বর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের। 'চিন্তা করবেন না, চিন্তা করার

কিছু নেই। তিনি কিছু জানেন না।'

'যদি না-ই জানেন, লিলঙ্গুয়েতে কেন আসবেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল চাখার সিং। 'এখনও আপনি আমাকে চিন্তা করতে বারণ করবেন?'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেণ্ড কোন শব্দ নেই। 'লিলঙ্গুয়েতে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'উনি কি চিরুণ্ডু রোডে আপনাকেও সেদিন দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' দাড়ি ধরে টানল চাখার সিং। 'থেমে আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। জানতে চাইলেন, পার্কের ট্রাকগুলোকে আমি দেখেছি কিনা।'

'কখন? আইভরিগুলো আমরা আপনার কাছে ট্রান্সফার করার পর...?'

'সাবধান!' চাখার সিং-এর চাপা গলায় প্রায় ধমকের সুর। 'হ্যাঁ, আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে যাবার পরের ঘটনা, নেভার মাইণ্ড। আমার লোকজনদের নিয়ে তারপুলিনটা ভাল করে বাঁধছিলাম, এই সময় ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখি এই ভদ্রলোককে...।'

বাধা দিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ড জানতে চাইলেন, 'কতক্ষণ কথা বলেন আপনারা?'

'এক কি দু'মিনিট। তারপর তিনি দক্ষিণে, হারারের দিকে চলে গেলেন। আমার ধারণা, আপনাকে অনুসরণ করছিলেন ভদ্রলোক—প্রায় নিশ্চিত আমি।'

'জামবুকে ধরে ফেলেন উনি, রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন,' গলা খাদে নামিয়ে যেন বিড়বিড় করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, উদ্বেগে বেসুরো লাগল চাখার সিং-এর কানে। 'পার্ক ডিপার্টমেন্টের ট্রাক সার্চ করেন। না, কিছুই তিনি পাননি।'

'বোঝাই যাচ্ছে, তিনি সন্দেহ করেছেন।'

'যাচ্ছে,' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে মেনে নিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'কিন্তু যদি মাত্র দু'এক মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলে থাকেন, আপনাকে জড়াতে পারবেন না। এমন কি আপনি কে তা-ও তাঁর জানা নেই।'

'আমার ট্রাকে নাম ও ঠিকানা বড়বড় হরফে লেখা ছিল,' বলল চাখার সিং।

আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমি খেয়াল করিনি,' তারপর বললেন তিনি। 'মস্ত বোকামি করেছেন, মাই ফ্রেন্ড। উচিত ছিল লেখাগুলো মুছে ফেলা।'

'পাখি উড়াল দেয়ার পর খাঁচার দরজা বন্ধ করে লাভ কি,' যুক্তি দেখাল চাখার সিং।

'কোথায় রেখেছেন...?' থেমে গেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তারপর আবার জানতে চাইলেন, 'কোথায় রেখেছেন ওগুলো? জাহাজে তুলতে পেরেছেন?'

'এখনও পারিনি। কাল পাঠানো হবে।'

'আরও আগে পাঠানো যায় না?'

'সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে মি. মাসুদ রানাকে আপনার সামলাতে হবে, তিনি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।'

'হ্যাঁ,' চাখার সিং বলল। 'শুধু সামলাব না, তার একটা ভাল ব্যবস্থা করতে

হবে আমাকে। আপনার ওদিকটা? সব কিছু কাভার করেছেন? মার্সিডিজ?'

'করেছি।'

'ড্রাইভার দু'জন?'

'কোন চিন্তা নেই।'

'কর্তৃপক্ষ আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'করেছেন, তবে স্রেফ রুটিন,' চাখার সিংকে আশ্বস্ত করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'চমকে ওঠার মত কিছু ঘটেনি। আমাকে তারা আপনার নাম বলেনি। তবে দূতাবাসে আপনি আর কখনও আমাকে ফোন করবেন না। শুধু এই নম্বরটা নিরাপদ, আমার সিকিউরিটি অফিসাররা এটাকে ক্লিয়ার রেখেছে।' নম্বরটা উচ্চারণ করলেন তিনি, চাখার সিং লিখে নিল।

'এই ভদ্রলোক সম্পর্কে পরে আপনাকে জানাব,' বলল চাখার সিং। 'একটা বিদঘুটে উপদ্রব হয়ে দেখা দিয়েছেন।'

'আশা করি খুব বেশিক্ষণ আপনাকে জ্বালাতন করতে পারবেন না,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, পরমুহূর্তে হাত বাড়িয়ে ডেস্ক থেকে তুলে নিলেন একজোড়া মূর্তি।

হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটি বাচ্চা মেয়ে আর এক বৃদ্ধ। অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি বসে আছে বৃদ্ধের কোলে, আদর ও স্নেহ-ভালবাসার কন্যাসুলভ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাকিয়ে আছে বলিরেখায় জর্জরিত, দাড়িবিশিষ্ট, অভিজাত চেহারার বৃদ্ধের মুখের দিকে। এই অপূর্ব শিল্পকর্ম তিনশো বছর আগে তোকুগাওয়া (TOKUGAWA) সাম্রাজ্যের একজন মহান শিল্পীর সৃষ্টি। আইভরি এত চমৎকার পালিশ করা হয়েছে যে জ্বলন্ত কয়লার মত চকচক করছে। শুধু জোড়ামূর্তিটাকে উল্টো করলে জানা যাবে যে ওদের ফুলে থাকা চাদরের নিচে দু'জনেই সম্পূর্ণ নগ্ন, এবং দৈহিক মিলনের সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ করেছে বৃদ্ধ।

শিল্পীর রসবোধ বিরাট আবেদন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের শরীর ও মনে। তাঁর বিশাল সংগ্রহের মধ্যে এই জোড়ামূর্তিটাই সবচেয়ে প্রিয়। এই মুহূর্তে মূর্তি দুটোর ওপর আলতোভাবে আঙুল বুলাচ্ছেন তিনি। আইভরির মসৃণ ও পিচ্ছিল স্পর্শ সব সময় তাঁকে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

মাসুদ রানার তৎপরতার খবর তাঁর কানে আসবে বলে আশঙ্কা করছিলেন তিনি, তবু চাখার সিং-এর মেসেজ কম ধাক্কা দেয়নি তাঁকে। শিখ বন্ধুর প্রশ্নগুলো তাঁর মনে পুরানো সন্দেহগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। যে-সব সাবধানতা তিনি অবলম্বন করেছেন সেগুলোর কথা আরেকবার স্মরণ করলেন মনে মনে, এবার নিয়ে সম্ভবত একশো বার।

চিউইউই হেডকোয়ার্টার ক্যাম্প ত্যাগ করার পর তিনি লক্ষ করেননি যে তাঁর জুতো আর স্ল্যাকসের নিচে রক্ত লেগে আছে। মাসুদ রানা বলার পর লক্ষ করলেন। অপরাধের এই গুরুতর প্রমাণ, জাম্বেজি উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার বাকি কষ্টকর পথটুকু পেরোবার সময়, সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে রাখে তাঁকে। অবশেষে মেইন হাইওয়েতে পৌঁছুলেন তাঁরা, দেখলেন তাঁদের জন্যে রঁদেভোয় অপেক্ষা করছে চাখার সিং। কাপড় ও জুতোয় রক্তের দাগ দেখিয়ে

তাকে তিনি তাঁর উদ্বেগের কথাও জানালেন।

'খুনের জায়গায় আপনি যাবেন কেন!' রীতিমত বকা দিল তাঁকে চাখার সিং। 'সাংঘাতিক বোকামি করে ফেলেছেন, নেভার মাইণ্ড।'

'দেখার দরকার ছিল কাজটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা। দরকার যে ছিল, তার প্রমাণও আছে—তখনও বেঁচে ছিল ওয়ার্ডেন।'

'কাপড় আর জুতো আপনাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

অত রাতে রাস্তায় আর কোন যানবাহনের দেখা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবু কোন ঝুঁকি নেয়নি তারা। হাইওয়ে থেকে অনেকটা দূরে সরে আসার পর পার্কের ট্রাক থেকে চাখার সিং-এর আসবাব-পত্র পরিবহনের গাড়িতে তোলা হয় আইভরি। সারি সারি গাছের আড়াল ছিল, কাজেই কেউ দেখতে পায়নি। ড্রাইভার দু'জনকে চাখার সিং-এর লোকজন সাহায্য করলেও আইভরিগুলো তুলতে প্রায় দু'ঘণ্টার মত লেগে যায়।

ইতিমধ্যে চাখার সিং-এর উপস্থিতিতে ছোট একটা আগুন জ্বেলেছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আগুনটা ভাল করে ধরার পর শুধু আণ্ডারঅয়্যার ছাড়া বাকি সব কাপড় খুলে ফেললেন তিনি। লাগেজ থেকে বের করে নতুন কাপড় পরছেন, আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে তাঁর পরিত্যক্ত কাপড় ও জুতো পুড়িয়ে ফেলল চাখার সিং। জুতোর রাবার সোল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। একটা লম্বা লাঠি দিয়ে আগুনটা উসকে দিল সে, লক্ষ রাখল সব যেন মিহি ছাই হয়ে যায়।

'মার্সিডিজেও অনেক জায়গায় রক্ত পাওয়া যাবে,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বলল চাখার সিং। 'মেঝেতে, অ্যাকসিলারেটরে, ব্রেক প্যাডেলে।' গাড়ির ফ্লোর ম্যাট আর কন্ট্রোলের নিচ থেকে রাবার কাভার বের করল সে, ওগুলোও পুড়িয়ে ফেলল। কালো ধোঁয়ায় চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, তারপরও সন্তুষ্ট হলো না।

'গাড়িটা আপনার ত্যাগ করতে হবে।' কি করতে হবে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে বলে দিল সে। 'বাকি সব আমি করব।'

রঁদেভো থেকে প্রথমে বিদায় নিলেন অ্যামব্যাসাডর। চাখার সিং-এর ট্রাকে সমস্ত আইভরি তখনও তোলা হয়নি, তার আগেই হারারের পথে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, যেন প্রমাণ করতে চাইছেন হামলার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। রানা তাঁর কাপড়ে রক্ত দেখেছে অনেকক্ষণ আগে, এতক্ষণে গুরুতর শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। এ ঠিক যেন মাদাম সুসেমি ওয়াং-এর বাড়িতে যৌন-ক্রীড়া শেষ করার পরের অবস্থা। তাইপের ওই বাড়িটা প্রচণ্ড আকর্ষণ করে তাঁকে। যে-সব ভয়ঙ্কর নেশা তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে কাজ দেয়, তার একটা মেটে ওই বাড়িটায় গেলে। কিন্তু নেশা মেটার পর প্রতিক্রিয়া হয়। বমি পায় তাঁর, সমগ্র অস্তিত্বে একটা কাঁপুনি শুরু হয়। প্রতিবার নিজেকে আশ্বাস দেন তিনি, পরের বার এরকম ঘটবে না।

গলফ ক্লাবের কাছাকাছি একটা এভিনিউয়ে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের তৈরি প্রাসাদতুল্য অনেক বাড়ি আছে, তারই একটায় থাকেন অ্যামব্যাসাডর। মাঝরাতের অনেক পর পৌঁছুলেন তিনি ওখানে। পৌঁছেই চলে গেলেন নিজের

বেডরুম স্যুইটে। এক হপ্তা আগেই স্ত্রী ও সন্তানদের তাইওয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে। এখানে তিনি একা।

আবার একবার কাপড় ছাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। অকুস্থলে এই কাপড় পরে যাননি, তবু একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ফেললেন সব। শরীরে সামান্য একটু রক্ত থাকলে তা কাপড়েও লাগবে, এ-কথা ভেবে উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। এরপর তিনি শাওয়ার সারলেন। পানির নিচে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে ভিজলেন, চুলে শ্যাম্পু দিলেন দু'বার, শক্ত ব্রাশ দিয়ে হাত আর পায়ের নখ ঘষলেন বারবার।

এক সময় আশ্বস্ত হলেন, তাঁর শরীরে এক বিন্দু রক্ত বা গান পাউডার নেই। ড্রেসিং রুমে ঢুকে নতুন এক সেট কাপড় পরলেন আবার। প্লাস্টিক ব্যাগটা নিয়ে চলে এলেন বাড়ির গ্যারেজে, মার্সিডিজটা এখানেই রেখেছেন। বুটের ভেতর ক্যানভাস গ্রিপ-এর পাশে ব্যাগটা রেখে উঠে বসলেন ড্রাইভিং সীটে। চিউইউইয়ে নিয়ে গেছেন এমন প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন, এমনকি বিনকিউলার ও বার্ড-বুকটাও।

গ্যারেজ থেকে বের করে বাড়ির সামনের ড্রাইভওয়েতে মার্সিডিজ দাঁড় করালেন অ্যামব্যাসাডর। গেটটা খোলা রয়েছে, গাড়ির চাবি ইগনিশনে থাকল।

ইতিমধ্যে রাত দুটো বেজে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হলো শরীরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে, তারপরও তাঁর ঘুম এল না। অসম্ভব নার্ভাস বোধ করছেন, পরনের সিল্ক রোব-এ খসখস আওয়াজ তুলে বেডরুমের মেঝেতে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর শুনতে পেলেন স্টার্ট নিল মার্সিডিজ। বেডসাইড ল্যাম্পের সুইচ অফ করে ছুটে গেলেন জানালার দিকে, পর্দা সামান্য সরিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে। হেডলাইট জ্বালা হয়নি, ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে নির্জন রাস্তায় পড়ল মার্সিডিজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিছানায় এসে বসলেন তিনি।

ঘুমের জন্যে সাধ্য-সাধনা করছেন, তারই ফাঁকে ভাবছেন এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আয়োজনটা করতে পারল চাখার সিং। তারপর তাঁর মনে পড়ল, হারারে শাখার পারিবারিক স্বার্থ দেখাশোনা করে চাখার সিং-এর ছেলে। ছেলেটা বাপের মতই বুদ্ধিমান আর বিশ্বস্ত।

সকালে, ব্রেকফাস্ট সারার পর, পুলিসকে ফোন করে চণ্ডমণ্ড গণ্ড মার্সিডিজ চুরির ঘটনাটা রিপোর্ট করলেন। চব্বিশ ঘণ্টা পর পুলিস ওটাকে খুঁজে পেল, এয়ারপোর্টে যাবার পথে হার্টফিল্ড-এ। চাকা ও এঞ্জিন খুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে গাড়িটায়। ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে, উদ্ধার করার মত কিছুই নেই। অ্যামব্যাসাডর জানেন, বীমা কোম্পানী ক্ষতিটা পূরণ করে দেবে, প্রায় কোন আপত্তি বা দেরি না করেই।

পরদিন সকালে অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক ফোন করল তাঁকে, [illegible] নম্বর কোন তালিকায় নেই। নিজের পরিচয় বা কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে [illegible] তাকে বলল, 'আজকের হেরাল্ড দেখুন, পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায়,' বলেই যোগাযোগ কেটে দিল সে। গলার আওয়াজটা চেনা চেনা লাগল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের। লোকটা [illegible] এশিয়ান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কথা বলার ঢঙটাও চাখার সিং-এর সঙ্গে মেলে।

পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার নিচের দিকে খবরটা দেখতে পেলেন অ্যামব্যাসাডর।

হেডিংটা তাৎপর্যহীন, নিচে মাত্র ছ'লাইনের একটা রিপোর্ট। 'মাতালদের মারামারি, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু।' হেডিঙের নিচে খবরটা এরকম–'জামবু চারমা, ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের একজন রেঞ্জার, একটা শুঁড়িখানায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া ও তর্ক করার সময় ছুরি খেয়ে মারা গেছে। অকুস্থলে পুলিস পৌঁছুনোর আগেই মাতালরা পালিয়ে যায়।'

পরদিনও সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে বলল, 'সাত নম্বর পৃষ্ঠায়।' এবার নিশ্চিত হলেন তিনি, গলাটা চাখার সিং-এর ছেলের।

এবারের হেডিং–'রেল দুর্ঘটনা'। নিচের খবরটা এরকম–'হার্টলে-র কাছাকাছি একটা রেলক্রসিং-এ ট্রেনে কাটা পড়েছে এক লোক। লাশটা পরে জানু দোরাদের বলে সনাক্ত করা হয়। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের একজন রেঞ্জার সে, তবে ডিউটিতে ছিল না। পুলিস জানিয়েছে, মাতাল অবস্থায় ট্রেনে কাটা পড়ে সে। জিম্বাবুই রেলওয়ের একজন মুখপাত্র জনসাধারণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, গার্ডবিহীন ক্রসিং পেরোবার সময় সতর্ক থাকতে হবে। বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত হার্টলে লাইনে এ-ধরনের দুর্ঘটনা চারটে ঘটল।'

চাখার সিং যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ঘটনার কোন সাক্ষি বা প্রমাণ নেই।

তিন দিন পর পুলিস কমিশনার স্বয়ং টেলিফোন করলেন অ্যামব্যাসাডরকে। 'আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ইওর এক্সেলেন্সী। ধরে নিচ্ছি চিউইউই ক্যাম্পে হামলা সম্পর্কে আপনি পড়েছেন। এই দুঃখজনক ঘটনা তদন্তে আশা করি আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব, অফকোর্স।'

'আমাকে জানানো হয়েছে, সেদিন আপনি একজন ভিজিটর হিসেবে ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। হামলা শুরু হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে চলে আসেন।'

'ঠিক তাই, কমিশনার।'

'আমাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা বিবৃতি দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে? আসলে এ-ধরনের কিছু করতে আপনি বাধ্য নন। ডিপ্লোম্যাটিক সুবিধেপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে আপনার নিরাপত্তা সব দিক থেকে সুরক্ষিত থাকবে।'

'সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য করতে চাই আমি। নিহত ওয়ার্ডেনকে আমি চিনতাম, [illegible] আমার অত্যন্ত ভাল লাগত। এটা একটা নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, আমি চাই অপরা[illegible] ধরা পড়ুক।'

'[illegible] আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, ইওর এক্সেলেন্সী। আমি তাহলে আমার একজন [illegible] ইন্সপেক্টরকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই?'

ইন[illegible] সাদা কাপড়ে মোটাসোটা এক শোনা, জিম্বাবুইয়ান পুলিসের ইউনিফর্ম [illegible] স্মার্ট সার্জেন্টকে সাথে করে নিয়ে এসেছে। ক্ষমা চেয়ে নেয়ার পর চণ্ড[illegible] কাছ থেকে চিউইউই ভ্রমণের বর্ণনা আদায় করল সে। রিফ্রিজারেট[illegible]কের কনভয়ের সঙ্গে চিউইউই ত্যাগ করেন তিনি, লিখিত রিপোর্টের এই [illegible] নিচে রেখা টানল। কি বলবেন তা আগেই মুখস্থ করে রেখেছিলেন [illegible], কাজেই কোথাও আটকালেন না। রানার সঙ্গে তাঁর দেখা

হওয়ার ঘটনাটা বলার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকলেন।

তাঁর কথা শেষ হতে ইতস্তত করল ইন্সপেক্টর, তারপর জানতে চাইল, 'মি. মাসুদ রানাও একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনি যা কিছু আমাকে বললেন, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়, শুধু এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে আপনার কাপড়ে আর জুতোয় রক্ত লেগে থাকতে দেখেছেন তিনি।'

'কখনকার ঘটনা সেটা?' চেহারা বিমূঢ় করে তুললেন অ্যামব্যাসাডর।

'যখন তিনি আপনাকে এবং পার্কের ট্রাকগুলোকে থামালেন, চিউইউইয়ে তাঁর ফিরে আসার পথে–পথের ওপর হানাদারদের পায়ের ছাপ দেখার পর।'

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের চেহারা থেকে বিমূঢ় ভাব দূর হয়ে গেল। 'ও, হ্যাঁ। পার্কের এলিফ্যান্ট কালিং অপারেশনের একজন উৎসাহী দর্শক ছিলাম আমি। বুঝতেই পারছেন, অপারেশনের সময় চারদিকে প্রচুর রক্ত ছিল···নিশ্চয়ই সেই রক্তের ওপর পা ফেলেছিলাম।'

এই পর্যায়ে বিব্রত ইন্সপেক্টর ঘামতে শুরু করেছে। 'আপনার কি মনে আছে, ইওর এক্সেলেন্সী, সেদিন সন্ধ্যায় কি পরেছিলেন আপনি?'

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার ভান করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'ওপেন-নেক শার্ট, ব্লু কটন স্ল্যাকস, আর সম্ভবত একজোড়া কমফোর্টেবল রানিং শু। সাধারণত এই সবই পরি আর কি।'

'ওগুলো আপনার কাছে এখনও আছে তো?'

'হ্যাঁ, কি বলেন, কেন থাকবে না। শার্ট আর স্ল্যাকস নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ধুয়ে ইস্ত্রি করা হয়ে গেছে। জুতো জোড়াও পরিষ্কার করা হয়েছে। আমার ভ্যালে কোন কাজ ফেলে রাখে না···,' হঠাৎ থেমে হাসলেন অ্যামব্যাসাডর, যেন এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ে গেছে। 'ইন্সপেক্টর, আপনি কি ওগুলো দেখতে চান? ইচ্ছে করলে পরীক্ষা করার জন্যে ওগুলো আপনি সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারেন।'

এবার ইন্সপেক্টরের বিব্রতবোধ বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। চেয়ারে নড়েচড়ে আরও ছোট করে ফেলল সে নিজেকে। 'এ-ধরনের সহযোগিতার জন্যে আপনাকে আমরা অনুরোধ করতে পারি না, ইওর এক্সেলেন্সী। তবে, মি. রানার দেয়া স্টেটমেন্টের কথা মনে রেখে আর আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে···'

'অবশ্যই কোন আপত্তি নেই,' তাকে আশ্বস্ত করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমি তো পুলিস কমিশনারকে আগেই বলেছি, সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য করতে চাই।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'তবে, এক ঘণ্টার মধ্যে স্টেট হাউজ-এ পৌঁছুতে হবে আমাকে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লাঞ্চ খাব। ওগুলো যদি আমি আমার একজন স্টাফকে দিয়ে আপনাদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিই, আপনি কিছু মনে করবেন?'

পুলিস অফিসাররা লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনি যে সাহায্য করেছেন তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার ধারণা, পুলিস কমিশনার স্বয়ং ও লিখিতভাবে জানাবেন আপনাকে।'

ডেস্কের পিছন থেকে না উঠেই দরজার কাছে ইন্সপেক্টরকে দাঁড় করালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'হেরাল্ডে দেখলাম, হামলাকারীদের সন্ধান পাওয়া গেছে, সত্যি নাকি? আপনারা তাহলে চুরি যাওয়া আইভরি উদ্ধার করতে পেরেছেন?'

'জাম্বেজি নদী পেরিয়ে জাম্বিয়ায় পালাচ্ছিল দুষ্কৃতকারীরা, তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, সবাই তারা হয় মারা গেছে নয়ত পালিয়েছে। আইভরিগুলো হয় আগুনে পুড়েছে নয়ত নদীতে ডুবে গেছে।'

'স্যাড, ভেরি স্যাড···,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্যে ওদের কঠিন সাজা হওয়া উচিত ছিল।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'তবে, এতে করে আপনাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল, তাই না?'

'ফাইল বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা,' উত্তরে বলল ইন্সপেক্টর। 'আলগা সুতোগুলো জোড়া লাগাতে আপনি সাহায্য করার পর একটা কাজই বাকি থাকল এখন–আপনাকে লেখা কমিশনারের চিঠি। তারপরই গোটা ব্যাপারটার ইতি ঘটবে।'

নিজের ওয়ার্ড্রোব থেকে যে কাপড়গুলো পুলিস হেডকোয়ার্টারে পাঠালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড সেগুলো চিউইউই বা জাম্বেজি উপত্যকার কোথাও পরাই হয়নি। এই মুহূর্তে সে-কথা ভেবে আপন মনে ক্ষীণ একটু হাসলেন তিনি। জোড়া আইভরি মূর্তি রেখে দিলেন ডেস্কের ওপর, এখনও সেটার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন, ইন্সপেক্টরের কথা ঠিক নয়, ব্যাপারটার এখনও ইতি ঘটেনি। মাসুদ রানা যতক্ষণ আশপাশে ঘুর ঘুর করবেন ততক্ষণ সমস্যাটা থেকেই যাবে।

ভাবছেন, এবারও কি চাথার সিং-এর ওপর ভরসা রাখা ঠিক হবে? দু'জন সাধারণ পার্ক রেঞ্জারকে সরানো আর মাসুদ রানার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে সরানো এক কথা নয়। তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলে প্রশ্ন উঠবে, তোলপাড় শুরু হবে চারদিকে।

ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন তিনি, ডেস্কে রাখা মাইক্রোফোনে কথা বললেন ক্যান্টনিজ ভাষায়। 'সুজি, আমার কাছে চলে এসো, প্লীজ।'

সেক্রেটারিকে আসতে না বলেও প্রশ্ন করতে পারতেন তিনি। আসতে বললেন তাকে দেখতে তাঁর ভাল লাগে বলে। পাহাড়ী এলাকার মিষ্টি মেয়ে সুজি ফেং, ভারি বুদ্ধিমতী আর অনুগত। তাইওয়ান ইউনিভার্সিটিতে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে ও, যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যে তাকে চাকরি দেননি তিনি।

ডেস্কের পাশে দাঁড়াল সুজি ফেং, এতটা কাছে যে যদি ইচ্ছে করেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড যাতে ছুঁতে পারেন তাকে। সে জানে, আত্মসমর্পণের এই ভঙ্গিটা বিশেষভাবে পছন্দ করেন তার বস্। আধুনিক শিক্ষা পেলেও, শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য তাকে পুরুষদের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখাতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বিশেষ করে প্রভুর সমস্ত দাবি তাকে মেটাতে হবে।

'কান্টাস এয়ারলাইনে আমার রিজার্ভেশন কনফার্ম করেছ?' জানতে চাইলেন অ্যামব্যাসাডর।

রানা লিলঙ্গুয়েতে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন, কাজেই এই ফাঁকে তাইপেতে ফিরে যাওয়া উচিত তাঁর। চিউইউই অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে তাঁর হতই

না, যদি আরও কিছুদিন দূতাবাসে থাকতে চাইতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে চলে গেছে, মাসের শেষ দিকে তিনিও কেটে পড়বেন। আর মাত্র আট দিন পর।

'জ্বী, রিজার্ভেশন কনফার্ম করা হয়েছে, ইওর এক্সেলেন্সী,' গলার সুরে শ্রদ্ধা, ফিসফিস করে বলল সুজি ফেং। পাহাড়ের ওপর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাবার লোটাস গার্ডেন আছে, সেখানে নাইটিঙ্গেলের মিষ্টি গান শোনা যায়, সুজি ফেঙের গলা তার কাছে ঠিক সেরকম মিষ্টি লাগে। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি।

'জিনিস-পত্র গোছানোর জন্যে লোকগুলো কখন আসবে?' জানতে চাইলেন তিনি, হাত দিলেন সুজি ফেঙের গায়ে। তাঁর ছোঁয়া পেয়ে সামান্য কেঁপে উঠল মেয়েটা, তাতে করে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'সোমবার সকালে, মি. লর্ড।' সুজির কালো চুল আলো লেগে চকচক করছে কাঁধের ওপর।

সুজির চিওং-সাম ড্রেসের ফাঁকে হাত গলিয়ে ত্বকের স্পর্শ নিলেন অ্যামব্যাসাডর, আইভরির মূর্তির মত মসৃণ। 'তুমি ওদেরকে সাবধান করে দিয়েছ তো, বলেছ আমার আর্ট কালেকশন অত্যন্ত ভঙ্গুর আর মূল্যবান?' প্রশ্নটা শেষ করেই সুজির উরুতে প্রচণ্ড জোরে চিমটি দিলেন তিনি।

ব্যথায় কেঁপে উঠল সুজি, নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। 'ইয়েস, মি. লর্ড,' ফিসফিস করল সে, এটা তার বসের শিখিয়ে দেয়া সম্বোধন।

সুজির উরুতে নক্ষত্র আকৃতির একটা দাগ তৈরি হয়েছে, আজ রাতে যখন সে তার প্রভুর কাছে আসবে তখনও ওখানে থাকবে ওটা।

ব্যথা দেয়ার ক্ষমতা অনুপ্রাণিত করে তুলল চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে। রানার কথা ভুলে গেলেন তিনি, ভুলে গেলেন ওর দিক থেকে সম্ভাব্য কি বিপদ আসতে পারে। পুলিস তাঁর পিঠ থেকে নেমে গেছে, আর সুজি ফেঙকে মনে হচ্ছে লোভনীয়। আট দিন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছে না, কাজেই এই ক'টা দিন সুজিকে নিয়ে ফুর্তি করা যেতে পারে। তারপর তিনি বাড়ি ফিরবেন, আশ্রয় নেবেন বাবার ছত্রছায়ায়।

আট

ল্যাণ্ডক্রুজারের পিছনের দরজা খুলে সুপারমার্কেট থেকে কেনা জিনিসগুলো রাখল রানা, তারপর ড্রাইভিং সীটে বসে পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল, চোখ বুলাল চাখার সিং-এর অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালিকার ওপর।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শহরের হালকা শিল্পাঞ্চলে চলে এল ও, রেলওয়ে লাইন আর স্টেশনের কাছাকাছি। এখানে মনে হলো চার কি পাঁচ একর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্লট রয়েছে চাখার সিং-এর, তার মধ্যে কোন কোনটায় ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে। এরকম একটা খালি প্লটে একটা সাইনবোর্ড দেখল রানা, লেখা রয়েছে—

আরেকটা চাখার সিং প্রজেক্ট
প্রস্তাবিত কটন কার্ডিং ফ্যাক্টরির জন্যে নির্বাচিত স্থান
উন্নতি! কর্মসংস্থান! প্রগতি!
সবই মালাবির জন্যে!

খালি প্লটটার পাশেই, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, চাখার সিং-এর টয়োটা এজেন্সির ওঅর্কশপ। সামনের দিকে অন্তত একশো নতুন টয়োটা ভেহিকেল দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্দর থেকে রেলে তুলে আনা হয়েছে ওগুলো, এখনও ধুলো ঝাড়া হয়নি। বোঝাই যায়, ডেলিভারি দেয়ার আগে মেইন ওঅর্কশপ বিল্ডিঙে পাঠানো হবে। খোলা সামনের দরজা দিয়ে মেকানিকদের একটা টিমকে কাজ করতে দেখল রানা। ফোরম্যানরা বেশিরভাগ এশিয়ান বা ভারতীয়, কয়েকজন পাগড়ি পরা শিখও আছে, তবে ওভারঅল পরা মেকানিকরা সবাই স্থানীয় ও কালো। দেখে মনে হলো ব্যবসাটা ভালই চলছে।

সামনের উঠনে ঢুকে ল্যাণ্ডক্রুজার থেকে নামল রানা। নীল ডাস্ট-কোট পরা একজন ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলল। ল্যাণ্ডক্রুজার সার্ভিসিং করাবার ছুতোয় ওঅর্কশপ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল ও। কিন্তু না, এখানে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চুরি করা আইভরি লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

ফোরম্যানকে বলল রানা, কাল সকাল আটটার দিকে ল্যাণ্ডক্রুজার পাঠিয়ে দেবে ও। গল্প করার ছলে জেনে নিল স মিল আর চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানীর ওয়্যারহাউসটা পরের রাস্তায়, ভেহিকেল ওঅর্কশপের ঠিক পিছনে।

ল্যাণ্ডক্রুজার নিয়ে চলে এল রানা, আরেক দিক থেকে ঢুকল পাশের রোডে। রোডের মাথা থেকেই দেখা গেল স মিলটাকে। এক ডজন রেলওয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাইভেট রেলওয়ে সাইডিং-এ, প্রতিটিতে পাহাড়ের মত উঁচু করে তোলা হয়েছে ভারি লগ। স মেশিন দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ দূর থেকেও পরিষ্কার শোনা গেল।

গেটের পাশ দিয়ে এগোবার সময় খোলা শেডগুলোর ভেতর তাকাল রানা। স মেশিনগুলোর ঘুরন্ত ডিস্ক পারদের মত চকচক করছে, কর্কশ লগে ব্লেডগুলো কামড় দেয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে হলুদ কাঠের গুঁড়ো।

ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে সরে এল রানা। স মিলের কোনাকুনি উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্স। গোটা কমপ্লেক্স উঁচু ডায়মণ্ড-মেশ ফেন্স দিয়ে ঘেরা—কংক্রিটের শক্ত ও মোটা পোল-এর সঙ্গে প্লাস্টিক-কোটেট সবুজ তার, মাথাগুলো কাত হয়ে আছে রাস্তার দিকে, কাঁটাতার দিয়ে ছাওয়া।

পাঁচটা আধা-বিচ্ছিন্ন ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে ওয়্যারহাউসটাকে। ছাদের ঢাল আর চূড়াগুলো আকৃতি পেয়েছে ঠিক যেন করাতের দাঁত, রঙবিহীন করোগেটেড অ্যাসবেস্টস দিয়ে মোড়া। দেয়ালগুলোও করোগেটেড অ্যাসবেস্টস। পাঁচটা ইউনিটেরই আলাদা দরজা, দরজাগুলো রোলার টাইপের, সাধারণত এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গারে যেমন দেখা যায়।

গেটে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা—

চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানী
সেন্ট্রাল ডিপো অ্যাণ্ড ওয়্যারহাউস

নিজের নাম ফাটাতে লজ্জা পায় না লোকটা, ভাবল রানা। প্রবেশপথের পাশে একটা ইটের তৈরি গেট হাউস রয়েছে। গেটে অন্তত একজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড আছে বলে মনে হলো রানার। শেষ বিল্ডিংটার কাছে এসে দেখল লম্বা অ্যাসবেসটস দরজা গুটিয়ে খোলা হয়েছে। বিশাল গুহা আকৃতির ওয়্যারহাউসের ভেতরটা দেখার সুযোগ হলো ওর।

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, ওয়্যারহাউসের মাঝখানে প্রকাণ্ড প্যানটেকনিকনটাকে দেখতে পেয়ে পালস রেট বেড়ে গেছে। চার রাত আগে আসবাব-পত্র পরিবহনের এই ভ্যানটাকে চিরুণ্ড্রু রোডে শেষবার দেখেছিল ও। ওটার পিছনে এখনও জোড়া লাগানো রয়েছে তারপুলিন মোড়া দশ চাকার ট্রেইলরটা-লাল ধুলোয় ঢাকা, ঠিক ওর ল্যাণ্ডক্রুজারের মত।

ট্রেইলরের পিছনের দরজা খোলা, দশ-বারো জন কালো শ্রমিক একটা ফর্কলিফট ট্রাকের সাহায্য নিয়ে কার্গো লোড করছে—খয়েরি রঙের বস্তায় ভরা, ভুট্টা হতে পারে, হতে পারে চিনি বা চাল।

জাম্বেজি উপত্যকায় কার্গো বলতে শুকনো মাছের ব্যাগ দেখেছিল রানা, সেগুলোর একটাও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পাশের জানালার কাচ নামাল, ভাবল গন্ধ পাবে, কিন্তু নাকে শুধু ধুলো আর ডিজেলের ঝাঁঝ ঢুকল।

তারপর ওয়্যারহাউসটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়ল ল্যাণ্ডক্রুজার। একটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে আরেকবার দেখবে নাকি? উঁহু, উচিত হবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। এরই মধ্যে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ক্যাপিটাল হোটেলে ফিরে এল রানা, গেস্ট'স কার পার্কে ল্যাণ্ডক্রুজার রেখে উঠে এল নিজের কামরায়। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে ধুয়ে ফেলল ঘাম আর আফ্রিকার ধুলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াল। প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোনো, রানা। উচিত কাজ হবে তোমার সন্দেহ পুলিসকে জানানো। কাজটা তাদের, তাদেরকেই দাও।'

'কবে থেকে আমরা,' জবাব দিল প্রতিচ্ছবি, 'উচিত কাজ করছি, রানা? তাছাড়া, এটা আফ্রিকা। নড়তেই তিন-চারদিন সময় নেবে পুলিস। এমনিতেই যে-সময় পেয়েছে চাখার সিং, সমস্ত আইভরি নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। কালকের মধ্যে আইভরি সহ তাকে ধরা অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

'তুমি আমাকে বলতে চাইছ, রানা, প্রশ্নটা সময়ের?'

'ঠিক তাই, বন্ধু।'

'ব্যাপারটা এমন নয় তো, বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার নেশাটা পেয়ে বসেছে তোমাকে?'

'নেশা একটা আছে, সেটা প্রতিশোধের, বন্ধু। তুমি কি আলি শাহ আর তার ছেলেমেয়েদের কথা ভুলে গেছ?'

'না, ভুলব কেন। সে কি ভোলবার।'

'তাহলে আর কথা নয়। প্রস্তুতি নাও।'

ডিনার খেয়ে এসে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল রানা। কোন তাড়া নেই। মাঝরাতের আগে বেরুতে পারছে না ও। প্রস্তুতি শেষ করার পর বিছানায় শুয়ে থাকল, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ অনুভব করছে। খানিক পরপর হাতঘড়ি দেখল ও। রাত বারোটা বাজতে আজ যেন বেশি সময় লাগছে। অপেক্ষার সময়টা সব সময় পীড়া দেয়।

শেষ কয়েকজন খদ্দেরকে সুপারমার্কেট থেকে বেরিয়ে যাবার অনুরোধ করল গার্ডরা, তারপর কাচ লাগানো জোড়া দরজা বন্ধ করে দিল। দেয়ালঘড়িতে দশটা বেজে পাঁচ। আয়না লাগানো জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে সব দেখছে চাখার সিং। সুইপাররা এরই মধ্যে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে, দ্রুত হাতে ক্যাশ মেলাচ্ছে তার মেয়েরা।

খানিক পর ওরা ওদের মায়ের নেতৃত্বে একটা মিছিল করে অফিস রূমে ঢুকল। সারাদিন বেচা-বিক্রির সব টাকা রাখা হলো তার ডেস্কে—নোটগুলো সযত্নে বাণ্ডিল করা, খুচরো মুদ্রা ভরা হয়েছে ক্যানভাস ব্যাগে। স্ত্রীর হাত থেকে কমপিউটর প্রিন্টআউট নিয়ে চোখ বুলাল চাখার সিং, এতে সর্বমোট বিক্রির যোগফল দেয়া আছে।

'বহুত খুব, বহুত খুব!' হিন্দীতে বলল সে। 'এত ভাল বেচা-কেনা ক্রিস্টমাসে ইভ-এর পরে আর হয়নি।' লেজার না দেখেও গত ছ'মাসে কবে কত বিক্রি হয়েছে, মুখস্থ বলতে পারবে সে।

টাকা-পয়সা সামলে রাখল চাখার সিং। তারপর স্ত্রীকে বলল, 'ডিনার খেতে আজ আমার দেরি হবে। জরুরী কাজ আছে, ওয়্যারহাউসে যেতে হবে।'

'একা বসলে আপনি তো আবার খেতে পারেন না,' প্রৌঢ়া স্ত্রী বলল। 'আমি তাহলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'না, তার কোন দরকার নেই—কখন ফিরি তার কি কোন ঠিক আছে। তোমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। মেয়েরা? আমার সোনামণিরা?' একে একে চার মেয়ের দিকে তাকাল চাখার সিং। 'বলো, তোমাদের জন্যে কি করতে পারি আমি? কারও কোন আবদার আছে?'

চার বোন ঘিরে ধরল বাবাকে। মিষ্টি গলায় হৈ-চৈ করে উঠল ওরা। সবারই এক আবদার! 'পিতাজি, বেশি রাত কোরো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল চাখার সিং, বলল, 'ঠিক আছে, বেশি রাত করব না।'

আবার মিছিল করে বেরিয়ে গেল সবাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল চাখার সিং। সব ক'টা মেয়েই তার লক্ষ্মী। আহা, সবাই ওরা যদি ছেলে হত! একেকটা জামাই যোগাড় করতে না জানি কত টাকা বেরিয়ে যায়।

ক্যাডিলাকে চড়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় চলে এল সে। গাড়িটা নতুন নয়। বৈদেশিক মুদ্রার খুব টানাটানি, সাধারণ একজন নাগরিককে বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করতে দেয়া হয় না। অবশ্য চাখার সিং নিজস্ব একটা সিস্টেম তৈরি

করে নিয়েছে। আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটিক স্টাফ হিসেবে নতুন চাকরি পায় যারা মালাবিতে, ওয়াশিংটন ত্যাগ করার আগেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। মালাবি কাস্টমস রেগুলেশন তাদেরকে নতুন গাড়ি আমদানি করার অনুমতি দেয়, শর্ত থাকে চাকরির মেয়াদ শেষে স্থানীয় বাজারে সেটা বিক্রি করে যেতে হবে। গাড়িটা মালাবিতে পৌঁছুনো মাত্র যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাডিলাকের যা দাম তার দ্বিগুণ টাকা দেয় সে তাদেরকে, স্থানীয় মুদ্রায়। এই টাকায় পুরো তিন বছর মালাবিতে রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করতে পারে তারা, বেতনের সমস্ত টাকা ব্যাংকে জমা হয়। তারা চলে গেলে গাড়ির মালিক হয় চাখার সিং। প্রতিটি গাড়ি একবছর চালায় সে, তারপর তার টয়োটা এজেন্সির শো-রুমে রাখে—গায়ে দাম লেখা থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে যে-দামে কিনতে পাওয়া যায় তার তিন গুণ। সাধারণত এক হপ্তার ভেতর বিক্রি হয়ে যায় গাড়ি। চাখার সিং-এর কাছে কোন লাভই তুচ্ছ নয়, গ্রহণযোগ্য নয় কোন লোকসান। মালাবিতে ব্যবসা করতে এসে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করেছে সে, এটা কোন দুর্ঘটনা বা ভোজবাজি নয়, এর পিছনে আছে কঠোর পরিশ্রম আর নিজের স্বার্থ বোঝার ধারালো বুদ্ধি। তার সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে মেয়েদের তো নয়ই, এমনকি তার স্ত্রীরও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই।

ঠেলে ওয়্যারহাউস গেটের বুম সরিয়ে দিল চেরিস, ক্যাডিলাক নিয়ে ভেতরে ঢুকল চাখার সিং। ভেতরে ঢুকেই গাড়ি থামাল সে, জানতে চাইল, 'ইয়েস?'

দৈত্য চেরিস জবাব দিল, 'সে এসেছিল, বস্। আপনি যেমন বলেছিলেন। চারটে দশ মিনিটে এই রাস্তা দিয়ে ট্রাক চালিয়ে গেছে। সে-ই একই ট্রাক। ধীরে ধীরে চালাচ্ছিল, সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিল জাল আর বেড়ার দিকে।'

চেহারায় অস্বস্তি, ভুরু কুঁচকে আছে চাখার সিং। 'লোকটা অভদ্র হয়ে উঠছে। নেভার মাইণ্ড।' বসের দিকে তাকাচ্ছে না চেরিস, তবে হাসি পাচ্ছে তার। কারণ সে ইংরেজি প্রায় জানে না বললেই হয়, অথচ বস্ ইংরেজিতে কথা বলছেন।

'চলো আমার সঙ্গে,' নির্দেশ দিল চাখার সিং। ক্যাডিলাকের পিছনের সীটে উঠে বসল চেরিস, এতটা বোকা নয় আবার যে বসের পাশে বসার সাহস দেখাবে।

ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে ধীরগতিতে গাড়ি চালাল চাখার সিং। লম্বা সবগুলো দরজা এরইমধ্যে রাতের জন্যে বন্ধ করে তালা দেয়া হয়েছে। গোটা কমপ্লেক্সে কোন অ্যালার্ম সিস্টেম নেই, এমনকি ফ্লাডলাইটের সাহায্যে পেরিমিটার ফেন্স-এ আলো ফেলারও কোন ব্যবস্থা নেই।

দুই কি তিন বছর আগে একটা সময় গেছে প্রায় প্রতিদিনই চুরি হত। অ্যালার্ম বা ফ্লাডলাইটের আলো দুঃসাহসী চোরদের বাধা দিতে পারত না। মরিয়া হয়ে এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত ওঝার পরামর্শ চাইল সে। এই বুড়ো ওঝা বা যাদুকর বাস করে কুয়াশা ঢাকা নির্জন মূলাঞ্জ মালভূমিতে, শুধু নিজের কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে।

খ্যাতি অনুসারে ফি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হলো ওঝাকে। শিষ্যদের নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল সে। বিরাট আয়োজন ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে সে তার অধীনস্থ ও সবচেয়ে শক্তিশালী আত্মা এবং শয়তান ও পিশাচদের নিয়োগ করল ওয়্যারহাউসের পাহারায়।

অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে শহরের সমস্ত লোফার, ভবঘুরে আর অলস বেকারদের আমন্ত্রণ জানাল চাখার সিং। কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে তারা দেখল, প্রথমে ওঝা ওয়্যারহাউসের পাঁচটা দরজায় একটা করে কালো মোরগ জবাই করল, ঝরে পড়া রক্ত ধরা হলো একটা পাত্রে, তারপর সেই রক্ত ছড়িয়ে দেয়া হলো দরজার গায়ে। তারপর পেরিমিটার ফেন্স-এর প্রতিটি কর্নার পোস্ট-এ বেবুনের একটা করে খুলি রাখল ওঝা। দর্শকরা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হলো। সেদিন থেকে গোটা শহরে জানাজানি হয়ে গেল যে চাখার সিং জাদুর সাহায্যে নিজেকে সুরক্ষিত করেছে।

এরপর ছ'মাস আর কোন চুরির ঘটনা ঘটেনি। তারপর শহরের একটা দুঃসাহসী গ্যাঙ সিদ্ধান্ত নিল, জাদুর ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখবে তারা। এক ডজন টেলিভিশন আর প্রায় চল্লিশটা ট্রানজিসটর রেডিও নিয়ে অনায়াসে পালিয়ে গেল দলটা।

ওঝাকে ডেকে চাখার সিং মনে করিয়ে দিল, সে তাকে গ্যারান্টি দিয়েছিল। প্রচুর কথা কাটাকাটি হলো, অবশেষে ওঝার কাছ থেকে বিরাট দাম দিয়ে আরেক জাদু কিনতে রাজি হলো চাখার সিং। তার নাম রাখা হলো চণ্ডী।

চণ্ডী আসার পর মাত্র একবার চুরি হয়েছে ওয়্যারহাউসে। পরদিন লিলঙ্গুয়ে হাসপাতালে মারা যায় চোর। তার খুলির সবটুকু চামড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, পেট ফেড়ে বের করা হয়েছিল নাড়িভুঁড়ি। সমস্যার স্থায়ী সমাধান এনে দেয় চণ্ডী।

এক প্রান্তের একটা পথ দিয়ে ফেন্স-এর ভেতর গাড়ি নিয়ে ঢুকল চাখার সিং। বেড়াটা এখনও ভাল আছে, এমন কি কর্নার পোস্টে আটকানো বেবুনের খুলিগুলো এখনও ভয় দেখিয়ে হাসছে। তবে ইনফ্রা-রেড অ্যালার্ম অদৃশ্য হয়েছে। ওটা এক জাম্বিয়ান খদ্দেরের কাছে চড়া দামে বেঁচে দিয়েছে চাখার সিং। চণ্ডী আসার পর ওটার আর কোন দরকার ছিল না।

বেড়ার সবটুকু ঘুরে দেখার পর ওয়্যারহাউসের পিছনে ক্যাডিলাক থামাল চাখার সিং। পাশেই রয়েছে মেইন বিল্ডিঙের মত করোগেটেড শিট দিয়ে ঢাকা একটা পরিচ্ছন্ন শেড। বোঝাই যায়, এটা পরে কোন এক সময় তৈরি করা হয়েছে, ওয়্যারহাউসের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে জোড়া দিয়ে।

ক্যাডিলাক থেকে নামার সময় বোটকা একটা গন্ধ ঢুকল চাখার সিং-এর নাকে। শেড-এর একমাত্র জানালা দিয়ে আসছে গন্ধটা। জানালা অনেক উঁচুতে, লোহার মোটা বার লাগানো।

চেরিসের দিকে ফিরল চাখার সিং। 'আমার চণ্ডী নিরাপদ তো?'

'ছোট খাঁচাটায় আছে, বস্, আপনি যেমন হুকুম দিয়েছেন।'

চেরিস আশ্বস্ত করলেও, দরজার গায়ে ছোট্ট ফুটোটায় চোখ রেখে ভেতরটা দেখে নিল চাখার সিং, তারপর দরজা খুলে শেডে ঢুকল। কামরাটা প্রায় অন্ধকারই বলা যায়, সামান্য আলো আসছে একমাত্র জানালাটা দিয়ে।

বোটকা গন্ধটা এখন তীব্র। তারপর হঠাৎ আবছা অন্ধকার থেকে ভেসে এল রোমহর্ষক গর্জন, নিজের অজান্তেই ঝট করে এক পা পিছিয়ে এল চাখার সিং। 'হায়, ভগবান!' ভয়টা গোপন করার জন্যে কৌতুক করার চেষ্টা। 'আমাদের চণ্ডীর মেজাজ দেখছি আজ খুবই গরম!'

খাঁচার বার-গুলোর পিছনে পায়চারি করছে জানোয়ারটা। গাঢ় একটা আকৃতি, জ্বলন্ত চোখ জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে।

'চণ্ডী!' আদর করে ডাকল চাখার সিং। 'আমার প্রিয় চণ্ডী!' দরজার পাশে হাত তুলে আলোর সুইচ অন করল সে। ঠাণ্ডা নীল আলোয় ভরে গেল শেডের ভেতরটা।

খাঁচার ভেতর একটা মাদী চিতাবাঘ কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি নিল, চোখে খুনের নেশা নিয়ে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে, তার ওপরের ঠোঁট ভাঁজ খেয়ে সরে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে দাঁতগুলো।

বিশাল একটা চিতা, নাক থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় সাত ফুট। পাহাড়ী বনভূমি থেকে ধরে আনার পর একবারই ওজন নেয়া হয়েছিল—একশো বিশ পাউণ্ড। যুবা বয়েসে ধরা পড়ে চণ্ডী, তার আগে বুনো ছাগল আর কুকুর মেরে আহার সংগ্রহ করত। ধরা পড়ার দিন কয়েক আগে এক রাখালও তার হাতে নিহত হয়।

'চণ্ডী, তুমি কি খুব রেগে আছো?' জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। ঠোঁট আরও ওপরে তুলে খেঁকিয়ে উঠল চণ্ডী। চাখার সিংকে ভাল করে চেনে সে।

'না, যথেষ্ট রেগে নেই,' সিদ্ধান্ত নিল চাখার সিং, সুইচবোর্ডের পাশের র‍্যাক থেকে একটা ইলেকট্রিক প্রড তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো চণ্ডীর। ইলেকট্রিক প্রড-এর হুল বা কাঁটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তার। চাপা গর্জন তুলে দ্রুত আগুপিছু করতে লাগল, নির্যাতন এড়াবার জন্যে পালাতে চাইছে। ওয়্যারহাউসের মূল দেয়ালের কাছে জাল ঘেরা খাঁচাটা একটা বোতলের গলার মত সরু হয়ে গেছে, এত সরু যে কোনমতে চিতার শরীরটা শুধু ঢুকতে পারবে—একটা টানেল, শেষ হয়েছে ওয়্যারহাউসের গায়ে বসানো ইস্পাতের স্লাইডিং দরজায়।

লম্বা একটা অ্যালুমিনিয়াম পোলের সঙ্গে জোড়া লাগানো রয়েছে প্রডটা, সেটা খাঁচার এক জোড়া বার-এর মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢোকাল চাখার সিং, হাত লম্বা করে ছুঁতে চেষ্টা করল চণ্ডীকে। ডিভাইসটাকে এড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল চণ্ডী, খাঁচার বাইরে থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠল চাখার সিং। বাঘটাকে বোতলের গলায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে সে।

তারপর চাখার সিংকে লক্ষ করে লাফ দিল চণ্ডী। লোহার বার-এ ধাক্কা খেল সে, থাবা মেরে ভেঙে ফেলতে চাইছে ইস্পাত। সারাক্ষণ আক্রোশে গজরাচ্ছে। কিন্তু পোলটা অনেক বড়, চাখার সিং তার নাগালের বাইরে থাকল।

সুযোগ পেয়ে চণ্ডীর গলার পাশটায় প্রডের ডগা ঠেকাল চাখার সিং। নীল ইলেকট্রিসিটি ঝলসে উঠল, ব্যথায় কুঁকড়ে গেল চিতা, ছিটকে সরে গিয়ে খাঁচার শেষ মাথার টানেলে ঢুকে পড়ল।

তৈরি হয়েই ছিল চাখার সিং, চণ্ডীর পিছনে জাল লাগানো দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। ফাঁদে আটকা পড়ে গেল চণ্ডী। ওয়্যারহাউসের দেয়ালে বসানো স্টীল হ্যাচ-এ ঠেকে আছে তার নাক, গোড়ালির পিছনে জাল ঘেরা দরজা থাকায় পিছিয়ে আসতে পারবে না। টানেলটা এত নিচু যে ওপর দিকে উঁচু হতেও পারবে না সে, আর এত সরু যে মাথা ফেরানো সম্ভব নয়। যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে ফেলা হয়েছে তাকে।

প্রডটা চেরিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দরজার কাছাকাছি টেবিলের সামনে চলে এল চাখার সিং। ছোট একটা ইলেকট্রিক শোল্ডারিং আয়রন তুলে নিয়ে ওয়াল সকেটে প্লাগ ঢোকাল সে। প্লাস্টিক মোড়া তার ছাড়তে ছাড়তে টানেল ও চণ্ডীর কাছে এসে দাঁড়াল। বার-এর ভেতর হাত গলিয়ে চণ্ডীর নিতম্ব চাপড়াল সে। ওখানে তার চামড়া মোটা আর মসৃণ। স্পর্শটা এড়াবার কোন উপায় নেই বেচারির। মনে হলো তার গোটা শরীর ফুলে উঠেছে আক্রোশে, হিংস্র গরগর আওয়াজ করছে সারাক্ষণ, ঘাড় বাঁকা করে চাখার সিং-এর হাতটাকে ক্ষতবিক্ষত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ইস্পাতের বারগুলো ঘাড় ফেরাতে দিচ্ছে না তাকে।

শোল্ডারিং আয়রনটা উঁচু করে ডগায় থুথু ছিটাল চাখার সিং উত্তাপ পরীক্ষা করার জন্যে। ছ্যাঁৎ করে শব্দ হলো, বাষ্প হয়ে উড়ে গেল থুথু। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ঠোঁটে, বার-এর ভেতর আবার হাত গলাল সে। খপ করে চণ্ডীর লেজটা ধরে ফেলে ওপর দিকে তুলল, ফলে ওটার জননেন্দ্রিয় উন্মোচিত হয়ে পড়ল, পায়ুমুখ সহ।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে চণ্ডী। হিসহিস শব্দ করছে সে। সম্পূর্ণ মেলা থাবা দিয়ে কংক্রিটের মেঝে খামচাচ্ছে। এরপর কি ঘটবে জানে সে, লেজ নামিয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

'সাহায্য করো,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল চাখার সিং। তার পাশে দাঁড়িয়ে চণ্ডীর লেজটা ধরল চেরিস। তার মুঠোর ভেতর সাপের মত মোচড় খাচ্ছে লেজটা।

কপালে চিন্তার রেখা, স্পর্শকাতর মাংস আর গর্তটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল চাখার সিং। অনেকগুলো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত দেখা যাচ্ছে জায়গাটায়, কোন কোনটা তাজা, ক'দিন হলো শুকিয়েছে। উত্তপ্ত আয়রনটা সাবধানে আগে বাড়াল সে, সদ্য শুকানো ক্ষতগুলোকে এড়িয়ে যাবে। স্পর্শ পাবার আগেই উত্তপ্ত আয়রনের আঁচ পেল চণ্ডী, আশঙ্কায় ও আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল তার পেশী।

'সামান্য একটু, মাই বিউটি,' আশ্বাস দিল চাখার সিং। 'খানিকটা রাগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ভাগ্যগুণে আজ রাতে যদি তোমার সঙ্গে মাসুদ রানার দেখা হয়ে যায়, বড় খুশি হই।'

লালচে আয়রনটা চণ্ডীর পায়ুমুখের নরম বৃত্তের গায়ে ঠেকাল চাখার সিং। খানিকটা ধোঁয়া উঠল, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস আর লোম পোড়ার কটু গন্ধ। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল চিতা, ইস্পাতের বার কামড়াল দাঁত দিয়ে।

ক্ষতটা পরীক্ষা করল চাখার সিং। চর্চার মাধ্যমে হাত পাকিয়েছে সে, তার দেয়া ছ্যাঁকা অসহ্য ব্যথা দেবে অথচ ক্ষতটা শুকিয়ে যাবে এক হপ্তার ভেতর, এবং চণ্ডীর চেহারা বা আচরণে কোন প্রভাব পড়বে না। শোল্ডারিং আয়রন টেবিলে

রেখে দিয়ে এক বোতল ডিজইনফেকট্যান্ট তুলে নিল সে। বোতলে নির্ভেজাল আয়োডিন রয়েছে, গাঢ় হলুদ। তুলোয় আয়োডিন ঢালল সে, তুলোটা চেপে ধরল ক্ষতের ওপর।

এখনও গজরাচ্ছে চণ্ডী, ব্যথায় ঝাঁকি খাচ্ছে তার পেশী। চোখ দুটো বিস্ফারিত, খোলা ঠোঁট থেকে দরদর করে লালা ঝরছে।

'যথেষ্ট হয়েছে, হ্যাচ খুলে দাও,' চেরিসকে নির্দেশ দিল চাখার সিং।

চণ্ডীর লেজ ছেড়ে দিল চেরিস। চাবুকের মত সপাং করে শব্দ তুলে লেজটা নেমে এল, দুই পায়ের মাঝখানে সেটাকে ঢুকিয়ে নিল চণ্ডী।

স্টীল হ্যাচের হ্যাণ্ডেলটা উঁচু করল চেরিস। শেষ একবার গর্জে উঠে ফাঁকটা গলে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল চণ্ডী, অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়্যারহাউসের ভেতর।

ছ্যাঁকা খাওয়ার পর সারারাত ওয়্যারহাউসের ভেতর পায়চারি করবে চিতা, প্রচণ্ড ব্যথা ও আক্রোশে অস্থির হয়ে থাকবে। ভোর হলে শেডে ফিরে আসবে, খাঁচায় বসে গরগর করবে আর জিভ দিয়ে চাটবে ক্ষতটা। ইলেকট্রিক প্রড-এর সাহায্যে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে, ভোর হলে এখন আর দেরি করে না, নিজেই চলে আসে খাঁচার ভেতর।

চণ্ডীর পিছনে হ্যাচটা বন্ধ করে দিল চেরিস, মনিবকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল বাইরে। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল চাখার সিং।

'মেইন গেটে, তুমি তোমার গার্ড হাউসে থাকবে,' চেরিসকে বলল সে। বেড়ার পাশে টহল দিয়ো না কিংবা মাসুদ রানাকে ওয়্যারহাউসে ঢুকতে বাধা দিয়ো না। সে যদি ঢোকে, চণ্ডীই তোমাকে সাবধান করবে।'

হাসল চেরিস, কারণ তার মনিবও হাসছে। শেষবার যে লোকটা ওয়্যারহাউসে ঢুকেছিল তার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। হাসপাতালে মারা যায় লোকটা।

'যখন শুনতে পাবে লোকটার ওপর কাজ শুরু করেছে চণ্ডী, মেইন গেট থেকে ফোন করবে তুমি আমাকে। ফোনটা আমার বিছানার পাশেই থাকবে। আমি না পৌঁছুনো পর্যন্ত ওয়্যারহাউসে ঢুকবে না। এখানে পৌঁছুতে পনেরো কি বিশ মিনিট লাগবে আমার। ততক্ষণে আমার কাজ অনেক কমিয়ে দেবে চণ্ডী।'

বাড়ি ফিরে চাখার সিং দেখল, তার স্ত্রী খাবার নিয়ে বসে আছে। কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, এসব কিছুই সে জানতে চাইল না। স্বামীর কোন ব্যাপারেই নাক গলানো তার স্বভাব নয়।

ডিনার খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা ধরে ব্যবসার হিসেব পরীক্ষা করল চাখার সিং। প্রতি মাসে অমৃতসরে টাকা পাঠায় সে, ওখানে তার আত্মীয়-স্বজনরা তার নামে জমি কিনে রাখছে।

বিছানায় ওঠার আগে স্টীল সেফ খুলে ডাবল-ব্যারেল টুয়েলভ-বোর শটগানটা বের করল সে, সাথে এক প্যাকেট এসএজি কার্ট্রিজ। ওর প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আছে, সম্ভব হলে আইন মেনে চলা তার স্বভাব।

তার স্ত্রী একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল, তবে কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না।

দরজার পাশে অস্ত্রটা রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল চাখার সিং। দশ মিনিট পর ঘুম এসে গেল চোখে।

বিছানার পাশে টেলিফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল রাত সোয়া দুটোয়। প্রথমবার রিঙ হতেই ঘুম ভেঙে গেল চাখার সিং-এর, দ্বিতীয়বার বাজতে শুরু করার আগেই ক্রেডল থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভার।

'ওয়্যারহাউসের ভেতর চণ্ডী মিষ্টি একটা গান ধরেছে,' [illegible] চেরিস।

'আমি আসছি,' জবাব দিল চাখার সিং, লাফ দিয়ে নামল বিছানা থেকে। মাসুদ রানার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পেল সে।

***

নরপিশাচ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

অন্ধকার রাস্তা ধরে ধীরগতিতে এগিয়ে এল ল্যাণ্ডক্রুজার। এদিকে স্ট্রীট ল্যাম্প না থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেল, মনে মনে ভাবল রানা। খোলা একটা শিল্প প্লটে ঢুকে পড়ল টয়োটা ট্রাক, চাথার সিং-এর সেন্ট্রাল ডিপোকে ঘিরে থাকা বেড়া থেকে তিনশো গজ দূরে। শেষ এক মাইল হেডলাইট না জ্বেলে হাঁটা গতিতে এসেছে ও। এবার এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল অন্ধকারে। কান পেতে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলাল। একটা বেজে দশ।

নেভী-ব্লু স্ল্যাকস আর কালো লেদার জ্যাকেট পরে আছে রানা। পকেট থেকে বের করে মাথা ঢাকল কালো উলের নরম ক্যাপে। কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে জড়িয়ে নিল ছোট একটা নাইলন ব্যাগ, টুল-বক্স থেকে বাছাই করা কয়েকটা ইকুইপমেন্ট আছে ভেতরে।

ছুটোছুটির কাজ নিয়ে আফ্রিকার দুর্গম এলাকায় আসা, তাই গভীর কাদা আর নরম বালির ওপর সেতু হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মই নিয়ে এসেছে রানা, ল্যাণ্ডক্রুজারের ছাদে বোল্ট দিয়ে আটকে। একেকটার ওজন সাত পাউণ্ডের বেশি নয়। ঝোপঝাড় টপকে ডিপোর দিকে রওনা হবার সময় মই দুটো ওর বগলের নিচে থাকল।

বেড়াটা যখন পঞ্চাশ ফুট দূরে, মই দুটো নামিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে একটা পরিত্যক্ত গাড়ির জং ধরা খোলের পিছনে চলে এল। ওয়্যারহাউসে কোন আলো জ্বলছে না, কোন ফ্লাডলাইটও আলোকিত করে রাখেনি বেড়াটাকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল রানার।

পানির মত সহজ হয়ে যাচ্ছে না? প্রশ্নটা মনে রেখে সামনে বাড়ল ও। আলো দেখা যাচ্ছে শুধু সামনের গেটে, গার্ড-হাউসের ভেতর। বাইরে সামান্য আভা বেরিয়েছে, তবে বেড়াটাকে পরীক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট। না, বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড নয়। পায়ে বাধার মত কোন তার পেল না, তারমানে অ্যালার্ম সিস্টেমও অনুপস্থিত।

পিছনদিকে, কর্নার পোস্টে চলে এল রানা। যদি কোন ইনফ্রা-রেড অ্যালার্ম সিস্টেম থাকে, এখানেই কোথাও ওপর দিকে থাকবে চোখটা। পোস্টের ওপর সাদা কি যেন একটা চকচক করছে, ভাল করে তাকাতে বোঝা গেল আসলে ছাল ছাড়ানো বেবুনের খুলি ওটা। থমথমে হলো রানার চেহারা, মই দুটো আনার জন্যে ফেরার সময় খানিকটা অস্বস্তিবোধ করল।

বেড়ার কোণে ফিরে এসে বসল রানা, টহলরত গার্ডের দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। আধ ঘণ্টা পর নিশ্চিত হলো, বেড়াটা কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

বেড়ার তার কেটে ভেতরে ঢোকাটাই সহজ, তবে যদি সম্ভব হয় রানা কোন চিহ্ন রেখে যেতে চায় না। দুটো মইই পুরোপুরি লম্বা করল ও, লুকানো অ্যালার্ম অকস্মাৎ বেজে ওঠার ভয়ে শক্ত করল শরীর, তারপর একটা মই কংক্রিট কর্নার পোস্টে ঠেকাল। অ্যালার্ম বাজল না দেখে দম ছাড়ল রানা।

দ্বিতীয় মইটা বয়ে নিয়ে এল বেড়ার মাথায়। প্রথম মইয়ের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, চূড়ার কাঁটাতার এড়াবার জন্যে পিছন দিকে হেলান দিয়ে। দ্বিতীয় মইটা দ্রুতগতিতে চূড়ার ওপর দিয়ে ভেতর দিকে ঝুলিয়ে দিতে চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য ছিল সাবধানে উল্টো দিকে নামাবে ওটাকে, কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গেল মুঠো থেকে।

ঘাসের ওপর পড়লেও, শব্দটা রানার কানে বোমা ফাটার মত লাগল। মইয়ের মাথায় টলমল করছে ও, প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, অপেক্ষা করছে চিৎকার বা গুলির।

কিছুই ঘটল না, এক মিনিট পর আবার দম ছাড়ল রানা। পোলো-নেক জার্সির ভেতর হাত গলিয়ে ফোম রাবারের একটা রোল বের করল, খোলা আকাশের নিচে শোবার সময় এটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে। কাঁটাতারের ওপর প্যাড হিসেবে কাজে লাগবে এখন।

দস্তানা পরা হাত দিয়ে স্পাইকগুলোর মাঝখানে তার ধরল রানা, তারপর প্রায় ডিগবাজি খেয়ে বেড়ার চূড়াটা সাবলীল ভঙ্গিতে টপকে এল, নয় ফুট ওপর থেকে পড়ল উল্টোদিকের ঘাসের ওপর। নিচে পড়ে একটা গড়ান দিল ও, স্থির হলো ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে। কান পেতে অপেক্ষা করছে, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে।

কোথাও কিছু নড়ছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই।

দ্রুত দ্বিতীয় মইটা বেড়ার ভেতর দিকে খাড়া করল রানা, হঠাৎ পালাতে হলে কাজে লাগবে। রঙ না করা অ্যালুমিনিয়াম অন্ধকারেও চকচক করছে, কাছাকাছি আসার আগেই দেখে ফেলবে টহলরত গার্ড। এ-ব্যাপারে করার কিছু নেই ওর। ওয়্যারহাউসের পাশের দেয়াল ঘেঁষে এগোল রানা। অন্ধকার বলে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। কোণটায় পৌঁছে এক মিনিট থামল, কান পাতল আবার। বহু দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকছে, আরেক দিক থেকে ভেসে আসছে রেলগাড়ির আওয়াজ। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

কোণ থেকে উঁকি দিল রানা, কাউকে দেখতে না পেয়ে ওয়্যারহাউসের পিছনের লম্বা দেয়াল ঘেঁষে এগোল। এদিকটায় কোন ফাঁকফোকর নেই, আছে শুধু ছাদের কাছাকাছি প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে এক সারি স্কাইলাইট উইণ্ডো।

সামনের দিকে আবছা অন্ধকারে ছোট একটা শেড দেখতে পেল রানা। ওয়্যারহাউসের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে জোড়া লাগানো ওটা, তবে ছাদটা মেইন বিল্ডিঙের চেয়ে অনেক নিচু। কাছাকাছি চলে আসছে রানা, অস্পষ্ট এক দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। কোন ধরনের সার বা পশুর কাঁচা চামড়া থেকে আসতে পারে।

শেডটাকে ঘিরে ঘোরার সময় গন্ধটা বেড়ে গেল, তবে ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না। শেডটা পরীক্ষা করছে ও। মেইন ওয়্যারহাউস আর শেড

যেখানে মিলিত হয়েছে, কোণটায় একটা ড্রাউনপাইপ দেখা যাচ্ছে। টান দিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শেডের ছাদে উঠে এল রানা। শুয়ে রয়েছে ও, চোখ তুলে তাকিয়ে আছে প্রধান দেয়ালের গায়ে স্কাইলাইটগুলোর দিকে, এখন মাত্র ওর দশ ফুট ওপরে। দুটো প্যানেল খোলা দেখা গেল।

ব্যাগ থেকে কুণ্ডলী পাকানো নাইলনের রশি বের করল, একটা প্রান্ত ভারি করার জন্যে গিট দিল কয়েকটা। ছাদের সরু চূড়ায় দাঁড়াল, নিজের পাশে বৃত্ত রচনা করে ঘোরাতে শুরু করল রশিটা, তারপর কজিতে ঝাঁকি দিয়ে ভারি প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে। খোলা দুই প্যানেলের বাজুতে লাগল, এঁকেবেঁকে নেমে এল রানার কাঁধে। আবার চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। পঞ্চমবারের চেষ্টায় স্কাইলাইট গলে ভেতরে ঢুকল রশির গিট, সঙ্গে সঙ্গে টান দিল রানা, ভাজ খেয়ে ফেরার পথে বাজুটাকে তিনবার পেঁচিয়ে আটকে গেল। এবার গায়ের জোরে টান দিল রানা, প্যাঁচ খুলল না। রশির ওপর চাপ রেখে উঠতে শুরু করল ও। রঙ না করা কর্কশ অ্যাসবেসটস দেয়ালে ক্যানভাস বুটের রাবার সোল ব্যবহার করল, চটপটে বানরের মত উঠে যাচ্ছে।

জানালার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, অনুভব করল রশির প্রান্ত প্যাঁচ খুলে নেমে আসছে। ঝপ করে এক ফুটের মত নেমে এল, আতঙ্কে অসুস্থ বোধ করল রানা। তারপর আবার স্থির হলো রশি। আবার ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ও, সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেছে। কাঁপুনিটা থামল খোলা স্কাইলাইটের ফ্রেমে দস্তানা পরা হাত লাগতে।

মাটি থেকে ত্রিশ ফুট ওপরে ঝুলছে, দেয়ালে লাথি মারছে ও, হড়কে যাচ্ছে পা দুটো, হাতে দস্তানা থাকা সত্ত্বেও ইস্পাতের ফ্রেম কেটে দিচ্ছে আঙুলগুলো। অনেক কষ্টে ডান হাতটাও ফ্রেমে তুলতে পারল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে পড়ল স্কাইলাইটের ফ্রেমে।

দম ফিরে পাবার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল রানা, অন্ধকার বিল্ডিঙের ভেতর কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। তারপর ব্যাগ খুলে টর্চটা বের করল। হোটেল থেকে বেরুবার আগে টর্চের লেন্সে একটা লাল প্লাস্টিক শেড লাগিয়ে নিয়েছে ও। নিচের দিকে লাল আভার মত ম্লান আলো পড়ল, বিল্ডিঙের বাইরে থেকে কারও চোখে পড়বে না।

ওর নিচে ওয়্যারহাউসের মেঝেতে বিভিন্ন আকার-আকৃতির প্যাকিং কেস, পাহাড় ও পাঁচিল তৈরি করে রেখেছে। 'সেরেছে,' বিড়বিড় করল রানা। ধারণা করেনি ভেতরে এরকম বিপুল পরিমাণে জিনিস-পত্র আছে। সবগুলো পরীক্ষা করে দেখতে এক হপ্তা লেগে যাবে। তাছাড়া, ওয়্যারহাউসের এটা মাত্র একটা অংশ, এরকম আরও চারটে আছে।

দেয়ালের গায়ে আলো ফেলল রানা। সুরক্ষার জন্যে করোগেটেড অ্যাসবেসটস দিয়ে মোড়া হয়েছে দেয়াল। অ্যাসবেসটস আটকানো হয়েছে একটা ফ্রেমে, ফ্রেমটাকে দেয়ালে গেঁথে রেখেছে ওয়েল্ডিং করা অনেকগুলো লোহার বাতা। ত্রিশ ফুট নিচের মেঝেতে নামার জন্যে ফ্রেমটা মই হিসেবে কাজ দিল।

নিচে নেমে টর্চটা নেভাল রানা। কোন গার্ড যদি গুটি গুটি এগিয়ে আসে, তাকে দিকভ্রান্ত করার জন্যে দ্রুত জায়গা বদল করল অন্ধকারে। দুটো বাক্সের মাঝখানে গুঁড়ি মেরে বসে থাকল, অটুট নিস্তব্ধতার ভেতর কান খাড়া করে আছে। আবার নড়তে যাবে, হঠাৎ পাথর হয়ে গেল।

কি যেন একটা হলো। বোধহয় কোন শব্দই। ঠিক শোনেনি, যেন স্নায়ুর সাহায্যে অনুভব করল। শব্দটা থেমে গেছে, আদৌ যদি হয়ে থাকে।

দ্রুতগতি হৃৎপিণ্ডের একশোটা স্পন্দন পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু শব্দটা আর হলো না। টর্চ জ্বালল ও, অস্বস্তির ভাবটা দূর করে দিল আলো।

দু'পাশে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে ইস্পাতের ফিতে দিয়ে বাঁধা কাঠের বিশাল সব বাক্স, মাঝখান দিয়ে নরম পায়ে এগোল রানা। প্যানটেকনিকনটা কোথায় পার্ক করা আছে জানে ও, ওয়্যারহাউসের শেষ মাথায়। তল্লাশীটা ওখান থেকেই শুরু হওয়া দরকার। শুকনো মাছের ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়ে কুঁচকে উঠল নাক।

টর্চ নিভিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আবার কি যেন একটা অনুভব করেছে ও। এতটা জোরালো নয় যে শব্দ বলে চেনা যায়, তবে ওর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে—যেন অন্ধকারে কাছাকাছি কোথায় কিছু একটা আছে। দম আটকে রাখল ও, নড়াচড়ার খসখসে আওয়াজ পেল—সত্যি, নাকি কল্পনা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না। যেন নিঃশব্দে ফেলা পা ঘষা খেয়েছে মেঝেতে, কিংবা সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলেছে কেউ।

অপেক্ষা করে আছে রানা। কই না। তাহলে হয়তো ওর উত্তেজিত স্নায়ুর কারসাজি। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আবার এগোল ও। বিল্ডিঙটার ভেতর কোন দেয়াল বা পাঁচিল নেই, ছাদটাকে আটকে রেখেছে শুধু লোহার পিলারগুলো, কয়েক সারি পিলার কয়েক ভাগে ভাগ করে রেখেছে গোটা ওয়্যারহাউসটাকে। আবার থেমে নাক টানল ও। এতক্ষণে পাচ্ছে। শুঁটকি মাছের গন্ধ। আরও দ্রুত এগোল এবার, সেই সঙ্গে গন্ধটাও বাড়ল।

ওয়্যারহাউসের সর্বশেষ অংশে, পিছনের দেয়াল ঘেঁষে, চটের বস্তার উঁচু একটা স্তূপ, প্রায় ছুঁয়ে আছে ছাদ। গন্ধটা তীব্র। প্রতিটি বস্তায় ছাপা রয়েছে—শুকনো মাছ, মালাউয়ের প্রডাক্ট। সঙ্গে প্রতীকচিহ্ন—সদ্য ওঠা সূর্যের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা মোরগ গলা লম্বা করে ডাক দিচ্ছে।

ব্যাগের ভেতরটা হাতড়ে একটা বারো ইঞ্চি স্ক্রুড্রাইভার বের করল রানা। উবু হয়ে বসে চটের বস্তার ভেতর ঢোকাল ওটা, তারপর এদিক ওদিক ঘোরাল, দেখতে চায় শুঁটকি মাছের ভেতর শক্ত কোন কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। প্রতিটি বস্তায় পাঁচ কি ছয়বার স্ক্রুড্রাইভার ঢোকাল, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর যতদূর হাত যায় একটা বস্তাও বাদ দিল না। তারপর নিচের বস্তার ওপর পা রেখে পিরামিড আকৃতির স্তূপের চূড়ার দিকে উঠল।

এক সময় থামল রানা। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে। এ-ধরনের বোকামি ওর দ্বারা কিভাবে সম্ভব হলো! কেন ধরে নিল, বস্তার ভেতর লুকানো আছে আইভরি? ওর তো আসলে এভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল—চণ্ডমণ্ড গণ্ড সত্যি যদি

রিফ্রিজারেটর ট্রাক থেকে চাখার সিং-এর প্যানটেকনিকনে আইভরি সরিয়ে থাকে,
তাহলে চিক্বগু রোডে ওদের সঙ্গে ওর দেখা হবার আগে যে অল্প সময় পেয়েছে
ওরা তারমধ্যে বস্তাগুলো নতুন করে ভরা সম্ভব নয়। বস্তাগুলোয় শুধু আইভরি
ভরলেই হবে না, ওগুলো আবার সীলও করতে হবে। অত সময় ও সুযোগ তারা
পায়নি। খুব বেশি হলে প্যানটেকনিকনের মেঝেতে আইভরি রেখে তার ওপর
ওটাকে মাছের বস্তা চাপা দিতে পারে রানা।

আরও ব্যাপার আছে। বোকামির কোন শেষ নেই, নিজেকে মনে মনে
তিরস্কার করল রানা। বড় আকারের আইভরিগুলো চটের বস্তায় আঁটবে না।
ছোটগুলো আঁটলেও বস্তার আকৃতি হবে বেঢপ। বেঢপ আকৃতির বস্তা পাগল ছাড়া
আর কেউ পাচার করার চেষ্টা করবে না আফ্রিকা থেকে, গন্তব্য যেখানেই হোক।

'গাধা,' বিড়বিড় করল রানা। চারদিকে লালচে আভা ফেলল, পরমুহূর্তে কি
যেন দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। আলোর শেষ সীমায় ছায়ার মধ্যে কিছু একটা,
গাঢ় আর বিরাট, নড়ে উঠল। চকচকে এক জোড়া…কি হতে পারে ওগুলো? কোন
পশুর চোখ? কিন্তু টর্চটা স্থির করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে উপলব্ধি করল, কোথাও
কিছু নেই, স্রেফ কল্পনা করছিল।

বস্তার পিরামিড থেকে মেঝেতে নেমে এল ও, সারি সারি বাক্সের মাঝখান
দিয়ে এগোল। পাশ কাটাবার সময় প্যাকিং লেবেল পরীক্ষা করছে–সাবানের
গুঁড়ো, গুঁড়ো দুধ, কালার টেলিভিশন, রিফ্রিজারেটর। প্রতিটি কেসে 'চাখার সিং
ট্রেডিং কোম্পানী'-র নাম লেখা রয়েছে। এগুলো সবই আমদানি করা কার্গো।
রানা খুঁজছে রফতানি বা পাচারের জন্যে প্রস্তুত কার্গো।

ওর সামনে, প্রধান দরজার কাছাকাছি, লোডিং র‍্যাম্প-এর ওপর একটা ফর্ক-
লিফট ট্রাকের আকৃতি দেখতে পেল। আরও সামনে এসে দেখল, ট্রাকের ফর্ক
বাহুতে বড় আকারের একটা কেস রয়েছে। ওটার পিছনে একই ধরনের কেস-এর
উঁচু স্তূপ দেখা গেল, র‍্যাম্পটাকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে। র‍্যাম্পের নিচে
দাঁড়িয়ে থাকা রেলওয়ে ট্রাকে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে ওগুলো।

বোঝা গেল, এগুলো পাচার বা রফতানির জন্যে পাঠানো হবে। দ্রুত এগিয়ে
এল রানা। কাছে এসে পরীক্ষা করল কেসগুলো। এগুলো আসলে টি-চেস্ট,
নিরেট ফ্রেমের চারধারে প্লাইউড ব্যবহার করা হয়েছে, ফ্লেক্সিবল স্টীল স্ট্র্যাপ
দিয়ে বাঁধা।

একটা চেস্ট-এর গায়ে স্টেনসিল করা লেখাগুলো পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে
দাঁড়িয়ে গেল হাতের রোম।

রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট
১৬৬৬ চুংচিং রোড
তাইপে
তাইওয়ান

'সান অভ আ গান!' আপনমনে হাসছে রানা। চাইনিজ কানেকশন পাওয়া
গেছে! ওর সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়, চাখার সিং-এর সঙ্গে অ্যামব্যাসাডর চঙমঙ
গঙের সম্পর্ক আছে! রেড ড্রাগন…ব্লাডি ড্রাগন!

ফর্ক-লিফট ট্রাকের কাছে উঠে এল রানা, মাস্টার সুইচ অন করে কন্ট্রোল
অপারেট করল। যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলল ইলেকট্রিক মোটর, নিঃশব্দে ওপরে উঠতে
শুরু করল চেস্টটা। মাথার কাছাকাছি আসতে থামাল রানা ওটাকে। ঝুলন্ত
কেসটার নিচে চলে এল। কেসটার ঢাকনি বা পাশে কোন চিহ্ন রেখে যাবে না ও,
যা দেখে বোঝা যাবে এখানে এসেছিল কেউ।

ট্রাকের ফর্ক বাহু দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে টি-চেস্টের তলায় স্ক্রুড্রাইভার
দিয়ে সজোরে খোঁচা দিল রানা। প্লাইউড ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকল সেটা, ফুটোটা ধীরে
ধীরে বড় করল ও, ভেতরে যাতে হাত ঢোকে। কেসের ভেতর হেভী ডিউটি হলুদ
প্লাস্টিক শিট রয়েছে, হাত দিয়ে ছেঁড়া সম্ভব নয়। ব্যাগ থেকে ছুরি বের করতে
হলো।

শুকনো চা পাতার গন্ধ পেল রানা। ফুটো দিয়ে কংক্রিটের মেঝেতে ঝর ঝর
করে ঝরে পড়ল গুঁড়ো চা। স্ক্রুড্রাইভারের সবটুকু কেসের ভেতর ঢুকে গেছে, কিন্তু
শক্ত বা কঠিন কিছুতে ঠেকছে না। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে রানার। র‍্যাম্পে কয়েক
টি-চেস্ট রয়েছে, যে-কোন একটায় আইভরি থাকতে পারে, কিংবা হয়তো
তেই নেই।
র্তটা আরও বড় করল রানা, তারপর হাত সহ স্ক্রুড্রাইভার যতটা সম্ভব
ঢুকিয়ে দিল।
ক্ত কিছুতে এত জোরে ধাক্কা লাগল যে ঝাঁকি খেল কব্জি। উল্লাসে প্রায়
করে উঠল রানা। গর্তের কিনারা ছিঁড়ে ফেলল, যাতে দুটো হাতই
তে পারে ভেতরে। হাত দিয়ে খুঁড়ে নামিয়ে আনল গুঁড়ো চা, পায়ের কাছে
য়ে গেল।
বিশেষে চায়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্ত জিনিসটার স্পর্শ পেল রানা।
মার গোল জিনিসটা। চেস্টের নিচে ঘাড় বাঁকা করে গর্তের ভেতর তাকাল
র্চের আলোয় সাদা ক্রীমের মত কি যেন দেখতে পাচ্ছে। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে
য়েক খোঁচা দিতে জিনিসটার ছাল উঠে গেল, আকারে ওর একটা আঙুলের
র্ত থেকে পড়ার সময় হাতের তালুতে আটকাল ছালটাকে।
র কোন সন্দেহ নেই। হাতের তালুতে রেখে টুকরোটা পরীক্ষা করল রানা।
আইভরি পাওয়া গেছে।

ড়া প্লাস্টিক দ্রুত হাতে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিল রানা, চা পড়া বন্ধ
হলো মেঝেতে পড়া গুঁড়ো হাত দিয়ে তুলে ঢুকিয়ে দিল বাক্সের ভেতর। প্রচুর
সময় গেল কাজটা শেষ করতে। গর্তটা পুরোপুরি জোড়া লাগানো সম্ভব হলো না,
তবে আশা করা যায় সকালে কাজে এসে যথেষ্ট অসাবধান লোডাররা কোন
অসঙ্গতি লক্ষ করবে না।

কন্ট্রোল অপারেট করে র‍্যাম্পে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল রানা টি-
চেস্টটাকে। কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে টর্চের আলো ফেলল
চারদিকে। এবার অস্পষ্টভাবে বা কল্পনার চোখে নয়, পরিষ্কার দেখতে পেল
ওটাকে।

র‍্যাম্পের কোণে বিশাল একটা আকৃতি, চোখ নয় যেন দু'টুকরো জ্বলন্ত

কয়লা। আলোটা ওদিকে পড়তেই প্রাণীটা সামান্য একটু ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হয়ে গেল, গাঢ় ছায়া আর লালচে আভার মধ্যে প্রায় অলৌকিক একটা রহস্য। ফর্ক-লিফটের পাশে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে রানা, চারদিকে টর্চের আলো ফেলে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছে।

তারপর অকস্মাৎ বিকট একটা গর্জন ওর নার্ভে যেন ধারাল ছুরি চালাল। অন্ধকার ওয়্যারহাউসের ভেতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে রোমহর্ষক আওয়াজটা। একটানা কর্কশ গর্জন, যেন কাঠের করাত দিয়ে ধাতব কিছু কাটা হচ্ছে, অসহ্য লাগায় দাঁতে দাঁত চাপল রানা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটাকে চিনতে পেরেছে ও, কিন্তু চোখ দুটোকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, যা শুনছে তা-ও সত্যি বলে মেনে নিতে পারছে না।

চিতাবাঘ! তলপেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বিপদটা উপলব্ধি করতে পারছে ও।

সমস্ত সুবিধে পাচ্ছে হিংস্র প্রাণীটা। রাত তার স্বাভাবিক পরিবেশ। অন্ধকার তাকে সাহসী আর মারমুখী করে তোলে।

টর্চের লেন্স থেকে লাল ফিল্টার খুলে নিল রানা, উজ্জ্বল আলো লাফ দিল ওয়্যারহাউসের ভেতর। আলোর টানেলটা চারদিকে ঘোরাল ও, দেখতে পেল আবার জানোয়ারটাকে। ওর পিছনে সরে গেছে ওটা, ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। এই চক্কর দেয়াটা সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ। খুন করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত।

আলো লাগতেই লাফ দিয়ে আবার অদৃশ্য হলো চণ্ডী। মাত্র এক ঝলক দেখা গেল ওটাকে, টি-চেস্টের পাঁচিলের পিছনে লুকিয়েছে। আক্রোশে গরগর করছে সারাক্ষণ, অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শব্দটা।

শিকার করার আগে রানাকে নিয়ে খেলছে চণ্ডী। চিউইউই পার্কে অনেক বছর আগে থেকেই ওর একটা কনসেশন আছে, একবার ওর এক রেঞ্জারকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল এক চিতা। তাকে উদ্ধার করার জন্যে প্রথম যে দলটা যায় তাদের মধ্যে রানাও ছিল। চিতা তার কি অবস্থা করেছিল, চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল দৃশ্যটা।

আফ্রিকার অপর বিপজ্জনক বিড়াল, সিংহ, জানে না দু'পেয়ে প্রাণী মানুষকে আক্রমণ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কোনটা। সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়বে, ফেলে দেবে শিকারকে, নাগালের মধ্যে শরীরের যে অংশটা পাবে সেখানে দাঁত বসাবে ব থাবা মারবে—লোকটাকে উদ্ধার করার আগে তার হয়তো একটা হাত বা পা কামড়ে আলাদা করে ফেলবে।

কিন্তু চিতাবাঘ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রাণী। মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ হিউম্যান অ্যানাটমি বোঝে সে। চিতার হাতে প্রায়ই মারা পড়ে বেবুন। সরাসরি বেবুনের মাথায় আক্রমণ করে চিতা, একই সঙ্গে নখ গেঁথে বের করে নেয় অরক্ষিত নাড়িভুঁড়ি। সাধারণত লাফ দিয়ে বেবুনের কাঁধে চড়ে বসে সে, কাঁধ দুটো ধরে সামনের দুই থাবায়, একই সঙ্গে পিছনের পা দিয়ে ঘন ঘন লাথি মারে—পোষা বিড়াল যেমন উলের গোল বল নিয়ে খেলে।

থাবার লম্বা নখগুলো, দ্রুত পাঁচ-সাতটা আঁচড়ে, একজন লোকের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে আনতে পারে। একই সময়ে লোকটার মুখ বা গলায় দাঁত ঢুকিয়ে দেয়, এবং সামনের একটা থাবা মাথার পিছনে হুক-এর মত আটকে টান দিয়ে খুলি থেকে ছাড়িয়ে আনে চুল সহ চামড়া। প্রায়ই চামড়ার সঙ্গে খুলির মাঝখানটা উঠে আসে, হালকাভাবে সেদ্ধ করা ডিমের কেটে নেয়া চূড়ার মত—আবরণ না থাকায় মসৃণ দেখা যায়।

এখনও ফর্ক-লিফটের পাশে গুঁড়ি মেরে রয়েছে রানা, গলাটাকে বাঁচাবার জন্যে চেইন টেনে লেদার জ্যাকেটটা চিবুক পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। নাভির চারধারে পেট ঢাকার জন্যে নাইলন ব্যাগটা নিতম্বের কাছ থেকে টেনে আনল সামনের দিকে। এরপর স্ক্রুড্রাইভার ডান হাতে নিয়ে টর্চ ধরা বাম হাত ঘুরিয়ে আলো ফেলল চক্কররত চিতার দিকে।

ওটার সম্পূর্ণ আকৃতি যতবার দেখছে রানা ততবার আঁৎকে উঠছে। টর্চের আলোয় কুচকুচে কালো দেখাল। আফ্রিকান উপজাতিদের গানে বলা আছে, চিতা প্রজাতির মধ্যে কালোগুলোই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

ওটাকে আলোর ভেতর ধরে রাখা অসম্ভব মনে হলো রানার। ছায়ার মতই ফাঁকিবাজ, এই আছে এই নেই। রানা বুঝতে পারছে ওয়্যারহাউসের যেখানটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক দূরে জায়গাটা, পিছন থেকে অরক্ষিত পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার দীর্ঘ সুযোগ পেয়ে যাবে চিতা। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস পেয়ে যাবে। এক সেকেণ্ডের জন্যে টর্চের আলো ঘোরাল রানা, পালাবার অন্য কোন পথ আছে কিনা খুঁজছে।

শুঁটকির বস্তা। কাছের দেয়াল ঘেঁষে পিরামিড। প্রায় জানালা পর্যন্ত উঁচু, ওয়্যারহাউসের মেঝে থেকে ত্রিশ ফুট।

স্কাইলাইট পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলেই হয়, ভাবল ও। তারপর উল্টোদিকে নামতে হবে। চিন্তা নেই, ওর কাছে নাইলন রশি আছে। সময় বয়ে যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা, নিজেকে তাগাদা দিল রানা।

নিরাপদ আশ্রয় ফর্ক লিফট ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। মেশিনটা ওর পিঠটাকে রক্ষা করছে, অনুভূতিটা নিরেট স্বস্তির মত। খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়বে ও, চিতার শক্তি আর ক্ষিপ্রতার সামনে অসহায় পুতুলে পরিণত হবে।

ফর্ক-লিফট ছাড়তেই আবার গর্জে উঠল চিতা, রোমহর্ষক আওয়াজটা আরও ভীতিকর ও ব্যগ্র শোনাল কানে।

'ভাগো!' খেঁকিয়ে উঠল রানা; আশা, মানুষের গলা পেয়ে একটু হলেও ভড়কাবে। একপাশে, আড়াআড়িভাবে সরে গেল চিতা, উঁচু এক সারি প্যাকিং-বক্সের আড়ালে অদৃশ্য হলো। আর ঠিক তখনই মারাত্মক ভুলটা করে বসল রানা।

বোকার মত ভুল, ক্ষমার অযোগ্য। চিউইউই কনসেশনে অমন কয়েকশো ক্লায়েন্টকে উপদেশ দিয়েছে ও, হিংস্র পশুর কাছ থেকে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা

করবেন না। আরও স্পষ্ট করে বলেছে, চিতা বা সিংহের দিকে পিছন ফিরবেন না। কারণ ওদের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো ধাওয়া করা। আপনি দৌড়ালে সে আক্রমণ করবে–যেমন পোষা বিড়াল পলায়নরত ইঁদুর দেখলে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। অথচ নিজের বেলা আজ কথাটা বেমালুম ভুলে বসল রানা।

ওর মনে হলো, ও সম্ভবত শুঁটকির পিরামিডে পৌঁছে যেতে পারবে। ঘুরেই দৌড়াল, সেই সঙ্গে ওর পিছনের অন্ধকারে নিঃশব্দ বিদ্যুৎ খেলে গেল চিতার শরীরে। শব্দ শুনলে বা অন্য কোনভাবে টের পেলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু রানা জানতেই পারেনি ওকে লক্ষ করে লাফ দিয়েছে চিতা। সমস্ত ভার আর বিদ্যুৎগতি আক্রমণের সবটুকু ধাক্কা সহ ওর পিঠে পড়ল চণ্ডী, দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে।

সামনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা। অনুভব করল কামড় দিয়ে আটকে গেল নখর, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো মাংসের ভেতর ঢুকে আঙটার মত বাঁকা হয়ে গেছে ওগুলো। কংক্রিটের মেঝেতে ফেলে না দিয়ে বস্তার স্তূপে ধাক্কা খাওয়াল ওকে চিতা। ফলে হাড়গোড় গুঁড়ো না হলেও, রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে গিয়েছে। অনুভব করল যেন পাঁজরগুলো ভেতর দিকে বাঁকা হয়ে ভেঙে গেছে।

এখনও রানার উঁচু কাঁধে চেপে রয়েছে চিতা, তবে ওটার ভারে হোঁচট খেতে খেতে রানা উপলব্ধি করল নখরগুলো ওর লেদার জ্যাকেট আর ভেতরের সোয়েটার খামচে ধরেছে, মাংসের নাগাল পায়নি এখনও।

যেভাবেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে রানা, নিজেকে ঠেক দিয়ে রেখেছে বস্তার ঢালু পাঁচিলে। অনুভব করল পেশী কুঁকড়ে তৈরি হলো চিতা, ওপরে তুলে আনছে পিছনের পা দুটো, গোটা শরীর স্প্রীঙের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলছে–ওর নিতম্ব থেকে উরুর পিছন পর্যন্ত আঁচড়ে সমস্ত মাংস তুলে নেবে। ঠিক এভাবেই আঁচড়ায় চিতা, ফলাফল কি হয় তাও দেখা আছে রানার। হাড় পর্যন্ত মাংস বলে কিছু থাকবে না উরু আর নিতম্বে। এক মুহূর্তে পঙ্গুও অচল হয়ে পড়বে রানা, রক্তক্ষরণে মারা যেতে সময় লাগবে কয়েক মিনিট।

বস্তার গায়ে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে পিছন দিকে পড়ল রানা, পড়ার সময় শরীরটা গুটিয়ে একটা বল করে নিল, হাঁটু জোড়া চিবুকের নিচে চলে এসেছে। ব্যাগের নাইলন বেল্টে টান দিল চিতার থাবা, তারপর লাথি ঝাড়ল পিছন দিকে, কিন্তু রানার পা নাগালের মধ্যে পেল না–আগেই সরিয়ে নিয়েছে ও। চিতার পিছনের পায়ের বাঁকা নখর ছড়িয়ে আছে, মাংসের নাগাল না পেয়ে আঘাত করল বাতাসে।

মানুষ ও পশুর একত্রিত ভার সশব্দে আছাড় খেল কংক্রিটের মেঝেতে। রানার আকৃতি ছোটখাট নয়, আর চিতাটা ওর নিচে রয়েছে। পতনের ধাক্কায় চাপা গলায় খেঁকিয়ে ওঠার মত হিসহিস আওয়াজ বেরুল ওটার ফুসফুস থেকে, রানা অনুভব করল লেদার জ্যাকেট থেকে ছুটে গেল নখগুলো। সবেগে মোচড় খেল ও, একটা হাত বাড়াল কাঁধের ওপর দিয়ে, অপর হাতে এখনও ধরে আছে স্ক্রুড্রাইভার। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও, একই সঙ্গে চিতার ঘাড়ের ভাঁজ

করা মোটা চামড়া খামচে ধরল। আতঙ্ক রানার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ, নিজের পিঠ থেকে ছাড়িয়ে আনল চিতাকে, পিঠ ঝাঁকিয়ে ছুঁড়ে দিল প্যাকিং-কেসের স্তূপে।

রাবারের একটা বলের মত ওর দিকে ফিরে এল চিতা। চিতার প্রথম আক্রমণেই রানার হাত থেকে ছুটে গেছে টর্চটা। কংক্রিটের মেঝে দিয়ে গড়িয়ে একটা প্যাকিং-কেসের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে ওটা। তির্যকভাবে বাঁকা হয়ে রয়েছে আলোর টানেল, প্লাইউড কেসে লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে চারধারে। ম্লান ওই প্রতিফলনে চিতার পরবর্তী আক্রমণ চাক্ষুষ করার মত যথেষ্ট আলো রয়েছে।

চিতার চোয়াল সবটুকু খোলা, লম্বা করা সামনের পা দুটো রানার কাঁধ ধরতে চাইল। ওর ওপর আছড়ে পড়ল ওটা, বুকে বুক, পিছনের পা দুটো বাঁকা হয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, ওর মুখ আর গলায় দাঁত বসাবার জন্যে স্যাঁৎ করে সামনে বাড়াল মাথাটা। চিতার এটা সেই প্রিয় ও বিখ্যাত আক্রমণ। বাধা দিল রানা দু'হাতে ধরা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে, একপাশ থেকে সবেগে ঢুকিয়ে দিল চিতার খোলা মুখের ভেতর।

ইস্পাতের প্রচণ্ড আঘাতে মাড়ির কিনারা থেকে একটা দাঁত ভেঙে গেল চিতার। মেঝেতে পড়ল রানা, স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে মুখটা চিতার নাগালের বাইরে রেখেছে। হিংস্র জানোয়ার আবার গর্জে উঠল, গরম লালা কুয়াশা হয়ে বেরিয়ে এসে আঘাত করল ওর চোখে-মুখে, পচা মাংস আর মৃত্যুর গন্ধে ভরে উঠল নাকের ফুটো।

রানা অনুভব করল চিতার সামনের একটা পা ওর কাঁধ ছাড়িয়ে লম্বা হচ্ছে, মাথার পিছনটা আঁকড়ে ধরে খুলি থেকে টেনে ছিঁড়ে আনবে চামড়া। একই সময়ে ভাঁজ হয়ে গেল পিছনের পা দুটো, ওর পেটের সামনেটা ছিঁড়ে আনার জন্যে পুরো মেলা রয়েছে তীক্ষ্ণ নখগুলো। তবে রানার মাথার পিছনটা শক্তভাবে সেঁটে আছে শুঁটকির বস্তায়। চিতা তার নখর গাঁথল, ওর খুলির মোটা চামড়ায় নয়, ওর কান থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে বস্তার কর্কশ পাটে। তারপরই চিতা তার দুই পিছনের পা সবেগে নিচে নামাল, তবে রানার পেট ছিঁড়ে নাড়িভুড়ি বের করতে পারল না, নখগুলো আঙটার মত আটকে গেছে ব্যাগের শক্ত নাইলন বেল্টে।

মুহূর্তের জন্যে চিতার আক্রমণ বিফল হয়েছে। পাটের বস্তা ছিঁড়ে ফেলছে সে, ভুলটা যেন ধরতে পারেনি। পিছনের পা দুটোও ঘন ঘন লাথি ছুঁড়ছে, তীক্ষ্ণ শব্দে ছিঁড়ে আনছে কঠিন নাইলন।

এখনও আক্রমণে রয়েছে চিতা, পিছিয়ে নিল মাথাটা, তার খোলা চোয়ালে রানার ঢোকানো ইস্পাত এড়াবার চেষ্টায়। এতক্ষণ স্ক্রুড্রাইভারটাকে আরও ভেতরে ঢোকাতে চাইছিল রানা, হঠাৎ সেটা বের করে এনে পরমুহূর্তে আবার গায়ের জোরে ঠেলে দিল সামনের দিকে, এবার ওর লক্ষ চিতার একটা চোখ।

লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, স্ক্রুড্রাইভার ঢুকে গেল চিতার ফুলে থাকা নাকের ফুটোর ভেতর। তবে নাকের প্যাসেজ ধরে মগজে পৌঁছুল না, সামান্য বাঁকা পথ ধরে নাকের কোমল হাড় ভেদ করল, তারপর চামড়ার নিচে চেকবোন ছুঁয়ে সামনে

বাড়ল। চিতার কানের নিচে দিয়ে বেরিয়ে এল ডগাটা, আঘাত পেয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল সে। মুহূর্তের জন্যে ঢিল পড়ল তার পেশীতে। শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা, গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল চিতাকে।

অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্যই বলতে হবে যে এখনও রক্ত ঝরাতে পারেনি চিতা। তবে এখন ওটাকে রানা পিছন দিকে ছুঁড়ে দেয়ার সময় চণ্ডী তার নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল ওকে। নখগুলো ঘষা খেল রানার বাহুতে, যেন ধারাল ক্ষুর দিয়ে কেটে ফেলা হলো লেদার আর উল, নাগাল পেয়ে গেল বাহুর পেশী। অকস্মাৎ ব্যথা পেয়ে রানার শক্তি যেন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল, এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়তে শুরু করল ও।

দুই পা এক করে ছুঁড়ল রানা, পরবর্তী আক্রমণের জন্যে শরীরটা যখন কুঁকড়ে ছোট করে আনছে চিতা, ওর এক করা গোড়ালি প্রচণ্ড আঘাত করল তাকে। জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে ছিটকে গেল সে, গাঢ় পশমের একটা বল যেন, টর্চের আলোয় ঢেউ খেলানো ও চকচকে লাগল।

রানার পিছনে, শুঁটকির বস্তাগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁক রয়েছে, এত ছোট যে কোনরকমে শুধু ওর শরীরটা ঢুকবে। পিছন দিকে ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে সরু প্যাসেজটার ভেতর ঢুকে পড়ল ও। এখন ওর দুই দিক ও পিছনটা নিরাপদ, চিতা হামলা করতে পারবে শুধু সামনে থেকে।

একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা সামনে বাড়াল চিতা, গরগর করছে, রানার নাগাল পেতে চেষ্টা করছে খোলা চোয়াল দিয়ে। স্ক্রুড্রাইভারটা তার চোখে মারল রানা। আবার ব্যর্থ হলো, তবে ইস্পাতের ডগা সেঁধিয়ে গেল চিতার লাল ও ভাঁজ করা জিভে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে, ফোঁস ফোঁস করছে ব্যথায়।

'ভাগ ব্যাটা! কেটে পড়!' চিৎকার করল রানা, আসলে নিজেকে সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে, জানে খেপে ওঠা জন্তুটাকে ধমক দিয়ে তাড়ানো যাবে না। মেঝেতে নিতম্ব ঘষে পিছিয়ে এল রানা, শুঁটকির বস্তার ফাঁকে যতটা সম্ভব সরিয়ে আনল নিজেকে।

ফাঁকটার মুখের সামনে পায়চারি শুরু করল চিতা, প্রতিবার পাশ কাটাবার সময় টর্চের ম্লান আভা ঢেকে দিচ্ছে। একবার থামল সে, পাছায় ভর দিয়ে বসল, একটা থাবা দিয়ে আহত নাক মুছল, ঠিক পোষা একটা বিড়ালের মত। তারপর পশম থেকে চেটে নিল নিজের রক্ত।

হঠাৎ ছুটে সামনে চলে এল চিতা, সরু প্যাসেজের প্রবেশমুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল, সামনের একটা থাবা লম্বা করে আবার নাগাল পেতে চাইল রানার। প্যাসেজের ভেতর ঢুকে হাতড়াচ্ছে থাবাটা, সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ক্রুড্রাইভার চালাল রানা। অনুভব করল, পায়ের কোথাও লেগেছে, ভেতরে ঢুকে গেছে ইস্পাতের ডগা। গর্জনের সঙ্গে চিতার মুখ থেকে বিস্ফোরিত হলো রক্ত আর থুথু, সরে গেল সে, আবার পায়চারি শুরু করল। কিছুক্ষণ পর পর থামল, মাথা নামিয়ে গর্জে উঠল আক্রোশে।

আস্তিনের ভেতর রক্ত গড়াচ্ছে, স্পর্শ পেল রানা। তারপর ওর আঙুল বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ল কয়েকটা ফোঁটা। স্ক্রুড্রাইভারটা দুই হাঁটুর

মাঝখানে গুঁজে রাখল ও, পরবর্তী আক্রমণের সময় যাতে তাড়াতাড়ি হাতে নিতে পারে, তারপর এক হাতের সাহায্যে ছেঁড়া বাহুটা রুমাল দিয়ে বাঁধল। রুমালের প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে শক্ত করল বাঁধনটা। ক্ষতটা গভীর নয়, চামড়ার আস্তিন রক্ষা করেছে ওকে। তবে বাহুটা এরই মধ্যে দপ দপ করতে শুরু করেছে। ও জানে, মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দাঁত বা নখরের সামান্য একটু আঁচড়ও ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে, সময়মত চিকিৎসা করা না হলে।

ওর চিন্তা শুধু এই একটাই নয়। চিতা ওকে ফাঁদে আটকে ফেলেছে। এখনও বুঝতে পারছে না এখান থেকে বেরুবে কিভাবে। অথচ সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। আশ্চর্যই বলতে হবে, চিতার গর্জন শুনে এখনও কেউ আসেনি। ধরে নিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে অন্তত একজন গার্ড আসবে।

চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র হঠাৎ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল ওয়্যারহাউস। আলোটা এত উজ্জ্বল যে চমকে উঠে আক্রমণের ভঙ্গি নিয়ে ফেলল চিতা, চোখ মিট মিট করছে। অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনল রানা, ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে প্রধান দরজা গুটিয়ে খুলে ফেলা হলো। পরমুহূর্তে ভেসে এল মোটর কার-এর শব্দ, দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

খেঁকিয়ে উঠে ওয়্যারহাউসের পিছন দিকে পিছু হটল চিতা, মাথা নিচু করে আছে, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

তারপর একজন লোকের গলা পেল রানা। 'ওহে, চণ্ডী! তোমার খাঁচায় ঢোকো এবার। ঢোকো ঢোকো।' চাথার সিং-এর গলা চিনতে পারল রানা।

হঠাৎ লেজ নামিয়ে ছুটল চিতা, রানার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

আবার কথা বলল চাথার সিং, 'চণ্ডীকে তাড়াতাড়ি খাঁচায় ভরো!' একটু পরই খাঁচার দরজা সশব্দে বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা। 'উজবুক লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল চাথার সিং। 'সাবধান, এখনও শালা বেঁচে থাকতে পারে।'

সরু প্যাসেজটার ভেতর যতটা সম্ভব পিছিয়ে এল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে বটে, কিন্তু কি করলে ওদের নজর এড়ানো যাবে বুঝতে পারছে না। ওর লাশ দেখতে না পেলে ওয়্যারহাউসের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজবে ওরা। আর স্ক্রুড্রাইভারকে অস্ত্র বলা চলে না।

'ওখানে একটা টর্চ পড়ে রয়েছে, জ্বলছে এখনও।'

'আর ওখানে, শুঁটকির বস্তার কাছে। দেখে মনে হচ্ছে রক্ত।' সতর্ক পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

'চণ্ডী তার দায়িত্ব পালন করেছে।'

'টর্চটা আমাকে দাও।'

গলার আওয়াজ কাছে চলে এল।

হঠাৎ এক জোড়া পা বেরিয়ে এল রানার দৃষ্টিপথে। লোকটা দাঁড়াল, টর্চের আলো ফেলল সরু প্যাসেজে।

'কি কাণ্ড। কি অদ্ভুত কাণ্ড!' সেই একই কণ্ঠস্বর। চাথার সিং ইংরেজিতে কথা

বলছে। 'ওহে, চেরিস, দেখে যাও! গর্দভ লোকটা এখানে, বহাল তবিয়তে। সাবাস, মাই ডিয়ার দুশমন। হাউ ডু ইউ ডু, রানা? তোমার সঙ্গে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থবোধ করছি।'

দুই

কথা না বলে চোখ ধাঁধানো টর্চের আলোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল রানা।

চাখার সিং সকৌতুকে বলে চলেছে, 'হাতের ওই অস্ত্রটা এখন আর তোমার দরকার নেই, রানা, নেভার মাইণ্ড। লক্ষ্মী ছেলের মত দাও ওটা আমাকে।'

রানা নড়ল না।

হাতের শটগানটা রানাকে দেখাল চাখার সিং। 'এটা লোড করা হয়েছে বুলশট কার্টিজে। আত্মরক্ষার প্রশ্নে মালাউয়ে পুলিস খুবই বিবেচক ও উদার, বিশেষ করে আমার বেলায় তো আরও। আমি তোমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দাও।'

হতাশ বোধ করছে রানা, স্ক্রুড্রাইভারটা চাখার সিং-এর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল। পা দিয়ে সেটাকে আরেক দিকে সরিয়ে দিল চাখার সিং।

'এবার তুমি তোমার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো, রানা।'

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, আহত হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল।

শটগানটা রানার পেটের দিকে তাক করল চাখার সিং, ইউনিফর্ম পরা গার্ডের উদ্দেশ্যে অ্যাঙ্গানি ভাষায় বলল, 'চেরিস, কেসগুলো পরীক্ষা করো। দেখো তো দু'একটা খোলা হয়েছে কিনা।'

কালো লোকটাকে চিনতে পারল রানা, সুপারমার্কেটে দেখেছে। একটা দানব, বিপজ্জনক চেহারার কসাই। ওর সঙ্গে লাগার চেয়ে চিতার সঙ্গে লাগাও বোধহয় ভাল। দেখল, র‍্যাম্প ধরে ফর্ক-লিফটের দিকে যাচ্ছে লোকটা।

মেশিনের কাছে পৌঁছুবার আগেই বিস্ময়ে ও উল্লাসে চিৎকার করল সে, হাঁটু গেড়ে এক মুঠো চা তুলে নিল। ওখানেও যে পড়ছিল, খেয়াল করেনি রানা। ঝরে পড়া গুঁড়ো চা অনুসরণ করে ফর্ক-লিফটের ওপর কেসটার কাছে পৌঁছে গেল সে।

'কেসটা উঁচু করো, চেরিস!' নির্দেশ দিল চাখার সিং। ফর্ক-লিফটের কন্ট্রোলে উঠে বসল চেরিস, কেসটা ওপরে তুলল।

কেসটার তলা থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল খানিকটা চা। লাফিয়ে উঠে কেসের গায়ে গর্তটার ভেতর হাত গলাল চেরিস।

'তুমি খুব চালাক লোক, রানা,' প্রশংসার ভান করে মাথা নাড়ল চাখার সিং। 'জাস্ট লাইক শার্লক হোমস, নো লেস। তবে মাঝে মধ্যে বেশি চালাক হওয়া

বুদ্ধিমানের কাজ নয়, নেভার মাইণ্ড।'

শিখ লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রানা উপলব্ধি করল, তার ভাঁড়সুলভ রসিকতার কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই। চোখ দুটো ঠাণ্ডা ও কঠিন, একজন নিষ্ঠুর খুনীর চোখ। এই লোক ভাঁড় নয়।

'চেরিস, আমাদের মিত্র তার ট্রাকটা কোথায় রেখে এসেছে জানো?' জিজ্ঞেস করল চাখার সিং, শটগানটা এখনও রানার পেটের দিকে তাক করা।

'হেডলাইট জ্বালেনি, তবে দক্ষিণ দিক থেকে ট্রাকের আওয়াজ পেয়েছি আমি। সম্ভবত খালি প্লটে, বস।' ওরা নিজেদের মধ্যে অ্যাঙ্গোনি ভাষায় কথা বলছে, ধরে নিয়েছে রানা বুঝতে পারছে না। কিন্তু জুলু আর নুদেবেল ভাষা জানে রানা, অ্যাঙ্গোনি বুঝতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।

'যাও, জলদি যাও! ট্রাকটা নিয়ে এসো এখানে!' চাখার সিং হুকুম দিল।

চেরিস চলে যাবার পর রানা ও চাখার সিং নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে। কোন রকম দুর্বলতা বা সিদ্ধান্তহীনতার লক্ষণ আছে কিনা লক্ষ করছে রানা। শান্ত ও পরিতৃপ্ত লাগল শিখ লোকটাকে, হাতের শটগান স্থির।

'আমার হাত গুরুতর জখম হয়েছে,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

'আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করো,' জবাব দিল চাখার সিং।

'আমি ইনফেকশনের কথা ভাবছি···।'

'কোন ভয় নেই,' হাসিমুখে অভয় দিল চাখার সিং। 'ইনফেকশন শুরু হবার আগেই মারা যাবে তুমি।'

'আপনি আমাকে খুন করতে চান?'

'বোকার মত প্রশ্ন করলে, নেভার মাইণ্ড। তুমিই বলো, আমার সামনে আর কি বিকল্প আছে? তুমি এত চালাক যে আমার গোপন ব্যাপারটা ধরে ফেলেছ। আমি যেমন প্রায়ই বলে থাকি, কিন্তু কথাটা লোকে কানে তোলে না—বেশি জ্ঞান নিরাময়ের অযোগ্য একটা ব্যাধি। হা, হা।'

'যদি মারাই যাই, আপনি তাহলে আমার কৌতূহল মেটাচ্ছেন না কেন? কেন বলছেন না চিউইউইয়ে কি ঘটেছিল? হানা দেয়ার প্রস্তাবটা কার ছিল, আপনার নাকি চণ্ডমণ্ড গণ্ডের?'

'হায়-হায়, কি সব জিজ্ঞেস করে! চিউইউই বা ওই লোক সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। তাছাড়া, গল্প করার মত মুড নেই আমার।'

'আমাকে বললে আপনার কোন ক্ষতি হচ্ছে না। রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীর মালিক কে?'

'নেভার মাইণ্ড, আপনার কৌতূহল আপনাকে সঙ্গে করে কবরে নিয়ে যেতে হবে।'

ল্যাণ্ডক্রুজারের আওয়াজ পেল ওরা।

নড়ে উঠল চাখার সিং। 'এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল চেরিস! ট্রাকটা লুকিয়ে রাখার জন্যে বেশি কষ্ট করোনি তুমি। চলো, ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মেইন গেটে যাই। তুমি পথ দেখাবে, প্লীজ? কিন্তু মনে রেখো, তোমার মাত্র এক ফুট পিছনে থাকবে শটগানের মাজল।'

আহত হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ওয়্যারহাউসের দরজার দিকে এগোল রানা। সারি সারি প্যাকিং-কেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল খালি রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে সবুজ ক্যাডিলাকটা দাঁড় করানো রয়েছে।

সম্ভবত চিতাবাঘ খাঁচায় না ঢোকা পর্যন্ত নিরাপদ ক্যাডিলাকের ভেতর অপেক্ষা করেছে চাখার সিং। বিল্ডিঙের পিছনটার কথা ভাবল রানা, মনে পড়ল উৎকট যে গন্ধটা নাকে পেয়েছিল আগে। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করছে ও, বুঝতে চেষ্টা করছে কোথায় রাখা হয় চণ্ডীকে, কিভাবেই বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, চাখার সিং বা চেরিস দু'জনের কেউই চণ্ডীকে বিশ্বাস করে না। বরং চণ্ডী খাঁচার বাইরে থাকলে অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করে তারা।

প্রধান দরজার কাছে পৌঁছুল ওরা, ইঙ্গিতে রানাকে থামতে নির্দেশ দিল চাখার সিং। তারপর হঠাৎ বিরাট দরজাটা একপাশে গুটিয়ে খুলে যেতে শুরু করল। দরজার বাইরে দেখা গেল রানার টয়োটাকে, দরজার দিকে মুখ করা, হেডলাইট জ্বলছে। ইলেকট্রিক্যালি অপারেট করা হয় দরজা, বাইরের দিকের কন্ট্রোল বক্স-এর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেরিস। দরজা পুরোপুরি খুলে যাবার পর কন্ট্রোল বক্সের লক থেকে কী-কার্ড বের করে নিল সে। কী-কার্ডটা ছোট্ট কী-চেইনের সঙ্গে ঝুলছে, রেখে দিল হিপ পকেটে।

'সব রেডি, বস্,' চাখার সিংকে বলল সে।

'কি করতে হবে তুমি জানো,' জবাব দিল চাখার সিং। 'আমি চাই না ফিরে এসে কোন পাখি আমার ছাদে বসুক। ভাল করে দেখে নেবে কোন ছাপ বা চিহ্ন যেন না থাকে। অবশ্যই দুর্ঘটনা হতে হবে–পাহাড়ী রাস্তায় এরকম দুর্ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, চেরিস?' আবার অ্যাঙ্গোনি ভাষায় কথা বলছে ওরা।

'একটা দুর্ঘটনার মত দেখাতে হবে,' বলল চেরিস। 'আগুন ধরলে আরও ভাল।'

রানার দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল চাখার সিং। 'এবার, প্রিয় বৎস। দয়া করে তুমি তোমার অটোমোবাইলে চড়ে বসো। কোথায় যেতে হবে বলে দেবে চেরিস। প্লীজ, তার নির্দেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন কোরো। শটগানে ওর হাত সাংঘাতিক ভাল।'

কথা না বলে ল্যাণ্ডক্রুজারের ক্যাবে উঠে পড়ল রানা। চাখার সিং নির্দেশ দিতে চেরিসও উঠল, বসল রানার সরাসরি পিছনের সীটে। ওরা বসার পর শটগানটা চেরিসের হাতে ধরিয়ে দিল চাখার সিং। কাজটা এত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সারা হলো যে ঝুঁকি নিয়ে কিছু করার সুযোগই পেল না রানা, তার আগেই জোড়া ব্যারেল ওর ঘাড়ে চেপে বসল।

রানার পাশে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল চাখার সিং। 'চেরিসের ইংরেজি একদম বাজে, নেভার মাইণ্ড,' সহাস্যে বলল সে। 'ওয়েনা কুলুমা ফানিকা-লো- তুমি এভাবে কথা বলো?'

'হ্যাঁ,' একই ভাষায় জবাব দিল রানা।

'গুড। তাহলে পরস্পরকে বুঝতে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। শুধু ওর হুকুম মত কাজ কোরো, রানা। এত কম রেঞ্জে শটগানটা তোমার এমন সুন্দর চেহারা একেবারে কুৎসিত বানিয়ে দেবে, কোন সন্দেহ নেই।'

জানালার কাছ থেকে পিছু হটল চাখার সিং। চেরিসের নির্দেশে ল্যাণ্ডক্রুজার পিছিয়ে আনল রানা, ইউ টার্ন নিয়ে এগোল মেইন গেটের দিকে, তারপর উঠল পাবলিক রোডে।

রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রানার, দেখল হেঁটে গিয়ে ক্যাডিলাকের দরজা খুলল চাখার সিং। রাস্তাটা বাঁকা হয়ে গেছে, এরপর আর রানার দৃষ্টিপথে থাকল না ওয়্যারহাউস।

ব্যাক সীট থেকে কঠিন হুমকির স্বরে পথ নির্দেশ দিচ্ছে চেরিস, প্রতিটি নির্দেশের সঙ্গে শটগানের মাজল দিয়ে খোঁচা মারছে রানার ঘাড়ে। নিস্তব্ধ ও নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ল্যাণ্ডক্রুজার। গোটা শহর ঘুমাচ্ছে। পুবদিকে যাচ্ছে ওরা। ওদিকে শুধু লেক আর পাহাড়, লোকবসতি নেই।

শহর ছাড়িয়ে আসার পর স্পীড বাড়াবার তাগাদা দিল চেরিস। রাস্তাটা ভাল, দ্রুত ছুটে চলেছে ট্রাক। ইতিমধ্যে রানার আহত বাহু আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, ব্যথাও করছে খুব। হাতটাকে কোলের ওপর ফেলে রেখেছে ও, ড্রাইভ করছে এক হাতে। চেষ্টা করছে ব্যথাটাকে ভুলে থাকার।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নতুন এলাকায় পৌঁছে গেল ওরা, পাহাড়ের প্রথম ঢাল বেয়ে ওঠার সময় সামনে পড়ল চুলের কাঁটার মত কয়েকটা বাঁক। ঢালের দু'দিকেই ঘন জঙ্গল, হাইওয়ের দু'পাশে সরে এসেছে। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি কমে গেল।

ভোর এল চুপিসারে। হেডলাইটের আলো যেখানে পৌঁছায়নি, আরও সামনে, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা গাছপালার আকৃতিগুলোকে। একটু পরই ভোরের আকাশের গায়ে ওগুলোর মাথা ও ডগা স্পষ্ট হতে দেখল ও। কব্জি ঘুরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। শুকনো রক্তে শক্ত হয়ে রয়েছে আস্তিন। ছ'টা বেজে সাত মিনিট হয়েছে।

চেরিসকে বোঝার মত যথেষ্ট সময় পেয়েছে রানা। তার সঙ্গে গায়ের জোরে ওর পারার কথা নয়। তাছাড়া, শটগানের মাজল ওর ঘাড়ে ঠেকে আছে, আন-আর্মড কমব্যাটের সুযোগ নেই। ভাবাবেগ বা দ্বিধা, কোনটাই নেই চেরিসের আচরণে। সময় হলে গুলি করবে সরাসরি, কোন সুযোগ না দিয়ে। শটগানটা যেভাবে চাখার সিং-এর হাত থেকে নিল আর যেভাবে বাগিয়ে ধরে আছে তা থেকেই বোঝা যায়, এটা ব্যবহারে অভ্যস্ত ও দক্ষ সে। তবে ল্যাণ্ডক্রুজারের ক্যাবের মত ছোট জায়গায় ব্যবহার করা একটু অসুবিধেই।

কি কি উপায় আছে চিন্তা করছে রানা। ট্রাকের ভেতরই চেরিসকে আক্রমণ করার ধারণাটা দ্রুত বাতিল করে দিল ও। লোকটার দিকে মুখ ফেরাবার আগেই চেরিস তার খুলি উড়িয়ে দেবে।

লাথি দিয়ে পাশের দরজাটা খুলতে পারে, লাফ দিতে পারে ক্যাবের বাইরে। সেক্ষেত্রে ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি পঞ্চাশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে ওকে, তা না

হলে মাটিতে পড়ার সময় হাত-পা ভাঙবে। ধীরে ধীরে অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলল ও। প্রায় সাথে সাথে এঞ্জিনের আওয়াজে তারতম্য ধরে ফেলল চেরিস, ওর ঘাড়ের গোড়ায় চেপে ধরল শটগানের মাজল।

'জোরে চালাও!' হুমকি দিল সে। 'চালাকি করতে গেলে এখানেই মরবে।'

ভবী ভোলবার নয়। গম্ভীর হলো রানা, ট্রাকের গতি বাড়াল। তবে এ-ও সত্যি যে এভাবে ছুটন্ত গাড়িতে গুলি করার ঝুঁকি চেরিস নেবে না, জানে তার পরিণতি কি হতে পারে।

গন্তব্য যেখানেই হোক, আশা করা যায় পৌঁছুবার পর থামতে বলবে চেরিস। তখন হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। রানা, তখন একটা খেলা তোমাকে দেখাতেই হবে, তা না হলে স্রেফ মরণ–নিজেকে সাবধান করে দিল ও।

হঠাৎ আরও খাড়া হতে শুরু করল রাস্তা, প্রতিটি বাঁক আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ। ভোর এখনও ঝাপসা। প্রতিবার বাঁক ঘোরার সময় এক নজর নিচের উপত্যকা দেখার সুযোগ হলো রানার, রূপালি কুয়াশার স্তর প্রায় ঢেকে রেখেছে। কুয়াশার ফাঁকে পাহাড়ী নদী, সাদা জলপ্রপাত দেখা গেল।

সামনে আরেকটা বাঁক। ঘোরার জন্যে পেশী শক্ত করল রানা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেরিস বলল, 'থামো! কিনারায় থামো! ওখানটায়।'

ব্রেক করল রানা, হাইওয়ে থেকে নেমে এসে কিনারায় ট্রাক থামাল।

একটা পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় রয়েছে ওরা। রাস্তার কিনারায় এক সারি সাদা রঙ করা পাথর। পাথর সারির সামনে বিশাল হাঁ করে আছে গভীর খাদ। দুশো বা তিনশো ফুট নিচে পাথর ভরা অগভীর নদী।

হ্যাণ্ডব্রেকে টান দিল রানা, অনুভব করল পাঁজরের গায়ে হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। গুলিটা কি এখুনি আসবে? ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে সাজাতে চাইলে ট্রাকের ভেতর গুলি করাটা বোকামি হবে। আকারে কেউ দানব হলে, তার কাছ থেকে সাধারণত বোকামিই আশা করা হয়–অন্তত, চেরিসকে দেখে মনে হয় না যে মগজের ভারে নুয়ে পড়েছে।

'এঞ্জিন বন্ধ করে আমাকে চাবি দাও,' হুকুম করল চেরিস।

কাঁধের ওপর দিয়ে চাবির গোছাটা বাড়িয়ে দিল রানা।

'হাত দুটো মাথায় রাখো,' বলল চেরিস, তার কথায় সামান্য একটু স্বস্তিবোধ করল রানা। নির্দেশ পালন করল ও, অপেক্ষা করছে।

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, দরজার হাতল ঘোরানো হয়েছে। কিন্তু ঘাড়ের পিছনে মাজলের চাপ এখনও কমছে না। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল রানা, পিছনের দরজাটা খুলে ফেলেছে চেরিস।

'নড়বে না,' রানাকে সাবধান করে দিল সে, সীট থেকে আড়াআড়িভাবে পিছলে নেমে যাচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে শটগানটা এখনও তাক করে আছে।

ট্রাকের বাইরে থেকে নির্দেশ পেল রানা, 'তোমার দিকের দরজাটা ধীরে ধীরে খোলো।' ট্রাকের পাশে চলে এসেছে চেরিস, পাশের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে শটগানের ব্যারেল, রানার মুখ থেকে মাজলের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি।

দরজা খুলল রানা।

'এবার বেরিয়ে এসো।'

ট্রাক থেকে নামল রানা।

শটগানটা এক হাতে, পিস্তলের মত করে ধরে রানাকে কাভার দিচ্ছে চেরিস, বাম হাতটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল। রানা দেখল, পিছনের সীটে পড়ে রয়েছে স্টীলের জ্যাক-হ্যাণ্ডেল। তারমানে আসার পথে সামনের সীটের তলা থেকে বের করে ওখানে রেখেছে এটা চেরিস। সেই মুহূর্তে, এক পলকে বুঝে নিল রানা চেরিস তাকে কিভাবে খুন করবে।

পিঠে শটগান ঠেকিয়ে খাদের কিনারায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে। তারপর খুলির ওপর জ্যাক-হ্যাণ্ডেলের প্রচণ্ড এক ঘা মারলেই কিনারা থেকে দুশো ফুট নিচের পাথরে পড়ে যাবে ও। ওকে ফেলে দেয়ার পর ট্রাকটাকেও ফেলা হবে। ড্রাইভারের দিকের দরজা খোলা রাখবে চেরিস, সম্ভবত জ্বলন্ত একটা ন্যাকড়া ফুয়েল ট্যাংকের ফিলারে গুঁজে দেবে সে। ট্রাকটা পড়বে ওর ওপর।

দেখে মনে হবে কুখ্যাত ও বিপজ্জনক পাহাড়ী রাস্তায় অসতর্কভাবে গাড়ি চালাবার খেসারত দিয়েছে আরেকজন ট্যুরিস্ট। পুলিসকে সন্দিহান করে তোলার মত কোন সূত্র পাওয়া যাবে না। বোঝার কোন উপায় থাকবে না দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সঙ্গে চাখার সিং বা লুকিয়ে রাখা আইভরির কোন সম্পর্ক আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সুযোগটা দেখতে পেল রানা।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে হাত গলাচ্ছে চেরিস, সামান্য হলেও আড়ষ্ট হয়ে আছে সে। শটগানটা এখনও রানার পেটের দিকে ধরা, তবে লক্ষ্যস্থির করতে দেরি হয়ে যাবে তার, রানা যদি দ্রুত কিছু একটা করে।

সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। চেরিস বা শটগানের দিকে নয়, দরজার দিকে। শরীরের সমস্ত ভার নিয়ে দরজার গায়ে পড়ল ও, সশব্দে বন্ধ হলো সেটা, ইস্পাতের কিনারা আর বাজুর মাঝখানে আটকে গেছে চেরিসের বাহু।

প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল চেরিস। সে চিৎকারে হাড় ভাঙার আওয়াজ চাপা পড়ল না। বেগুনি রঙের তর্জনী পিছলে গেল ট্রিগারে, একটা ব্যারেল থেকে গুলি বেরুল। গুলিটা রানার মাথা থেকে এক ফুট দূর দিয়ে ছুটে গেল, যদিও বিস্ফোরণটা এলোমেলো করে দিল ওর চুল। রিকয়েল-এর ধাক্কায় ওপর দিকে খাড়া হলো ব্যারেল।

ছুটে আসার ঝোঁকটা কাজে লাগিয়ে এবার চেরিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল শটগান–বাটস্টক ও গরম ব্যারেল। শটগানটা মাত্র এক হাতে ধরে আছে চেরিস, অপর হাতের হাড় ভেঙে যাওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারপরও দ্বিতীয় ব্যারেল থেকে গুলি করল সে, সরাসরি আকাশের দিকে।

ব্রীচ-এর একটা পাশ দিয়ে চেরিসের মুখ সজোরে ঠুকে দিল রানা, আঘাতটা লাগল তার ওপরের ঠোঁটে, ভেঙে দিল নাক, উপড়ে আনল ওপরের মাড়ির চার-পাঁচটা দাঁত। আবার চিৎকার করল চেরিস, মুখের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল রক্ত আর দাঁতগুলো। ইস্পাতের ফাঁদে আটকা পড়া ভাঙা হাতটা ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করছে সে, অসহ্য ব্যথা বাড়িয়ে তুলছে আরও।

দু'হাতে ধরা শটগানটা হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে আনল রানা। উঁচু করল, ওল্টাল, ইস্পাতের বাট-প্লেট সবেগে নামিয়ে আনল চেরিসের নাকে-মুখে, গুঁড়িয়ে দিল চোয়ালের হাড়।

চেহারা বদলে গেল লোকটার। ভেতর দিকে ডেবে গেছে একদিকের চোয়ালের হাড়, ওপরের সারিতে কোন দাঁত দেখা যাচ্ছে না, কালো মুখে চকচক করছে তাজা রক্ত। পিছন দিকে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে পড়ল সে, তাকে বেঁধে রেখেছে শুধু ফাঁদে আটকা পড়া হাতটা। দরজার হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, খুলে গেল দরজা, চেরিসের হাতটা মুক্ত করল যখন ব্যাপারটা একদমই আশা করছে না সে।

পাথুরে মাটিতে পড়ে ফুটবলের মত ড্রপ খেল চেরিস, ভাঙা হাতটা টেনে না রাখায় পতনের গতি তাকে খাদের কিনারায় এনে ফেলল। ছুটে গিয়ে তার পাঁজরে লাথি মারল রানা। লাথিটা আসছে দেখতে পেল চেরিস, ভাল হাতটা বাড়িয়ে রানার গোড়ালি ধরার চেষ্টা করল। নাগালে পেল না, তার আগেই ফিরে এসেছে রানার পা। লাথি খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে চেরিসের শরীর, আবার ছুটে গিয়ে তার পিঠে লাথি মারল রানা। কিনারা থেকে ছিটকে সামনে চলে গেল সে, নেমে গেল নিচের দিকে।

তার চিৎকার শুনতে পেল রানা, ক্রমশ কমে যাচ্ছে ভলিউম, শরীরটা নিচে পড়ার পর থেমে গেল। নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে উঠল।

বুকের কাছে এখনও শটগানটা আঁকড়ে ধরে আছে রানা, হেলান দিয়ে রয়েছে ল্যাণ্ডক্রুজারের গায়ে, সামান্য হাঁপাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পর সাবধানে সামনে বাড়ল ও, খাদের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল।

পানির কিনারায়, পাথরে মুখ রেখে পড়ে রয়েছে চেরিস, ওর সরাসরি নিচে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত হাত দুটো দু'দিকে মেলা। খাদের কিনারায় পাথুরে মাটিতে ধস্তাধস্তি বা আঁচড়ের কোন দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করল রানা। নেই।

দ্রুত চিন্তা করছে ও। পুলিসকে সব কথা জানাবে? জানাবে ওকে খুন করার জন্যে এখানে আনা হয়েছিল, আত্মরক্ষার জন্যে চেরিসকে ফেলে দিয়েছে খাদে? আইভরির কথা জানাবে? উঁহুঁ, না! এ-দেশের একজন নাগরিককে বিদেশী কোন লোক খুন করলে কর্তৃপক্ষ খেপে যেতে পারে। আত্মরক্ষার চেষ্টাকে ধরা হতে পারে অজুহাত হিসেবে। উঁহুঁ, পুলিসকে রিপোর্ট করলে ফেঁসে যেতে হবে।

সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে গেল পাহাড়ী রাস্তায় ভারি এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে। লো গিয়ারে নেমে আসছে সম্ভবত কোন ট্রাক। তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ডক্রুজারের মেঝেতে শটগানটা লুকিয়ে ফেলল রানা, তারপুলিনে জড়িয়ে। আবার খাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল, ট্রাউজারের জিপার খুলে পিছন ফিরল রাস্তার দিকে। প্রস্রাব করছে।

রানার মাথার অনেক ওপরে, রাস্তার বাঁকে দেখা গেল ট্রাকটাকে, পাহাড় বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ট্রাকের পিছনে উঁচু স্তূপ হয়ে রয়েছে কাঠ ও গাছের গুঁড়ি, চেইন দিয়ে আটকানো। ক্যাবে দু'জন লোককে দেখা গেল, ড্রাইভার আর তার হেলপার।

ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলার একটা ভঙ্গি করল রানা, তারপর চেইন টেনে বন্ধ করল ট্রাউজার। কালো ড্রাইভার ঠোঁট মুড়ে হাসল, ট্রাকটা সগর্জনে পাশ কাটাবার সময় একটা হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে। রানাও হাত নাড়ল।

ট্রাকটা অদৃশ্য হতেই ছুটে ল্যাণ্ডক্রুজারে ফিরে এল রানা। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওর ট্রাক। দুশো গজ এগোবার পর ট্রাক চলাচলের একটা শাখা পথ দেখতে পেল ও, মেইন হাইওয়ে থেকে নেমে গেছে, দেখে মনে হলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয়নি। হাইওয়ে থেকে নেমে এল রানা, নতুন রাস্তা ধরে এগোল। রাস্তার মাঝখানে ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে, গতি বাড়ানো গেল না। পিছনে হাইওয়ে অদৃশ্য হলো এক সময়। ল্যাণ্ডক্রুজার থামাল রানা, পায়ে হেঁটে ফিরে আসছে হাইওয়েতে, আবার কোন ট্রাক আসতে দেখলে গা ঢাকা দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে থাকল।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে চেরিসের লাশটা একবার দেখে নিল রানা। ওর মন বলছে লাশ ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অকুস্থল ত্যাগ করা উচিত। জানে, মালাউয়ের জেলখানা আফ্রিকার অন্যান্য জেলখানার চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয়। বিচার ব্যবস্থাও প্রহসনেরই নামান্তর। তাছাড়া, আহত হাতটা সাংঘাতিক ব্যথা করছে। সংক্রমণ যে শুরু হতে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণটা নষ্ট না করা পর্যন্ত ক্ষতটা দেখতেও রাজি নয় ও।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা ঘুরে নিচে নামার একটা পথ খুঁজে বের করল রানা। পথটা হরিণদের, খাড়া ও আঁকাবাঁকা। চেরিসের কাছে পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগল ওর। গলায় হাত ঠেকাতে সরীসৃপের মত ঠাণ্ডা লাগল। পালস পরীক্ষা করার কোন দরকার নেই। পতনের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে। দ্রুত হাতে তার পকেটগুলো খালি করল রানা। ময়লা একটা পাসবুক পেল, পরিচয়-পত্র বলতে আর কিছু নেই। এটাকে নষ্ট করা দরকার। নোংরা একটা রুমাল আর খুচরো কিছু পয়সা ছাড়া আর শুধু চারটে এসএসজি শটগান কার্টিজ আর কী-কার্ড পাওয়া গেল। কী-কার্ডটা ওয়্যারহাউসের দরজা খোলার কাজে লাগে। রানার প্রয়োজন হতে পারে।

সন্তুষ্টবোধ করল রানা, কারণ পুলিসের কাজ কঠিন করে তুলেছে ও। সহজে তারা চেরিসকে সনাক্ত করতে পারবে না, লাশটা যদি খুঁজে পায়ও। শরীরটাকে গড়িয়ে নদীর কিনারায় নিয়ে এল ও, পায়ের ধাক্কায় ফেলে দিল তীব্র স্রোতের মধ্যে।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাটির দিকে ভেসে গেল লাশটা। তাকিয়ে আছে রানা, ডুবে গেল চেরিস। মনে মনে আশা করল রানা, বাকি কাজটা ওর হয়ে সারবে কুমীর।

ল্যাণ্ডক্রুজারের কাছে ফিরে এল রানা, ইতিমধ্যে হাতটা এমন ব্যথা করছে যেন আগুন জ্বলছে ওখানে। ড্রাইভিং সীটে বসে ওর পাশে প্যাসেঞ্জার সীটে রাখল মেডিকেল বক্স, ক্ষতের জমাট বাঁধা রক্তের সঙ্গে আটকে যাওয়া আস্তিন ধীরে ধীরে খুলল ও। ক্ষতটা দেখে থমথমে হয়ে উঠল চেহারা। নখরের আঁচড় গভীর নয়, তবে এরইমধ্যে হলুদ রসের মত পানি বেরুতে শুরু করেছে, ক্ষতের চারপাশে মাংস হয়ে উঠেছে গরম আর লাল। অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল

রানা। তারপর একটা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জে ব্রড-স্পেকট্র্যাম অ্যান্টিবায়োটিক ভরে বাম হাতের বাইসেপে পুশ করল।

কাজগুলো সারতে সময় লাগল। আবার হাত ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখল প্রায় আটটা বাজে। বাতিল পথটা ধরে পিছিয়ে আনল টয়োটাকে, ফিরে এল পাহাড়ী হাইওয়েতে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথাটাকে ধীরগতিতে পাশ কাটাল রানা, দেখল রাস্তার পাশে ধুলোর ওপর টয়োটার চাকা আর ওর পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে। ওগুলো মুছবে কিনা ভাবল, মনে পড়ল টিমবার লরির ড্রাইভার ওখানে ওকে দেখেছে। কিন্তু না, চাখার সিংকে আইভরি সরাতে বাধা দিতে হলে এখানে আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিলঙউয়ে-তে ফিরে যেতে হবে ওকে।

রাজধানীর দিকে ছুটছে ল্যাণ্ডক্রুজার। গ্রামগুলোকে পাশ কাটাবার সময় স্পীড কমিয়ে আনতে হলো রানাকে, মোষ ও গরুর গাড়িতে তরকারি আর সবজি নিয়ে হাট-বাজারে যাচ্ছে গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা। শহরের কাছাকাছি চলে আসার পর যানবাহনের ভিড় বাড়ল রাস্তায়। সাবধান, একই গতিতে ট্রাক চালাচ্ছে ও, এমন কিছু করছে না যাতে হঠাৎ কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাস্তায় ল্যাণ্ডরোভার আর টয়োটার কমতি নেই, কাজেই ওর ল্যাণ্ডক্রুজার বিশেষভাবে লক্ষ করার মত নয়। তবে ব্যক্তিগত লোগোটার জন্যে তিরস্কার করল নিজেকে, ট্রাকের গায়ে ওটা অত বড় করে আঁকার ব্যাপারে গর্ববোধের খানিকটা ভূমিকা তো ছিল। কিন্তু তখন কে জানত যে বিচার এড়ানোর জন্যে ফেরারি সাজতে হবে ওকে।

রাজধানীতে ল্যাণ্ডক্রুজার নিয়ে ঘোরাঘুরি করাটা বোকামি হয়ে যাবে। সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে এল রানা, পাবলিক কার পার্কে ট্রাক রেখে বেরিয়ে এল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকে পুরুষদের ওয়াশ-রূমে চলে এল, স্পোর্টস গ্রিপ থেকে বের করল স্পেয়ার টয়লেট-কিট আর পরিষ্কার একটা শার্ট। ছেঁড়া, রক্তমাখা শার্ট আর জার্সিটা গোল পাকিয়ে ফেলে দিল রিফিউজ বিন-এ। ক্ষতটা এখনও ব্যথা করছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে গোটা হাত, তবু ওখানে হাত না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। দাড়ি কামাবার পর নতুন শার্টটা পরল, লম্বা আস্তিনে ঢাকা পড়ে গেল ব্যাণ্ডেজটা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। সম্মানী ভদ্রলোক বলেই মনে হলো। 'শালা,' বলে আদর করল নিজেকে, ওয়াশ-রুম থেকে বেরিয়ে এগোল টেলিফোন বুদের দিকে।

খানিক আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটা প্লেন ল্যাণ্ড করেছে, অ্যারাইভাল লাউঞ্জে প্রচণ্ড ভিড়। ওর ওপর কারও নজর নেই। টেলিফোন বুদের ওপরের দেয়ালে পুলিসের জরুরী নাম্বারগুলো বড় করে লেখা রয়েছে। মাউথপীসে রুমাল জড়াল রানা, রিসিভারে কথা বলল সোয়াহিলি ভাষায়।

'ডাকাতি ও খুন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে চাই আমি,' মহিলা পুলিস অপারেটরকে বলল ও। 'তাড়াতাড়ি একজন সিনিয়র অফিসারকে লাইন দিন।'

'দিস ইজ ইন্সপেক্টর মায়রা,' গলার আওয়াজ অত্যন্ত ভারি, কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। 'খুন সম্পর্কে তথ্য আছে আপনার কাছে?'

'মন দিয়ে শুনুন,' বলল রানা, আগের মতই সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলছে। 'একবারই মাত্র বলব আমি। চিউইউই ন্যাশনাল পার্ক থেকে লুঠ করা আইভরি এখানে মানে লিলঙউয়েতে রয়েছে। ডাকাতির সময় অন্তত আটজন লোককে খুন করা হয়। লুঠ করা আইভরি পাবেন টি-চেস্টে, ওগুলো চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানীর ওয়্যারহাউসে আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, কারণ ওগুলো যে-কোন মুহূর্তে সরিয়ে ফেলা হবে।'

'আপনি কে কথা বলছেন, প্লীজ?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি শুধু তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে আইভরিগুলো উদ্ধার করুন,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

অ্যাভিস কার-এর রেন্টাল কাউন্টারে চলে এল ও। কাউন্টারের কালো মেয়েটা ভারি মিষ্টি হাসি উপহার দিল ওকে। নীল একটা ফোক্সওয়াগেন গালফ পেল রানা, ওকে বলা হলো, 'দুঃখিত, রিজার্ভেশন না থাকায় এরচেয়ে ভাল গাড়ি দিতে পারলাম না।'

কারপার্ক ত্যাগ করার আগে ধুলো ঢাকা ল্যাণ্ডক্রুজারের পাশে একবার দাঁড়াল রানা, খানিকটা আড়াল তৈরি করে তারপুলিনে জড়ানো শটগানটা ঢুকিয়ে নিল ফোক্সওয়াগেনের বুটে। বিনকিউলারটা নিতেও ভুলল না।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে রেলওয়ে লাইনের দক্ষিণ দিকটায় থাকল রানা, যানবাহনের ভিড়ে গাড়ি চালাচ্ছে সাবধানে। বাণিজ্যিক অফিস এলাকা ছাড়িয়ে খোলা বাজার এলাকার দিকে যাচ্ছে ও। ওদিকটা আগেই দেখা আছে ওর।

সাড়ে দশটাতেই খোলা বাজারে অসম্ভব ভিড় দেখা গেল। হকাররা রাস্তার ধারে তাদের পণ্য সাজিয়ে বসেছে, খদ্দেররাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এই ভিড়ের মধ্যেই চলাচল করছে বা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক ও মিনি-বাস। রানাকে আড়াল দিল ওগুলো। ছোট্ট নীল ফোক্সওয়াগেনটাকে কয়েকটা মিনি-বাসের মাঝখানে এমনভাবে দাঁড় করাল ও, যাতে গাড়িতে বসেই রেলওয়ে লাইন আর হালকা শিল্পাঞ্চলটা দেখা যায়। বাজারটা উঁচু জায়গায় হওয়ায় সুবিধেটা পাওয়া গেল।

ভাল করে তাকাতে রানা দেখল, চাখার সিং-এর ওয়্যারহাউস আর টয়োটা ওঅর্কশপ থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে রয়েছে ও। এত কাছে যে বিল্ডিঙের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা কোম্পানীর সাইনবোর্ডটা খালি চোখেই পড়া গেল। চোখে বিনকিউলার লাগাতে ওয়্যারহাউস আর প্রধান দরজার সামনেটা পরিষ্কার দেখা গেল। লোডিং র‍্যাম্পে কয়েকজন লোক কাজ করছে, তাদের মুখের ভাবও দেখতে পাচ্ছে রানা।

ওয়্যাহাউসের মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে অনেক ট্রাক, অনেক ট্রাক বেরিয়েও যাচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে বিশাল প্যানটেকনিকন আর ট্রেইলরটা চিনতে পারল রানা। কিন্তু পুলিসী তৎপরতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অথচ ওদেরকে ফোন করার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর মায়রা ঘুষখোর কিনা কে জানে, ভাবল রানা। সদলবলে হানা

দেয়ার আগে সে হয়তো ফোন করে সাবধান করে দেবে চাখার সিংকে, যাতে আইভরিগুলো সরিয়ে ফেলার সময় পায় সে। স্বদেশে এ-ধরনের ঘটনা প্রচুর ঘটে, রানার সন্দেহ হওয়ার সেটাই কারণ। দারিদ্র্য ও দুর্নীতি কোন কোন দেশকে একেবারে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছে।

হঠাৎ সতর্ক হলো রানা। মেইন লাইন থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা লোকোমোটিভ পিছু হটছে। লাইন বদলে শাখায় চলে এল, শাখাটা ঢুকেছে ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্সে। পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে ড্রাইভার।

লোকোমোটিভ আসছে দেখে বাউণ্ডারী ফেন্স-এর গায়ে বসানো জালঘেরা গেট খুলে দিল ওয়্যারহাউসের একজন গার্ড, লাইন ধরে সরাসরি ওয়্যারহাউসের খোলা দরজার দিকে এগোল লোকো, ভেতরে ঢুকল শ্লথগতিতে। রানার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হলো সেটা, তবে কয়েক সেকেণ্ড পর অস্পষ্ট ধাতব আওয়াজ শুনে বুঝল এঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো রেল-ট্রাক। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, তারপর ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে এল লোকো, টেনে আনছে তিনটে রেল-ট্রাককে। ধীরে ধীরে বাড়ল লোকোর গতি।

তিনটে বগিই হেভী ডিউটি ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। চোখে বিনকিউলার, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু ক্যানভাসের নিচে টি-চেস্টগুলো আছে কিনা বুঝতে পারল না।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ফোক্সওয়াগেনের হুইলে ঘুসি মারল রানা, হতাশায় কালো হয়ে গেছে চেহারা। পুলিস এল না কেন? প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে ওদেরকে ফোন করা হয়েছে।

বগিতে অবশ্যই আইভরি আছে, ভাবল রানা। বাইরে পাঠানোর মত অন্য কোন কার্গো র‍্যাম্পে ছিল না কাল রাতে। আইভরিই, কোন সন্দেহ নেই। রওনা হয়ে গেল তাইওয়ানের পথে।

বগি তিনটেকে নিয়ে মেইন লাইনে ফিরে আসছে লোকো। বাজারের সীমানা ঘেঁষে যেতে হবে ওটাকে, রানা যেখানে রয়েছে। ফোক্সওয়াগেন স্টার্ট দিয়ে মেইন রোডে চলে এল ও, স্পীড বাড়িয়ে পাশ কাটাল একটা লরিকে, সরাসরি সামনের লেভেল-ক্রসিঙের দিকে যাচ্ছে। মেইন গুডস ইয়ার্ড-এ পৌঁছুতে হলে এই লেভেল-ক্রসিং পেরোতে হবে লোকোর ড্রাইভারকে।

লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে, ঢং ঢং করে বেজে উঠল একটা ঘণ্টা, রানার সামনে খাড়া ব্যারিয়ারটা নেমে এল সাঁৎ করে। ব্রেক করতে বাধ্য হলো ও। ক্রসিঙের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে এগোল লোকো, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ফোক্সওয়াগেনের সরাসরি সামনে দিয়ে। লোকোর গতি খুব কম দেখে সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেণ্ডও লাগেনি রানার।

হ্যাণ্ডব্রেকে টান দিল ও, এঞ্জিন চালু রেখেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। ব্যারিয়ারের তলা দিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রথম বগিটা এত কাছ দিয়ে চলে গেল যে ইচ্ছে করলে ছুঁতে পারত ও।

বগির গায়ে একটা হোল্ডারে আটকানো রয়েছে রেলওয়েজ কনসাইনমেন্ট

কার্ড। লেখাটা পড়তে কোন অসুবিধে হলো না।

প্রাপক: রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী
গন্তব্য: তাইওয়ান
কার্গো: ২৫০ কেস চা

সন্দেহের আর কিছু থাকল না। চলন্ত ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, রাগে জ্বালা করছে গা। ওর চোখের সামনে দিয়ে আইভরি সরিয়ে ফেলছে ওরা অথচ কিছুই ওর করার নেই।

লাল আলো নিভে গেল, থামল ঘণ্টাধ্বনি, আবার খাড়া হলো ব্যারিয়ার। ফোক্সওয়াগেনের পিছন থেকে হর্ন দিচ্ছে কয়েকটা মিনি-বাস আর ট্রাক। ফিরে এসে গাড়ি ছাড়ল রানা।

খানিকদূর এগিয়ে বামদিকে বাঁক নিল ও, রেললাইনের পাশ দিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা। গাড়ি পার্ক করার জন্যে ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করল, যেখান থেকে রেলওয়ের গুডস ইয়ার্ডটা দেখা যাবে।

চোখে বিনকিউলার তুলে রানা দেখল লম্বা একটা মালবাহী ট্রেনের পিছনে জোড়া লাগানো হলো বগি তিনটে। বগিগুলোর পিছনে থাকল ট্রেনের কিচেন। কিছুক্ষণ পর গুডস ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল ট্রেনটা। সবুজ একটা মেইন লাইন লোকো টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে, রওনা হলো মোজাম্বিক আর বেইরা বন্দরের উদ্দেশে, এখান থেকে পাঁচশো মাইল দূরে।

হতাশা ও রাগে ছটফট করছে রানার মন। কিন্তু কি করতে পারে ও? মাথার ভেতর দ্রুত কয়েকটা আইডিয়া খেলে গেল, আইডিয়া না বলে ফ্যান্টাসী বলাই ভাল। লোকোটা হাইজ্যাক করা যায়! ছুটে যেতে পারে পুলিস হেডকোয়ার্টারে, ট্রেন সীমান্ত পেরোবার আগেই তৎপর হবার দাবি জানাতে পারে।

এ-সব কিছু না করে খোলা বাজারের সীমানায়, আগের জায়গায় ফিরে এল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে নজর রাখল চাখার সিং-এর ওয়্যারহাউস আর টয়োটা ওঅর্কশপের ওপর।

ক্লান্ত লাগছে রানার, তেতো হয়ে আছে মন। হঠাৎ খেয়াল হলো, কাল রাতে ঘুমায়নি ও। আড়ষ্ট হাতটা ব্যথা করছে সারাক্ষণ। ব্যাণ্ডেজটা খুলল ও, সংক্রমণের পরিচিত লক্ষণগুলো না দেখে স্বস্তিবোধ করল। ক্ষতগুলো বরং শুকিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা আবার বাঁধল।

ওয়্যারহাউসের দিকে চোখ, আইভরিগুলো কিভাবে আটকানো যায় ভাবছে রানা।

উপলব্ধি করল, ওর হাত বাঁধা। গোটা ব্যাপারটা এসে শেষ হবে চেরিসের মৃত্যুতে। চাখার সিংকে শুধু একটা আঙুল তুলতে হবে ওর দিকে, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে যাবে ও। না, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মত বোকামি করা চলবে না।

ওয়্যারহাউসের ওপর লক্ষ রাখছে রানা, কল্পনার চোখে কয়েকটা মুখ দেখতে পেল। আলি শাহ, রুমানা, ওদের ছেলেমেয়ে। শোকটা এখনও এত প্রবল যে অসুস্থ বোধ করল ও। 'প্রতিশোধ আমি নেবই,' বিড়বিড় করে যেন ওদেরকে

সান্ত্বনা দিতে চাইল।

গুডস ট্রেন চলে যাবার পর প্রায় দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এই সময় ওয়্যারহাউসের আশপাশে হঠাৎ একটা তৎপরতা লক্ষ করল রানা। মেইন গেটে দেখা গেল চাখার সিং-এর সবুজ ক্যাডিলাক, পিছু পিছু এল বাদামি রঙের দুটো পুলিস ল্যাণ্ডরোভার, দুটো থেকেই ইউনিফর্ম পরা কনস্টেবল যেন উপচে পড়ছে।

গেটে থামল কনভয়টা, গার্ডদের সঙ্গে কি যেন কথা হলো, তারপর গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওয়্যারহাউসের দরজার পাশে থামল গাড়িগুলো। একজন অফিসারের নেতৃত্বে ল্যাণ্ডরোভার দুটো থেকে নামল এগারোজন কনস্টেবল। ক্যাডিলাকের পাশে দাঁড়ানো চাখার সিং-এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলল অফিসার। বিনকিউলার দিয়ে রানা দেখল, চাখার সিংকে হাসিখুশি ও নিরুদ্বিগ্ন লাগছে। তার পাগড়ি ধবধবে সাদা, সুদর্শন মুখে মানিয়েছেও দারুণ।

কনস্টেবলদের নিয়ে ওয়্যারহাউসের ভেতর ঢুকল অফিসার, বেরিয়ে এল এক ঘণ্টা পর, পাশে রয়েছে চাখার সিং। অফিসারের মুখে সবিনয় হাসি, হাত নেড়ে কি যেন বলছে সে। সম্ভবত বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছে। চাখার সিং-এর মুখে সহনশীল, উদার হাসি, বেশ ক'বার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বোধহয় বোঝাতে চাইছে ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। দু'জন অনেকক্ষণ ধরে পরস্পরের করমর্দন করল।

ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে চলে গেল পুলিস। ক্যাডিলাকের পাশে দাঁড়িয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেখল চাখার সিং। রানার মনে হলো, এখন আর হাসছে না সে।

'বাস্টার্ড!' ফিসফিস করল রানা। 'ভেবো না পার পেয়ে গেছো!'

রাগ দমন করে আবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করল ও। সীমান্ত পেরোবার আগে ট্রেনটা থামানো সম্ভব কি? খানিক পর ধারণাটা বাতিল করে দিল। ও জানে, মালবাহী ট্রেনটা বিরতিহীন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে সীমান্তে।

তাহলে পোর্ট অভ বেইরা-তে বাধা দিলে কেমন হয়, দূরপ্রাচ্যগামী স্টিমারে আইভরি তোলার আগে? ধারণাটা খারাপ নয় তবে কাজ হবে কিনা বলা কঠিন। চাখার সিং সম্পর্কে অল্প যে-টুকু জেনেছে ও, তাতে করে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঘুষ প্রদান ও অন্যায় প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তার একটা শক্তিশালী নেটওঅর্ক মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কাজ করছে, জিম্বাবুই আর জাম্বিয়ায় তো বটেই, এবং মোজাম্বিকেই বা নয় কেন, বিশেষ করে ওটা যখন মহাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত আর বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র?

রানা প্রায় নিশ্চিত, ওয়্যারহাউসের ভেতর ব্যাগভর্তি টাকা হাত বদল হয়েছে। অর্থাৎ এ-দেশের ভেতর কর্তৃপক্ষ তাকে সাহায্য করবে। মালাউয়ের বাইরের লোকদের কাছ থেকেও সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করবে সে। মালাউয়ের চারধারে কোন বন্দর নেই, কাজেই মোজাম্বিক বন্দরের ক্যাপটেন, আর্মি, পুলিস আর কাস্টমস অফিসারদের সাহায্য নেবে সে। টাকা খেয়ে চাখার সিং-এর স্বার্থ রক্ষা করবে তারা। রানা সিদ্ধান্ত নিল, তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

গাড়ি চালিয়ে শহরের মাঝখানে মেইন পোস্ট অফিসে চলে এল রানা।

মালাউয়ে পুলিসের কাছে যথেষ্ট সফিস্‌টিকেটেড ইকুইপমেন্ট থাকার কথা নয়, ওর টেলিফোন কল দ্রুত ট্রেস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবু রানা কোন ঝুঁকি নিল না—সংক্ষেপে কথা বলল ও, মাউথপীসে রুমাল জড়িয়ে, সোয়াহিলি ভাষায়।

'ইন্সপেক্টর মায়রাকে জানান, লুট করা আইভরি এগারোটা পঁয়ত্রিশে ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে গেছে। মালবাহী ট্রেনে তুলে বেইরা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আইভরিগুলো আছে টি-চেস্টের ভেতর। প্রাপক রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, তাইপে।'

অপারেটর ওর নাম জিজ্ঞেস করার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল একটা জেনারেল স্টোরে। পুলিস যদি কিছু না করে, দায়িত্বটা ওকেই নিতে হবে।

এক প্যাকেট সেফটি-ম্যাচ, এক রোল সেলোটেপ, এক বাক্স মশার কয়েল আর দুই কিলো হিমায়িত মাংস কিনল রানা। তারপর ফিরে এল ক্যাপিটাল হোটেলে।

হোটেল কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কামরাটা কেউ সার্চ করেছে। ছোট ক্যানভাস ব্যাগটা খুলে দেখল ভেতরে এলোমেলো হয়ে রয়েছে ওর ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র। চাখার সিং-এর কাজে লাগবে এমন কিছু ছিল না ব্যাগটায়। পাসপোর্ট আর ট্রাভেলস চেক ক্যাশিয়ারের ডেস্কে জমা রেখেছে রানা। তবে তল্লাশীটা থেকে প্রমাণ হলো চাখার সিং সম্পর্কে ওর ধারণা ঠিকই আছে। লোকটা শুধু শয়তান নয়, চালাক শয়তান। একটি সংগঠিত অপরাধচক্রের হোতা সে, কোন কৌশলই তার অজানা নেই। রানা ভাবল, ঠিক আছে, আমিও দেখতে চাই কতটা দৌড় তোমার। তবে তার আগে ঘুম দরকার ওর।

বাহুর ড্রেসিং বদল করল রানা, আরেকটা ইঞ্জেকশন পুশ করল, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়।

প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঘুমাল ও, তারপর শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাল। ক্লান্তি দূর হওয়ায় তাজা ও ঝরঝরে লাগছে শরীরটা, সেই সাথে মনটাও শান্ত ও খুশি। সন্দেহ নেই এমনকি ঘুমের মধ্যেও ব্যস্ত ছিল মাথাটা, কারণ রাইটিং-ডেস্কে বসার পর ওর প্ল্যানের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পেল ও। জেনারেল স্টোর থেকে কেনা জিনিসগুলো ওর সামনে ডেস্কের ওপর সাজানো রয়েছে। প্রথমেই মশার একটা কয়েল জ্বালল ও। তারপর কাজ শুরু করল, লক্ষ রাখল কি হারে পুড়ছে ওটা।

সবগুলো ম্যাচ-বক্স থেকে কাঠি বের করল রানা, প্রতিটি কাঠির মাথা থেকে ছুরির সাহায্যে চেছে আলাদা করল বারুদ। বাতিল কাঠিগুলো ফেলে দিল ওয়েস্ট-পেপার বিন-এ। বারুদগুলো কাগজের মোড়কে ভরল আবার, তারপর টেপ দিয়ে আটকাল।

ওর মুঠোর আকৃতি পেল মোড়কটা, ছোট্ট আগুনে বোমা হিসেবে দারুণ কাজ দেবে। ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে মশার কয়েল কি হারে পুড়ছে—প্রতি আধ ঘণ্টায় দু'ইঞ্চির মত। ধোঁয়ার গন্ধটা সহ্য হয় না রানার, হাঁচি পায়, কাজেই

কয়েলটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল টয়লেটে।

ডেস্কে ফিরে এসে নতুন দুটো কয়েল পাঁচ ইঞ্চি লম্বা করে কাটল, পুড়তে সময় নেবে এক ঘণ্টার কিছু বেশি। হাতে তৈরি আগুনে বোমার ফিউজ ওগুলো, দ্বিতীয়টা ব্যাক-আপ হিসেবে কাজ করবে প্রথমটা ব্যর্থ হলে। বারুদ ভরা প্যাকেটটা ফুটো করল রানা, ফুটোর ভেতর কয়েলের প্রান্তগুলো ঢোকাল, টেপ দিয়ে আটকাল যাতে জায়গামত থাকে।

এরপর নিচে নেমে এসে ডিনার খেল। ডিনারে বসে ইচ্ছে হলো খানিকটা হুইস্কি খায়। নিজেকে মানা করল, সামনে বিপজ্জনক কাজ রয়েছে।

ডিনারের পর টেলিফোন গাইড উল্টে চাখার সিং-এর বাড়ির ঠিকানা বের করল রানা। টাউন ম্যাপের ভাঁজ খুলে দেখে নিল রাস্তাটা। নিচে নেমে চড়ে বসল ফোক্সওয়াগেনে, প্রায় ফাঁকা ও নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। চাখার সিং সুপারমার্কেটের আলোকিত সামনেটা দূর থেকে দেখতে পেল ও। স্বাভাবিক গতিতে পাশ কাটিয়ে এল জায়গাটা। তারপর গোটা এলাকাটা চক্কর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল। বিল্ডিংটার পিছনের গলিতে আবর্জনা ভরা ব্যাগ আর খালি কার্ডবোর্ড বাক্সের স্তূপ দেখল ও, সুপারমার্কেটের পিছনের দেয়ালে ঠেকে রয়েছে, সময়মত নিয়ে যাবে পৌরসভার গাড়ি। আবর্জনা-স্তূপের ওপর, পাঁচিলের মাথায় স্মোক ডিটেকটর দেখে খুশি হলো ও, বুঝল ফায়ার-ওয়ার্নিং সিস্টেমের একটা অংশ ওটা।

ওখান থেকে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল রানা। প্রায় খালি এয়ারপোর্ট কারপার্কে ল্যাণ্ডক্রুজারটা এখন নজর কাড়ছে। লক্ষ রাখার কথা বলে অ্যাটেনড্যান্টকে ক'টা টাকা দিল ও, তারপর ট্রাকের পিছনের দরজা খুলে মেডিকেল বক্সের ভেতরটা হাতড়াল, খুঁজে নিল স্লিপিং ক্যাপসুল ভরা প্লাস্টিকের বোতলটা।

স্ট্রীট ল্যাম্পের নিচে ফোক্সওয়াগেন থামাল রানা। কোলের ওপর রেখে কিমা করা মাংসের প্লাস্টিক ব্যাগটা খুলল। ইতিমধ্যে নরম হয়ে গেছে মাংস। নখের সাহায্যে স্লিপিং ক্যাপসুলগুলো খুলে সাদা পাউডার ঢালল মাংসের ওপর। পঞ্চাশটা ক্যাপসুল ব্যবহার করল ও। জানে, এই মাংস খাওয়াতে পারলে বড় আকারের একটা হাতিকেও অচল করে দেয়া যাবে। গুঁড়ো ওষুধ কুচি করা মাংসের সঙ্গে ভাল করে মেশাল ও।

গাড়ি চালিয়ে গভর্নমেন্ট হাউস আর স্টেট হাউসের পিছনে, অভিজাত এলাকায় চলে এল রানা। চাখার সিং-এর বাড়িটা এখানেই। বাড়িটার সামনে দুই বা তিন একর জায়গা জুড়ে শুধু লন আর বাগান। পাশ কাটিয়ে এল ও, গাড়ি থামাল প্রায় অন্ধকার রাস্তায়। তারপর ফুটপাত ধরে ফিরে চলল।

চাখার সিং-এর বাড়িটাকে ঘিরে থাকা বেড়ার পাশে আসতেই দুটো গাঢ় আকৃতি বিচ্ছিন্ন হলো ছায়া থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ার জালে। জার্মান রটওয়েইলার্স, চিনতে পারল রানা। ওর রক্ত পান করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কুকুর দুটো। হায়েনার পর রটওয়েইলার্সই রানার সবচেয়ে অপ্রিয় জানোয়ার। ফুটপাত ধরে, বাড়িটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটছে ও, বেড়ার

ওপারে ওর পাশাপাশি হাঁটছে কুকুর দুটো।

সামনে ড্রাইভওয়েতে ঢোকার গেট। রানা লক্ষ করল, চেইনের সঙ্গে ঝুলন্ত তালাটা আসলে জটিল কিছু নয়, হাতে পেপার ক্লিপ থাকলে দু'মিনিটের কাজ।

ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রটওয়েইলার্স দুটো, কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরল রানা, ঢুকে পড়ল অন্ধকার একটা গলিতে। পকেট থেকে ওষুধ মেশানো মাংসের প্যাকেটটা বের করল ও, ভাগ করল দুটো সমান ভাগে। আবার আগের পথ ধরে ফিরে আসছে ও।

কুকুর দুটো ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। বেড়ার ওপর দিয়ে এক ভাগ মাংস ছুঁড়ে দিল ও, শূন্যে থাকতেই একটা কুকুর হাঁ করা মুখে আটকাল সেটা, এক ঢোকে গিলে ফেলল। এবার মাংসের দ্বিতীয় ভাগটাও ছুঁড়ল ও, দেখল সেটাও এক ঢোকে গিলে ফেলা হলো।

ফোক্সওয়াগেনে চড়ে শহরে ফিরে এল রানা। সুপারমার্কেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে থামল, গাড়িতে বসেই বারুদ ভরা মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসা মশার কয়েলের প্রান্ত দুটোয় আগুন দিল। ফুঁ দিয়ে শিখা নেভাল, দেখে নিল ভালভাবে পুড়ছে কিনা।

গাড়ি থেকে নেমে শান্তভাবে হাঁটছে রানা। একটু পরই সুপারমার্কেটের পিছনের গলিতে পৌঁছে গেল। আগুনে বোমাটা খালি একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে ফেলল ও, হাঁটার গতি না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল গলি থেকে।

ফোক্সওয়াগেনে বসে হাতঘড়ি দেখল রানা। দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। আবার গভর্নমেন্ট হাউসের পিছনে চলে এল ও, গাড়ি থামাল চাখার সিং-এর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে।

হাতে কালো লেদার গ্লাভস পরল রানা। ড্রাইভিং সীটের তলা থেকে শটগানটা বের করল, হালকা তারপুলিন দিয়ে এখনও মোড়া রয়েছে। অস্ত্রটা খুলে তিনটে আলাদা ভাগ করল, প্রতিটি পার্টস মুছল সযত্নে, যাতে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকে। তারপর ফোরস্টক-এর সঙ্গে জোড়া লাগাল ডাবল ব্যারেল। ফোক্সওয়াগেন থেকে নেমে ব্যারেলগুলো ট্রাউজারের একটা পায়ার ভেতর ঢুকিয়ে দিল, ব্রীচ আর বাটস্টক থাকল ওর লেদার জ্যাকেটের তলায়।

প্যান্টের ভেতর ব্যারেল থাকায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, তবে সবাইকে দেখিয়ে অস্ত্র বহন করার চেয়ে একটু খোঁড়ানো ভাল। কতক্ষণ পর পর এই এলাকায় টহল দেয় পুলিস জানা নেই ওর। পকেটে হাত ভরল রানা, দেখে নিল স্পেয়ার কার্ট্রিজ আর ওয়্যারহাউসের চাবি আছে কিনা। আড়ষ্ট পা টেনে হাঁটছে ও, যাচ্ছে চাখার সিং-এর বাড়ির দিকে।

বাড়িটার কোণে পৌঁছুল ও, বেড়ার ওপার থেকে কোন কুকুর ওকে অভ্যর্থনা জানাল না। মৃদু শিস দিল রানা, তারপরও এল না তারা। তারমানে ওষুধে কাজ হয়েছে। গাড়িপথে ঢোকার গেটে ওর হিসেবের চেয়ে কম সময় ব্যয় হলো, পেপার-ক্লিপের সাহায্যে তালাটা খুলতে এক মিনিটের বেশি লাগল না। গেটটা পুরোপুরি খোলা রেখে লনের ওপর দিয়ে এগোল রানা, কাঁকর ছড়ানো গাড়িপথটাকে এড়িয়ে।

মালাউয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জাম্বিয়ার মত খারাপ নয়, তবু চাখার সিং-এর বাড়িতে নাইট গার্ড থাকবে বলে ধারণা করল ও। কিন্তু না, কেউ ওকে চ্যালেঞ্জ করল না। দেখা যাচ্ছে মানুষের চেয়ে জানোয়ারদের ওপরই চাখার সিং-এর বেশি আস্থা।

বাগানে ঢুকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল পেয়ে গেল রানা, এখান থেকে বাড়িটার মূল অংশের ওপর চোখ বুলাল। নিচু র‍্যাঞ্চহাউসের স্টাইলে বানানো হয়েছে বাড়িটা, জানালাগুলো বিশাল, প্রায় সবগুলোই খোলা আর আলোকিত। মাঝেমধ্যে পর্দার গায়ে সচল ছায়া পড়তে দেখল ও। ছায়ার আকৃতি দেখে আন্দাজ করল কে মা আর কে মেয়ে।

জোড়া গ্যারেজ মূল ভবনের লাগোয়া। একটা দরজা খোলা, ভেতরে সবুজ ক্যাডিলাক চকচক করছে। তার মানে চাখার সিং বাড়িতেই আছে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে শটগানটা জোড়া লাগাল রানা, ব্রীচে ভরল দুটো এসএসজি কার্ট্রিজ। কাছ থেকে গুলি করলে একটা লোককে কেটে দু'টুকরো করবে এই বুলেট। অ্যাকশন ক্লোজ করল ও, সেট করল সেফটি-ক্যাচ। জানালা থেকে আসা আলো হাতঘড়ির ডায়ালে ফেলার জন্যে কব্জিটা ঘোরাল, চোখ বুলাল আলোকিত সংখ্যাগুলোর ওপর। এখন থেকে আনুমানিক বিশ মিনিট পর, নির্ভর করে মশার কয়েল কি হারে পুড়ছে তার ওপর, বারুদ ভরা কাগজের মোড়কটা বিস্ফোরিত হবে। আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরে যাবে, চারদিক ঢাকা পড়ে যাবে ধোঁয়ায়। আগুন ধরার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বেজে উঠবে ফায়ার অ্যালার্ম।

খোলা লনের ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল রানা, বাড়ির জানালাগুলোর দিকে চোখ। পায়ের তলায় কিচকিচ আওয়াজ করল কাঁকর, তারপর গ্যারেজের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। চিৎকার হবে, পেশী শক্ত করে অপেক্ষা করল, কিন্তু কোন শব্দ হলো না। ক্যাডিলাকের দরজাগুলো পরীক্ষা করল ও। সবগুলোয় তালা দেয়া।

গ্যারেজের দেয়ালে একটা দরজা রয়েছে, নির্ঘাত মূল ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত। এই দরজা দিয়েই গ্যারেজে ঢুকবে চাখার সিং।

ফায়ার অ্যালার্ম বাজার খবর পেয়ে গ্যারেজে ঢুকবে সে, তার আগে আরও অন্তত পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হবে রানাকে। অপেক্ষা করছে ও, বিবেক ও নীতিবোধ প্রশ্ন তুলল ওর মনে। কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

চেরিস খুন হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে রানা। তবে ঠাণ্ডা মাথায় আগেও অনেক খুন করেছে ও। ওর পেশায় টিকে থাকতে হলে মাঝে-মধ্যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে খুন না করে কোন উপায় থাকে না। যদিও কোন হত্যাই আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় না রানাকে। দেশপ্রেমিক হিসেবে এসপিওনাজ জগতে আছে ও, মাতৃভূমির স্বার্থ রক্ষার জন্যে নির্বাচিত একজন সৈনিক, এবং খুন-খারাবি একজন সৈনিকের দায়িত্ব হলেও প্রতিটি হত্যাকাণ্ড ঘটাবার পর এক ধরনের অপরাধবোধে জর্জরিত হতে হয় ওকে।

তারপরও আজ আবার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা। ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব কষে। প্রশ্ন উঠল, আলি শাহ যাদের দ্বারা খুন হয়েছে তাদেরকে সে

খুন করবে, এভাবে চিন্তা করাটা কি ঠিক হচ্ছে? কোন বিচারক রায় দেননি, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেননি, তারপরও কোন্ অধিকারে একজনের প্রাণ কেড়ে নিতে চায় সে?

তারপর রুমানা আর ওদের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ল। আক্রোশে হাঁপিয়ে উঠল রানা। এই মুহূর্তে নাগাল পেলে জেরা করার ঝামেলায় যাবে না, সরাসরি গুলি করে মেরে ফেলবে চাখার সিংকে। রানা বিশ্বাস করে, এটা ওর পবিত্র একটা কর্তব্য-ষোলো আনা প্রতিশোধ নেয়া। যারা দায়ী তাদের একজনকেও বাঁচতে দেবে না ও। এ-ও জানে, খুনগুলো ঘটাবার পর অদ্ভুত এক অপরাধবোধ জাগবে মনে, তবু দায়িত্ব ত্যাগ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

দরজার ভেতর কোথাও টেলিফোন বেজে উঠল। নড়ে উঠল রানা, আরও শক্ত করে ধরল শটগানটা। এক মিনিট পর দ্রুতগতি পায়ের শব্দ ঢুকল কানে, দরজার ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে। তালা খোলার আওয়াজ হলো। দড়াম করে দেয়ালে বাড়ি খেল কবাট। গ্যারেজে ঢুকল এক লোক। আলো রয়েছে লোকটার পিছনে, মাথায় পাগড়ি না থাকায় প্রথম এক মুহূর্ত চাখার সিংকে চিনতে পারল না রানা। ক্যাডিলাকের পাশে চলে এল লোকটা। চাবির শব্দ হলো, কী-হোল খুঁজছে সে। না পেয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল, তারপর দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে অন করল আলোর সুইচ।

আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গ্যারেজ।

মাথায় পাগড়ি না থাকলেও চাখার সিং-এর না কাটা চুল আর দাড়ি মোচড় খেয়ে খুলির মাঝখানে একটা মস্ত খোঁপার মত হয়ে আছে। রানার দিকে খানিকটা পিছন ফিরে রয়েছে সে, ক্যাডিলাকের দরজার তালায় চাবি ঢোকাল।

এগিয়ে এসে তার পিছনে দাঁড়াল রানা, পিঠে ঠেকাল শটগানের মাজল। 'বীরত্ব দেখিয়ে কিছু করতে যাবেন না, মি. চাখার। আপনারই শটগান আপনার শিরদাঁড়ায় ঠেকে আছে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল চাখার সিং। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে, হাঁ হয়ে আছে মুখ। 'কিন্তু...তুমি...' শুরু করলেও, নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনার প্ল্যানে কাজ হয়নি। চেরিসের ঘিলু খুব কম, না বলে পারছি না। তাকে আপনার অনেক আগেই বরখাস্ত করা উচিত ছিল। এবার গাড়ির ওই দিকে চলে যান, তবে সাবধানে নড়াচড়া করবেন। প্লীজ লেট আস কীপ আওয়ার ডিগনিটি।'

শিখ লোকটার পিঠে মাজলের গুঁতো মারল রানা, পাতলা সুতী শার্টের ভেতর চামড়া ছিলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট জোরে। খাকি রঙের স্ল্যাকস আর ওই শার্টটাই শুধু পরে আছে সে, পায়ে স্যাণ্ডেল। বোঝাই যায়, ব্যস্ত হাতে কাপড় পরেছে সে।

ক্যাডিলাকের রেডিয়েটর গ্রিলকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজার কাছে চলে এল ওরা।

'দরজাটা খুলুন। ভেতরে ঢুকুন,' নির্দেশ দিল রানা।

নরম, আরামদায়ক সীটে বসল চাখার সিং; তাকিয়ে আছে শটগানের

ব্যারেলের দিকে, তার মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। যতটা না গরম পড়েছে তারচেয়ে বেশি ঘামছে সে। টিয়া পাখির মত বাঁকা নাকে ঘামের বিন্দু জমেছে। জুলফির কাছ থেকে মোটা ধারায় গড়াচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে দাড়ি। তার মুখ থেকে মাংস ও এলাচের গন্ধ বেরুচ্ছে। তবে ক্যাডিলাকের চাবি রানার দিকে বাড়িয়ে দেয়ার সময় তার চোখে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠল।

'তুমি...আপনি গাড়ি চালাবেন? এই নিন চাবি, কোন আপত্তি নেই। চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন। নিজেকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম, পুরোপুরি।' হাসি হাসি মুখ করল চাখার সিং। 'আমার ভাষা বোঝেন তো? হে হে, বুঝবেন না কেন—নেভার মাইণ্ড, এক অর্থে বলা যায় একই দেশের মানুষ আমরা,' হিন্দী ভাষায় কথাগুলো বলল সে।

'নাইস ট্রাই, মি. সিং। তবে শটগানটা মুহূর্তের জন্যেও আপনার দিক থেকে সরবে না। ড্রাইভিং সীটে সরে বসুন, সাবধানে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সরে যাচ্ছে চাখার সিং, শটগানের মাজল দিয়ে তাকে গুঁতো মারল রানা। 'তাড়াতাড়ি করুন।'

'আসলে কি চান আপনি, মি. রানা?'

'কথা নয়, একদম চুপ!' প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে পড়ল রানা। শটগানটা কোলের ওপর, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে কেউ দেখতে পাবে না, তবে মাজলটা ঠেকে আছে চাখার সিং-এর নিচের দিকের পাঁজরে। খালি হাতটা দিয়ে দরজা বন্ধ করল ও। 'এবার স্টার্ট দিন। রাস্তায় বের করুন গাড়ি।'

লনের ওপর হেডলাইটের আলো পড়তে দূরে দেখা গেল ঘাসের ওপর নিঃসাড় পড়ে রয়েছে একটা কুকুর।

'আমার কুকুর...আমার মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় ওগুলো!'

'সুযোগ থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিতাম,' বলল রানা। 'তবে ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে কুকুরটা, মরেনি।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্যাডিলাক। 'আমার দোকান, শহরে আমার সুপারমার্কেটে আগুন লেগেছে। বোধহয় আপনিই দায়ী, মি. রানা। ওখানে আমার কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুঁজি খাটছে...।'

'সত্যি আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত, মি. সিং,' বলল রানা। 'জীবন বড় কঠিন, তাই না? তবে আপনার আর কি ক্ষতি হবে, ক্ষতি যা হবার বীমা কোম্পানীর হবে। তা আপনি হঠাৎ আমাকে এত সম্মান দেখাচ্ছেন কেন বলুন তো? যতদূর মনে পড়ে, এর আগে আপনি আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করেছেন।'

'মানুষ ভুল করে না?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। 'তাছাড়া আপনি আমার ছেলের বয়েসী, তুমি তো বলতেই পারি।'

'না, আপনিই বলুন,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এবার ওয়্যারহাউসের দিকে গাড়ি চালান।'

'ওয়্যারহাউস? কোন ওয়্যারহাউস?'

'যেখানে আপনার আর চেরিসের সঙ্গে আজ ভোররাতে আমার দেখা

হয়েছিল, মি. সিং। এবার চিনতে পারছেন?'

ওয়্যারহাউসের দিকেই গাড়ি চালাচ্ছে চাখার সিং, এখনও দরদর করে ঘামছে সে। বন্ধ ক্যাডিলাকের ভেতর রসুন আর এলাচের গন্ধ বেশি করে পাচ্ছে রানা। খালি হাতটা দিয়ে এয়ার-কণ্ডিশনিং অ্যাডজাস্ট করল ও।

কেউ কোন কথা বলছে না, তবে ঘন ঘন রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাচ্ছে চাখার সিং—বোঝা যায়, সাহায্য পাবার আশায় আছে সে। তবে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকাই বলা যায়।

শিল্পাঞ্চলে ঢোকার মুখে ট্রাফিক লাইটে থামল ক্যাডিলাক। পিছন থেকে হেডলাইটের আলো পড়ল ক্যাডিলাকের ভেতর, তারপর একটা ল্যাণ্ডরোভার এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাশে। বাদামি রঙ গাড়িটার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা দেখল, ইউনিফর্ম পরা দু'জন কনস্টেবল বসে রয়েছে।

ওর পাশে আড়ষ্ট হলো চাখার সিং, নিজেকে যেন গুটিয়ে নিচ্ছে লোকটা। চুপিসারে তার দিকের দরজার কাছে পৌঁছে গেল একটা হাত।

'প্লীজ, মি. সিং,' বলল রানা, কথায় হাসির সুর। 'এ-ধরনের ভুল করবেন না। রক্ত আর নাড়িভুঁড়ি ছড়িয়ে থাকলে আপনার ক্যাডিলাকের রিসেল ভ্যালু কমে যাবে।'

ধীরে ধীরে চুপসে গেল চাখার সিং। পুলিস কনস্টেবলদের একজন ল্যাণ্ডরোভার থেকে এখন তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

'হাসুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসুন।'

মাথাটা ঘোরাল চাখার সিং, খোঁচা খাওয়া কুকুরের মত মুখ বিকৃত করল। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে তাকাল কনস্টেবল। ট্রাফিক সিগন্যাল বদলে গেল, সামনে বাড়ল ল্যাণ্ডরোভার।

'ওদেরকে আগে থাকতে দিন,' নির্দেশ দিল রানা।

পরবর্তী মোড়ে বাম দিকে ঘুরল ল্যাণ্ডরোভার।

'দারুণ সহযোগিতা করেছেন,' বলল রানা। 'আপনার আচরণে আমি সন্তুষ্ট।'

'আমরা অসভ্য নই, মি. রানা—আপনি বা আমি। সভ্য মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করে। জানতে পারি, কি কারণে আপনি আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছেন?'

'আবার ইয়ার্কিও মারা হচ্ছে!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'আপনার কোন ধারণা নেই কতটুকু খারাপ ব্যবহার করা হবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী।'

'ইয়ার্কি? মস্করা? ওহ্ নো! বিলিভ মি, আপনার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই আমি। ঠিক আছে, আইভরি নিয়েই কথা হোক। কিন্তু আইভরি আপনার উদ্বেগ হয় কি করে?'

'আইভরি চুরি হলে যে-কোন ভাল লোকই উদ্বিগ্ন হবে। তবে আপনি ঠিক ধরেছেন। ওটা আসল কারণ নয়।'

'তাহলে আসুন চেরিসের হাতে আপনাকে তুলে দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি। ওটা ব্যক্তিগত কিছু ছিল না। নিজের বিপদ নিজেই আপনি ডেকে এনেছিলেন। নিজেকে আমি রক্ষা করার চেষ্টা করলে আপনি আমাকে দোষ দিতে

পারেন না। আপনার শরীরে বা সম্মানে যদি কোন আঘাত লেগে থাকে, খুশি মনে ক্ষতিপূরণ দেব আমি। নেভার মাইণ্ড, আসুন আমরা বরং একটা সংখ্যা নিয়ে আলাপ করি। দশ হাজার ডলার। মার্কিন, অবশ্যই।' হাসি হাসি মুখ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল চাখার সিং।

'এটাই কি আপনার শেষ প্রস্তাব? না বলে পারছি না, কৃপণতার চূড়ান্ত করছেন আপনি!'

'হ্যাঁ, ঠিক, কম হয়ে গেছে। বেশ, তাহলে পঁচিশ হাজার···না, যান, পঞ্চাশই নিন। পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার।'

'আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিল আলি শাহ,' মৃদু, নরম সুরে বলল রানা। 'তার বউ ছিল ভারি লক্ষ্মী একটা মেয়ে। ওদের তিন ছেলেমেয়ে-দুটো মেয়ে, একটা ছেলে। আলি শাহ্ তার ছেলের নাম রেখেছিল আমার নামে···।'

'এবার আপনি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছেন, মি. রানা, নেভার মাইণ্ড। আলি শাহ্ কে?' জানতে চাইল চাখার সিং। 'ঠিক আছে যান, তার বাবদেও পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া গেল। সব মিলিয়ে এক লাখ মার্কিন ডলার। নগদ গুণে দেব আপনাকে, আপনি হেঁটে চলে যাবেন। দু'জনেই এই বোকামির কথা ভুলে যাব। ব্যাপারটা ঘটেইনি। আমি ঠিক বলছি, মি. রানা?'

'একটু দেরি হয়ে গেছে, মি. সিং। আলি শাহ ছিল চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে চীফ ওয়ার্ডেন।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল চাখার সিং। 'ওই ব্যাপারটার জন্যে সত্যি আমি সাংঘাতিক দুঃখিত, মি. রানা। ঘটনাটা আমার নির্দেশে ঘটেনি···' তার ভঙ্গুর কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের কাঁপন লক্ষ করার মত। 'ওই ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিই আমি জড়িত নই। জড়িত আসলে···জড়িত আসলে ওই চীনা ভদ্রলোক।'

'তাহলে চীনা ভদ্রলোক সম্পর্কে বলুন আমাকে।'

'বললে আপনি আমার ক্ষতি করবেন না? কসম?'

মনে হলো বেশ সময় নিয়ে বিবেচনা করছে রানা। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল ও। 'আপনার ওয়্যারহাউসে যাব আমরা, নিরিবিলিতে বসে ব্যাপারটা নিয়ে কথা হবে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড সম্পর্কে আপনি যা জানেন সব আমাকে বলবেন, তারপর আপনাকে আমি ছেড়ে দেব-কোন ক্ষতি না করে।'

রানার দিকে ফিরল চাখার সিং, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আভায় ভাল করে দেখল ওকে, তারপর বলল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করলাম, মি. রানা। আমার ধারণা কথা দিয়ে কথা রাখার লোক আপনি।'

'আপনার ধারণা নির্ভুল, মি. সিং,' আশ্বস্ত করল রানা। 'গাড়িতে আর কোন কথা নয়, কেমন? ওয়্যারহাউসে চলুন।'

স মিল পাশ কাটিয়ে এল ওরা। কাঠ বোঝাই উঠন দিনের মত আলোকিত। লম্বা শেডের ভেতর কাজ করছে শ্রমিকরা।

'ব্যবসা খুব ভালই মনে হয়, মি. সিং। রাতেও কাজ করাচ্ছেন।'

'হপ্তাশেষে বড় একটা চালান যাবে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'লাভটা ভোগ করার জন্যে অন্তত এই ক'টা দিন বেঁচে থাকতে চাইবেন আপনি, কাজেই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

রাস্তার শেষ মাথায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়্যারহাউস। মেইন গেটের সামনে গাড়ি থামাল চাখার সিং। গেট হাউসের ভেতর লোক বা আলো নেই।

'লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ,' বলল চাখার সিং, ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যাডিলাকের কন্ট্রোলের দিকটা ইঙ্গিত করল। 'আপনার দিক থেকে গেট অপারেট করতে হবে।' রানার হাতে একটা প্লাস্টিক-কোটেড ইলেকট্রনিক কী-কার্ড ধরিয়ে দিল সে। এই একই কার্ড চেরিসের কাছ থেকেও পেয়েছে রানা।

জানালার কাঁচ নামিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকল রানা, কার্ডটা কন্ট্রোল বক্সের ফাঁকে চেপে ধরল। খুলে গেল গেট, গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল চাখার সিং। ওদের পিছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল গেট।

'আপনার চিতা-গার্ড নিশ্চয় অনেক খরচ বাঁচিয়ে দিচ্ছে,' আলাপী সুরে কথা বলছে রানা, তবে চাখার সিং-এর পাঁজরে শটগানের চাপ একটুও কমায়নি। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝি না, ওটাকে আপনি অমন খেপিয়ে রাখেন কিভাবে? আমার অভিজ্ঞতা বলে, খোঁচা না দিলে চিতা কখনও কোন মানুষকে আক্রমণ করে না।'

'কথাটা ঠিক।' মৌখিক চুক্তি হবার পর চাখার সিং আগের চেয়ে অনেক শান্ত। তার ঘাম ঝরাও বন্ধ হয়ে গেছে। খানিকটা উৎসাহের সুরেই কথা বলছে সে। 'যার কাছ থেকে কিনি, সেই আমাকে পরামর্শটা দিয়েছিল। দিন কয়েক পর পর শয়তানটাকে ব্যথা দিতে হয়, নেভার মাইণ্ড। ওটার লেজের তলায় গরম লোহা ব্যবহার করি আমি···,' হেসে উঠল সে, এবার নির্ভেজাল মজা পেয়ে। 'আহ্, যদি দেখতেন কী রকম খেপে শালী! ওরকম চেঁচামেচি জীবনে আপনি শোনেননি।'

'আপনি ওটাকে ইচ্ছা করে খেপান? খেপিয়ে তোলার জন্যে কষ্ট দেন?' রানা বিস্মিত ও আহতবোধ করল, কথার সুরে ঘৃণা আর রাগ চাপা থাকল না।

'আরও যোগ্য ও দক্ষ করার জন্যে এক ধরনের ট্রেনিং মাত্র। জানি পশু-প্রেমিকদের পছন্দ হবে না ব্যাপারটা। সামান্য জখম, শুধু চামড়া আর খানিকটা চর্বি পোড়ে, শুকাতে বেশি সময় লাগে না।'

ওয়্যারহাউসের সামনে গাড়ি থামাল চাখার সিং। রোলার ডোর খোলার জন্যে কী-কার্ডটা আরেকবার ব্যবহার করল রানা। ভেতরে ঢুকল ওরা, পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'ওদিকে, লোডিং র‍্যাম্পে পার্ক করুন,' নির্দেশ দিল রানা। হেডলাইটের আলোয় গুহাসদৃশ ওয়্যারহাউস আলোকিত হয়ে উঠল। আগের মতই মাল-পত্রে ঠাসা দেখল রানা।

র‍্যাম্পের দিকে এগোচ্ছে ক্যাডিলাক, মুহূর্তের জন্যে হেডলাইটের পুরো আলোয় ধরা পড়ল চিতাবাঘ। নিখুঁত চৌকো আকৃতিতে সাজিয়ে স্তূপ করা হয়েছে অনেকগুলো প্যাকিং-কেস, স্তূপটার মাথায় গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে সে। আলো লাগতেই মাথা নিচু করে গর্জে উঠল, হলুদ চোখ জ্বলজ্বল করছে, খেঁকিয়ে ওঠার

ভঙ্গি করে ভাঁজ তুলল ঠোঁটে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে প্যাকিং কেসের আরেকটা স্তূপের আড়ালে চলে গেল।

'চণ্ডীর মুখে জখমটা দেখলেন?' অভিমান ও নরম অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। 'ওটা আপনার কীর্তি, অথচ তারপরও আপনি আমাকে নিষ্ঠুর বলে দোষ দেন, মি. রানা। শয়তানটা এই মুহূর্তে সাংঘাতিক খেপে আছে, কোনভাবে সামলানো যাচ্ছে না। ওটাকে হয়তো মেরেই ফেলতে হবে আমার। বড় বেশি বিপজ্জনক, এমন কি আমার বা আমার লোকদের জন্যেও।'

'এখানেই আলাপ করা যায়,' বলল রানা, চাখার সিং-এর কথায় গুরুত্ব দিল না। 'হেডলাইট নেভান, এঞ্জিন বন্ধ করুন।' হাত বাড়িয়ে ক্যাডিলাকের কেবিন লাইটের সুইচ অন করল ও, হেডলাইট নিভে যেতে গাড়ির ভেতরে নরম আভা থাকল শুধু।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ওরা, তারপর শান্তভাবে প্রশ্ন করল রানা, 'তাহলে বলুন, মি. সিং, কখন ও কোথায় চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হলো আপনার।'

'প্রায় তিন বছর আগে। এক বন্ধু আমাকে জানাল, আইভরি ও অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে আগ্রহ আছে ভদ্রলোকের, ও-সব আমি তাকে সাপ্লাই দিতে পারি।'

'অন্যান্য জিনিসগুলো কি?'

ইতস্তত করছে চাখার সিং, তার পাঁজরে শটগানের গুঁতো মারল রানা। 'কি কথা হয়েছে, এরইমধ্যে ভুলে গেলেন?'

'ডায়মণ্ড...' কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করল চাখার সিং। 'নামিবিয়া আর অ্যাঙ্গোলা থেকে। সান্দওয়ানা থেকে পান্না...'

'দেখা যাচ্ছে সাপ্লাই পাবার বহু উৎস আছে আপনার, মি. সিং।'

'আমি একজন ব্যবসায়ী, মি. রানা। ব্যবসায় আমি ভাল করছি, বোধহয় খুব ভাল করছি। সেজন্যেই মি. গণ্ড আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চান।'

'লাভের বিনিময়ে পরস্পরকে আপনারা সাহায্য করতে রাজি হন, তাই তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং 'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ব্যবহার করার সুযোগ ছিল তাঁর। সম্পূর্ণ নিরাপদ শিপমেন্ট...।'

'তবে পাচারের মাল বেশি ভারি হয়ে গেলে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরা যায় না,' বলল রানা। 'এই যেমন আইভরির শেষ চালানটা।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো চাখার সিং। 'তবে তাঁর ফ্যামিলি কানেকশনও বিরাট উপকারে লাগে।'

'আপনাদের সমস্ত ব্যবসার বিশদ বিবরণ দিন। তারিখ, পণ্য, মূল্য...'

'কি বলছেন!' প্রতিবাদ করল চাখার সিং। 'গত তিন বছরে কত ব্যবসা হয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে! সব কি আর কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব?'

'এইমাত্র না আপনি বললেন আপনি খুব ভাল একজন ব্যবসায়ী?' শটগান দিয়ে আবার তাকে গুঁতো মারল রানা, সরে যেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো চাখার সিং, আগে থেকেই দরজার সঙ্গে সেঁটে আছে শরীরটা। 'আমি জানি, প্রতিটি

ব্যবসার খুঁটিনাটি সবকিছু আপনার মনে আছে।'

'ঠিক আছে,' বাধ্য হয়ে রাজি হলো চাখার সিং। 'প্রথম ব্যবসাটা করি আমরা তিন বছর আগে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় হপ্তায়। আইভরি, মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। ওটা ছিল পরীক্ষামূলক চালান। কোন সমস্যা হয়নি। মার্চের প্রথম হপ্তায় দ্বিতীয় চালানটা পাঠাই আমরা–আইভরি আর গণ্ডারের শিং, বিরাশি হাজার ডলার। একই বছর মে মাসে পান্না, চার লাখ ডলার...।'

সমস্ত তথ্য মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা, লেখার সময় বিস্তারিত মনে পড়বে। প্রায় বিশ মিনিট ধরে বলে গেল চাখার সিং। সবশেষে বলল, 'আর বাকি থাকল একটা শিপমেন্ট–এবারের আইভরি। এ-সম্পর্কে আপনি জানেন।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অবশেষে আমরা চিউইউই প্রসঙ্গে এলাম। আইডিয়াটা কার ছিল, মি. সিং?'

'কার আবার। অ্যামব্যাসাডরের। পুরোপুরি তাঁর একার আইডিয়া।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আইভরি গোডাউন সম্পর্কে তাঁর জানার কথা নয়। ওটা ঠিক কোথায় তা খুব কম লোকই জানে। আপনি জানতে পারেন কারণ আইভরির অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে অনেকদিন থেকে জড়িত আপনি।'

'বেশ। হ্যাঁ, ওটা সম্পর্কে জানা ছিল আমার। কয়েক বছর ধরে খোঁজ-খবর রাখছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম কবে সুযোগ পাব। তবে, চণ্ডমণ্ড গণ্ড আমাকে বলেন, তাঁর বড় একটা চালান দরকার। হারারে এমব্যাসীতে তাঁর মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, বড় একটা দাঁও মেরে কেটে পড়তে চেয়েছিলেন। বড় চালান দরকার ছিল তাঁর পরিবারকে প্রভাবিত করার জন্যে। আমাকে বলেন, 'তাঁর বাবাকে খুশি করতে হবে।'

'তবে লোকজন ভাড়া করেন আপনি, তাই না? হানাদার-বাহিনীর সঙ্গেও আপনি যোগাযোগ করেন। এ-সব কাজ চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দ্বারা হবার নয়। আপনার মত কনট্যাক্ট নেই তাঁর।'

'আমি আপনার বন্ধুকে খুন করার হুকুম দিইনি,' গলা কেঁপে গেল চাখার সিং-এর। 'আমি চাইনি এ-ধরনের কিছু ঘটুক।'

'তারমানে কি আপনি চেয়েছিলেন বেঁচে থাকুক ওরা, মি. গণ্ডের কথা পুলিসকে বলার জন্যে?'

'হ্যাঁ–না, না! খুন করার আইডিয়াটা ছিল মি. গণ্ডের। আমি খুন-খারাবিতে বিশ্বাসী নই, মি. রানা।'

'সেজন্যেই কি আপনি আমাকে আর চেরিসকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়েছিলেন?'

'না! আপনি আমাকে কোন সুযোগ দেননি, মি. রানা। প্লীজ, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে। আমি একজন ব্যবসায়ী, গ্যাঙলিডার নই।'

'ঠিক আছে, আপাতত এ-প্রসঙ্গ থাক। এবার বলুন, মি. গণ্ডের সঙ্গে এরপর কি ব্যবসা করতে যাচ্ছেন আপনি? এত লাভজনক ব্যবসা, নিশ্চয় এটা চালিয়ে যাবেন আপনারা–মি. গণ্ড তাইওয়ানে ফিরে গেলেও, তাই না?'

'না!'

'মিথ্যে বলবেন না, মি. সিং। তা বললে চুক্তিটা ভাঙা হবে।' ইস্পাতের মাজল এত জোরে চালাল রানা, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল চাখার সিং।

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ঠিক আছে। বলছি। কিন্তু এভাবে আমাকে মারবেন না। মারলে আমি কথা বলতে পারব না।'

চাপ একটু কমাল রানা। 'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মি. সিং। আপনি চুক্তি ভাঙার সুযোগ দিলে খুশি হব আমি। আলি শাহের মেয়ে দুটোর বয়স ছিল আট আর দশ। আপনার লোকেরা ওদেরকে রেপ করেছে। তার ছেলে, মাসুদ, বয়স মাত্র চার। দেয়ালে আছাড় মেরে ওরা তার খুলি ফাটিয়েছে। দৃশ্যটা সুন্দর ছিল না, মি. সিং। হ্যাঁ, আপনি চুক্তি ভাঙার সুযোগ দিলে খুশি হব আমি।'

'প্লীজ, মি. রানা, এ-সব আমি শুনতে চাই না। আমি একজন সংসারী মানুষ, ব্যবসা করে খাই। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি চাইনি...'

'আপনার জটিল বোধ আর অনুভূতির ব্যাপারগুলো বাদ দিন, মি. সিং। আমি জানতে চাইছি, আগামী দিনগুলোর জন্যে আপনাদের কোন প্ল্যান ছিল কিনা।'

'নির্দিষ্ট কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করি আমরা,' স্বীকার গেল চাখার সিং। 'আফ্রিকায় বিরাট সম্পত্তি আছে গণ্ড পরিবারের। আইভরির এই শেষ চালানটা তাইপেতে পৌঁছুবার পর পরিবারে মি. চণ্ডমণ্ডের মর্যাদা তুঙ্গে উঠে যাবে। বাবার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান হয়ে উঠবেন তিনি। তাঁর আশা, রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীর আফ্রিকান শাখার পুরো দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেবেন বাবা।'

'রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী?'

'ওটা ওদের পারিবারিক হোল্ডিং কোম্পানী।'

'এ-সব প্ল্যানে আপনারও ভূমিকা আছে, তাই না? আপনার এক্সপার্ট সার্ভিসের চাহিদা খুব বেড়ে যাবে। এ-ব্যাপারে মি. চণ্ডমণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয় আপনার কথা হয়েছে?'

'না-!' আবার আর্তনাদ করল চাখার সিং, রানা তার পাঁজরে শটগানের প্রচণ্ড গুঁতো মেরেছে। 'প্লীজ, ভাই, আমাকে আর মারবেন না। হাই ব্লাড প্রেশারে ভুগছি আমি। এভাবে আঘাত পেতে আমি অভ্যস্ত নই। এ-ধরনের আনসিভিলাইজড আচরণ আমার স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর...।'

'মি. চণ্ডমণ্ডের সঙ্গে আপনার পরবর্তী ব্যবসাটা কি? কোত্থেকে কি লুঠ করে কখন কোথায় পাঠাবেন?'

'আমি তাঁকে বলে দিয়েছি, লুঠপাট করার মধ্যে আমি আর নেই।'

'তাহলে? ব্যবসাটা কি রকম হবে? কোথায় হবে?'

'উবোমো-য়,' ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল চাখার সিঙ। 'রেড ড্রাগনের প্ল্যান হলো, তারা উবোমো-য় ব্যবসা করবে।'

'উবোমো?' রানার গলায় বিস্ময়। 'শেখ ফাহিম ফয়সল?'

উবোমো মানে আফ্রিকা মহাদেশের একটি দুর্লভ সাফল্যের ইতিহাস। মালাউয়ের মতই, গ্রেট রিফট ভ্যালি-র ঢালে প্রায় লুকিয়ে আছে। আফ্রিকার পুব পাশে লেক আর পাহাড় নিয়ে একটা দেশ, যেখানে খোলা বৃক্ষহীন প্রান্তর আর

আদি নিরক্ষীয় বনভূমি মিলিত হয়েছে। হেস্টিংস বান্দার মতই প্রেসিডেন্ট শেখ ফাহিম ফয়সল প্রাচীন আফ্রিকান পদ্ধতিতে শাসন করছেন দেশটাকে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতে হয় এই জন্যে যে দেশটাকে তিনি ঋণমুক্ত রাখতে পেরেছেন, উপজাতিদের ঝগড়া মিটিয়ে দেশটাকে কয়েক টুকরো হতে দেননি।

প্রেসিডেন্ট ফাহিম ফয়সল সম্পর্কে জানে রানা, ভদ্রলোক ছোট একটা কটেজে থাকেন, মাথার ওপর করোগেটেড লোহার ছাদ, ল্যান্ডরোভারটা নিজেই চালান। মার্বেল পাথরের তৈরি কোন প্রাসাদ নয়, নয় কোন রোলস রয়েস বা কালো মার্সিডিজ, কিংবা নয় কোন ব্যক্তিগত জেট প্লেন। অর্গানাইজেশন অভ আফ্রিকান ইউনিটি-র মীটিঙে যোগ দেয়ার জন্যে কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্সের ট্যুরিস্ট ক্লাস কেবিনের টিকেট কাটেন ভদ্রলোক, নিজের লোকদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে ষোলো ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, বিলাসিতা তাঁর একদমই পছন্দ নয়। তাঁর দেশ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা করে, কাজেই বিশ্বাস করা যায় না যে রেড ড্রাগন-এর মত একটা ডাকাত-দলের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসবেন তিনি।

'ফাহিম ফয়সল? আমি বিশ্বাস করি না,' জোর দিয়ে বলল রানা।

'ফাহিম ফয়সল বাতিল একজন মানুষ। তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। উন্নতির পথে তিনি একটা বাধা। শিগগিরই তাঁকে বিদায় করা হবে। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। উবোমোয় নতুন এক লোক আসছেন। তরুণ, প্রাণচঞ্চল, আশাবাদী...।'

'এবং লোভী,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে মি. চণ্ডমণ্ড বা রেড ড্রাগনের কি সম্পর্ক?'

'বিশদ কিছু আমি আপনাকে বলতে পারব না, আমার নিজেরই জানা নেই। মি. চণ্ডমণ্ড আমাকে অতটা বিশ্বাস করেন না। আমাকে তিনি শুধু বলেছেন, আমি যেন আমার লোকজনকে পাঠাই ওখানে, সব আয়োজন করে রাখি। নির্দিষ্ট দিনে তারা যেন কাজে লাগে।'

'নির্দিষ্ট দিনটা কবে?'

'তা আমি জানি না, আপনাকে তো বললামই। তবে কাছাকাছি কোন একটা দিনই হবে।'

'এ-বছর? আগামী বছর?'

'ভগবানের কিরে, খোদার কসম, আমি জানি না। আপনাকে আমি কিছুই গোপন করিনি। আপনার সমস্ত শর্ত আমি পূরণ করেছি। এবার আমার শর্ত আপনি পূরণ করুন। আপনার সম্পর্কে খবর নিয়েছি আমি। আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধ করে নিজেদের দেশ স্বাধীন করেছেন, আপনাদের কথার দাম আছে। জেনেছি, আপনি একজন ভদ্রলোক। বাংলাদেশী ভদ্রলোকেরা কথা দিয়ে কথা রাখে। ঠিক বলিনি, মি. রানা?'

'আমার সম্পর্কে এ-সব আপনি কিভাবে জানলেন?'

'টেলিফোন করে, মি. রানা। লণ্ডনের একটা প্রাইভেট সিক্রেট সার্ভিসে ফোন করে এ-সব আমি জেনেছি।'

স্বস্তিবোধ করল রানা। প্রাইভেট কোন সিক্রেট সার্ভিস ওর সম্পর্কে খুব কমই জানবে। 'আপনার শর্তটা যেন কি ছিল, মি. সিং?' জানতে চাইল ও। 'মনে করিয়ে দিন আমাকে।' শটগানের চাপ মুহূর্তের জন্যেও ঢিলে করছে না।

'মি. চণ্ডমণ্ড সম্পর্কে আপনাকে সব কথা বলার পর আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন–কোন ক্ষতি না করে।'

'আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি, মি. সিং?'

'না, এখনও করেননি।' তবে চাথার সিং আবার ঘামতে শুরু করেছে, আগের চেয়ে দ্রুত। তার প্রতিপক্ষের চেহারা এত কঠিন, যেন একজন খুনে।

তার দিকে হাত বাড়াল রানা, খপ করে দরজার হাতল ধরল। ঘটনাটা এত দ্রুত, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে নড়ার কোন সময়ই পেল না চাথার সিং। দরজার গায়ে সেঁটে ছিল সে, শটগানের চাপ এড়াবার চেষ্টায়।

'আপনি মুক্ত, মি. সিং,' নরম সুরে বলল রানা। ওর একটা হাত হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল ড্রাইভারের দিকের দরজা, অপর হাতটা রাখল চাথার সিং-এর বুকের মাঝখানে। সমস্ত রাগ ও ঘৃণা এক করে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ও।

বিস্ফোরিত হলো দরজা। ওটার গায়ে শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে রেখেছিল চাথার সিং। বুকে রানার হাতের ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ছিটকে পড়ল সে। ওয়্যারহাউসের পাকা মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ল, তারপর শরীরটা গড়িয়ে গেল দু'বার। ওখানেই স্থির হয়ে পড়ে থাকল সে, বিস্ময়ের ধাক্কায় অসাড় ও পঙ্গু হয়ে গেছে।

দড়াম করে বন্ধ করল রানা দরজা, তালা লাগাল, তারপর হেডলাইট দুটো জ্বালল। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই ঘটল না। গাড়ির বাইরে মেঝেতে পড়ে আছে চাথার সিং, চোখে খুনের নেশা, বুলেটপ্রুফ কাঁচের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ওয়্যারহাউসের গভীরে কোথাও গাঢ় ছায়ার মধ্যে থেকে কর্কশ আওয়াজ তুলল চিতাবাঘ।

এক লাফে সিধে হলো চাথার সিং, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাডিলাকের গায়ে, খালি হাতে জানালার কাঁচ খামচাচ্ছে। পেশীগুলো জ্যান্ত পোকার মত কিলবিল করায় কুৎসিত হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা।

'আমাকে বাঁচান, ভাই! আমাকে মাফ করে দিন, ভাই! চণ্ডী, ভাই…প্লীজ, ভাই…!' বন্ধ জানালার বাইরে থেকে ভোঁতা আর অস্পষ্ট শোনাচ্ছে তার গলা, তবে তার কণ্ঠস্বরে নগ্ন আতঙ্ক তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল কানে। মুখের কোণ থেকে লালা গড়াতে শুরু করেছে।

রানা নির্লিপ্ত, তাকিয়ে আছে; হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা, শক্ত হয়ে আছে চোয়াল।

'আপনি যা চাইবেন,' আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে চাথার সিং-এর গলা থেকে। 'যা চাইবেন তাই দেব আপনাকে…' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে, আবার রানার দিকে ফিরল উন্মত্ত পাগলের চেহারা নিয়ে। আজরাইলের ছায়া দেখতে পেয়েছে সে, আলোর বাইরে নিঃশব্দে চক্কর দিচ্ছে।

'টাকা!' চিৎকার করছে চাথার সিং, জানালার কাচে হাতের তালু দিয়ে ধাক্কা

মারছে ঘন ঘন। 'টাকা দেব আপনাকে–দু'লাখ, পাঁচ লাখ…এক মিলিয়ন ডলার! যত চাইবেন তত দেব। আমাকে শুধু ভেতরে ঢুকতে দিন। প্লীজ, আমার ওপর দয়া করুন, ভাই। আমি আপনার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। এখানে আমাকে ফেলে রেখে যাবেন না!'

গর্জে উঠল চিতা, আওয়াজটা এমনই ভীতিকর যে গাড়ির ভেতর নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা সত্ত্বেও গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। ঝট করে ঘুরল চাথার সিং, অন্ধকারের মুখোমুখি হলো, পিছিয়ে এসে সেঁটে গেল ক্যাডিলাকের গায়ে। 'পিছু হটো, চণ্ডী!' আতঙ্কে অস্থির তার গলা। 'ফেরো, ফিরে যাও, খাঁচায় ঢোকো!'

তারপর দু'জনেই ওরা চিতাটাকে দেখতে পেল। প্যাকিং-কেসের দুই পাঁচিলের মাঝখানে গুঁড়ি মেরে রয়েছে। চোখ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে হেডলাইটের আলো, হলুদ আর চকমকে। অদ্ভুত এক ছন্দে দোলাচ্ছে লেজটা। চাথার সিংকে লক্ষ করছে সে।

'না!' ফুঁপিয়ে উঠল চাথার সিং। 'এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন না! আপনার দুটো পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচান!'

চিতার চোখে নীরব ঘৃণা ও আক্রোশ, ঠোঁট উঁচু করে নিঃশব্দে খেঁকানোর ভঙ্গি করল। খাকি স্ল্যাকসের সামনেটা ভিজে গেল, কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ঝর ঝর করে প্রস্রাব করছে চাথার সিং। স্যাণ্ডেল পরা পায়ের চারধারে পাকা সিমেন্টের ওপর জমা হলো পানি।

'ওটা আমাকে খুন করবে। এটা অমানবিক! প্লীজ, ভেতরে ঢুকতে দিন আমাকে!' হঠাৎ করে চাথার সিং উন্মাদ হয়ে গেল। ক্যাডিলাকের গায়ে হাতের চাপ দিয়ে ওয়্যারহাউসের বন্ধ প্রধান দরজার দিকে ছুটল সে, ঝুলে থাকা অন্ধকারের ভেতর একশো ফুট দূরে ওটা। ওই দূরত্বের অর্ধেকটাও পেরোতে পারল না, তার আগেই নাগাল পেয়ে গেল চিতা। পিছন থেকে এল ওটা, পাকা মেঝের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে, তারপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল চাথার সিং-এর কাঁধে।

জোড়া মাথা ও কুঁজ বিশিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার একটা প্রাণী বলে মনে হলো ওদেরকে। পরমুহূর্তে চিতার ভারে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল চাথার সিং। পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল দুটো শরীর, একসঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে, পা ছুঁড়ছে দিকবিদিক, চাথার সিং-এর আর্তনাদ একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে চিতার কর্কশ গর্জনের সঙ্গে।

মুহূর্তের জন্যে লোকটা সিধে হলো হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে, কিন্তু চোখের পলকে আবার তার ওপর চড়াও হলো চিতা, এবার ওটার লক্ষ হলো মুখ। খালি হাতে চিতাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল চাথার সিং, হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল খোলা চোয়ালের ভেতর। তার কব্জির ওপর দাঁত বসাল চিতা।

এমন কি বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকেও কব্জির হাড় ভাঙার আওয়াজটা শুনতে পেল রানা, শুকনো টোস্ট-এর মত মচমচ শব্দ হলো। আরও কর্কশ ও তীক্ষ্ণ হলো চাথার সিং-এর আর্তনাদ। অসহ্য ব্যথা প্রবল শক্তি এনে দিল তাকে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাতের সঙ্গে ঝুলছে চিতা।

এলোমেলো পা ফেলে পাক খাচ্ছে চাখার সিং, শক্ত মুঠো দিয়ে আঘাত করছে চিতাকে, ওটার চোয়াল থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে অপর কব্জিটা। চিতার পিছনের পা দুটো তার উরুর ওপর আঁচড় কাটছে, ছিঁড়ে নামিয়ে আনছে খাকি স্ল্যাকস, হলুদ নখর কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাংস খুলে ফেলার সময় প্রস্রাব আর রক্ত মিলে একাকার হয়ে গেল।

কার্ডবোর্ড বাক্সের উঁচু একটা স্তূপের গায়ে ধাক্কা খেল চাখার সিং, নিজের চারধারে নামিয়ে আনল বাক্সগুলোকে। এরপর তার আর চিতার বোঝা বহন করার শক্তি থাকল না, আবার পড়ে গেল সে, এখনও তার ওপর চড়ে আছে চিতা।

থাবা মারছে চিতা, কামড় বসাচ্ছে, সেই সঙ্গে গজরাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল চাখার সিং-এর নড়াচড়া। দুর্বল হতে শুরু করা ব্যাটারি যেমন একটা ইলেকট্রিক খেলনার নড়াচড়া ধীরে ধীরে মন্থর করে তোলে, তার অবস্থাও ঠিক সেরকম হলো। এখনও চিৎকার করছে সে, তবে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে আওয়াজটা।

সরে বসে ক্যাডিলাকের কন্ট্রোলের সামনে চলে এল রানা। গাড়ি স্টার্ট দিতেই শিকারকে ছেড়ে পিছন দিকে লাফ দিল চিতা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল ক্যাডিলাকের দিকে। লেজটা একদিক থেকে আরেকদিকে আসা-যাওয়া করছে।

গাড়িটাকে ধীরে ধীরে পিছু হটিয়ে লোডিং র‍্যাম্প থেকে নামিয়ে আনল রানা। খানিক ঘুরিয়ে এমনভাবে দাঁড় করাল, নিচে নেমে দরজার দিকে হাঁটার সময় চিতা যাতে ওর আর ক্যাডিলাকের মাঝখানে থাকে। এঞ্জিন চালু থাকল, জ্বালা থাকল হেডলাইট, গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ও। কন্ট্রোল বক্সটা মাত্র কয়েক পা দূরে, পিছু হটার সময় স্থির চোখ রাখল চিতার ওপর। ওর কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছে ওটা, তবু ফাঁকটায় চাবি ঢোকানোর সময় একবারও চোখের পাতা ফেলল না। সশব্দে খুলে গেল ভারি দরজা। চাবিটা ফাঁকের ভেতরই থাকল। শটগানটা হাত থেকে ছেড়ে দিল এবার রানা, পিছু হটে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে।

খেয়াল আছে, হঠাৎ দৌড়ানো চলবে না। দৌড় দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁক চাপবে চিতার। যদিও মাঝখানে ক্যাডিলাক একটা বাধা। তাছাড়া, একটা শিকার আগেই পেয়ে গেছে চিতা।

আরও খানিকটা পিছিয়ে এসে তারপর ঘুরল রানা, হন হন করে হেঁটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। চেরিসের কাছ থেকে পাওয়া কী-কার্ড ব্যবহার করে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও, পিছনে বন্ধ করল মেইন গেট, তারপর ফুটপাথ ধরে ছুটল।

সকালে যখন চাখার সিংকে পাওয়া যাবে, ধরে নেয়া হবে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় সে, অজ্ঞাত কারণে ঢুকে পড়ে ভুল জায়গায়, এবং ওয়্যারহাউসের দরজা খোলার সময় নিজেরই পোষা চিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিস যুক্তি দেখাবে, ক্যাডিলাকে লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ কন্ট্রোল থাকায় ডোর কন্ট্রোল অপারেট করার জন্যে গাড়ি ছেড়ে নামতে বাধ্য হয়েছিল সে। রানা আঙুলের ছাপ বা অন্য কোন সূত্র রেখে যাচ্ছে না।

পেরিমিটার ফেন্স-এর শেষ মাথায় পৌঁছে থামল একবার ও, পিছন ফিরে

তাকাল। ক্যাডিলাকের হেডলাইট এখনও খোলা ওয়্যারহাউসের দরজা আলোকিত করে রেখেছে। নিচু ও গাঢ় একটা আকৃতি দেখতে পেল ও, স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে, তারপর লাফ দিল পেরিমিটার ফেন্স-এর মাথা লক্ষ করে। পাখির মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার মত সাবলীল ভঙ্গি, বেড়াটা অনায়াসে টপকাল চিতা।

ক্ষীণ হাসল রানা। ও জানে, অত্যাচারিত জানোয়ারটা কোনদিকে না ফিরে সোজা তার ঠিকানার দিকে ছুটবে—কুয়াশা আর বনভূমিতে ঢাকা পাহাড়ে। এত কষ্টভোগের পর অবশ্যই তার পাওনা হয়েছে স্বাধীনতা।

ত্রিশ মিনিট পর ভাড়া করা ফোক্সওয়াগেনে ফিরে এল রানা। কোথাও না থেমে এয়ারপোর্টে ঢুকল, দেখল বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাভিস অফিস। গাড়ির চাবিটা রিটার্ন বক্সে ফেলে হেঁটে চলে এল পাবলিক কারপার্কে, ল্যাণ্ডক্রুজারের পাশে।

হোটেলে ফিরে দ্রুত হাতে ক্যানভাস ব্যাগটা ভরে নিল রানা। হাতটা স্লিং-এ বাঁধার জন্যে একটা নেক-টাই ব্যবহার করল। প্রচুর নাড়া খাওয়ায় ক্ষতটা ব্যথা করতে শুরু করেছে আবার। ক্যাশিয়ারের ডেস্কে বসা ক্লার্ক ওর ক্রেডিট কার্ডে ছাপ মেরে দিল, ব্যাগটা নিজেই ল্যাণ্ডক্রুজারে বয়ে আনল ও।

কৌতূহল দমন করতে পারল না, ট্রাক নিয়ে চাখার সিং-এর সুপারমার্কেটে চলে এল রানা। থামল না, ধীর গতিতে পাশ কাটাল শুধু। মেইন বিল্ডিঙের কোন ক্ষতি হয়নি, তবে পিছনের গলিতে এখনও দমকল-বাহিনীর কর্মীরা আবর্জনার স্তূপ আর বিল্ডিঙের দেয়ালে হোস দিয়ে পানি ছড়াচ্ছে। দশ-বারোজন প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে দর্শক হিসেবে।

পশ্চিম দিকে ঘুরে লিলংউয়ে ত্যাগ করল রানা, ফিরে যাচ্ছে জাম্বিয়ান সীমান্ত চৌকির দিকে। ওখানে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগবে ওর। সময়টা কাটাবার জন্যে রেডিও খুলে মালাউয়ে স্টেশন ধরল।

সীমান্ত চৌকির কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, ছ'টার খবরে প্রচার করা হলো ঘটনাটা।

'আমাদের রাজধানীর সংবাদদাতা এই মাত্র রিপোর্ট করলেন যে বিখ্যাত একজন মালাউয়ে ব্যবসায়ী এবং শিল্প উদ্যোক্তা তাঁর পোষা চিতার আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন। মি. চাখার সিংকে দ্রুত লিলংউয়ে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ওখানে তাঁকে ইনটেনসিভ-কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। হাসপাতালের একজন মুখপাত্র জানান, মি. সিং-এর জখম অত্যন্ত মারাত্মক এবং তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। কোন পরিস্থিতিতে মি. সিং আক্রান্ত হন তা এখনও জানা যায়নি, তবে পুলিস তাঁর একজন কর্মচারীকে খুঁজছে। পুলিস আশা করছে চেরিস বুনদাওয়ানা তদন্তে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। চেরিস বুনদাওয়ানার সন্ধান পেলে নিকটবর্তী পুলিস স্টেশনে রিপোর্ট করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

রেডিও বন্ধ করে মালাউয়ে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন পোস্ট-এর বাইরে ট্রাক পার্ক করল রানা। বিপদ হতে পারে ভেবে সতর্ক হয়ে উঠল ও। এরইমধ্যে ওর

নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়ে থাকতে পারে, বিশেষ করে আহত চাখার সিং যদি ওর নাম বলে থাকে পুলিসকে। লোকটা বেঁচে যাবে বলে ধারণা করেনি ও। আশা করেছিল কাজটা অসম্পূর্ণ রাখবে না চণ্ডী। ওরও ভুল হয়েছে, আরও খানিক দেরি করে সরানো উচিত ছিল ক্যাডিলাক। গাড়ির নড়াচড়াই শিকারের ওপর থেকে মনোযোগ নড়িয়ে দিয়েছে চিতার।

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, চাখার সিং-এর শরীরে কয়েক গ্যালন রক্ত ভরতে হবে। আফ্রিকায় রক্ত গ্রহণ করার সঙ্গে বিপজ্জনক ঝুঁকি থেকে যায়।

পুরানো একটা গান, কয়েকটা শব্দ বদলে, গুনগুন করে গেয়ে উঠল রানা।

অ্যাশেস টু অ্যাশেস
অ্যাণ্ড ডাস্ট টু ডাস্ট
ইফ দা লেপার্ডস্ ডোন্ট গেট হিম
দেন এইচআইভি মাস্ট।

তারপর, সাহস সঞ্চয় করে, পাসপোর্ট হাতে পোস্টের দিকে এগোল ও। উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন ছিল না। আইনের লোকজনরা সবাই হাসিখুশি ও বিনয়ী। 'মালাউয়েতে আপনার ছুটি উপভোগ করলেন, স্যার? আপনাদের দেখলে সব সময় খুশি হই আমরা, স্যার। আবার আসবেন কিন্তু, স্যার।'

বৃদ্ধ হেস্টিংস বান্দা ভাল ট্রেনিং দিয়েছেন ওদের। সবাই ওরা উপলব্ধি করে পর্যটন শিল্প তাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জাম্বিয়ান দিকের পোস্ট লক্ষ করে হাঁটছে রানা, পাসপোর্টের ভেতর পাঁচ ডলারের একটা নোট ঢুকিয়ে রাখল। দু'দেশের দুটো পোস্টের মাঝখানে দূরত্ব মাত্র একশো ফুট, কিন্তু ওর মনে হলো বিশাল এক লাফে অন্ধকার যুগে ফিরে যাচ্ছে ও।

তিন

লুসাকায় পৌঁছে এক ঘণ্টার মধ্যে মাইকেল ডাফকে টেলিফোন করল রানা। বন্ধু ফিরে এসেছে, খুশিতে ওকে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানাল সে।

'এরপর কোনদিকে যাচ্ছ তুমি, চিরতরুণ বেদুঈন?' রানার প্লেটটা বিখ্যাত ইয়র্কশায়ার পুডিং-এ দ্বিতীয়বার ভরে দিয়ে জানতে চাইল নোরা। 'গড, কী অ্যাডভেঞ্চারাস আর রোমান্টিক জীবন তোমার! আমার আসলে সত্যি তোমার জন্যে একটা বউ খুঁজে বের করা উচিত, তুমি আমাদের স্বামীকুলকে অস্থির করে তুলছ! আমাদের সঙ্গে কতদিন তুমি আছ?'

'সেটা নির্ভর করে মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ড নামে এক ভদ্রলোক সম্পর্কে মাইকেল আমাকে কি জানাতে পারে তার ওপর। যদি হারারেতে থাকেন, তাহলে ওখানেই যেতে হবে আমাকে। যদি না থাকেন, তাহলে লণ্ডনে ফিরে যাব-কিংবা হয়তো একবার ঘুরে আসব তাইওয়ান থেকে।'

'এখনও তুমি সেই চীনা ভদ্রলোকের পিছনে লেগে আছো?' হুইস্কির বোতল খুলছে মাইকেল ডাফ। 'জানার আমাদের অধিকার আছে, গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে?'

নোরার দিকে চট করে একবার তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাঁকাল নোরা, বলল, 'তুমি বুঝি চাইছ আমি কিচেনে ফিরে যাই?'

'বেশ তো। তোমাকে আবার কখন কি গোপন করলাম।' বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি, চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে যা ঘটেছে তার জন্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ড দায়ী, তিনিই হানা দেয়ার আয়োজনটা করেন।'

হুইস্কি ভরা গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে থেমে গেল, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মাইকেল ডাফ। 'ওহ ডিয়ার! সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আলি শাহ ছিল তোমার বন্ধু, মনে পড়ছে আমার। কিন্তু চণ্ডমণ্ড গণ্ড! তুমি ঠিক জানো? তিনি একজন অ্যামব্যাসাডর, গ্যাঙস্টার নন!'

'আসলে দুটোই-অ্যামব্যাসাডর, তবে গ্যাঙস্টারও,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'তিনি একা নন, একজন স্যাঙাতও আছে-চাখার সিং। দু'জন মিলে চুটিয়ে অবৈধ ব্যবসা করে যাচ্ছে। শুধু আইভরি নয়, ড্রাগ থেকে ডায়মণ্ড পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে হাত দিয়েছে তারা। লাভ দেখলে পাইকারী খুন-খারাপিতেও আপত্তি করে না।'

'চাখার সিং। নামটা ইদানীং শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।' মাত্র এক সেকেণ্ড চিন্তা করল মাইকেল ডাফ। 'মনে পড়ছে, আজ সকালের খবরে। তারই পোষা চিতাবাঘ জখম করেছে, তাই না?' তার কপালে চিন্তার একটা রেখা ফুটল। 'ঠিক যে-সময় তুমি লিলঙউয়েতে ছিলে। কী একটা কাকতালীয় ঘটনা, রানা। তোমার একটা হাত স্লিং-এ বাঁধা, ওটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো-কিংবা তোমার নির্লিপ্ত চেহারার সঙ্গে?'

'তুমি জানো আফ্রিকায় আমি এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে আসিনি, কাজ করছি টিভির জন্যে,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সব সময় বিপদ আর হাঙ্গামা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। তবে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটার আগে, অর্থাৎ চিতাটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, তার সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করি আমি। একটা তথ্য পেয়েছি। তুমি এসপিওনাজ জগতে নেই জেনেও বলছি, তথ্যটা তোমার কাজে আসতে পারে।'

আহত দেখাল মাইকেল ডাফকে। 'কোমল প্রাণীদের সামনে কঠিন প্রসঙ্গ তোলাটা কি উচিত হলো তোমার, দোস্ত?'

দাঁড়িয়ে পড়ল নোরা। 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কিচেনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। দশ মিনিটে ফিরব।' নিজের ওয়াইনগ্লাসটা হাতে করে নিয়ে গেল সে।

'কি তথ্য, রানা?' আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মাইকেল ডাফ।

'চাখার সিং বলল, উবোমোতে অভ্যুত্থান ঘটাবার আয়োজন করা হয়েছে। শেখ ফাহিম ফয়সল উৎখাত হবেন।'

'ওহ, ডিয়ার মি, নট ফয়সল! কি বলছ, রানা? শেখ ফয়সল অত্যন্ত ভাল করছেন! অত্যন্ত যোগ্য প্রেসিডেন্ট তিনি। এ অসম্ভব! খুঁটিনাটি আর কিছু জানো

তুমি?'

'দুঃখিত, না। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত, তিনি ও তাঁর পরিবার–তবে নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়বেন ওরা, প্রকাশ্য কোন ভূমিকা থাকবে না বলেই ধারণা করি। প্রস্তাবিত বিপ্লবে শ্রেফ আগ্রহী স্পনসর, পরে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে পাবার শর্তে।'

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ডাফ। 'প্রচলিত হুক। উবোমোর নতুন শাসক চেটেপুটে খাবার সময় ওদেরকেও ঘি আর মাখনের ভাগ দেবে। সে কে হতে পারে, কোন ধারণা আছে তোমার?'

'নেই, দুঃখিত; তবে খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে ব্যাপারটা। বোধহয় কয়েক মাসের মধ্যে।

'ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে আমরা প্রেসিডেন্ট ফাহিম ফয়সলকে সতর্ক করে দিতে পারি। উনি অনুরোধ করলে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বিমানে করে একটা এসএএস ব্যাটালিয়ন পাঠাতে পারেন, তাঁকে গার্ড দেয়ার জন্যে। আমি জানি, প্রধানমন্ত্রী পছন্দ করেন ভদ্রলোককে, তাছাড়া উবোমো কমনওয়েলথ-এর সদস্য।'

'তুমি যা ভাল মনে করো,' বলল রানা। 'আমি চাই, সেই সঙ্গে তুমি চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ব্যাপারটাও চেক করবে।'

'তিনি নেই, রানা। হারারেতে আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আজ সকালেই কথা হয়েছে আমার। ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার আগ্রহ আছে জানি বলেই আলাপ করার সময় প্রশ্ন করি আমি। শুক্রবার সন্ধ্যায় চাইনীজ এমব্যাসীতে ফেয়ারওয়েল পার্টি হয়েছে মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ড-এর, শনিবারের ফ্লাইটে চড়ে দেশে ফিরে গেছেন।'

'ইস!' ক্ষোভ ও হতাশায় ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। 'আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। আমি হারারে যাচ্ছিলাম···।'

'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হত বলে মনে করি না,' বাধা দিয়ে বলল মাইকেল ডাফ। 'সাধারণ একজন ব্যবসায়ীকে তার পোষা চিতার মুখে ঠেলে দেয়া আর একজন অ্যামব্যাসাডরকে গুঁতো মারা এক কথা নয়। তোমার জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, রানা।'

'তিনি এখন আর অ্যামব্যাসাডর নন,' যুক্তি দেখাল রানা। 'আমি তাঁর পিছু নিয়ে তাইওয়ানেও যেতে পারি।'

'কিছু যদি মনে না করো, এটাও একটা বাজে আইডিয়া। তাইওয়ান মি. চণ্ডমণ্ডের নিজের উঠান। যতটুকু শুনি, দ্বীপটার প্রায় মালিকই বলা যায় ওদেরকে। গোটা দেশটায় গণ্ড পরিবারের অনুচররা ছড়িয়ে আছে। অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে দেবতার ভূমিকা যদি নিতেই চাও, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকো, রানা। তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয়, চণ্ডমণ্ড শিগগির আবার আফ্রিকায় ফিরে আসবেন।'

'হুম!' চিন্তা করছে রানা।

'উবোমো নিরপেক্ষ মাঠ, তাইওয়ানের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল তোমার জন্যে। কিছু কিছু সাহায্য আমিও হয়তো করতে পারব তোমাকে ওখানে।

কাহালি-তে আমাদের একটা অফিস আছে, এমন সম্ভাবনাও আছে যে আমাকে হয়তো···,' হঠাৎ থেমে আড়ষ্ট হাসল মাইকেল ডাফ, তারপর বলল, 'এখনও ব্যাপারটা ফাইন্যাল হয়নি, তবে শোনা যাচ্ছে আমার পরবর্তী পোস্টিং হতে পারে কাহালিতে।'

হাতের গ্লাসে তাকিয়ে আছে রানা, এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ। আমি বরং এখন লণ্ডনেই ফিরি। ছবিটা এডিট করি, সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। তাছাড়া, হাত একেবারে খালি হয়ে গেছে, টাকাও দরকার।'

'যাবার আগে এই দুই মানিকজোড় সম্পর্কে যা জানো সব আমাকে বলে যাও–চাখার সিঙ আর চণ্ডমণ্ড গণ্ড সম্পর্কে। দেখব এদিক থেকে তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি। তাছাড়া, যদি···।'

'যদি আমার কিছু ঘটে?'

'ও-কথা মনেও এনো না, দোস্ত। যদিও না বলে পারছি না, এবার তুমি একজোড়া হেভীওয়েটকে বেছে নিয়েছ।'

'ল্যাণ্ডক্রুজার আর অন্য সব ইকুইপমেন্ট লুসাকায়, তোমার কাছে রেখে যেতে চাই আমি,' বলল রানা। 'অবশ্য তোমার যদি কোন অসুবিধে না হয়।'

'প্লেজার, ডিয়ার ফ্রেন্ড। আমার বাড়ি তোমারও বাড়ি। ফীল ফ্রী।'

পরদিনও ওদের বাড়িতে এল রানা। মাইকেল ডাফ হাইকমিশনে, রানাকে সাহায্য করল নোরা আর ওদের একজন স্টাফ। কয়েক মাস জঙ্গলে থাকার ফলে ইকুইপমেন্টগুলোয় ধুলো জমেছে, সব পরিষ্কার করে আবার ট্রাকে তুলে রাখতে হলো। ল্যাণ্ডক্রুজারটা থাকল অতিরিক্ত গ্যারেজে, পরবর্তী অভিযানের জন্যে তৈরি অবস্থায়।

দুপুরে লাঞ্চের জন্যে হাইকমিশন থেকে মাইকেল ডাফ ফিরতে স্টাডিতে বসে এক ঘণ্টা আলাপ করল ওরা। পরে একটা বোতল খুলে ওদের সঙ্গে যোগ দিল নোরা, দু'জনকে নিয়ে চলে এল সুইমিং পুলের পাশে। গাছের ছায়ায় চেয়ার-টেবিল ফেলা হয়েছে, লাঞ্চ সারবে ওরা।

'তোমার মেসেজ আমি লণ্ডনে পাঠিয়েছি,' রানাকে বলল মাইকেল। 'দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে লণ্ডনেই রয়েছেন প্রেসিডেন্ট ফাহিম ফয়সল। ফরেন অফিস থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, কিন্তু তেমন কোন লাভ হয়নি। তোমার তথ্যও অবশ্য পরিষ্কার বা নিরেট নয়। সংক্ষেপে, শেখ ফয়সল তাঁর দেশে অভ্যুত্থানের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের মানুষ আমাকে ভালবাসে, বা এ-ধরনের কিছু বলেছেন তিনি। বলেছেন, আমি তাদের পিতা। প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য করার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। লাভ বলতে এইটুকু।'

'সম্ভবত সিংহের মুখে ফিরে যাচ্ছেন ভদ্রলোক,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা, তাকিয়ে আছে নিজের প্লেটের দিকে–ভেজিটেবল গার্ডেনে নিজের হাতে ফলানো সবুজ সবজির সালাড তুলে দিচ্ছে নোরা।

'সম্ভবত,' একমত হলো মাইকেল ডাফ, হাসছে সে। 'সিংহের কথা যখন

উঠল, মনে পড়ে যাচ্ছে তোমাকে দেয়ার মত তথ্য পেয়েছি আমি। লিলঙউয়েতে আমার বন্ধুকে ফোন করেছিলাম। তোমার বন্ধু চাখার সিং সংকটাপন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন। হাসপাতাল থেকে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, এখনও সিরিয়াস, তবে অবনতির দিকে যাচ্ছে না। শুনে হয়তো খুশি হবে, তাঁর একটা হাত কেটে ফেলতে হয়েছে। মনে হচ্ছে ভালভাবেই চিবিয়েছে চিতা।'

'খুশি হতাম মাথাটা চিবালে।'

'সব আশা কি পূরণ হয়, দোস্ত! যাই হোক, এদিকের সব খবর লণ্ডনে ফোন করে তোমাকে আমি জানাব। সেই আগের নম্বরটাই তো? আমার ডায়েরীতে লেখা আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নোরার দিকে তাকাল রানা। 'ফেরার সময় কি আনব তোমার জন্যে, নোরা?'

'ফোর্টনাম-এর পুরো স্টক।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোরা। 'না, ঠাট্টা করছি। শুধু ফেয়ারবাই-এর হলুদ বিস্কিট, এক টিন। আর কয়েকটা ফ্লোরিস সাবান, যদি পারো। ওহ্, ভাল হয় যদি দুটো শিফন আনতে পারো–তোমারই কথা, শাড়ি পরলে আমাকে দারুণ লাগে। আর খাঁটি ইংলিশ চা, আর্ল গ্রে–আগেরবার যেমন এনেছিলে...।'

'ইজি, গার্ল,' কৌতুক করল মাইকেল ডাফ। 'ছেলেটা উট নয়, বুঝতে চেষ্টা করো। এক টনের বেশি ঘাড়ে চাপিয়ো না।'

সেদিন বিকেলে রানাকে ওরা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে তুলে দিল। পরদিন সকাল সাতটায় হিথরো বিমানবন্দরে নামল রানার প্লেন।

সেদিন রাতেই স্টুডিও কাম ফ্ল্যাটে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। রিসিভার তুলবে কি তুলবে না ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। কেউ জানে না লণ্ডনে ফিরে এসেছে ও। ফোনের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। চার-পাঁচবার বেজে থেমে গেল ফোন। কিন্তু এক মিনিট পর আবার শুরু হলো। যে-ই করুক, ব্যাপারটা জরুরী না হয়ে যায় না। রিসিভার তুলল রানা।

'রানা, সত্যি তুমি, নাকি অভিশপ্ত অ্যানসারিং মেশিন? কোন রোবটের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নই আমি, ম্যাটার অভ প্রিন্সিপল।'

মাইকেল ডাফের গলা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল রানা। 'কি ব্যাপার, মাইকেল? নোরা ভাল আছে? তুমি কোথায়?'

'লুসাকাতেই, রানা। দু'জনেই আমরা বহাল তবিয়তে আছি। ফাহিম ফয়সল সম্পর্কে আরও কিছু দুঃসংবাদ, দোস্ত। তোমার ধারণাই ঠিক, রানা। এইমাত্র খবর এসেছে। আকাশ ভেঙে পড়েছে তাঁর মাথায়। সামরিক অভ্যুত্থান। আমাদের কাম্পালি অফিস থেকে এইমাত্র সিগন্যাল পেলাম একটা।'

'প্রেসিডেন্ট ফয়সলের পরিণতি? নতুন লোকটা কে?'

'কিছুই বলতে পারছি না। দুঃখিত, রানা। ব্যাপারটা এখনও ঘোলাটে। বিবিসির নিউজে হয়তো থাকবে, টিভি খুলে অপেক্ষা করতে পারো। তবে কাল আমি তোমাকে আবার ফোন করব, নতুন কোন তথ্য পেলে জানাব।'

রাত আটটায় ওয়ার্ল্ড সার্ভিস নিউজে বিবিসি খবরটা পরিবেশন করল, কম গুরুত্বপূর্ণ শেষ খবর হিসেবে। শেখ ফাহিম ফয়সলের একটা প্রোফাইল ফটোগ্রাফ-এর ওপর স্থির হয়ে থাকল ক্যামেরা, খবরে শুধু বলা হলো উবোমোয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, ক্ষমতা দখল করেছে সামরিক জান্তা। ফটোয় দেখা গেল প্রায় সত্তর বছর বয়েসেও ড. শেখ ফাহিম ফয়সল যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও সুদর্শন। তাঁর গায়ের রঙ চকচকে কয়লা, শান্ত চোখ, তাকানোর ভঙ্গিটা সরাসরি। তারপরই আবহাওয়ার খবর পড়া শুরু হলো, মন খারাপ করে টিভি বন্ধ করে দিল রানা।

বছর পাঁচেক আগে একবারই মাত্র ড. ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে দেখা হয়েছে রানার, ও তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটা ম্যাগাজিনের ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টারের চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। লেক আলবার্ট-এ মাছ ধরার অধিকার নিয়ে বিরোধ চলছিল জায়ারে আর উগাণ্ডার মধ্যে, সেই সূত্রে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সাক্ষাৎকার দেন ওকে, তাঁদের মধ্যে ড. শেখ ফাহিম ফয়সলও ছিলেন। মাত্র এক ঘণ্টার ইন্টারভিউ ছিল সেটা; ভদ্রলোক তাঁর চমৎকার বাক্শৈলী, মোহন ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমের ছটায় রীতিমত মুগ্ধ করেন রানাকে। উবোমোয় বিভিন্ন উপজাতির বাস, অসংখ্য বিবাদপ্রিয় গোত্রে বিভক্ত তারা, কমবেশি সবাইকে সন্তুষ্ট করে কিভাবে গোটা দেশটায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখেছেন তিনি জানতে পেরে ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে ওর মাথা। মনের গভীরে ক্ষীণ একটু ঈর্ষাও জাগে, আহারে, এরকম একজন নেতা যদি আমরাও পেতাম!

পাঁচ বছর আগে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কেও ড. ফাহিম ফয়সল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, মনে পড়ে রানার। সেই ভাল মানুষটা আজ নেই, ফলে আরও একটু আকর্ষণ হারাল আফ্রিকা, ওর বেড়ানোর জন্যে হয়ে উঠল আরও একটু নিরানন্দ।

পরদিন সোমবারটা ব্যাংক ম্যানেজার আর ওর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে কাটাল রানা। রাতে ফ্ল্যাটে ফিরল, মন একটু ভাল হয়েছে। অ্যানসারিং মেশিনে মাইকেল ডাফের আরেকটা মেসেজ পেল ও। 'গড, এই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ব্যাপারটা আমি ঘৃণা করি। ফিরে আমাকে ফোন কোরো, রানা।'

লণ্ডনের চেয়ে লুসাকার সময় দু'ঘণ্টা এগিয়ে আছে, তবু ফোন করল রানা। 'তোমার কি ঘুম ভাঙালাম, মাইকেল?'

'এখনও আলো নেভাইনি, রানা। তোমার জন্যে খবর আছে হে। উবোমোয় নতুন ভদ্রলোকের নাম কর্নেল সিমন সাফারি। বেয়াল্লিশ বছর বয়েস। লণ্ডন স্কুল অভ ইকনমিকস আর বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা। কেউই তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, তবে এরইমধ্যে তিনি তাঁর দেশের নাম বদলে ফেলেছেন, নতুন নাম–পিপল'স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ উবোমো। লক্ষণ খারাপ। আফ্রিকায় প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্র মানে অত্যাচারতন্ত্র। সাবেক সরকারের সদস্যরা অনেকেই মারা গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে, তবে সেটা প্রত্যাশিত।'

'ড. ফয়সল সম্পর্কে কোন খবর পাওনি?' রিসিভার চেপে ধরে জানতে চাইল

রানা।

'কসাইয়ের তালিকায় সব নাম স্পষ্ট নয়, ধরে নেয়া হচ্ছে চার দেয়ালের ভেতর ফেলা হয়েছে তাঁকে।'

'চাখার সিং আর চণ্ডমণ্ড গণ্ড সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ফোন কোরো।'

'করব।'

স্টুডিওর কাটিং-রূমে নিজেকে বন্দী করল রানা, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল উবোমো আর ড. ফয়সলকে। বিসিআই ও রানা এজেন্সির কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে আফ্রিকার ওপর এই নতুন সিরিজটা দাঁড় করিয়েছে ও, এতে দেখানো হয়েছে কি কি কারণে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং কিভাবে তা রক্ষা করা সম্ভব। সিরিজটা যদি সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়, ব্যক্তিগত আর্থিক সচ্ছলতা বলে কিছু থাকবে না ওর, প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, টিভি ন্যাচারালিস্ট হিসেবে যে সুনাম ইতিমধ্যে অর্জন করেছে, তা-ও ম্লান হয়ে যাবে–এমন কি কাভার হিসেবেও তেমন কোন মূল্য থাকবে না ওটার।

হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেল, সারাদিনে একবার শুধু খাবার আর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনার জন্যে ফ্ল্যাট থেকে বেরোয় রানা। এডিটিং-এ এতই মগ্ন হয়ে থাকল যে আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো দূর অতীতে ঘটা অস্পষ্ট ও ঝাপসা বলে মনে হতে লাগল ওর। শুধু টিভির ছোট্ট পর্দায় আলি শাহকে দেখা গেলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে ওর, তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় কবর থেকে কথা বলছে সে, এক নিমেষে সব কথা মনে পড়ে যায় আবার। তখন প্রতিজ্ঞাটার কথা নিজেকে মনে করিয়ে দেয় রানা। আপনমনে বিড়বিড় করে, 'আবার আসছি। তোমাকে আমি ভুলে যাইনি। ওদের একটাকেও আমি ছাড়ব না। কথা দিয়েছি, মনে আছে?'

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সিরিজের চারটে এপিসোড ওর এজেন্টকে দেখাবার জন্যে তৈরি হলো। রানার প্রথম সিরিজটাও বিক্রি করেছিল সেলিনা মার্কহাম, সেই থেকে সম্পর্কটা অটুট আছে ওদের।

বিক্রি করার চুক্তিপত্রে এমন সব নিরীহদর্শন শর্ত জুড়ে দেয় প্রৌঢ়া সেলিনা মার্কহাম, দীর্ঘদিন পর হলেও অপ্রত্যাশিত মোটা টাকা লাভ হয়ে যায় রানার। এরকম একবার জাপান থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়্যালিটি পেয়েছে রানা, যা ওর হিসেবের মধ্যে ছিল না।

এপিসোড চারটে দেখার পর কোন মন্তব্য করলেন না সেলিনা মার্কহাম, শুধু বললেন, 'তোমাকে আমি লাঞ্চ খাওয়াব।'

আরও প্রায় দু'ঘণ্টা রানাকে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রাখলেন ভদ্রমহিলা, তারপর ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার সময় বললেন, 'মার্ভেলাস, মাই বয়। ব্রাভি মার্ভেলাস। ইওর বেস্ট ওঅর্ক আপটিল নাউ...ওয়াণ্ডারফুল। কাল সকালের মধ্যে চারটে কপি চাই আমার।'

হেসে উঠল রানা, স্বস্তিবোধ করছে। 'এখুনি আপনি ওগুলো বিক্রি করতে

পারবেন না- এখনও তো শেষই হয়নি।'

'পারব না? বিক্রি করতে পারব না? ঠিক আছে, দেখাচ্ছি।'

প্রথম এপিসোডগুলো ইটালিয়ানদের দেখালেন তিনি। আফ্রিকার ওপর ঐতিহাসিক ও ভাবাবেগজনিত আগ্রহ আছে ওদের, রানার ভাল বাজার হিসেবে ইটালি আগে থেকেই তালিকার ওপরদিকে ছিল। এক হপ্তা পর চুক্তিপত্রের খসড়া নিয়ে রানার ফ্ল্যাটে চলে এলেন তিনি। 'সিরিজটা আমার মতই পছন্দ করেছে ওরা, চারটে এপিসোড দেখেই পঁচিশ পার্সেন্ট অ্যাডভান্স করতে রাজি হয়েছে।'

'ইউ আর আ উইচ, দিস ইজ ব্ল্যাক ম্যাজিক!' ইটালিয়ানদের অগ্রিম থেকেই প্রায় সমস্ত খরচের টাকা উঠে আসছে, হিসাব করতে বসে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল রানার। সেলিনা মার্কহামকে কমিশন দেয়ার পর প্রায় আড়াই লাখ ডলার লাভ হবে ওর। আরও বেশি হবে, নির্ভর করে আমেরিকানদের ওপর। দুনিয়ার আর সব টিভি নেটওঅর্ক কেনার পর প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে অঙ্কটা।

'তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?' জানতে চাইলেন প্রৌঢ়া।

'আফ্রিকার নিরক্ষীয় এলাকার ওপর কিছু করব বলে ভাবছি,' বলল রানা। 'ওই এলাকা সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানি আমরা, অথচ বিরাট ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব আছে।'

'গুড আইডিয়া। কবে থেকে কাজ শুরু করছ?'

'এখনও ঠিক করিনি।'

'তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও,' পরামর্শ দিলেন সেলিনা মার্কহাম। 'ভাল কথা, পলের সঙ্গে কি হয়েছে তোমার? ফোনে কি সব আবোলতাবোল বকছিল। তার ধারণা, তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দু'জনে আর কোনদিন একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না। কি ব্যাপার?'

'ব্যাপারটা দুঃখজনক,' বলল রানা। 'আফ্রিকা ডাইং সিরিজে সত্যি খুব ভাল কাজ করেছে ও। আমার নতুন একজন ক্যামেরাম্যান দরকার। তেমন ভাল কেউ আছে নাকি হাতে?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন সেলিনা মার্কহাম। 'মেয়ে হলে তোমার আপত্তি আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে আপত্তি নেই। আফ্রিকা কঠিন জায়গা, বুনো আর নিষ্ঠুর। কোন মেয়ে কি টিকে থাকতে পারবে?'

'আমি যে মেয়েটার কথা ভাবছি সে যেমন কঠিন তেমনি যোগ্য। এইমাত্র বিবিসির হয়ে আর্কটিক-এর ওপর একটা সিরিজ শেষ করেছে। ঠিক আছে, তোমাকে দেব দেখতে, তাহলেই বুঝতে পারবে বৈরী পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে কিরকম খাপ খাওয়াতে পারে।'

পরদিনই টেপটা রানার স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিলেন তিনি, তবে নিজের কাজে এত ব্যস্ত থাকল রানা যে ডেস্ক দেরাজে পড়ে থাকল ওটা।

তিন দিন পর সিরিজটার কাজ শেষ হলো। টেপটা তখনও দেরাজে পড়ে

আছে, চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনায় এত উত্তেজিত ও ব্যস্ত রানা যে ওটার কথা মনেই নেই।

তারপর একদিন আবার লুসাকা থেকে ফোন করল মাইকেল ডাফ। 'রানা, এই সব ফোনের বিল দিতে হবে তোমাকে। হার ম্যাজেস্টি'জ সরকারের প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'পরের বার দেখা হলে তোমাকে আমি লাঞ্চ খাইয়ে দেব।'

'ঘুষ, না? শোনো, ভাল খবর হলো : তোমার বন্ধু চাম্বার সিং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।'

'ঠিক জানো তুমি, মাইকেল?'

'বিস্ময়কর আরোগ্য, বলা হয়েছে আমাকে। আমার লিলঙউয়ের লোক ব্যাপারটা চেক করে দেখেছে। শুধু একটা হাত নেই, তাছাড়া সব ঠিক আছে। তাকে শায়েস্তা করতে চাইলে আরেকটা চিতাবাঘ পাঠাতে হবে তোমাকে, প্রথমটায় কাজ হয়নি।'

'আমার অপর বন্ধু সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?' প্রশ্ন করল রানা।

'চীনাম্যান? দুঃখিত। রেড ড্রাগন আর ড্যাডির কাছে ফিরে গেছে।'

'তার নড়াচড়ার খবর পেলে আমাকে জানিও। লণ্ডনে আরও কিছুদিন থাকতে হবে আমাকে। কি না ঘটছে এখানে!'

বাড়িয়ে বলেনি রানা। চ্যানেল ফোর মোটা টাকা দিয়ে 'আফ্রিকা ডাইং' সিরিজ কিনে নিয়েছে, শুধু ইংল্যাণ্ডে দেখানোর জন্যে। তিন হপ্তা পর রোববারে প্রথম এপিসোডটা দেখাবে তারা।

শনিবারে রানাকে ফোন করলেন সেলিনা মার্কহাম। 'রানা, সোফিয়ার টেপটা তুমি দেখেছ?'

'সোফিয়া? সে আবার কে?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'আর্কটিক ড্রিম-এর ক্যামেরা পারসন, সোফিয়া ক্যারল। টেপটা আজ কতদিন হলো তোমার কাছে পাঠিয়েছি।'

'সত্যি দুঃখিত। একদম ভুলে গেছি। ঠিক আছে, এখুনি দেখছি আমি।' এবার কথা রাখল রানা, দেরাজ থেকে বের করে টেপটা ঢোকাল ভিসিআর-এ।

আধঘণ্টা পর মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা, সোফিয়া ক্যারল প্রথমশ্রেণীর ক্যামেরা পারসনই বটে। আর্কটিক শুধু দুর্গম বা বৈরী এলাকা নয়, স্রেফ ঠাণ্ডা একটা নরক। ওখানে যার ক্যামেরা শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, তার ক্যামেরা আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে যাদু দেখাবে। সোফিয়া ক্যারলের সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যাকুলতা অনুভব করল রানা।

আফ্রিকা ডাইং সিরিজের প্রথম প্রদর্শনী, নিজের ফ্ল্যাটে অতিরিক্ত বারোটা টিভি সেট ভাড়া করে এনেছেন সেলিনা মার্কহাম। একটা সেট এমন কি গেস্ট টয়লেটেও রাখা হয়েছে। মিডিয়া জগতের রুই-কাতলারা এসেছেন তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে। প্রধান অতিথি রানা এল আধ ঘণ্টা দেরি করে, ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকার জন্যে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হলো ওকে।

একটানা পঁয়তাল্লিশটা মিনিট সেলিনা মার্কহামের নিমন্ত্রিত অতিথিরা

আক্ষরিক অর্থেই সম্মোহিত হয়ে বসে থাকলেন যে যার চেয়ারে–রানা তাদেরকে অপার্থিব সৌন্দর্যমণ্ডিত অন্য এক ভুবনে পাঠিয়ে দিয়েছে, যেখানে সৌন্দর্যের সঙ্গে পাল্লা দেয় মানুষের নিষ্ঠুর লোভ আর বীভৎস পাপ।

এক সময় শেষ হলো এপিসোডটা। বিশাল ড্রইংরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কেউ একজন মৃদু করতালি দিল একবার, সেই শুরু। ঝাড়া পাঁচ কি সাত মিনিট একটানা চলল, থামার কোন লক্ষণ নেই। নিঃশব্দে রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন সেলিনা মার্কহাম। কিছুই তিনি বললেন না, শুধু রানার হাতটা ধরে চাপ দিলেন মৃদু।

খানিক পর রানা উপলব্ধি করল ওকে পালাতে হবে, তা না হলে মানুষের চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে ও। অনেক কষ্টে বারান্দায় বেরিয়ে এল, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকল একা, মনটা ফিরে গেছে আলি শাহের আফ্রিকায়।

কেউ একজন ওর হাত ছুঁলো। এক মুহূর্ত সাড়া দেয়নি রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ওর পাশে একটা মেয়ে। ওর প্রায় কাছাকাছি লম্বা, সবচেয়ে আগে অস্বাভাবিক এই ব্যাপারটাই লক্ষ করল ও। সুন্দরী যদি না-ও হয়, পুরুষালি ও বুনো একটা ভাব তার শক্ত-সমর্থ চওড়া কাঠামোর সঙ্গে বেমানান নয়। প্রথমদর্শনেই কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা, কিছুটা বোধহয় আকর্ষণও বোধ করল।

'সেই সন্ধে থেকে তোমাকে পাবার চেষ্টা করছি আমি,' বলল মেয়েটা। 'কোন সুযোগ পাচ্ছিলাম না। কথা ছিল মিসেস মার্কহাম পরিচয় করিয়ে দেবেন, অপেক্ষা করার ধৈর্য হলো না। আমি সোফিয়া ক্যারল।' সপ্রতিভ একজন তরুণের মত হাসল মেয়েটা।

হাতটা অফার করল রানা। শক্ত মুঠোয় নিয়ে সেটা ঝাঁকিয়ে দিল সোফিয়া। 'উনি আমাকে তোমার একটা টেপ দিয়েছেন,' বলল রানা, মনে মনে ভাবছে এই মেয়েকে বৈরী আফ্রিকা সহজে কাবু করতে পারবে না। 'আর্কটিক-এর ওপর তোমার কাজ দারুণ লাগল।'

'আফ্রিকা ডাইং-এর পরিচালক প্রশংসা করছে, তাহলে হয়তো সত্যি ভাল করেছি,' চওড়া মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা, যদিও রানার প্রশংসায় গলে পড়ার কোন ভাব নেই। 'কোনদিন যদি তোমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই, খুশি হব আমি,' সরাসরি বলল সে।

'সুযোগ হতে পারে,' বলল রানা। 'যতটা তাড়াতাড়ি আশা করি আমরা, হয়তো তারও আগে।' এখনও রানার হাতটা ছাড়েনি সোফিয়া ক্যারল, রানাও সেটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল না। রানার মনে হলো, এই মেয়েকে আফ্রিকা নিয়ে গেলে মন্দ হয় না, সময়টা বোধহয় ভালই কাটবে।

রানা ও সোফিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে, ওখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে আরেকজন চ্যানেল ফোর-এ 'আফ্রিকা ডাইং' দেখছেন। স্যার মরিস টাক ট্যাফোর্ড ব্রিটেনে রেজিস্ট্রি করা 'স্টার ওভারসীজ স্টীম শিপ কোম্পানী লিমিটেড'-এর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী একশোজনের মধ্যে অন্যতম। লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে এখনও 'শিপিং' তালিকায় থাকলেও, গত পঞ্চাশ বছরে কোম্পানীটি

তার ব্যবসার ধরন সম্পূর্ণ বদলে নিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক ঝাঁক ছোট স্টিমার আফ্রিকা আর এশিয়া থেকে পণ্য আনা-নেয়া করত, কিন্তু ব্যবসাটা জমেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে গোটা কোম্পানী নামমাত্র মূল্যে কিনে নেন টাফ ট্যাফোর্ড। যুদ্ধের সময় স্মাগলার হিসেবে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন তিনি, লাভের বিপুল টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে স্টারকে করে তোলেন বহুমুখী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

এই মুহূর্তে হল্যাণ্ড পার্ক-এ, নিজ বাড়ির চারতলায় বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। হল্যাণ্ড পার্ক লণ্ডনের অন্যতম অভিজাত এলাকা। নাইজেরিয়ায় কনসেশন আছে স্টার-এর, সেখান থেকে আনা আফ্রিকান হার্ডউড দিয়ে তাঁর স্টাডির প্যানেল বানানো হয়েছে। বাছাই করা, মাপ মেলানো, পালিশ করা প্যানেল মার্বেল পাথরের মত চকচকে। প্যানেলে একটাই মাত্র ছবি, কারণ কাঠের নকশাগুলো জমিনই তো দুর্লভ শিল্পকর্মের একটা দৃষ্টান্ত। ডেস্ক-এর দিকে মুখ করা পেইন্টিংটা পিকাসোর, পাশবিক শক্তি আর উত্তেজনাকর যৌনাবেদনই ছবিটির বিষয়বস্তু–উন্মত্ত এক দৈত্যাকার ষাঁড় ও নগ্ন এক নারী।

দরজায় পাহারা দিচ্ছে একজোড়া গণ্ডারের শিং। একটা শিঙের গা এক জায়গায় চকচক করছে, ওখানটায় গত কয়েক দশক ধরে টাফ ট্যাফোর্ডের ডান হাত পড়ছে প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত। কামরায় ঢোকার বা কামরা থেকে বেরুবার সময় শিংটার গায়ে হাত বুলান তিনি। বলা যায় এটা তাঁর একটা কুসংস্কার। শিংগুলো তাঁর জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছে।

আঠারো বছরের এক ছোকরা, কপর্দকশূন্য ও ক্ষুধার্ত, থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা পুরানো রাইফেল ও এক মুঠো কার্তুজ, সে ওই গণ্ডারটাকে ধাওয়া করে ঢুকে পড়ে সুদানের খাঁ-খাঁ মরুভূমিতে। নীলনদের তীর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটা মাত্র গুলি মগজে ঢুকিয়ে মারে সে ওটাকে। ওটার মাথা থেকে সবেগে বেরিয়ে আসা রক্ত সরু একটা নালা তৈরি করে মরুভূমির মাটিতে, সেই অগভীর গর্ত থেকে কাঁচসদৃশ একটা পাথর তুলে নেয় ছোকরা মরিস ট্যাফোর্ড, আকারে সেটা এত বড় যে তার হাতের তালু প্রায় ঢাকা পড়ে যায়।

ওই হীরাটাই শুরু। গণ্ডারটা মারা যাবার দিন থেকে বদলে গেল তাঁর ভাগ্য। শিংগুলো আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন তিনি, ওগুলো তাঁর কাছে পিকাসোর ছবির চেয়েও অনেক বেশি দামী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লিভারপুলের এক বস্তিতে জন্ম তাঁর। বাবা ছিলেন মাতাল, বাজারের কুলি। ষোলো বছর বয়েসে বাড়ি ছাড়েন ট্যাফোর্ড। নিষ্ঠুর এক ফার্স্ট মেট-এর যৌন আকর্ষণ এড়াবার জন্যে দার এস সালাম-এ জাহাজ থেকে পালান, এবং আবিষ্কার করেন আফ্রিকার রহস্য, সৌন্দর্য ও প্রতিশ্রুতি। কৌশলী, সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষের জন্যে আফ্রিকা তার সম্ভাবনার দুয়ার খোলা রেখেছে, সুযোগটা ষোলোআনা সদ্ব্যবহার করেছেন টাফ ট্যাফোর্ড, সেজন্যেই আজ তিনি সেরা একশোজন ধনীর অন্যতম।

আফ্রিকায় তাঁর স্বার্থ আছে, কাজেই আফ্রিকা সম্পর্কে সব কথা জানা থাকা চাই তাঁর। চ্যানেল ফোর ধরে 'আফ্রিকা ডাইং' দেখার সেটাই কারণ। এপিসোড

শেষ হতে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিয়ে টিভি বন্ধ করলেন তিনি, স্থির পাথরের মত চুপচাপ বসে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে নোট বইটা তুলে নিলেন, পাতা উল্টে লিখলেন–মাসুদ রানা।

চার

স্যার মরিস টাফ ট্যাফোর্ডকে চেনে বৈকি রানা। পরিচয় নেই, তবে জানে তাঁর স্টার কোম্পানীর শুঁড় আফ্রিকার এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে পৌঁছায়নি। ভদ্রলোকের আফ্রিকা ভ্রমণের খবর টিভি বা খবরের কাগজে খুব কমই আসে, কিন্তু তাঁর গালফস্ট্রীম এক্সিকিউটিভ জেটকে প্রায়ই পার্ক করা অবস্থায় দেখা যায় লুসাকা বা কিনসাসা বা নাইরোবির এয়ারপোর্ট টারমাকের দূর প্রান্তে। গুজব তাঁকে মবুতু-র মার্বেল প্রাসাদে সম্মানী অতিথি ও গোপন পরামর্শদাতার আসনে বসিয়েছে, পরিচিত করে তুলেছে লুসাকার প্রেসিডেনশিয়াল হাউসের কর্তাব্যক্তি কেনেথ কাউণ্ডার বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে। বলা হয়, চব্বিশ ঘণ্টার যে-কোন সময় ফোন তুলে ক্লার্ক বা মুগাবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন তিনি।

আফ্রিকা মহাদেশের ব্রোকার, কুরিয়ার, অ্যাডভাইজার, ব্যাংকার ও নেগোশিয়েটার, এরকম আরও অনেক কিছু বলা যায় তাঁকে, কোনটাই মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত নয়।

রানার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে না পেরে সেলিনা মার্কহামকে ধরেন ভদ্রলোক। প্রথমে রানা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। দু'দিন পর বাংলাদেশ দূতাবাসকে অনুরোধ করেন স্যার ট্যাফোর্ড। তাঁর আগ্রহ লক্ষ করে কৌতূহল বোধ করে রানা, দেখা করতে আসার পিছনে সেটাই কারণ।

মাথায় লাল ফেজ পরা কালো এক আফ্রিকান ভৃত্য দরজা খুলে দিল। রানা সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলছে শুনে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে। মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে যেন ফুলের বাজার বসেছে। লাল জিম্বাবুই টিক-এর তৈরি জোড়া দরজার সামনে পৌঁছে এক পাশে সরে দাঁড়াল লোকটা, রানার উদ্দেশে মাথা নোয়াল। কামরার ভেতর ঢুকে সিল্ক ইরাণী কার্পেটের মাঝখানে দাঁড়াল রানা।

ডেস্কের পিছন থেকে চেয়ার ছাড়লেন স্যার ট্যাফোর্ড। রানার কাছে এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল, কেন তাঁকে টাফ বলা হয়। ভদ্রলোকের হাড়গুলো অস্বাভাবিক চওড়া, যদিও ডোরাকাটা সুট তাঁর কাঠামোর উঁচু হয়ে থাকা প্রান্তগুলোকে সুডৌল ও মসৃণ করে তুলেছে, ভদ্রোচিত আড়াল দিয়েছে বিশাল বপুটাকে। পাঁচ নম্বর একটা ফুটবল তাঁর মাথা, কোন চুল নেই। চোয়ালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব, চোখে শকুনের দৃষ্টি।

'রানা,' বললেন তিনি। 'এসে ভাল করেছেন।' তাঁর কণ্ঠস্বর আন্তরিক, কথার সুরে অমায়িক একটা ভাব আছে, যা তাঁর চেহারার সঙ্গে ঠিক মানায় না। ডেস্কের

ওপর দিয়ে রানার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'অনুরোধ জানিয়ে ভাল করেছেন আপনিও, ট্যাফোর্ড,' জবাব দিল রানা, বলা যায় ঢিল খেয়ে থাকলে পাটকেলই ছুঁড়েছে। রানা বুঝিয়ে দিল, সম্পর্কটা হবে সমান মর্যাদার। চোখ কুঁচকে সম্মতি দিলেন টাফ ট্যাফোর্ড।

করমর্দন করল ওরা, পরস্পরকে পরীক্ষা করছে; শক্তি পরীক্ষার বালকসুলভ প্রতিযোগিতায় না গিয়েও পরস্পরের হাত ধরে থাকল প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ। তারপর একটা লেদার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। রানা বসার পর চাকরের উদ্দেশে বললেন, 'মুরুম্বু, চা দেবে, প্লীজ? আপনি চা খাবেন, তাই না, রানা?'

মুরুম্বু চা পরিবেশন করছে, গণ্ডারের শিং দুটোর দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'এ-ধরনের ট্রফি সাধারণত দেখা যায় না।'

ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে গেলেন স্যার ট্যাফোর্ড। শিং দুটোর গায়ে হাত বুলালেন তিনি, যেন কোন নারীকে আদর করছেন। 'না, দেখা যায় না। আমি তখন বালক মাত্র, পনেরো দিন ধাওয়া করে মারি ওটাকে। নভেম্বর মাস, ছায়ার ভেতর তাপমাত্রা ছিল একশো বিশ ডিগ্রী। পনেরো দিনে দুশো মাইল মরুভূমি চষে ফেলি।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'কম বয়েসে কত পাগলামিই না করি আমরা।'

'বেশি বয়েসেও পাগলামি আমরা কম করি না,' মুচকে হেসে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'ঠিক বলেছেন আপনি। খানিকটা পাগলামি না করলে জীবনে মজা বলতে কিছু থাকে না।' চায়ের কাপে চুমুক দিলেন তিনি, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতে বললেন মুরুম্বুকে। তারপর আবার রানার দিকে তাকালেন। 'আমি ছাড়া আফ্রিকাকে যদি কেউ চিনতে পেরে থাকে, তো আপনি–ইউ গট ইট রাইট। ইউ গট ইট এক্স্যাক্টলি রাইট। আফ্রিকার সমস্যাগুলো সরাসরি দেখিয়েছেন–উপজাতীয় বিরোধ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, অজ্ঞতা ও দুর্নীতি। আপনার দেয়া সমাধানগুলোও গ্রহণযোগ্য। ইয়েস, ইউ গট ইট রাইট।'

অসতর্ক হয়ো না, নিজেকে সাবধান করল রানা। প্রশংসা করা হচ্ছে তোমাকে নরম করার জন্যে। বুড়ো সিংহের মত তোমাকে নিয়ে খেলছেন উনি।

'মিডিয়া, তথা মানুষের ওপর আপনার যে প্রভাব, সত্যি তার তুলনা হয় না। আপনি কিছু দেখেছেন বললে মানুষ তা বিশ্বাস করবে। তারমানে আপনার দৃষ্টির ওপর তাদের আস্থা আছে। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। আপনাকে আমি সাহায্য ও উৎসাহিত করতে চাই।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা; জানে, ভাল কোন কারণ ছাড়া কাউকে সাহায্য করার লোক অন্তত টাফ ট্যাফোর্ড নন। 'এবার দয়া করে বলবেন কি আমার কাছ থেকে ঠিক কি চান আপনি?'

'ড্যাম ইট,' যেন নিজের দ্বিধা তাঁকে বিরক্ত করছে। 'আপনাকে আসলে আমার পছন্দ হয়েছে। আমার বিশ্বাস, পরস্পরকে আমরা বুঝব। দু'জনেই আমরা বিশ্বাস করি, এই গ্রহে বেঁচে থাকার অধিকার আছে মানুষের, এবং যেহেতু

প্রাণীদের মধ্যে সেই সেরা, তার অধিকার আছে নিজের স্বার্থে দুনিয়াকে শোষণ করার–অবশ্যই সীমা বজায় রেখে এবং পূরণ হওয়ার উপায় খোলা রেখে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস।'

'আপনার যে ইন্টেলিজেন্স, এরচেয়ে কম কিছু আমি আশা করি না। ইউরোপে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফসল ফলাচ্ছে, গাছ কাটছে, শিকার করছে পশু; অথচ মাটি এক হাজার বছর আগের চেয়ে উর্বর এখন, আরও বেশি হয়েছে পশুর সংখ্যা, বনভূমিও আগের চেয়ে ঘন।'

'তবে চেরনোবিলে নয়, নয় যেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে। যদিও আমি একমত, ইউরোপ খুব একটা খারাপ অবস্থায় নেই। আফ্রিকা আর এশিয়ার কথা অবশ্য আলাদা।'

'আফ্রিকা আমার প্রেম। আমার প্রথম প্রেম। উপলব্ধি করি, ওখানকার সমস্ত অমঙ্গলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ। আমার যে ক্ষমতা, পুঁজি বিনিয়োগ করে মহাদেশের দু'এক অংশের দারিদ্র্য খানিকটা হলেও ঘোচাতে পারি। আর আপনার যে প্রভাব ও প্রতিভা, মানুষের মনে আফ্রিকা সম্পর্কে যে অজ্ঞতা রয়েছে তা দূর করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন।'

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। 'আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে আপনাকে, ট্যাফোর্ড।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'অবশ্যই আপনি উবোমো দেশটা সম্পর্কে সব জানেন, তাই না?'

ঘাড়ের পিছনে চুল খাড়া হবার স্পর্শ পেল রানা। কেন যেন ওর আগেই সন্দেহ হয়েছিল, ওর ভাগ্য ওকে ওদিকেই নিয়ে যাবে। 'উবোমো, দ্য ল্যাণ্ড অভ রেড আর্থ। লাল মাটির দেশ। হ্যাঁ, ওখানে আমি গেছি। তবে নিজেকে আমি দেশটা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করতে পারি না।'

'ষাটের দশকে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার পর থেকে ওখানে তেমন কিছু ঘটেনি,' বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'গোঁয়ার এক বুড়ো একনায়ক উন্নতি, অগ্রগতি, প্রগতি ও পরিবর্তনের পথে বিরাট বাধা হয়ে ছিলেন।'

'শেখ ফাহিম ফয়সল,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, তবে কয়েক বছর আগে। তখন তিনি প্রতিবেশীদের ফিশিং রাইট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।'

'ভদ্রলোকের রোগই তাই, নীতিগতভাবে যে-কোন পরিবর্তনের বিরোধী। তিনি চেয়েছেন দেশের লোক তাঁর অনুগত থাকবে, তাঁর কথায় উঠবে তাঁর কথায় বসবে।' মাথা নাড়লেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'যাই হোক, তিনি এখন অতীত ইতিহাস। দেশটাকে খুলে দেয়ার জন্যে, দেশবাসীকে বিংশ শতাব্দীতে টেনে আনার জন্যে ওখানে এখন রয়েছেন সিমন সাফারি। ফিশিং রাইটস ছাড়াও, উবোমোয় রয়েছে বেশ ভাল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ। কাঠ আর খনিজ পদার্থ। আমি বিশ বছর ধরে ফাহিম ফয়সলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি এগুলো তাঁর দেশবাসীর জন্যে ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু তিনি আমার কথা কানে তোলেননি।'

'হ্যাঁ, খুব জেদী মানুষ তিনি,' বলল রানা। 'তবে আমি ভদ্রলোককে পছন্দ করি।'

'ও, হ্যাঁ, পছন্দ করার মতই এক অথর্ব বুড়ো বটে,' সায় দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'তবে তিনি এখন আর কোন প্রসঙ্গ নন। দেশটা উন্নতির ছোঁয়া পাবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে, এবং একটা আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম-এর পক্ষ থেকে সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটি নিতে চাই আমি–ওই কনসর্টিয়ামের লিডিং মেম্বার হলো স্টার কোম্পানী।'

'শুনে মনে হচ্ছে আমাকে আপনার দরকার নেই।'

'ব্যাপারটা এত সহজ হলে বেঁচে যেতাম। ফাহিম ফয়সলের সময় উবোমোয় এক মহিলা ব্যারিস্টার কাজ করছিলেন।' স্যার ট্যাফোর্ড গম্ভীর হলেন, রুক্ষ হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, ফলে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন মহিলা, অন্যান্য সাংবাদিক বা গবেষকরা যা পাননি। মহিলা উবোমোর বনবাসীদের ওপর একটা বই লিখেছেন–আমি বা আপনি ওদেরকে পিগমি বলব, তবে শুনতে পাই আজকাল ওদের পেগমি বলা নাকি অসভ্যতা। তার লেখা বইটির নাম...,' মনে করার জন্যে থামলেন তিনি।

'বৃক্ষছায়ার মানুষ,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, বইটা আমি পড়েছি। লেখিকার নাম মনিকা রিভেরা।' অসুর নিধন, কর্নেল ম্যানুয়েল রিভেরার মৃত্যু, পেনডুলা, জেনারেল কিরিকিটি বাওনা–ঘটনা ও ব্যক্তির টুকরো টুকরো ছবিগুলো এক পলকে রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল বনভূমিতে মনিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে রানার, তারপর আর দেখা হয়নি। তবে মনিকা কোথায় কি করছে সে-খবর মাঝে-মধ্যে পায় ও। সে যে আইন শেষ করে আফ্রিকার ওপর গবেষণা শুরু করেছে, এটা ওর কাছে একটা পুরানো খবর।

'আপনি তাঁকে চেনেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'একবার পরিচয় হয়েছিল,' বলল রানা, ঘনিষ্ঠতার কথাটা প্রকাশ করল না। 'বেশ ভাল লেখে, স্টাইলটা আমার খুব পছন্দ। উনি আসলে...।'

'উনি আসলে একটা উপদ্রব,' কড়া সুরে রানাকে বাধা দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'ব্যাপারটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে,' শর্ত দিল রানা, তবে গলার স্বরটা নিরপেক্ষ রাখল।

'ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি মেয়েটাকে ডেকে পাঠান। উনি তখন জঙ্গলে কাজ করছিলেন। উন্নতি ও অগ্রগতির প্ল্যানগুলো ব্যাখ্যা করেন প্রেসিডেন্ট, মহিলার সমর্থন ও সহযোগিতা চান। মীটিংটা সফল হয়নি। বন্ধ ফাহিম ফয়সলের ভক্ত, শুধু এই কারণে প্রেসিডেন্ট সাফারির বন্ধুত্বের প্রস্তাব

* মাসুদ রানা সিরিজের শ্বাপদসংকুল দ্রষ্টব্য।

প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি।'

হ্যাঁ, মনিকা সেই প্রকৃতিরই মেয়ে, ভাবল রানা। একজন স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্টকে তাচ্ছিল্য করার সাহস তার হবে।

'তারপর তিনি সীমান্ত এলাকায় প্রচারণা শুরু করলেন, ফলে অধিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। তাঁর অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট সাফারি মানবাধিকার লংঘন করছেন। বলছেন, প্রেসিডেন্ট নাকি অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে দেশটার প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। তাঁকে তিনি রেপিস্ট বলছেন, প্রাকৃতিক সম্পদকে ধর্ষণ করতে চান। আপনিই বলুন, কোন ভদ্রমহিলা এ-ধরনের ভাষা একজন সম্মানী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন?'

'চিন্তার কথা,' বলল রানা। 'অভিযোগগুলো যদি সত্যি হয়।'

'নতুন সরকারকে যতভাবে সম্ভব আক্রমণ শুরু করলেন তিনি, কাজেই প্রেসিডেন্ট তাঁকে বাধ্য হয়ে দেশ থেকে বের করে দিলেন। মহিলা আমেরিকান নাগরিক, তবে ব্রিটিশ পাসপোর্টও আছে। এখনও তাঁর শিক্ষা হয়নি, এখানে ফিরে এসেও উবোমো সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন।'

'তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার,' বলল রানা, ওকে ডেকে পাঠানোর পিছনে স্যার ট্যাফোর্ডের উদ্দেশ্যটা কি না জেনে কোন পক্ষ অবলম্বন করতে চাইছে না।

'দুঃখজনক হলেও সত্যি, শক্তিশালী লেখনির সাহায্যে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন মহিলা। টিভিতে তাঁকে দেখায়ও ভাল। তিনি যে একজন ফ্যানাটিক, এটা তিনি গোপন রাখতে পারেন।'

'একটা জিনিস বুঝছি না,' বলল রানা। 'স্টার কোম্পানী বিশাল একটা ব্যাপার, মনিকা রিভেরার মত একজন লেখিকাকে ভয় পাবার কি আছে আপনাদের?'

'না, ভয় পাবার কিছু নেই, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, উবোমোয় আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার পর তিনি ও তাঁর সমর্থকরা যা নয় তাই বলে অপপ্রচার শুরু করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে আজেবাজে মিথ্যে কথা লেখা হচ্ছে। কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডাররা নানা রকম প্রশ্ন তুলছেন, জবাব দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমরা। সামনে আবার বার্ষিক সাধারণ সভা। এদিকে, এইমাত্র জানতে পারলাম যে স্টার-এর সামান্য কিছু শেয়ারও তাঁর কেনা আছে। অর্থাৎ সাধারণ সভায় তিনি যে উপস্থিত থাকবেন এবং গোলযোগ সৃষ্টি করবেন, এ আপনি ধরে নিতে পারেন। "প্রকৃতি প্রেমিক" নামে একদল ফ্যানাটিক তাঁকে উৎসাহ যোগাচ্ছে...।'

'বিব্রতকর পরিস্থিতি, সন্দেহ নেই,' হাসি চেপে বলল রানা। 'আপনি আমার কাছ থেকে ঠিক কি ধরনের সাহায্য আশা করেন?'

'সাধারণ মানুষ আর বিজ্ঞানীদের ওপর আপনার প্রভাব মনিকা রিভেরার চেয়ে অনেক বেশি। সর্বস্তরের লোকজনকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছি আমি। সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আমার প্রস্তাব হলো, উবোমোয় গিয়ে আপনি একটা ডকুমেন্টারী ছবি তৈরি করুন। মনিকা রিভেরা যে-সব অভিযোগ করছেন তা সত্যি

কিনা পরীক্ষা করুন। ছাপার অক্ষরের চেয়ে টিভি অনেক বেশি শক্তিশালী মিডিয়াম, আপনার ডকুমেন্টারী তাঁকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। আপনাকে আমি ম্যাক্সিমাম এক্সপোজার-এর নিশ্চয়তা দেব। স্টার-এর রয়েছে বিশাল সব মিডিয়ানেটওঅর্ক···।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। স্পর্ধা ছাড়া কি, ভদ্রলোক ওকে কিনে নিতে চান! অনেক কষ্টে চুপ করে থাকল ও। আগে সব কথা শোনা যাক।

'প্রেসিডেন্ট স্যাফারি এবং তাঁর সরকার সম্ভাব্য সবরকমভাবে সহযোগিতা করবেন আপনার সঙ্গে, কথা দিচ্ছি আমি। আপনার যা যা লাগবে সব তাঁরা সরবরাহ করবেন। সামরিক পরিবহন—হেলিকপ্টার, লেক পেট্রল বোট, চাওয়ামাত্র পেয়ে যাবেন। যেখানে খুশি যেতে পারবেন, যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলবেন···।'

'রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে?' রানার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

'রাজনৈতিক বন্দী? কেন, তাদের সঙ্গে কথা বলার দরকার কি? আপনার ডকুমেন্টারী হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর পিছিয়ে পড়া একটা সমাজের উন্নতির ওপর। শুনুন, রানা, প্রেসিডেন্ট সাফারি অত্যন্ত উদার ও প্রগতিশীল নেতা, তিনি কোন রাজনৈতিক নেতাকে বন্দী করে রেখেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে ফাহিম ফয়সলের ব্যাপারটা কি?'

'আমি কি উবোমো সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি? আপনার কথায় আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত রয়েছে?'

'না, আমি শুধু জানতে চাইছি কিসের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, শুনুন তাহলে। ফাহিম ফয়সলের বয়স হয়েছিল। ক্ষমতা বদলের সময় তাঁকে বাধ্য হয়ে গৃহবন্দী করে রাখেন প্রেসিডেন্ট সাফারি। ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে আইনবিদ ও ডাক্তার ছিল, যখন তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। প্রেসিডেন্ট সাফারি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এখনও কোন ঘোষণা দেননি। কারণ ব্যাপারটাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হতে পারে···।'

'লোকে হয়তো ভাববে সামরিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হবার পর তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে,' বলল রানা, বৃদ্ধ ফাহিম ফয়সলের জন্যে দুঃখ হলো ওর।

'হ্যাঁ, মানুষ এরকম ভাবতে পারে,' বলে চলেছেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'তবে প্রেসিডেন্ট সাফারি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আসল ঘটনা সেরকম কিছু না।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম। এবার, খরচের প্রসঙ্গ। স্বভাবতই আপনি প্রথমশ্রেণীর কাজ চাইবেন। অন্তত দুই মিলিয়ন ডলারের মত লাগবে, তার কমে হবে না। কে দেবে টাকাটা? স্টার?'

'না, তাহলে লোকে বলবে এটা আমাদের বিজ্ঞাপন—কোম্পানী প্রপাগাণ্ডা। না, বাইরে থেকে টাকা যোগাড় করে দেব আমি। টাকাটা আসবে দূরপ্রাচ্যের একটা কোম্পানী থেকে। কোম্পানীটি কনসর্টিয়াম-এর সদস্য হলেও, এই পর্যায়ে প্রকাশ্য স্টার-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। হংকঙে ওদের একটা ফিল্ম কোম্পানীও আছে, সেটাকে আমরা ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করব।'

'পেরেন্ট কোম্পানীর নাম কি? হেডকোয়ার্টার কোথায়?' ক্ষীণ একটা আশঙ্কা

জাগছে রানার মনে, এ-ধরনের একটা আশঙ্কা আগেও ভুগিয়েছে ওকে।

'পেরেন্ট কোম্পানীটি তাইওয়ানিজ, খুব বিখ্যাত না হলেও মোটা টাকা খাটায়, অত্যন্ত শক্তিশালী।'

'নামটা বলবেন না?'

'টিপিক্যালি চাইনিজ,' বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'রেড ড্রাগন কোম্পানী।'

তাকিয়ে থাকল রানা, কথা বলার শক্তি নেই। আলি শাহের মৃত্যু অদ্ভুত ভাবে চণ্ডমণ্ড গণ্ড আর ওর নিয়তির মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। ভাগ্যই যেন ওদেরকে আবার মুখোমুখি দাঁড় করাবার দায়িত্ব পালন করছে।

'কোনও ব্যাপারে আপনি উদ্বিগ্ন, রানা?' স্যার ট্যাফোর্ড জানতে চাইলেন।

'না, আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছি। আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল রানা। উবোমোয় যাবার এই সুযোগ হারাতে রাজি নয় ও কিছুতেই। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে নাগালের মধ্যে পাবার সুযোগ এটা, হারালে আলি শাহের আত্মা ধিক্কার দেবে ওকে। 'আপনি আয়োজন করুন, তারপর জানান আমাকে।'

পাঁচ

তিন দিন পর রানার ক্যামেরা পারসন হিসেবে চুক্তিপত্রে সই করল সোফিয়া ক্যারল। দু'ঘণ্টা বেতন, সুযোগ-সুবিধে ও শর্ত নিয়ে আলোচনার পর চার কপি চুক্তিপত্র তৈরি করল রানা। কাজটায় মন দেয়া কঠিন হয়ে উঠল, কারণ ওর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে কাগজের ওপর সারাক্ষণ ঝুঁকে থাকল সোফিয়া, ফলে তার বিশাল ও নরম পুরোটা বুক রানার ঘাড় ও মাথায় রোমাঞ্চকর বোঝা হিসেবে চেপে থাকল। চারটে কপির মধ্যে দুটো থাকবে ওদের কাছে, একটা করে যাবে সেলিনা মার্কহাম ও স্টার কোম্পানীর ঠিকানায়।

'তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি হলো, এ উপলক্ষ্যে একটা উৎসব হওয়া দরকার,' প্রস্তাব করল সোফিয়া। 'চলো, আমার ফ্ল্যাটে আজ তুমি খাবে। কোন অজুহাত দেখালে ভাল হবে না কিন্তু।'

হাসিমুখে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা। 'ভুলে গেছ, আজ আমাদের স্টার হেডকোয়ার্টারে ব্রিফিং করা হবে?'

রানার ফ্ল্যাটে রয়েছে ওরা, এগিয়ে এসে ওর চেয়ারের হাতলে বসল সোফিয়া, একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। 'আমি রাতের কথা বলছি, মহাশয়! বলছি সারাটা রাতের কথা, যদি বুঝতে পেরে না থাকো।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' বলল রানা, মনস্থির করতে পারছে না। সোফিয়ার দৈহিক কাঠামোটাই শুধু বিশাল নয়, তার প্রাণশক্তিও বিপুল। কাল বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে ছিল ওরা, লণ্ডন শহরে চরকির মত রানাকে ঘুরিয়েছে মেয়েটা। হাঁটে না, লাফ দেয়। গাড়ি চালায়, যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সারাক্ষণ খই ফুটছে মুখে, শুনে মনে হবে ঝগড়া করছে। যখন হাসে, সাবধান

হয়ে যায় রানা, জালে গড়িয়ে পড়বে গায়ে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা ভারি অস্বস্তিবোধ করেছে ও, এ আবার কেমন মেয়ে রে বাবা! ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে, এ-সব ওর নোংরা কোন কৌশল নয়। ওর স্বভাবটাই এরকম-আন্তরিক, প্রাণচঞ্চল, খোলামেলা-কারও সঙ্গে মিশলে মাঝখানে জড়তা বা সংকোচকে বাধা হতে দেয় না।

'হ্যাঁ, কাজ আগে, তারপর আনন্দ,' রানার কথা মেনে নিল সোফিয়া। 'চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক।'

খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের প্রাচীন মঠের পাশেই একটা পাব, তার ঠিক উল্টোদিকে স্টার কোম্পানীর হেড অফিস। রাস্তাটার নাম ব্ল্যাকফ্রাইয়ারস। টিউব স্টেশনের মেইন এন্ট্রান্স থেকে বেরিয়ে বিল্ডিঙটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা ও সোফিয়া। আশপাশে পাঁচ-সাততলা অনেকগুলো বিল্ডিং, স্টার বিল্ডিঙটা সবগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে, বিশেষ করে রাস্তার আরেক প্রান্তের ইউনিলিভার বিল্ডিঙটাকে। ইউনিলিভার গ্র্যানিট পাথরে তৈরি, স্টার মার্বেল পাথরে, ইউনিলিভারের সামনে অলিম্পিয়ান ঈশ্বরদের অনেকগুলো বিশাল আকারের মূর্তি রয়েছে, স্টারে ওগুলোর সংখ্যা বারো গুণ বেশি। ইউনিলিভারের প্রতিটি গ্রীক স্তম্ভের জায়গায় স্টারে রয়েছে চারটে করে স্তম্ভ।

সিঁড়ি বেয়ে প্রধান দরজার সামনে উঠে এল ওরা, পাথুরে ঈশ্বররা তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। রিভলভিং গ্লাসডোর পেরিয়ে লবিতে ঢুকল রানা, সামান্য ভয় ভয় ভাব নিয়ে ওকে অনুসরণ করল সোফিয়া। লবির মেঝে দাবার ছক, কালো ও সাদা মার্বেল। গোটা ছাদ সোনা রঙে গিলটি করা, তার ওপর বিচিত্র ধাঁচের অলংকরণ। প্যানেলে দক্ষ শিল্পীদের কাজ, বেশিরভাগই ধর্মীয় দৃশ্য।

একজন সিনিয়র পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের পরিচয় জানিয়ে ওদেরকে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় নিয়ে এলেন তিনি, ল্যান্ডিং ও প্যানেলের প্রতিটি শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কয়েকশো কামরার ভেতর স্টার বাহিনীর লোকজন কাজ করছে, প্রতি তলায় করিডরগুলো সংখ্যায় এত বেশি যে গোলকধাঁধার মত লাগল। অবশেষে চারতলার কনফারেন্স রুমে এল ওরা, এত বড় যে হাজার দুয়েক লোক বসতে পারবে।

'ওদের জন্যে চারজন কর্মকর্তা অপেক্ষা করছিলেন। পাবলিক রিলেশন্স অফিসার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাইকেল হবসন, সিনিয়র জিওলজিস্ট; তাঁর দায়িত্বে রয়েছে উবোমোর খনিজ উন্নয়ন। পাশে বসে রয়েছেন তাঁর সহকারী, বব গুডম্যান। তারপর টনি এণ্ডারসন, উবোমোর টিম্বার ও ফিশিং কনসেশন দেখাশোনা করছেন। সবশেষে ডেরিক শার্প, লিগ্যাল সেকশনের সিনিয়র কর্মকর্তা, আইনগত যে-কোন প্রশ্নের সমাধান দেবেন।

বৈঠক শুরু হবার আগে শেরি পরিবেশন করা হলো।

পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ছোট একটা ভাষণ দিলেন। 'মি. মাসুদ রানা, আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, কাজেই

মনে কোন প্রশ্ন জাগলে ইতস্তত করবেন না। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর উবোমো যে উন্নতি করতে যাচ্ছে তার ফল উবোমোর সর্বস্তরের জনসাধারণই ভোগ করবে, স্টার তাদেরকে এ-কাজে সাহায্য করার বিনিময়ে শুধু আরও সুনাম অর্জন করতে চায়-লাভের কথা যদি বলেন, শুধু খরচ উঠলেই আমরা খুশি।'

এরপর দ্য পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ উবোমো-র অবস্থান সম্পর্কে বললেন তিনি, বিশাল এক পর্দায় দেশটার ম্যাপ আলোকিত হয়ে উঠল।

মধ্য আফ্রিকার পুব দিকে লেক আলবার্ট আর এডওয়ার্ডের মাঝখানে, গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি-র ঢালে উবোমো-পশ্চিমে জায়ারে, সাবেক বেলজিয়ান কঙ্গো, পুব দিকে উগাণ্ডা রুওয়েনজোরি পাহাড়শ্রেণীর নিচে রাজধানী কাহালি, লেকের তীরে। রুওয়েনজোরিকে চাঁদের পাহাড়ও বলা হয়।

উবোমোর লোকসংখ্যা চল্লিশ লাখের মত আন্দাজ করা হয়, যদিও কখনও আদমশুমারি হয়নি। উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উহালি-রা। তবে নতুন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি এবং মিলিটারী কাউন্সিল-এর বেশিরভাগ সদস্য হিটা উপজাতির লোক। উবোমোর সব মিলিয়ে উপজাতি রয়েছে এগারোটা, তাদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হলো বামবুটি, যাদেরকে পিগমিও বলা হয়। দেশের উত্তর প্রান্তে হাজার পঁচিশেক বামবুটি রেইন ফরেস্টে বসবাস করে, সংখ্যাটা ক্রমশ কমছে। স্টার-এর বেশিরভাগ মিনারেল কনসেশনগুলো ওদিকেই। সমস্ত কনসেশনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সোফিয়া বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করল, দেখে মনে হলো পাবলিক রিলেশন্স অফিসার জবাব দিচ্ছে তার উন্নত স্তনযুগলকে। এরপর একে একে কোম্পানীর এক্সিকিউটিভরা তাঁদের বক্তব্য বলে গেলেন।

টনি এণ্ডারসন বোঝালেন লেকের ধারে তাঁরা কি ধরনের রিসর্ট আর ক্যাসিনো গড়ে তুলতে চাইছেন। তাঁর আশা, ট্যুরিস্টরা ওখানে মূলত ইটালি আর ফ্রান্স থেকে যাবে-রোম থেকে আকাশ পথে সময় লাগবে আট ঘণ্টা। বছরে তিন লাখ ট্যুরিস্ট আশা করছেন তিনি। ট্যুরিজম ছাড়া আয়ের আরেকটা উৎস, অ্যাকুয়াকালচার ইণ্ডাস্ট্রি। বাঁধ দিয়ে পানি আটকানো হবে, সেখানে চাষ হবে চিংড়ি সহ বিভিন্ন মাছের। বছরে এক মিলিয়ন টন শুকনো প্রোটিন উৎপাদন করা তাঁর লক্ষ্য। লেক থেকেও এই পরিমাণ মাছ তুলে হিমায়িত করার ইচ্ছে রাখেন তিনি।

রানা বলল, 'তারমানে লেকে আপনি কার্প ও এশিয়ান শ্রিম্প্ ছাড়বেন, তাতে লেকে ইকোলজিক্যাল সমস্যা দেখা দেবে না?'

'একদল বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছেন, মাস ছয়েকের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে যাব-আশা করি কোন অসুবিধে হবে না,' রানাকে আশ্বস্ত করে হাসলেন টনি এণ্ডারসন। রানা আন্দাজ করল, বিশেষজ্ঞরা সবাই স্যার ট্যাফোর্ড-এর বেতনভুক হবেন, কাজেই অনুকূল রিপোর্ট পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

দেশটার অর্ধেক পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে খোলা প্রান্তর, ওখানে ক্যাটল-র‍্যাঞ্চ করা হবে। ওখানে সমস্যা হলো, পোকামাকড়। প্লেন থেকে ওষুধ ছিটিয়ে ধ্বংস

করা হবে ওগুলো। প্রজেক্টটা শেষ হলে উবোমোয় গরুর মাংসের কোন অভাব থাকবে না, রফতানি থেকেও আয় হবে বিপুল।

'প্লেন থেকে ওষুধ ছিটাবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কি কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন?'

'আপনি শুনে খুশি হবেন যে স্টার বিপুল পরিমাণে সেলক্রিন যোগাড় করেছে, খুবই কম দামে...।'

'সেলক্রিন? ওটা তো আমেরিকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে! আমেরিকায় আর ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে।'

রানাকে আবার আশ্বাস দিয়ে বলা হলো, উবোমোয় সেলক্রিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি।

রানা উপলব্ধি করল, শুধু চণ্ডমণ্ড গঞ্জের নাগাল পাবার জন্যে নয়, স্টার-এর অশুভ ব্যবসায়িক তৎপরতা ব্যর্থ করার জন্যেও উবোমোয় ওর যাওয়াটা জরুরী। জাম্বেজি উপত্যকায় সেলক্রিন ব্যবহার করার ফলে কি ঘটেছে দেখা আছে ওর। পাখি আর স্তন্যপায়ী ছোট প্রাণীরা পোকা খেয়েই জীবন ধারণ করে, সেলক্রিন সমস্ত পোকা ধ্বংস করে দেয়ায় তারাও বাঁচেনি।

র‍্যাঞ্চের জন্যে উপযোগী নয় এমন জায়গায় ফলানো হবে তুলো আর আখ। লেক থেকে পাম্প করে সরবরাহ করা হবে পানি। তবে এ-সবে সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি নগদ আমদানির ব্যবস্থা করা হবে লগিং অপারেশন থেকে। পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় শ্রেণীকে ঢেকে রেখেছে ঘন বনভূমি, ওখান থেকে গাছ কেটে রফতানি করা হবে।

'বৃক্ষছায়া,' বিড়বিড় করল রানা।

'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'না, কিছু না। আপনি বলে যান, প্লীজ।'

লগিং অপারেশন আর মাইনিং অপারেশন একই সঙ্গে চলবে, একটা অন্যটার পরিপূরক হিসেবে। যে-কোন একটা প্রজেক্ট করা হলে লাভজনক হবে না। হিসাব করে দেখা গেছে, খনিজ পদার্থ আবিষ্কার ও উত্তোলনের খরচ উঠে যাবে গাছ কাটার আয় থেকে, ফলে খনিজ থেকে যা আয় হবে তার সবটাই লাভ। এ-ব্যাপারে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন মাইকেল হবসন।

মাইকেল হবসনও প্রায় আধ ঘণ্টা সময় নিলেন।

সার-সংক্ষেপ দাঁড়াল: উবোমোর বনভূমি কেটে সাফ করে ফেলা হবে, গরু-মোষের খামার তৈরি ও ফসল ফলাবার স্বার্থে ব্যবহার করা হবে মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশক, ভূমি-ধস বা অন্যান্য বিপদের কথা বিবেচনা না করেই খনিগুলো থেকে চেঁছে বের করা হবে প্রাকৃতিক সম্পদ। স্টার-এর নেতৃত্বে উবোমোকে ছিবড়ে বানাবার, পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়ার চমৎকার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রানা ধারণা করল, গোটা অধিবেশনটা সম্ভবত রেকর্ড করা হচ্ছে ক্যামেরায়, টাফ ট্যাফোর্ডকে পরে দেখানো হবে। কাজেই ওদের কথায় সায় দিয়ে গেল ও, মনে মনে জানে উবোমোয় পৌঁছে ওদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে।

মীটিং শেষ হলো। তারপর ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো স্যার ট্যাফোর্ডের

চেম্বারে। পাবলিক রিলেশন্স অফিসার সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'স্যার ট্যাফোর্ড অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, দু'মিনিটের বেশি সময় নেবেন না, প্লীজ।'

ওদেরকে দেখে ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়ালেন টাফ ট্যাফোর্ড। 'ওরা আপনার যত্ন নিয়েছে তো, রানা?' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'যত্ন তো নিয়েছেনই, মুগ্ধও করেছেন,' রানা তাঁকে আশ্বস্ত করল। 'যে ধারণাটা পেলাম, আমার ডকুমেন্টারীর নাম যদি হয় "উবোমো, আফ্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ" তাহলে বোধহয় দারুণ মিলে যায়, কি বলেন?'

'আই লাইক ইট!' নির্দ্বিধায় বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'আপনাকে খুশি করা গেছে, সেজন্যে আমি আনন্দিত, রানা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়েও আনন্দিত আমি। এবার, আমাকে যদি ক্ষমা করেন...।'

স্টার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে বলো তো, সোফিয়া?'

'বুঝলাম, স্যার ট্যাফোর্ড অত্যন্ত সেক্সি পুরুষ। তাঁর সব কিছু থেকে টাকা আর ক্ষমতার গন্ধ বেরুচ্ছে, ক্যাভিয়ার ও শ্যাম্পেনের চেয়ে কড়া।'

'আর কি বুঝলে, ভদ্রলোকের যৌনাবেদন ছাড়া? উবোমোকে নিয়ে স্টার-এর পরিকল্পনা, কেমন লাগল তোমার?'

'প্রচুর টাকা কামাবে ওরা, এটা পরিষ্কার। আর কি বোঝার আছেই বা, টাকাই তো দুনিয়ায় সব, তাই না?'

হতাশ বোধ করল রানা, তবে কিছু বলল না আর।

স্যার ট্যাফোর্ডের মহিলা সেক্রেটারি আগেই টেলিফোনে সাবধান করে দিল, সাক্ষাৎ হবে গোপনে। কিভাবে কোথায় যেতে হবে সব বুঝিয়ে বলে দিল সে। উল্লাসে এতই অধীর হয়ে পড়ল সোফিয়া ক্যারল যে তাকে একটা ধন্যবাদ দেয়ার কথাও মনে থাকল না। স্যার ট্যাফোর্ড তার শরীরটার লোভে পড়ে গেছেন, এরকম একটা ধারণা তার আগেই হয়েছিল, সেটা সত্যি হতে দেখে রঙিন স্বপ্নগুলো চারদিকে পাখা মেলে দিল। প্রাসাদ, ইয়ট, হীরা বসানো গহনা, রোলস রয়েস, ব্যক্তিগত জেট প্লেন–তার মনে হলো এগুলো ইচ্ছে করলেই পেতে পারে সে, শুধু একটু কৌশলে এগোতে হবে।

অভিজাত একটা রেস্তরাঁর কেবিনে দেখা হলো ওদের। স্যার ট্যাফোর্ড ডিনারের অর্ডার দিলেন। সোফিয়া যে মিথ্যে স্বপ্ন দেখছে না, যেন সেটা প্রমাণ করার জন্যেই পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, বললেন, 'তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ এটা উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করো, সোফিয়া।'

বাক্সটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল সোফিয়া। হীরা বসানো একটা নেকলেস!

ডিনার এল। এক ফাঁকে সোফিয়া বলল, 'আপনার কোন সেবায় লাগতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব, স্যার ট্যাফোর্ড।'

ডিনার শেষ হলো। স্যার ট্যাফোর্ড সরাসরি জানতে চাইলেন, 'রানার সঙ্গে তুমি শুচ্ছো নাকি?'

'জ্বী!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ওর সঙ্গে বিছানায় উঠছ তুমি?'

অপমান বোধ করল সোফিয়া। ভয় লাগল, এটা তাকে পরীক্ষা করার একটা কৌশলও হতে পারে। সে বলল, 'আমি আপনার কাছ থেকে এ-ধরনের প্রশ্ন আশা করি না, স্যার ট্যাফোর্ড। আপনি আমাকে অপমান করছেন।'

'কার সঙ্গে কথা বলছি আমি? আমার ধারণা, থেরেসা স্মিথ-এর সঙ্গে। তোমার বার্থ-সার্টিফিকেটে এই নামটাই তো আছে, তাই না? চোদ্দ বছর বয়সে মারিজুয়ানা ধরো, আঠারোতে শেখো চুরি আর দেহদান করতে। মহিলাদের জেলে ভরা হয় তোমাকে, তবে ভাল আচরণের জন্যে তিন মাস পরই ছাড়া পেয়ে যাও। ওই তিন মাসে ফটোগ্রাফী শেখো। কোথাও ভুল হলে বলবে।

'জেল থেকে বেরিয়ে নামটা পাল্টে ফেল, ফটোগ্রাফার হিসেবে চাকরি পাও কানাডার পিটারসন টেলিভিশনে। চাকরিটা যায় চুরির অভিযোগে, তবে ওরা তোমার বিরুদ্ধে কেস করেনি। তারপর থেকে রেকর্ড তোমার ভালই-ভাল হয়ে গেছে, নাকি আরও চালাক হয়েছ?'

'ইউ বাস্টার্ড!' হিসহিস করে উঠল সোফিয়া।

'আমি বুড়ো এক লোক, ডিয়ার। তোমার শরীরের ওপর আমার কোন লোভ নেই। আমি জানি, তোমার টাকা দরকার। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে পারো। যা জিজ্ঞেস করলাম তখন, রানার সঙ্গে বিছানায় উঠছ?'

'না।'

'ওঠো। কিন্তু সাবধান, ভালবেসে ফেলো না। নাকি সেরকম কোন আশঙ্কা আছে?'

'আমি দুনিয়ায় একজনকেই ভালবাসি, এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে আছে সে।'

'গুড। তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি হতে পারে। পঁচিশ হাজার ডলার, ঠিক আছে?'

ঠোঁট বাঁকা করে সোফিয়া বলল, 'আমি শুনেছি একটা ঘোড়ার জন্যে এর দশগুণ বেশি দাম দেন আপনি।'

'তা দেই। ঠিক আছে, পারিশ্রমিক নিয়ে পরে কথা হবে। আগে শোনো তোমাকে কি করতে হবে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সোফিয়া। 'বলুন।'

'কাজটা একদম সহজ,' বলে শুরু করলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

হপ্তার বাকি ক'টা দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে পড়াশোনা করে কাটাল রানা। বিশেষ করে উবোমোর ওপর লেখা বই ছাড়াও কঙ্গো, রিফট ভ্যালি আর সংশ্লিষ্ট লেকগুলোর ওপর যা যা লেখা হয়েছে সব ওকে যোগাড় করে দিল লাইব্রেরিয়ান মহিলা। এ-সবের মধ্যে মনিকা রিভেরার লেখা 'বৃক্ষছায়ার মানুষরা'-ও থাকল। এবার নিয়ে তিনবার পড়ল বইটা ও।

দেখতে দেখতে শুক্রবার এসে গেল। স্টার কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা

আজ। মেকআপ করতে বেশি সময় নিল সোফিয়া, ফলে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল ওদের।

স্টার-এর হেড অফিসে আজ কড়া সিকিউরিটি। রুশদী-বিরোধী মৌলবাদী, আইআরএ, মাফিয়া বা অন্য কোন সন্ত্রাসীদের কোন সুযোগ দিতে চান না স্যার ট্যাফোর্ড। ভেতরে ঢুকে ডায়াসে উঠল ওরা, স্বয়ং স্যার ট্যাফোর্ড ওদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন। ওদের সামনের সারিতে বসেছেন বোর্ড মেম্বাররা। তাঁদের মধ্যে ভারতের একজন মহারাজা, ব্রিটেনের একজন আর্ল, পাঁচজন ব্যারন, পুব ইউরোপের দু'জন নতুন ধনকুবেরকে চিনতে পারল রানা।

ভাষণের শুরুতে সুসংবাদ দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড। জাম্বিয়ায় এবার বাদামের বাম্পার ফলন হয়েছে। পেমবা চ্যানেলের অয়েল ড্রিলিং থেকে লাভ হয়েছে মোটা টাকা। একটা করে তথ্য দেন তিনি, উপস্থিত শেয়ার হোল্ডাররা হাততালিতে ফেটে পড়েন।

তারপর তিনি কৌতুক করে বললেন, 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এতক্ষণ আপনাদেরকে আমি দুঃসংবাদ শুনিয়েছি, এবার সুসংবাদ শুনুন। সুসংবাদ হলো, উবোমো। দ্য পিপল'স রিপাবলিক অভ...।'

'চেয়ারম্যানকে আমার একটা প্রশ্ন করার আছে!' একটা নারীকণ্ঠ, শোনামাত্র চিনতে পারল রানা। তীক্ষ্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আশ্চর্য চড়া।

জনারণ্যের ভেতর এতক্ষণ মনিকাকে খুঁজছিল রানা, কিন্তু পাচ্ছিল না। এখন তাকে দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই, সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। অস্বাভাবিক চড়া কণ্ঠস্বরের কারণটাও বোঝা গেল, কথা বলছে একটা ইলেকট্রিক বুল-হর্ন মুখের সামনে তুলে ধরে।

'মি. চেয়ারম্যান, স্টার তার ট্রেডমার্ক বদলে সবুজ একটা গাছ বেছে নিয়েছে। আমি জানতে চাই, গাছ কাটা হবে বলেই কি এই পরিবর্তন?'

বিশাল হলরুমে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নিস্তব্ধতা ভাঙল আবার মনিকাই। 'বহু বছর ধরে স্টার পেশাদার শিকারীদের ভাড়া করছে বুনো পশুদের হত্যা করার জন্যে। বাঘ, গণ্ডার, হাতি, হরিণ-যেখানে যা পাচ্ছেন সব আপনি মেরে সাফ করে ফেলছেন। আজ ত্রিশ বছর ধরে আফ্রিকার বনভূমি কেটে চাষাবাদের জন্যে জমি বের করছে স্টার, জমিতে বিষ ঢালছে, দূষিত করছে লেক আর নদী, অথচ ফলানো ফসল স্থানীয় অধিবাসীরা ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না...।'

'দয়া করে আপনি আপনার নামটা বলবেন, এবং প্রশ্নগুলো ছোট করবেন?'

'আমি মনিকা রিভেরা, স্টার-এর একজন শেয়ারহোল্ডার। শুনুন, বোর্ড মেম্বারদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই...।'

'অর্ডার, অর্ডার!' হুংকার ছাড়লেন কোম্পানী সেক্রেটারি। 'আপনি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন, মিস মনিকা রিভেরা। আপনি কোন প্রশ্ন করছেন না।'

'ঠিক আছে, করছি প্রশ্ন। স্টার-এর চেয়ারম্যান কি সচেতন যে এখানে যখন বসে আছি আমরা, ঠিক এই সময় উবোমোর বনভূমি কেটে সাফ করে ফেলা হচ্ছে? উনিকি জানেন, স্টার-এর তৎপরতার কারণে উবোমোর পঞ্চাশটারও বেশি

বুনো প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এরইমধ্যে?'

'শেম! সিট ডাউন!'

'প্রজাতির মৃত্যু সরাসরি প্রভাব ফেলবে আমাদের ওপর। এর ফলে আমরা, মানুষ, অস্তিত্ব হারাব দুনিয়ার বুক থেকে।'

অসন্তুষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা গুঞ্জন তুলল। মৃদু মৃদু হাসছেন স্যার ট্যাফোর্ড, দেখে মনে হবে করুণা করছেন, আক্রমণের জবাব দিতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। শেয়ারহোল্ডাররা কি পছন্দ করেন, জানেন তিনি।

'বসে পড়ুন!' কেউ একজন চিৎকার করল। 'ঝগড়াটে মেয়েমানুষ!'

'মনিকা রিভেরা,' কোম্পানী সেক্রেটারি বললেন, 'আপনাকে আমি নিজের আসনে বসে পড়ার অনুরোধ করছি। আপনি আমাদের সভার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন।'

'আপনার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করছি, মি. চেয়ারম্যান,' সরাসরি স্যার ট্যাফোর্ডের দিকে তর্জনী তাক করল মনিকা, 'অভিযোগ করছি ধর্ষণের।'

সচিৎকার প্রতিবাদ শুরু হলো, শেয়ারহোল্ডাররা দাঁড়িয়ে পড়লেন অনেকে। 'শেম! শেম!'

'মেয়েলোকটা পাগল।'

তাদের একজন ভিড় ঠেলে মনিকার কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কারণ নিজের চারধারে সমর্থকদের একটা ছোট দলকে আগেই জায়গা করে দিয়েছে মনিকা। তাদের কাপড়চোপড় সাধারণ, তবে চেহারায় আত্ম-বিশ্বাসের কোন অভাব নেই। সবাই তারা 'প্রকৃতি প্রেমিক' নামে একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

'আমার অভিযোগ উবোমোকে আপনি রেপ করছেন, মি. চেয়ারম্যান।'

'ওকে বের করে দাও!'

'মিস মনিকা রিভেরা, আপনি শান্ত না হলে আমরা বাধ্য হব আপনাকে…।'

'আমি একজন শেয়ারহোল্ডার, বলার আমার অধিকার আছে…।'

'নোংরা একটা জঞ্জাল! বের করে দাও ওকে।'

শেয়ারহোল্ডারদের অনেকেই এখন মনিকার দিকে এগোচ্ছে। তার সমর্থকরা বেশি সুবিধে করতে পারছে না। মনিকা বলে চলেছে, 'জবাব দিন! পঞ্চাশটা প্রজাতি ধ্বংস করেছেন আপনি…।'

'সিকিউরিটি! সিকিউরিটি!' চিৎকার জুড়ে দিলেন কোম্পানী সেক্রেটারি। হলরুমের চারদিক থেকে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে এল এবার মনিকার দিকে। তার সমর্থকরা হেরে গেল, তবে মনিকা গার্ডদের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ল। প্রায় পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেল গার্ডরা, মনিকা তাদেরকে আঁচড়াল, কামড়াল, পা ছুঁড়ল।

হলরুমে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মাইক্রোফোনের সামনে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন স্যার ট্যাফোর্ড। বললেন, 'কৌতুক-নাটিকাটি আপনাদেরকে হাসির খোরাক না যুগিয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাই। তবে ঘটনাটা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল কি ধরনের উদ্ভট মাত্রায়

বাধা আসে আমাদের চলার পথে।

মিস মনিকা রিভেরা তাঁর অযৌক্তিক কথাবার্তা ও বদমেজাজের জন্যে ইতিমধ্যেই কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি যে একটা উন্মাদ তার প্রমাণঃ উবোমো সরকারের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি ও তাঁর সমর্থক প্রকৃতি প্রেমিকরা চান, দশ হাজার লোক অনাহারে থাকে থাকুক, তবু একটা গাছ কাটা যাবে না, একটা বুনো পশুকে মারা যাবে না, ফসল ফলানো যাবে না। এ স্রেফ পাগলামি। যাই হোক, স্টার পরিবেশ সংরক্ষণে কতটা আন্তরিক, তার একটা নমুনা দিই। এ খাতে গবেষণা বাবদ গত বছর আমরা এক লাখ পাউণ্ড খরচ করেছি…।'

রানা লক্ষ করল, স্যার ট্যাফোর্ড বললেন না যে এক লাখ পাউণ্ড খরচ করা হয়েছে প্রায় এক বিলিয়ন পাউণ্ড লাভ থেকে।

শেয়ারহোল্ডাররা হাততালি দিয়ে সমর্থন করছেন চেয়ারম্যানকে। তাঁরা পুঁজি খাটাচ্ছেন লাভ করার জন্যে, আর স্যার ট্যাফোর্ড তাঁদেরকে লভ্যাংশ পাইয়ে দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। আফ্রিকায় দুটো বেশি গাছ কাটা পড়লে বা কিছু পোকা বেশি মারা পড়লে তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই।

পরদিন খবরের কাগজে হেডিং হলো–টাফ ট্যাফোর্ড প্রকৃতি প্রেমিকদের এক হাত নিয়েছেন।

ছয়

হিথরো থেকে উবোমোর রাজধানী কাহালি পর্যন্ত সরাসরি কোন ফ্লাইট নেই, কাজেই নাইরোবিতে নামতে হলো ওদেরকে। দুই রাজধানীর মধ্যে এয়ার উবোমোর প্লেন আসা-যাওয়া করে, তবে আজ কোন ফ্লাইট না থাকায় রাতটা হোটেলে কাটাতে হবে ওদেরকে। হাতে একটা দিন সময় থাকায় সোফিয়াকে পরীক্ষা করার ইচ্ছে হলো রানার, দেখতে চায় আফ্রিকার মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মেয়েটা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কিনা। একটা গাড়ি ভাড়া করে শহরের বাইরে, নাইরোবি ন্যাশনাল পার্কে চলে এল।

পার্কটা আফ্রিকার আরেক বিস্ময়। শহরের এত কাছ থেকেও চাক্ষুষ করা সম্ভব হিংস্র সিংহ কিভাবে শিকার করছে। এখানে আগেও এসেছে রানা, পার্ক ওয়ার্ডেন ওর পরিচিত। সোয়াহিলি ভাষায় কুশল বিনিময় করল ওরা। একজন রেঞ্জারকে ওদের গাইড হিসেবে দেয়া হলো।

ওদেরকে নদীর কিনারায় একটা স্ট্যাণ্ডে নিয়ে এল রেঞ্জার, চারপাশে অ্যাকাশিয়া গাছের ভিড়। স্ট্যাণ্ডে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাকর দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড এক গণ্ডার তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। দানব-দানবী নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে নিরাপদ মনে করে গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি চলে এল ওরা।

বলতে হলো না, সনি ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে সোফিয়া। নিজে তো সাহায্য করলই না, রেঞ্জারকে এগোতে দেখে বাধা দিল রানা। ওর ইচ্ছে যা করার একাই করুক সোফিয়া।

বিপজ্জনক জেনেও সামনে এগোচ্ছে সোফিয়া, তবে সাবধানে। সন্দেহ নেই, সাহস আছে মেয়েটার। গণ্ডার এমনিতেই চোখে ভাল দেখে না, এই মুহূর্তে দু'টোই প্রায় অন্ধ হয়ে আছে বলা যায়, তবু এত কাছাকাছি চলে আসাটা উচিত হয়নি। রেঞ্জার পিছিয়ে পড়ল, তার নিষেধে কান না দিয়ে আরও একটু সামনে বাড়ল রানা ও সোফিয়া। অবশ্য দু'জনেই তৈরি হয়ে আছে, বিপদ দেখলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে।

প্রেমিকাকে নিয়ে খেলছে প্রেমিক। ঝোপের আড়াল থেকে ছবি তুলছে সোফিয়া। এক সময় মিলিত হলো দুই প্রকাণ্ডদেহী। ওদের কাজ শেষ হতে সোফিয়ার বাহু ধরে টান দিল রানা, ফিসফিস করে বলল, 'চলো, পালাই!' সাবধানে পিছাতে শুরু করল দু'জন। প্রায় গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় চিৎকার করল রানা, 'সোফিয়া! ষাঁড়টা ধাওয়া করছে!'

একটুও না চমকে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। দেখল সত্যি তাই, ঝড়ের বেগে ওদের দিকে ছুটে আসছে গণ্ডার। 'ওরে মারে!' বলে গাড়ির দিকে ছুটল সে।

ভাগ্য ভাল ওদের, গণ্ডার কাছাকাছি চলে আসার আগেই গাড়িতে উঠে পড়তে পারল। গাড়ি চলতে শুরু করার পরও ওদের পিছু ছাড়েনি সে, তবে ড্রাইভার স্পীড বাড়াবার পর তাকে আর দেখা গেল না।

সন্ধের দিকে হোটেলে নিজের কামরায় বসে টিভির পর্দায় ওদের মিলনটা দেখল রানা। ঘরে শুধু ওরা দু'জন, অস্বস্তি বোধ করছিল রানা। কিছুটা দেখার পরই সেট অফ করে দিল ও, বলল, দারুণ, সোফিয়া, 'দারুণ—তোমার কাজ সত্যিই প্রথম শ্রেণীর।'

'কাজের প্রশংসা কে শুনতে চায়,' ঠোঁট ফোলাল সোফিয়া। 'আমি ভেবেছিলাম আমার কাজটা তোমাকে যথেষ্ট উত্তেজিত করবে—এতটাই যে তুমি আমার প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠবে।'

আড়ষ্ট বোধ করল রানা, ঠোঁটে অপ্রতিভ হাসি। 'তোমার কাজের প্রশংসা মানেই তো তোমার প্রশংসা।'

'ছাই!'

'ঠিক আছে, শোনো—সত্যি তুমি ভাল।'

'আমি যে কতটা ভাল, তোমার কোন ধারণা নেই, রানা,' বলে সোফায় এসে বসল সোফিয়া, রানার পাশে। 'দেখতে চাও?' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল সে।

এক সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হলো, রানা?' অবাক হয়ে গেছে সোফিয়া।

'কই, কিছুই হয়নি,' বলে বাথরুমের দিকে এগোল রানা। 'তুমি বসো, আমি শাওয়ারটা সেরে নিই।' বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। ওর দেখার সুযোগ হলো না, বন্ধ দরজার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। রানা

তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করায় সাংঘাতিক অপমান বোধ করেছে সে। 'হতাশ হবার কিছু নেই, স্যার ট্যাফোর্ড,' বিড়বিড় করল আপন মনে। 'ধরা ওকে দিতেই হবে!'

এক ঘণ্টা পর, নিচে নেমে সোফিয়াকে নিয়ে ডিনার খেতে বসেছে রানা। জিনস-এর প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা এক তরুণী ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, তবে রানা তাকে দেখতে পায়নি। 'রানা, আমার দিকে তাকাও, দেখো তো চিনতে পারো কিনা!'

ঝট করে মুখ তুলল রানা। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিকা রিভেরা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, এক পা এগিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল মনিকাকে। 'মাই গড! তুমি! কেমন আছ, মনিকা?'

'তুমি যেমন রেখেছ!' হেসে উঠে রানার নাকে নাক ঘষল মনিকা।

'আমি যেমন রেখেছি মানে?'

'জানো না, কিছুই জানো না! জানবেই বা কিভাবে, কোন খবর রাখলে তো! আমি যে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি, কারণটা কি জানো? জানো, আফ্রিকার প্রেমে পড়ে গেছি আমি? এমন প্রেম, সারাটা জীবন আফ্রিকায় কাটিয়ে দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি? এবং এ-সবের জন্যে তুমি দায়ী, মাসুদ রানা। হ্যাঁ, তুমি। তুমি আমাকে আফ্রিকাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ!'

'মাই গড!' বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'আমাকে বসতে বলবে না?' রানাকে মৃদু ঝাঁকি দিল মনিকা।

হেসে উঠল রানা। 'শেষবার তোমাকে দেখেছি একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছ।'

'তারমানে তুমি ওখানে ছিলে!' এবার মনিকার বিস্মিত হবার পালা। 'দেখি তো!'

'যুদ্ধ করছিলে, দেখবে কিভাবে!' হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, সোফিয়ার ক ভুলেই গেছে ও। 'এসো, তোমার সঙ্গে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পরিচয় করি দিই। সোফিয়া ক্যারল...।'

'আমি আসলে ক্যামেরাম্যান, ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট নই,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে রানার ভুল সংশোধন করে দিল সোফিয়া।

'জানি, আর্কটিক-এর ওপর আপনার কাজ আমি দেখেছি—সত্যি খুব ভা বলল মনিকা। এভাবে প্রশংসা করায় সামান্য অপ্রতিভ হলো সোফিয়া।

সে বলল, 'ধন্যবাদ, আমি কিন্তু আপনার বইটা পড়িনি, মনিকা রিভেরা!'

'তাতে কি, আপনি একা নন, আরও কয়েকশো কোটি লোক পড়েনি বইটা রানার দিকে ফিরল মনিকা, ওর ইঙ্গিতে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'আমি আগে থেকেই তোমার ফ্যান, তোমার প্রতি ভক্তি আরও বেড়ে গে ডকুমেন্টারীগুলো দেখে। তুমি নাইরোবিতে এসেছ শুনে চারদিকে ঘুর করছিলাম, যদি তোমাকে দেখতে পাই! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আ রানা।'

'বলবে, সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না!'

ওয়েটার ডিনার নিয়ে এল। সোফিয়া বলল, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে শুরু করুন, মনিকা রিভেরা।'

'হাউ সুইট অভ ইউ, মিস সোফিয়া।' ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকাল মনিকা। 'আমরা পুরানো বন্ধু, খেতে না চাইলেও রানা আমাকে জোর করে খাওয়াবে।' ঈর্ষা ও রাগ বিরাট ভূমিকা রাখছে ওদের আচরণে, তবে প্রকাশ্যে নয়।

ওয়েটারকে তিনজনের মত ডিনার দিতে বলল রানা।

'নাইরোবিতে কি করছ তুমি, রানা?' জানতে চাইল মনিকা।

'আমরা আসলে উবোমোয় যাচ্ছি...।'

'উবোমোয়!' আনন্দ ও উত্তেজনায় এক সেকেণ্ড কথাই বলতে পারল না মনিকা। 'দ্যাটস মার্ভেলাস! উবোমো তোমার জন্যে পারফেক্ট সাবজেক্ট। কবে যাচ্ছ, রানা?'

'কাল,' রানার হয়ে জবাব দিল সোফিয়া। 'ও একা নয়, আমিও ওর সঙ্গে থাকছি।'

কিন্তু সোফিয়ার দিকে তাকালই না মনিকা, দ্বিতীয় প্রশ্নটাও রানার দিকে তাকিয়ে করল, 'সামরিক অভ্যুত্থানের পর ওখানে গেছ তুমি?'

'না, ওখানে আমি শেষবার গেছি বছর চারেক আগে।'

'তখন ক্ষমতায় ছিলেন শেখ ফাহিম ফয়সল।'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। কি ঘটেছে তাঁর? শুনলাম ব্যাপারটা নাকি হার্ট অ্যাটাক?'

কোন মন্তব্য না করে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল মনিকা। ওয়েটার ফিরে এসে ডিনার পরিবেশন করল। রানা বলল, 'শুনলাম, শেখ ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তোমার?'

'কে বলল? কোত্থেকে শুনলে?' ঝট করে মুখ তুলে জানতে চাইল মনিকা।

'কোথাও একটা আর্টিকেল-এ পড়েছি,' বলল রানা। 'অনেক দিন আগে।' সময়মত নিজেকে সামলে নিয়েছে ও। মনিকার সামনে টাফ ট্যাফোর্ডের নামটা উচ্চারণ করা উচিত হবে না, অন্তত এখুনি না।

'ও, হ্যাঁ। সম্ভবত সানডে টেলিগ্রাফ-এ পড়েছ। ওরা তাঁর ওপর একটা আর্টিকেল ছেপেছিল, তাতে আমার সম্পর্কে দু'একটা কথা লেখা হয়েছে।'

'উবোমোয় আসলে কি ঘটছে বলো তো?' জানতে চাইল রানা।

'আফ্রিকার অন্যান্য দেশে যে-সব সমস্যা আছে, উবোমোয়ও তুমি তাই দেখতে পাবে–উপজাতীয় কোন্দল, দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, নিরক্ষরতা। কিন্তু বাস্টার্ড সাফারি এসে সমস্যাগুলো আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে শুয়োরটা। বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে দেশটা। তার অপশাসনের ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে উবোমোয়।'

'উপজাতীয়দের সম্পর্কে বলো প্রথমে।'

খাওয়ার ফাঁকে শুরু করল মনিকা। আফ্রিকার সবচেয়ে বড় অভিশাপ উপজাতীয় কোন্দল। মোট ছ'টা উপজাতি, তবে ধরা চলে মাত্র দুটোকে। সংখ্যায় বেশি উহালিরা, চল্লিশ লাখের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ। বেশিরভাগ লেকের ধারে বাস

করে, ফসল ফলায় বা মাছ ধরে। উহালিরা অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ ও ভালমানুষ। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিটা উপজাতি ওদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। হিটারা হিংস্র, অভিজাত ও বীর। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে, এমন কি ইউরোপিয়ানদেরও অধম বলে জ্ঞান করে তারা। হিটারা দেখতেও অদ্ভুত সুন্দর- যেমন লম্বা তেমনি সুদর্শন। কোন লোক ছ'ফুটের কম লম্বা হলে হিটারা তাকে বামুন বলে। হিটা তরুণীদের দেখলে তুমি বলবে ওরাই দুনিয়ার সেরা সুন্দরী।

উনিশশো উনসত্তর সালে ব্রিটিশরা উবোমো ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ওরা। সংখ্যায় বেশি, নির্বাচনে জিতে যায় উহালিরা। এই প্রথম সরকার গঠন করে তারা, প্রেসিডেন্ট হন শেখ ফাহিম ফয়সল। ভালমানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তাই ছিলেন। হয়তো দেবতা ছিলেন না, তবে কোন সন্দেহ নেই আফ্রিকার ভাল শাসকদের একজন ছিলেন তিনি, এমনকি তাঁদের অনেকের চেয়েও সৎ ও যোগ্য ছিলেন। কিন্তু উহালিরা ক্ষমতায়, এটা সহ্য হয়নি হিটাদের। হত্যা করা হিটাদের একটা জন্মগত স্বভাব, রক্ত ঝরাতে না পারলে শান্তি পায় না। ধীরে ধীরে সামরিক বাহিনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা। পরিণতি কি হয়েছে সবাই তা জানে। সিমন সাফারি নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে। তার অত্যাচার সকল সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দশ লাখ হিটা ত্রিশ লাখ উহালিকে জিম্মি করে রেখেছে উবোমোয়। অন্যান্য উপজাতিগুলোরও একই অবস্থা, তার মধ্যে মনিকা রিভেরার প্রিয় বামবুটিরাও রয়েছে।

'বামবুটিদের কথা বলো আমাকে,' বলল রানা। 'বৃক্ষছায়ার মানুষদের কথা শোনাও।'

'ওহ্, রানা, তুমি আমার বইয়ের নাম জানো!'

'শুধু নাম জানি? তিন-তিন বার পড়েছি বইটা...।'

'উফ!' পনেরো মিনিটে এই প্রথম কথা বলল সোফিয়া ক্যারল। মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল সে। 'ডিনারটা শেষ হলে বাঁচি, আমার ঘুম পেয়েছে।'

তার উপস্থিতি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল রানা, হঠাৎ খেয়াল হতে টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল, উদ্দেশ্য সোফিয়ার কব্জি ধরে দুঃখ-প্রকাশক মৃদু চাপ দেবে। সোফিয়া তাড়াতাড়ি হাতটা তুলে নিজের কোলের ওপর রাখল।

'আমার আরও খানিকটা ওয়াইন দরকার,' বলল সে। 'কেউ যদি ঢেলে দেয়।'

তার গ্লাসটা ভরে দিল রানা। প্লেটের দিকে চোখ নামিয়ে স্টেক-এর শেষটুকু সদ্ব্যবহার করছে মনিকা।

সবাই হঠাৎ চুপ করে গেছে, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'বামবুটিদের কথা হচ্ছিল। ওদের সম্পর্কে বলো আমাকে, মনিকা।'

মুখ তুলে তাকাল মনিকা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। তাকে দেখে মনে হলো

কঠিন একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে। অপেক্ষা করে থাকল রানা।

'শোনো,' অবশেষে মুখ খুলল মনিকা। 'বামবুটিদের সম্পর্কে জানতে চাও, তাই না? বেশ। আমি যদি প্রস্তাব দিই, আমার সঙ্গে জঙ্গলে চলো, নিজের চোখে দেখবে ওদের, কেমন হয় সেটা? তোমাকে আমি এমন সব জিনিস দেখাতে পারি, সে-সব জিনিসের ছবি আজ পর্যন্ত তোলার সুযোগ পায়নি কেউ।'

'তুমি নিজেই যেখানে যেতে পারছ না, আবার আমাকে নিয়ে যাবে কিভাবে?' জানতে চাইল রানা। 'শুনলাম প্রেসিডেন্ট সাফারি তোমাকে ধরতে পারলে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে।'

হেসে উঠল মনিকা। 'এ-ধরনের লোককে ভয় না পাওয়ার শিক্ষা আমি তোমার কাছে পেয়েছি, রানা। ভুলে যেয়ো না, প্রায় পাঁচ বছর হলো ওখানকার জঙ্গলে আছি আমি। সাফারির কর্তৃত্ব শেষ হয়েছে যেখান থেকে বৃক্ষছায়া শুরু। আমার অনেক বন্ধু আছে। সাফারির আছে অনেক শত্রু।'

'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে?'

'দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'এবার বলো–কেন, মনিকা?'

'মানে?'

'তোমার বাবা দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন ছিলেন। তাঁর সমস্ত ব্যবসা ও সম্পত্তির একমাত্র মালিক তুমি। সে-সব ফেলে আফ্রিকার জঙ্গলে–কেন, মনিকা?'

'উত্তরটা তোমাকে আগেই আমি দিয়েছি। আফ্রিকা আমাকে যাদু করেছে। ভেবো না এটা আমার আবেগসর্বস্ব প্রেম। বৃক্ষছায়ায় অনেক কাজ করছি আমি, তার মধ্যে একটা হলো, বামবুটিদের সাইকোলজি নিয়ে গবেষণা। পিগমিরা বেঁটে কেন, এটাও আমাদের চিন্তার বিষয়। আগেও এ-সব নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তবে আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি। বিশদ বলা যাচ্ছে না এখানে, তবে আমার বিশ্বাস, হরমোন রিসেপটর-এর অভাবই আসল কারণ···।'

'কে বলল, একঘেয়েমির শিকার আমি?' সোফিয়ার গলার স্বরে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল। 'রীতিমত মুগ্ধ হচ্ছি। পিগমিদের আপনি ইঞ্জেকশন দিয়ে হিটাদের মত লম্বা করে ফেলবেন, তাই না?'

বিব্রত হতে রাজি নয় মনিকা, বলল, 'বামবুটিরা বেঁটে, কারণ ওই পরিবেশে বেঁটে হওয়াই দরকার। কোন ভাবে যদি ওদেরকে লম্বা করা হয়, তাতে সমস্যায় পড়ে যাবে ওরা। রেইন ফরেস্টে বেঁচে থাকতে হলে বেঁটে হওয়াটা জরুরী।'

'বুঝলাম না,' তাকে উৎসাহ দিল রানা। 'আমাকে বোঝাও, বেঁটে হওয়া সুবিধেজনক হয় কি করে।'

'জঙ্গলে প্রায় নিশ্ছিদ্রভাবে ছাওয়া এলাকাটা, বাতাসহীন স্যাতসেঁতে পরিবেশে যে তাপ তৈরি হয়, ওরা খর্বকায় বলেই ছায়ার আশ্রয়ে তা সহ্য করতে পারে। ঘন বনভূমি, আকারে ছোট বলে দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে চলাফেরা করতে পারে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বামবুটিরা কিভাবে হাঁটে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তোমার চোখের সামনে থেকে এক নিমেষে গায়েব হয়ে যাবে। প্রাচীন মিশরীয় পর্যটকরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন অদৃশ্য হবার শক্তি আছে ওদের।'

কফির অর্ডার দিল রানা।

উৎসাহে ভাটা পড়েনি মনিকার। 'ওখানে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে গবেষণা করছি। গাছ-গাছালির গুণাগুণ সম্পর্কে। চমৎকার জ্ঞান রাখে বামবুটিরা, বিশেষ করে রোগ সারানোর গুণ সম্পর্কে। আমরা হিসেব করে দেখেছি, প্রায় পাঁচ লাখ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে রেইন ফরেস্টে, তার মধ্যে কয়েকশো মানুষের উপকারে লাগে বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের বেশিরভাগ রোগের ওষুধ ওই সব উদ্ভিদের ভেতর লুকিয়ে আছে–ক্যানসার ও এইডস-এর ওষুধও।'

'কল্পকাহিনী,' মন্তব্য করল সোফিয়া, কফির কাপে চুমুক দিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

'চুপ করো, সোফিয়া,' ধমক দিল রানা। 'ভারি আগ্রহ হচ্ছে আমার। তোমার গবেষণা কতদূর এগিয়েছে?'

'যতটা আশা করেছিলাম ততটা নয়।' মুখ বাঁকাল মনিকা। একদল বামবুটি বুড়ি আমাকে পাতা, শিকড় আর বাকল যোগাড় করে দেয়। কোনটার কি গুণ বলে দেয় আমাকে, আমি ওগুলোকে ক্যাটালগে তুলি, গুণ পরীক্ষা করি, ফলাফল লিখি–কিন্তু আমার ল্যাবরেটরি একটা কুঁড়েঘরে, নিরাপত্তার ভারি অভাব···।'

'তবু ওখানে আমি একবার যেতে চাই।'

'যাবে, সত্যি তুমি আমাদের গোনডালা-য় যাবে, আমি যেখানে থাকি?' আনন্দে চকচক করছে মনিকার চোখ। রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল সে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল সোফিয়া। 'স্যার ট্যাফোর্ড যদি শোনেন যে এইডস-এর ওষুধ পাওয়া যাবে, সাংঘাতিক আগ্রহী হয়ে উঠবেন তিনি। স্টার তার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর মাধ্যমে বাজারজাত করবে···।'

'স্টার? স্যার ট্যাফোর্ড?' যেন ইলেকট্রিক শখ খেয়েছে, রানার বাহু থেকে হাতটা সরিয়ে নিল মনিকা, তাকিয়ে আছে সোফিয়ার দিকে। 'স্যার ট্যাফোর্ড কে? কোন্ স্যার ট্যাফোর্ড?'

'টাফ ট্যাফোর্ড, মিস মনিকা,' চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সোফিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে। 'উবোমোয় যে ছবিটা তুলতে যাচ্ছে রানা, স্যার ট্যাফোর্ডই সেটার খরচ যোগাচ্ছেন। আইডিয়াটা হলো, আমি আর রানা দুনিয়ার লোককে দেখাব উবোমোর কী সাংঘাতিক উপকার করছে স্টার। ছবির নামও দিয়ে ফেলেছে রানা–উবোমো, আফ্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। রানার একটা মাস্টারপীস হতে যাচ্ছে ছবিটা···।'

সোফিয়ার কথা শেষ হলো না, লাফ দিয়ে সিধে হলো মনিকা, কফির কাপটা উল্টে পড়ল টেবিলের ওপর, রানার কোলের ওপর ছিটকে পড়ল খানিকটা কফি। 'তুমি!' দু'চোখে আগুন আর বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'তুমি আর ওই বেজন্মা কুত্তাটা! কি করে পারলে, রানা?' চরকির মত আধ পাক ঘুরল সে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে রেস্তরাঁ থেকে। 'শেষ পর্যন্ত ট্যাফোর্ডের সঙ্গে হাত মেলালে? ছি-ছি!'

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানাও, শার্ট আর ট্রাউজার থেকে কফি মুছছে রুমাল দিয়ে।

'এরকম একটা কাজ কেন তুমি করলে?' সোফিয়ার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠল ও।

'তোমরা দু'জন আমার নার্ভে খোঁচা মারছিলে,' মুচকি হেসে বলল সোফিয়া।

'তুমি একটা সাংঘাতিক মেয়ে! কি ক্ষতি করলে বুঝবে না। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে।' মনিকার পিছু নিয়ে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হোটেলের লবিতে তাকে পাওয়া গেল না। 'এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছ...?' দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল রানা। দরজার বাইরে চোখ পড়তে দেখল, একটা হোণ্ডা মোটরসাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে সে। 'মনিকা! শোনো, মনিকা!' কিন্তু রানার দিকে তাকালই না সে, মোটরসাইকেল ছেড়ে দিল।

ছুটল রানা, চিৎকার করছে, 'শোনো, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও!' কোন লাভ হলো না, গেট থেকে বেরিয়ে গেল মোটরসাইকেল, যানবাহনের ভিড়ে মিশে গেল।

গেটের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাল রানা, কিন্তু খালি কোন ট্যাক্সি দেখতে পেল না। বোকার মত কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। হোটেলে ফিরতে মন চাইল না, সোফিয়াকে এই মুহূর্তে সহ্য করা কঠিন হবে। তারচেয়ে একা কিছুক্ষণ রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা ভাল। রাগটা কমুক।

দু'ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরে রানা দেখল ওর কামরায় বসে রয়েছে সোফিয়া। 'তুমি এখানে?' একটু কঠিন সুরেই জানতে চাইল রানা।

'তোমার কাছে ক্ষমা চাইব বলে অপেক্ষা করছি।'

'এখন আর ক্ষমা চেয়ে কি লাভ, ক্ষতি তো যা হবার হয়েই গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোফিয়া বলল, 'ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিলে তুমি গ্রহণ করবে, রানা?'

'মানে?' ঘুরে তার দিকে তাকাল রানা।

'রাতটা আমি তোমার ঘরে কাটাতে চাই।'

'না,' বলে সোফিয়ার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'দুঃখিত।'

'জানতে পারি, তুমি আমাকে এভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ কেন?'

'চেষ্টাটা করছি মনিকা আমাদের মাঝখানে এসে পড়ার আগে থেকেই,' বলল রানা। 'সহজ ব্যাখ্যা হলো, কাজ আর ফূর্তি আলাদা রাখতে চাই আমি।'

'ও।' আর কিছু না বলে নিজের কামরায় চলে গেল সোফিয়া।

পরদিন সকালে হোটেলের বিল দেয়ার সময় রানা দেখল, বিশেষ একটা আইটেমের জন্যে অতিরিক্ত একশো বিশ কেনিয়া শিলিং ধরা হয়েছে। আইটেম হিসেবে লেখা রয়েছে, 'ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন কল'। সোফিয়াকে প্রশ্ন করল ও, 'তুমি কি কাল রাতে বিদেশে কোথাও ফোন করেছ?'

'মাকে ফোন করে জানাই তোমার মেয়ে নিরাপদে আছে। ভাবিনি সামান্য এই খরচের জন্যে কোন প্রশ্ন উঠবে।'

সোফিয়ার আচরণ কেমন যেন লাগল রানার। ভিডিও ইকুইপমেন্ট ট্যাক্সিতে তোলার জন্যে রিসেপশন ছেড়ে আগেই বেরিয়ে গেল সে, তার পিছু না নিয়ে একটু দেরি করল ও, তারপর টেলিফোন একচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে

জানতে চাইল বিলে যে কল-এর কথা লেখা হয়েছে তা কত নাম্বারে করা হয়েছে?

'লণ্ডন ৭৩৭৪৬৪৬, স্যার।'

'নাম্বারটা আবার আমাকে পাইয়ে দিন, প্লীজ।'

'রিঙ হচ্ছে, স্যার।'

তৃতীয়বার রিঙ হতে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'গুড মর্নিং, মে আই হেল্প ইউ?'

'আপনার নাম্বারটা বলুন তো,' বলল রানা।

কিন্তু অপরপ্রান্তের লোকটা ভারি সতর্ক। 'আপনি কাকে চান, প্লীজ?'

রানার মনে হলো, গলার আওয়াজটা চিনতে পারছে ও, আফ্রিকান বাচনভঙ্গি স্পষ্ট। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল ও। 'তুমি, মুরুম্বু না?' সোয়াহিলি ভাষায় জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, আমি মুরুম্বু বাওনা। আপনি কাকে চাইছেন, স্যার?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মুরুম্বু হলো স্যার ট্যাফোর্ডের আফ্রিকান ভৃত্য। তারমানে কাল রাতে মনিকার পিছু নিয়ে রেস্তরাঁ থেকে ও বেরিয়ে যাবার পর হল্যাণ্ড পার্কে ফোন করেছিল সোফিয়া। তারমানে গোপনে যোগাযোগ রাখছে ওরা। সোফিয়া ক্যারল, মহিলা স্পাই?

এয়ার উবোমোর কাহালি ফ্লাইট রওনা হলো, একটা সীটও খালি নেই। বেশিরভাগ আরোহী ব্যবসায়ী অথবা ছোটখাট সিভিল সার্ভেন্ট। ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরা ছ'জন সামরিক অফিসারও রয়েছে, কাঁধ ও বুকে ডেকোরেশন রিবন, চোখে গাঢ় সানগ্লাস। তবে কোন ট্যুরিস্ট নেই, লেকের ধারে স্টার এখনও ক্যাসিনোগুলো চালু করেনি। এয়ারহোস্টেস হিটা তরুণী যেমন সুন্দরী তেমনি লম্বা। মিষ্টি বিস্কিট আর চা পরিবেশন করল সে। চার ঘণ্টার ফ্লাইট, দু'ঘণ্টা আরোহীদের সেবা করল, বাকি দু'ঘণ্টা টয়লেটে কাটাল-প্রতিবার ঢোকার সময় একজন করে সামরিক অফিসার সঙ্গী হলো তার।

নিরাপদেই পৌঁছুল ওরা। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে যাচ্ছে, রানার সামনে এসে দাঁড়াল ক্যামোফ্লেজ ড্রেস ও মেরুন বেরেট পরা এক হিটা অফিসার। 'মি. মাসুদ রানা? আপনার বইয়ের ব্যাক-কাভারে ফটো আছে, দেখেই চিনতে পেরেছি।' হাত বাড়াল সে। 'আমি ক্যাপটেন শোল। উবোমোয় যে-ক'দিন থাকবেন, আমি আপনার গাইড। মহামান্য প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। স্যার মরিস ট্যাফোর্ড তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সূত্রে আপনিও মহামান্য প্রেসিডেন্টের বন্ধু। মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একটা ককটেল পার্টির আয়োজন করেছেন।'

চমৎকার ইংরেজি বলে ক্যাপটেন শোল। অসম্ভব লম্বা শরীর, ঝুঁকে আছে রানার ওপর। একহারা গড়ন, ভারি সুদর্শন চেহারা। সোফিয়ার দিকে চোখ পড়তে আনন্দে চকচক করে উঠল তার দৃষ্টি। একটা ঢোকও গিলল।

'ইনি আমার ক্যামেরা অপারেটর,' পরিচয় করিয়ে দিল রানা, 'মিস সোফিয়া

ক্যারল।' সোফিয়াও সমান আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেন শোলের দিকে।

সামরিক বাহিনীর একটা ল্যাণ্ডরোভারে তোলা হলো ভিডিও ইকুইপমেন্ট ও লাগেজ। তারপর ওরা উঠল। রানার গায়ে হেলান দিয়ে সোফিয়া ফিসফিস করল, 'হিটারা খুব সেক্সি হয়, না?'

'আমি কি করে বলব।' স্যার ট্যাফোর্ডকে গোপনে ফোন করেছিল সোফিয়া, এটা জানার পর থেকে মেয়েটাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না ও। তার হালকা রসিকতায় এখন আর সাড়া দেয় না।

সাত

জীবনের ওপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে উবোমোয় ফিরে আসছে মনিকা রিভেরা। অনেক কারণেই মন ভাল নেই তার। ইউরোপে গিয়েছিল কর্নেল সিমন সাফারির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু উৎসাহিত হবার মত কিছু ঘটেনি। তারপর রানার ব্যাপারটা–এখনও ওর ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার। এত থাকতে লোভী রাক্ষস টাফ ট্যাফোর্ডের সঙ্গে হাত মেলাল ও, ভাবা যায় না। সে কি তাহলে রানাকে চিনতে ভুল করেছে? ভুল হয়েছে ওকে তার জীবনের আদর্শ পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করাটা?

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একা হাঁটছে মনিকা, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানাকে। সে জানে, আবার দেখা হবে ওদের, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি কোন একদিন। রাগটা তখন থাকবে না, কিন্তু আকর্ষণ আর প্রশ্নগুলো থাকবে। রানার কাছে ব্যাখ্যা চাইবে সে, ওর এরকম অধোপতন হলো কি করে?

একটা এঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে লেক পাড়ি দিয়েছে মনিকা, ভোর রাতের দিকে পেট্রল বোট দেখতে পেয়ে রাবারের ভেলায় বাতাস ভরে নেমে পড়ে পানিতে। বোটম্যান উহালি মুসলমান, ওর সঙ্গে তাকে দেখলে উবোমো নৌ-বাহিনীর হিটা অফিসাররা কোন প্রশ্ন না করে গুলি করে মেরে ফেলত। ভাগ্য ভাল, বোটম্যানকে একা দেখে কিছু বলেনি তারা, তাকেও অন্ধকারে দেখতে পায়নি। ভেলায় প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল সে, তারপর ডাঙায় ওঠে। লেকের কিনারা ধরে দু'ঘণ্টা হাঁটার পর জেলেদের গ্রামে পৌঁছায়, মসজিদের পিছনে শেখ ফাহিম ফয়সলের ভাতিজা তরুণ শেখ ফারুক ফয়সল তার জন্যে অপেক্ষা করছিল একটা ট্রাক নিয়ে। ট্রাকে উঠে তারপুলিনের নিচে শুয়ে পড়ে মনিকা, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটতে থাকে ট্রাক। তারপর পুরানো কাহালিতে পৌঁছায় ওরা। ওখান থেকে শহর এড়িয়ে একা কলাবাগানে ঢুকেছে মনিকা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা হেঁটে শেষ বাগানটা পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে গভীর বনভূমিতে। তারপরও পেরিয়ে গেছে প্রায় এক ঘণ্টা।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। শেষ ঝর্ণাটাকে পাশ কাটিয়ে এল মনিকা, এই সময় চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পেল। বিস্মিত হলো ও, দিনের বেলা তো

চিতা সাধারণত আওয়াজ করে না। আবার ডাকল চিতা, এবার অনেকটা কাছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা, কান খাড়া করল। নদীর দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

একটা সন্দেহ জাগল মনিকার মনে। হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে অপেক্ষা করে থাকল ও। তারপর আবার ডাকল চিতা, তার মাথার ওপর নদীর পাড় থেকে। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ফুট দূরে রয়েছে চিতা।

আবার ডাকল চিতা। এবার আর সন্দেহ নয়, কি ঘটছে বুঝতে পারল মনিকা। চিৎকার করে ছুটল ও, একটা ঘন ঝোপের গায়ে হাতের ডাল দিয়ে সপাং সপাং করে বাড়ি মারল, যেখানে লুকিয়ে আছে বাঘটা। একটা বাড়ি পড়ল নগ্ন নিতম্বে, ব্যথায় তীব্র প্রতিবাদ জানাল একটি পুরুষকণ্ঠ। 'মাগো! বাবাগো! আল্লারে!'

ডালের ঘন ঘন আঘাতে ঝোপ থেকে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল মনিকা। 'বুড়ো শয়তান! আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা। দাঁড়াও, আজ তোমাকে মজা দেখাচ্ছি!'

সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক বুড়ো বামবুটি, কৃত্রিম আতঙ্কে মনিকার চারপাশে ছুটোছুটি করছে। হাঁপিয়ে গেল মনিকা, হাসতে হাসতে খিল ধরে গেছে পেটে।

'আমার মন বলছিল তোমার ফেরার সময় হয়েছে,' পিঠ থেকে নামিয়ে সদ্য শিকার করা একটা বাঁদর দেখাল বুড়ো বান্দা হাবিব। 'সেজন্যেই এগিয়ে এসেছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে। এটা মেরেছি, তোমাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াব বলে। এই এলাকায় কয়েক বছর ধরে আছে মনিকা, উহালি জেলেদের মন জয় করে নিয়েছে। বান্দা হাবিব একটা জেলেপাড়ার সর্দার, মনিকাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করে।

হাসি-খুশি ভাব দেখালেও, মনিকার মনে হলো কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় আছে বুড়ো।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। ঝোপের আড়াল থেকে কুড়িয়ে তীর আর ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে বান্দা হাবিব। উহালিরা বার্তা পাঠিয়েছে শহর থেকে, এক এক করে সব বলে গেল মনিকা। এখানকার খবরাখবরও জেনে নিল। খেতে বসে পারুমার কথা জানতে চাইল মনিকা। পারুমা বান্দা হাবিবের স্ত্রী।

'তার কথা আর কি বলব!' হতাশায় নিজের কপালে চাঁটি মারল বান্দা হাবিব। 'গাছে চড়ে আমাকে ভেঙচায়, ঠিক যেন একটা বাঁদর। কথা বলে, যেন মেঘ ডাকে। কিন্তু যে-ই আমি বলি আরেকটা বিয়ে করব, অমনি আমার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ে!'

'বাকি আর সবার খবর কি?' বুড়োর দুশ্চিন্তার কারণটা জানার চেষ্টা করছে মনিকা। 'আমি চলে যাবার পর সমাজে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি বা অশান্তি হয়েছে? তোমার ভাই ওজি হাবিব কেমন আছে?'

'ওজি তো ওজিই,' বলে এড়িয়ে গেল বান্দা হাবিব, কাঠ কুড়িয়ে এনে রান্নার আয়োজন শুরু করল সে।

গোনভালা আর দু'ঘণ্টার পথ, তবে রাতে ওরা আর হাঁটবে না। মনিকার সঙ্গে

কলা ছিল, রোস্ট করা বানরের মাংসের সঙ্গে খেয়ে নিল ওরা। ব্যাগ থেকে স্লিপিং ব্যাগ বের করে শুয়ে পড়ল মনিকা, ওর পাশেই শুকনো পাতার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে বান্দা হাবিব। গভীর অন্ধকার, হঠাৎ ডাকল সে, 'বেটি, জেগে আছিস?'

'তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, বুড়ো বাপ,' সাড়া দিল মনিকা।

'জঙ্গলের বাপ আর মা রাগ করেছে রে।'

স্লিপিং ব্যাগ থেকে মুখ বের করল মনিকা। 'তাহলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেন, তারা রাগ করল কেন?'

'তারা জখম হয়েছে রে বেটি,' ফিসফিস করে বলল বান্দা হাবিব। 'তাদের রক্তে ভরে গেছে নদী।'

বুড়ো কি বলতে চায় বোঝার জন্যে কিছুক্ষণ চিন্তা করল মনিকা। জঙ্গলের রক্তে নদী আবার ভরে কিভাবে? 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, বুড়ো বাপ। কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় রে বেটি। মা আর বাবা খুব ব্যথা পাচ্ছে। সম্ভবত মোলিমো আসবে রে।'

এর আগের একটা ক্যাম্পে বামবুটিদের সঙ্গে ছিল মনিকা, তখন মোলিমো এসেছিল। ওর দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ মেয়েদের বাইরে বেরুতে দেয়া হয় না। পারুমা ও গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ঘরের ভেতর ছিল ও। তবে রাতের জঙ্গলে পুরুষ গণ্ডারের মত বিকট গর্জন আর উন্মত্ত হাতির মত ভারি পায়ের আওয়াজ শুনেছিল। সকালে বান্দা হাবিবকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মোলিমো কি ধরনের প্রাণী?'

'মোলিমো মোলিমোই। জঙ্গলের প্রাণী। মা ও বাবার কণ্ঠস্বর।'

আবার মোলিমো আসবে শুনে ভয় ও রোমাঞ্চ দুটোই অনুভব করল মনিকা। এবার মহিলাদের সঙ্গে ঘরের ভেতর থাকবে না সে। 'বান্দা হাবিব, তুমি যদি ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে না পারো, দেখাতে পারবে কি? রক্ত ভরা নদী আমি দেখতে চাই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বান্দা হাবিব বলল, 'ঠিক আছে, দেখাব। গোনডালার পথ থেকে সরে যাব কাল সকালে, কেমন?'

সকালে ব্যাগ খুলে বান্দা হাবিবকে এটা-সেটা উপহার দিল মনিকা। একটা টোবাকো পাইপ, একটা রেজার, পাঁচ-সাত গজ জিনস–বুড়োর জন্যেই এনেছে সে। 'চলো, এবার তুমি আমাকে রক্ত ভরা নদী দেখাবে।'

'চলো।' রওনা হয়ে গেল ওরা।

কোন বিরতি না নিয়ে একনাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা হাঁটল ওরা, তারপর এসে দাঁড়াল একটা নদীর কিনারায়। বামবুটিরা নদীটাকে টেটিওয়া বলে। চাঁদের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে নদীটা, চলার পথে অসংখ্য লেক আর জলপ্রপাত তৈরি করেছে, পেরিয়ে এসেছে বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তর, তারপর প্রবেশ করেছে বাঁশবাগানে, যেখানে সদল বলে বাস করে গরিলারা। ওখান থেকে আবার পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে তিন হাজার ফুট নিচে নেমেছে, ঢুকে পড়েছে নির্ভেজাল রেইন ফরেস্টে।

বামবুটি নারী-পুরুষরা টেটিওয়ার পানিতে গোসল করে ও মাছ মারে, তবে এখন নয়–নদীটা রক্তে ভরে যাবার আগে। এখন টেটিওয়ার লাল পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনিকা, চেহারায় আতঙ্ক।

পঞ্চাশ ফুট চওড়া নদীটা, দুই কিনারাতেই ঘন বন, গাছের ডালপালা দু'দিক থেকে এগিয়ে এসে প্রায় ঢেকে ফেলেছে নিচের পানি, ছাদের মত। এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত নদীর পানি লাল হয়ে আছে–টকটকে লাল নয়, গাঢ় খয়েরি। পানি এখন আর আগের মত চকচক করছে না, গতিও মন্থর হয়ে পড়েছে। নদীর কিনারায় মাটি ও বালি লালচে চেহারা পেয়েছে, ডাঙায় পড়ে রয়েছে মরা মাছের স্তূপ।

'এর কারণ কি, বান্দা হাবিব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মনিকা।

ঠোঁট উল্টে তামাক পাতা পাকিয়ে গোল করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বুড়ো বান্দা হাবিব। চামড়ার তৈরি ছোট্ট থলেতে জ্বলন্ত এক টুকরো কয়লা আছে, তার গলার সঙ্গে ঝুলছে থলেটা। পাকানো পাতায় আগুন ধরিয়ে ধূমপান শুরু করল সে। কিনারা থেকে পানিতে নামল মনিকা, ঝুঁকে এক মুঠো কাদা তুলল। দুই আঙুলের মাঝখানে ঘষতে পিচ্ছিল লাগল। খানিকটা কাদা স্কার্টে লেগেছে, ধুতে গিয়ে দেখল রঙ উঠছে না। তারপর লক্ষ করল তার হাতের তালু আর আঙুলও লাল হয়ে রয়েছে। প্রশ্নটা আবার করল মনিকা।

অন্যদিকে তাকিয়ে খুক খুক করে কাশল বান্দা হাবিব, ধূমপানে ব্যস্ত।

'কি হলো, বুড়ো বাপ?'

'আমি জানি না।'

'জানো না কেন? জানার জন্যে উজানের দিকে যাওনি তুমি?'

'যাইনি। যাইনি ভয়ে।'

বামবুটিরা যে ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক কিছু বলে মনে করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'এই অবস্থা ক'টা নদীর?'

'অনেক, অনেক,' বলল বান্দা হাবিব, তারমানে চারটে।

নদীগুলোর নাম জেনে নিল মনিকা, উপলব্ধি করল উবোমোর গোটা নিষ্কাশন এলাকাই দূষিত হয়ে পড়েছে। 'উজানের দিকে যেতে হবে, বুড়ো বাপ। কারণটা জানা দরকার।'

কিন্তু আর এক পা এগোতেও রাজি নয় বুড়ো। প্রথমে সে যুক্তি দেখাল, গোনডালায় ওরা সবাই মনিকার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর কুসংস্কারের দোহাই পাড়ল, ওদিকে গেলে তার গ্রামের ওপর অভিশাপ নেমে আসবে। অগত্যা একাই রওনা হয়ে গেল মনিকা।

প্রায় বিশ মিনিট তার পিছু পিছু এল বান্দা হাবিব, হুমকি দিয়ে বলছে তাকে একা রেখে ফিরে যাবে সে। তার একটা কথারও জবাব দিল না মনিকা। আরও প্রায় বিশ মিনিট কাটল, ইতিমধ্যে চুপ হয়ে গেছে বুড়ো। তারপর হঠাৎ গান ধরল সে। মনিকার পরিচিত গান, সে-ও বুড়োর সঙ্গে গাইতে শুরু করল। খানিক পর তাকে পাশ কাটাল বুড়ো, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মনিকাকে।

পরবর্তী দু'দিন টেটিওয়ার কিনারা ধরে এগোল ওরা। নদীর রঙ এদিকে

আরও গাঢ় হয়েছে, গতি হারিয়ে প্রায় স্থির হয়ে আছে প্যানি-পানি না বলে কাদা বলাই ভাল। কাদার ভেতর থেকে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। গন্ধটাও ঝাঁঝাল, যেন ছোট পশু-পাখি মরে পচে গেছে। দ্বিতীয় দিনের বিকেলে বান্দা হাবিব জানাল, ওদের গোত্র যে এলাকায় শিকার করে তার শেষ সীমানায় এসে পৌঁচেছে ওরা। প্রতিটি গোত্রের জন্যে আলাদা এলাকা ভাগ করা আছে, কেউ কারও এলাকায় ঢুকে শিকার করতে পারে না। দুই এলাকার মাঝখানে খানিকটা জমিন করিডর হিসেবে থাকে, দু'পক্ষের কেউই ওখানে শিকার করে না। রাতটা ওখানেই কাটাল ওরা। বছরের প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয় এদিকে, তবে গত দু'দিন হয়নি।

পরদিন সকালে আবার রওনা হলো ওরা। দুপুরের পর দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা, কান পাতল। অদ্ভুত একটা শব্দ, আগে কখনও শোনেনি সে। অস্পষ্ট, তবে যতোই এগোল ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠল। কি ঘটছে বুঝতে পেরে রাগে যেন আগুন ধরে গেল তার শরীরে। আরও দু'মাইল এগোবার পর দেখল, টেটওয়া মরে গেছে, কোনরকম নড়াচড়া নেই। নদীর দুই কিনারায় ডালপালার স্তূপ জমেছে, মাঝখানটাও আবর্জনায় ভরাট। আরও কিছুটা এগোবার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা। বনভূমি এখানে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। উজ্জ্বল সোনালি রোদ পড়েছে সামনে, যেখানে দশ লাখ বছরেও পড়েনি।

সামনে এমন একটা দৃশ্য, যে-কোন দুঃস্বপ্নকেও হার মানাবে। সন্ধে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে সেদিক তাকিয়ে থাকল সে। রাতের অন্ধকার দয়া করল তার ওপর, ঢেকে দিল দৃশ্যটা।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙার পর মনিকা উপলব্ধি করল, সে চিৎকার করে কাঁদছে। পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে বুড়ো বান্দা হাবিব।

ফিরতি পথটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর লাগল। পাঁচদিন পর গোনডালায় পৌঁছুল ওরা।

বনভূমির মাঝখানে গাছ মোড়া পাহাড়, নিচে ঘাসজমি, একপাশে দুটো ঝর্ণা। গোনডালায় পৌঁছে নিজের কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনিকা। পাহাড়ী ঢালের গায়ে এই কুঁড়েটাই ওর আবাস ও ল্যাবরেটরি। ঘরটা বানানো হয়েছে কাঠ দিয়ে, ভেতরটা পার্টিশন দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করা। বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে বাগান, ওখানে নিজের হাতে তরি-তরকারি ফলায় মনিকা, ফুল ফোটায়।

ও একা নয়, সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের অনেক মহিলা। সবার সঙ্গে ওর গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক, ওরা তাকে আপনজনের চেয়ে বেশি জানে। ফিসফাস আলাপ করছে ওরা, ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চুল রূপোর মত চকচকে, পরনে নীল সুট আর স্যাণ্ডেল। কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকালেন তিনি, মনিকাকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। 'এসেছ? আমি তোমাকে আরও আগে আশা করেছিলাম।'

'পথে দেরি হয়ে গেল, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'ওহ্‌, মাই চাইল্ড! এখন আর আমি প্রেসিডেন্ট নই—অন্তত সিমন সাফারির দৃষ্টিতে নই। তাছাড়া, তুমি না আমাকে আংকেল বলো? হঠাৎ প্রেসিডেন্ট

বলছ কেন?'

'আবার একদিন আপনি প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটা আপনাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে। আংকেল, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'পরে।' বারান্দা থেকে নেমে এসে মনিকাকে আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ শেখ ফাহিম ফয়সল। 'আগে দেখবে চলো তোমার অনুপস্থিতিতে আমাদের কাজ কি রকম এগিয়েছে।'

লণ্ডন থেকে মেডিসিনের ওপর ডক্টরেট করেছেন শেখ ফাহিম ফয়সল। দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন, স্বাধীনতার পর সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেন।

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সিমন সাফারি ক্ষমতা দখল করার পর অল্প কয়েকজন অনুসারী নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছেন তিনি, আশ্রয় নিয়েছেন মনিকা রিভেরার কুঁড়েঘরে। আজ দশ মাস হলো এখানে আছেন তিনি, ধীরে ধীরে এই কুঁড়েটাই হয়ে উঠেছে তাঁর গবেষণাগার এবং অত্যাচারী সিমন সাফারির বিরুদ্ধে উহালি রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট-এর হেডকোয়ার্টার। শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারেই নয়, গবেষণার কাজেও মনিকা নিজেকে তাঁর যোগ্য সহকারিণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উহালি ও বামবুটিদের প্রধান দুটো শত্রু হলো, হিটাদের বাদ দিয়ে, ম্যালেরিয়া ও এইডস। গ্রামের মেয়েরা ক্যানসার ও ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে লতাপাতার শিকড় বেটে খায়। বৃদ্ধা মহিলারা এমন লতাপাতা ও শিকড়ের সন্ধান জানে, যা খেলে টিউমার সেরে যায়। তাদের দেয়া ওষুধ খেলে ম্যালেরিয়ার রোগীও সুস্থ হয়। তারপর ড. শেখ ফাহিম ফয়সল লক্ষ করলেন যে বৃদ্ধারা এইডসের রোগীদেরও নিজেদের তৈরি ওষুধ দেয়। দাবি করা হয়, কোন কোন এইডস রোগী নাকি ভালও হয়ে গেছে। নির্বাসিত জীবনে অলস সময় কাটছিল, ডাক্তারী বিদ্যাটা কাজে লাগাবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি। শুরু হলো জঙ্গল থেকে লতাপাতা ও শিকড়ের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার কাজ।

এখন আর ম্যালেরিয়া এদিকে কোন সমস্যা নয়, যদিও ওষুধ আবিষ্কারের কৃতিত্বটা শেখ ফাহিম ফয়সল নিতে রাজি নন। ওষুধটা প্রচলিত ছিল অনেক আগে থেকেই, তিনি শুধু সেটাকে আরও শক্তিশালী করেছেন, ঠিক করেছেন মাত্রা।

উহালি পুরুষ যারা এইডসে ভুগছে তাদেরও চিকিৎসা করছেন তিনি, ওই লতাপাতার নির্যাস আর শিকড় বাটার সাহায্যে। ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে এখনও কিছু বলার উপায় নেই, তবে উৎসাহিত হবার মত তো বটেই—কারণ রোগীদের মধ্যে এখনও অনেকে বেঁচে রয়েছে, যাদের বহু আগেই মরে যাবার কথা ছিল। শেখ ফাহিম ফয়সল ও মনিকার আশা, খুব ভাল একটা কিছু ঘটবে ওদের এই কুঁড়েঘরে।

আট

ফরমোজা মানে অপূর্ব সুন্দর। রোলস-রয়েসে সিলভার স্পিরিট থেকে চারদিকে তাকালেন স্যার ট্যাফোর্ড, মনে মনে ভাবলেন, নামটা যথার্থ। সমতল প্রান্তর ছাড়িয়ে বনভূমি ঢাকা পাহাড় বেয়ে উঠছে গাড়ি। পাহাড়ের একটা কাঁধ ঘুরে এগিয়েছে রাস্তাটা, চওড়া ফরমোজা প্রণালীর ওপারে, একশো মাইল বা তারও বেশি দূরে মূল চীনকে দেখা গেল, অস্পষ্ট একটা ড্রাগনের মত।

নিজের জেট প্লেন থাকলে কত আরাম, ভাবলেন স্যার ট্যাফোর্ড। লণ্ডন থেকে আবুধাবী, বাহরাইন, ব্রুনাই, তারপর হংকং। প্রতিটি শহরে দু'একদিন করে থেকেছেন, ব্যবসায়ী বন্ধু ও অংশীদারদের সঙ্গে নতুন নতুন চুক্তি করেছেন। সবশেষে এসেছেন তাইওয়ানে। তাইপে এয়ারপোর্টে চণ্ডমণ্ড গণ্ড তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে রোলস-রয়েসে তাঁর পাশেই বসে রয়েছেন তিনি। গণ্ড পরিবারের সঙ্গেও ব্যবসায়িক কথাবার্তা হবে তাঁর, সেজন্যেই আসা। তিনি তাঁর মেজবানের কনিষ্ঠ পুত্রকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন। যদিও চণ্ডমণ্ড গণ্ড তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা রাখেননি এখনও, তা সত্ত্বেও তাঁর ডোশিয়ে সবটাই পড়া আছে স্যার ট্যাফোর্ডের। চণ্ডকিণ্ড গণ্ডের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন এক ইংরেজ মহিলা, তাঁরই গর্ভে জন্ম চণ্ডমণ্ড গণ্ডের। বৃদ্ধ বয়েসের শেষ সন্তান, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে সবার চেয়ে একটু বেশি স্নেহ করেন চণ্ডকিণ্ড গণ্ড। সম্ভবত বিশাল সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব এই কনিষ্ঠ পুত্রের হাতেই তুলে দেবেন তিনি। চণ্ডমণ্ড গণ্ড বুদ্ধিমান, কৌশলী, নিষ্ঠুর ও ভাগ্যবান।

চিয়াং কাইশেক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রী নেয়ার পর সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তাইওয়ানিজ আর্মির কমাণ্ডার ছিলেন চণ্ডকিণ্ড গণ্ডের ব্যক্তিগত বন্ধু, ফলে পদোন্নতি পেতে অসুবিধে হয়নি চণ্ডমণ্ড গণ্ডের। সামরিক বাহিনীতে তাঁর রেকর্ড এমনিতে ভালই, শুধু এক জায়গাতেই কালো একটু ছায়া পড়েছিল। ব্যাপারটা তাইপে ব্রোথেলের এক মেয়েকে নিয়ে। কালো দাগটা অবশ্য পরে মুছে ফেলা হয়েছে। তদন্তের রিপোর্টটা গায়েব করে দেয়া হয়। এ-থেকেই বোঝা যায়, চণ্ডকিণ্ড গণ্ডের প্রভাব কতটা কাজের।

এরপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে যোগ দেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। এখানেও দ্রুত উন্নতি করেন তিনি। প্রথমে তাঁকে আফ্রিকার ছোট্ট এক দেশে অ্যামব্যাসাডর করে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি কি করেছেন না করেছেন তা-ও স্যার ট্যাফোর্ড জানেন।

জাম্বেজি নদীতে কালো এক তরুণীর লাশ পাওয়া যায়, কুমীর মাত্র আংশিক খেতে পেরেছে। লাশের স্তন ও জননেন্দ্রিয়ে অস্বাভাবিক কিছু ক্ষত থাকায় জোর তদন্ত শুরু করে পুলিস। তারা জানতে পারে, ঘটনার সময় একটা গেমলজ-এ অবস্থান করছিলেন তাইওয়ানিজ অ্যামব্যাসাডর, মেয়েটার গ্রাম থেকে খুব একটা

দূরে নয়। নিখোঁজ মেয়েটাকে লজ-এ ঢুকতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু বেরুতে দেখা যায়নি। তদন্ত এই পর্যন্তই এগোয়, কারণ প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বিশেষ নির্দেশ আসে, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে বিরক্ত করা যাবে না। এরপর তাইপে থেকে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে বদলি করে পাঠানো হয় জিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারারেতে।

বাবা তাঁকে রেড ড্রাগন কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছেন। স্যার ট্যাফোর্ড জানেন, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের লক্ষ্য হলো প্রেসিডেন্ট হওয়া। তাহলেই রেড ড্রাগনের মত বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে আসবে।

গণ্ড পরিবারের বাড়িটা রাজপ্রাসাদকেও হার মানাবে। দু'পাশে লন ও হেলিপ্যাড, মাঝখান দিয়ে ছুটছে গাড়ি। গেস্ট হাউসে পৌঁছুতে প্রায় সাত মিনিট লাগল রোলস-রয়েসের। ইতিমধ্যে কয়েকটা সুইমিং পুলকে পাশ কাটিয়ে এসেছে ড্রাইভার। গেস্ট হাউসে পৌঁছে চীনা পোশাক পরতে হলো স্যার ট্যাফোর্ডকে, বলা হয়েছে, তা না হলে কর্তা সাক্ষাৎ দেবেন না।

ভবনটা চীনা স্থাপত্য রীতিতে তৈরি হয়েছে। প্রকাণ্ড হলরুমে পনেরো থেকে বিশজন চীনা তরুণী বিশাল এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাঝখানে সিংহাসনে বসে রয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধ চণ্ডকিণ্ড গণ্ড। সুন্দরী তরুণীরা সবাই খুব ব্যস্ত। কেউ পানীয় ঢালছে, কেউ হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে, আবার কেউ সুগন্ধে ভেজানো তুলো দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে প্রভুর পদযুগল।

স্যার ট্যাফোর্ডকে দেখে সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন না চণ্ডকিণ্ড গণ্ড। মার্বেল পাথরের মেঝেতে মোটা লাল কার্পেট, তার ওপর দিয়ে হেঁটে এলেন তিনি। ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠলেন, লক্ষ করলেন মঞ্চের কিনারা ঘেঁষে চণ্ডকিণ্ড গণ্ডের অন্যান্য ছেলেরা বসে আছেন–তাঁরাও সিংহাসনেই। চণ্ডকিণ্ড গণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে চীনা পদ্ধতিতে মাথা নত করে সম্মান দেখালেন স্যার ট্যাফোর্ড। তারপর সিংহাসনের সামনে একটা সোফায় বসলেন।

উত্তরে চণ্ডকিণ্ড গণ্ড শুধু একটা হাত তুললেন। 'গরীব মানুষের বাড়িতে আপনাকে সুস্বাগতম, স্যার ট্যাফোর্ড,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'সুন্দরীরা, সম্মানিত মেহমানকে তোমরা জেসমিন চা দাও।'

তরুণীরা একটা বিরাট বাটিতে করে চা এনে দিল। বাটিটা দেখে বিস্মিত হলেন স্যার ট্যাফোর্ড। বাটির শরীর এত পাতলা যে ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে, ওটাকে ধরে থাকা নিজের আঙুলগুলোর কাঠামো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তারপর তিনি লক্ষ করলেন, বাটির গায়ে সূক্ষ্ম নকশাও আছে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে না থাকলে বোঝা যায় না। অ্যান্টিকস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, বুঝতে পারলেন, জিনিসটা পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত একটা শিল্পকর্ম, মিং সাম্রাজ্যের সময়কার, সম্রাট চিং তাই-এর আমলে তৈরি।

বাটিটা খালি করে নিচু টেবিলে নামিয়ে রাখছেন স্যার ট্যাফোর্ড, কিন্তু নামালেন না। ইচ্ছে করেই বেশ খানিকটা ওপর থেকে ছেড়ে দিলেন সেটা। টেবিলে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বাটি। 'ভারি দুঃখিত, কি একটা কাণ্ড করলাম!'

'কিছু আসে যায় না!' উদার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে অভয় দিলেন চঙকিঙ গঙ, তাঁর ইঙ্গিতে তরুণীরা ছুটে এসে ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই ওটা অনেক দামী জিনিস ছিল?' খোঁচা দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'নগণ্য একটা জিনিস, স্যার ট্যাফোর্ড। প্লীজ, ওটার কথা ভুলে যান।'

স্যার ট্যাফোর্ড উপলব্ধি করলেন, তিনি যা চেয়েছিলেন সেটা অর্জিত হয়েছে–প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি। ঢোলা চীনা পোশাক পরতে হওয়ায় শরীরে যে জ্বালাটা ছিল তা এখন আর নেই। দু'জনই জানেন ওঁরা, বাটিটা ছিল অমূল্য একটা সম্পদ।

নিজের বাটি খালি করলেন বৃদ্ধ চঙকিঙ গঙ, তারপর সযত্নে মুছলেন ওটা, এক টুকরো লম্বা সিল্ক দিয়ে মুড়ে বাড়িয়ে দিলেন স্যার ট্যাফোর্ডের দিকে। 'আপনার জন্যে ক্ষুদ্র একটা উপহার, স্যার ট্যাফোর্ড। আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব এই জিনিসের মত ভঙ্গুর হবে না।'

চুপসে গেলেন স্যার ট্যাফোর্ড, মুখের হাসি অনেক কষ্টে ধরে রাখলেন। সোফা ছেড়ে বাটিটা নিলেন তিনি, বললেন, 'আপনার এই বদান্যতা চিরকাল মনে রাখব আমি, মি. গঙ।'

'আমার ছোট ছেলে আমাকে বলেছে, আপনি নাকি আমার আইভরি কালেকশন দেখতে খুব আগ্রহী। আমার মত আপনিও কি আইভরি কালেকশন করেন, স্যার ট্যাফোর্ড?'

'তা না করলেও, আফ্রিকান যে-কোন জিনিস সম্পর্কে আগ্রহী আমি।'

আইভরি মিউজিয়ামটা মূল ভবনের এক পাশে, স্যার ট্যাফোর্ডকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। অশীতিপর বৃদ্ধ হলে কি হবে, চঙকিঙ গঙের হাঁটাচলার মধ্যে কোন দুর্বলতা বা আড়ষ্ট ভাব নেই। মিউজিয়ামটা পাহারা দিচ্ছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে একদল গার্ড, এদেরকে মূল ভবনের বাইরেও দেখেছেন স্যার ট্যাফোর্ড, মোট সংখ্যা সম্ভবত একশোজনের বেশিই হবে।

মিউজিয়ামটা এত বড় যে ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যাবে। আইভরির কালেকশন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্যার ট্যাফোর্ড। লক্ষ করে চঙকিঙ গঙ বললেন, 'এগুলো অমূল্য সম্পদ। ছোটখাট একটা রাষ্ট্রের সারা বছরের যে বাজেট, টাকার হিসেবে তার চেয়ে কম হবে বলে মনে করি না। কিন্তু আইভরি তুচ্ছ জিনিস, স্যার ট্যাফোর্ড, বিশেষ করে আপনি নিজে যখন এ-জিনিস কালেকশন করেন না। আসুন, আমার অন্যান্য কালেকশন দেখবেন।'

সোনা-রূপা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে অলঙ্কৃত অ্যাকুয়ারিয়াম-এর পাশে থামলেন একবার চঙকিঙ গঙ, খাবার দিলেন মাছগুলোকে। পুরো একটা ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেদিকে চোখ রেখে বললেন, 'লোভ, স্যার ট্যাফোর্ড। লোভ ছাড়া আমি বা আপনি কোথায় থাকতাম আজ?'

'জ্বী, আপনার সঙ্গে আমি একমত। বিহাইণ্ড এভরি ফরচুন দেয়ার ইজ আ ক্রাইম–বালজাককে সালাম। মানুষকে এমন অসহায় করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেটাও একটা ক্রাইম। একটা ক্রাইম আরেকটা ক্রাইমকে উৎসাহিত করে–মানুষের মধ্যে যাদের সৃজনশীল প্রতিভা আছে, লোভী হওয়া বা

অপরাধ করা তাদের সাজে বৈকি। লোভ ও অপরাধ হলো ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের জ্বালানি।'

আরেকটা প্রকাণ্ড মিউজিয়ামে নিয়ে আসা হলো স্যার ট্যাফোর্ডকে। চঙকিঙ গঙ বললেন, 'সব তো দেখতে পারবেন না, দেখতে হলে মাসখানেক লাগবে। আসুন, নির্দিষ্ট কয়েকটা জিনিস দেখাই আপনাকে।'

পবিত্র ও ধর্মীয় সেকশনে নিয়ে আসা হলো স্যার ট্যাফোর্ডকে। রুশ সাম্রাজ্যের অ্যান্টিকস, অন্যান্য সাম্রাজ্যের মত, আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

'পিটার দা গ্রেট,' বিড়বিড় করলেন চঙকিঙ গঙ। 'তাঁর ব্যক্তিগত বাইবেল।'

আইভরির কৌটায় রয়েছে এক কপি টোরা। রয়েছে প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। সোনা ও আইভরি দিয়ে মোড়া, হাতে লেখা কোরান। খ্রিস্টান সেইন্টদের দুর্লভ স্ট্যাচু।

রোমান ও গ্রীক মেয়েদের হাতপাখা ও চিরুনি রাখা হয়েছে আলাদা সেকশনে। বলা হলো, শুধু এগুলোর দাম হবে একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। আরও আছে রোমান অস্ত্রশস্ত্র, ফেরাউনদের ব্যবহার করা তৈজসপত্র, ক্লিওপেট্রার অলঙ্কার। সব মিলিয়ে অ্যান্টিকস-এর সংখ্যা দশ হাজার। তার মধ্যে গোটা পঞ্চাশ দেখতেই দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল।

মূল ভবনে ফেরার পথে বৃদ্ধ চঙকিঙ গঙ বললেন, 'অনেক কিছুই আছে আমার, বিশেষ করে আমার আইভরির কালেকশন দুনিয়ার সেরা, তবু আমি অতৃপ্ত, স্যার ট্যাফোর্ড। ভাল মানের আরও আইভরি চাই আমার। উবোমোয়, চাঁদের পাহাড়ে হাতির সংখ্যা নাকি এখনও প্রচুর–আমাদের সিণ্ডিকেট তো ওখানেই অপারেশন চালাচ্ছে, তাই না?'

'ঠিক আছে, আমি দেখব আপনি যাতে আরও আইভরি কালেক্ট করতে পারেন,' কথা দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'আমার ছোট ছেলের এক বিশ্বস্ত এজেন্ট আছে উবোমোয়,' বললেন চঙকিঙ গঙ। 'তার নাম চাখার সিং। আপনি তাকে চেনেন?'

'ঠিক চিনি না, তবে নাম শুনেছি। জানি অবৈধ আইভরি আর গণ্ডারের শিং পাচার করেন তিনি।'

'গত দশ দিন থেকে উবোমো বেসিনে রয়েছেন তিনি,' চঙকিঙ গঙ বললেন।

'আমি তাকে বা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'প্রেসিডেন্ট সাফারি বিশেষ একটা গেম লাইসেন্স ইস্যু করতে পারেন। সংবিধানে এ-ধরনের একটা বিধি আছে বলে জানি আমি। যদি না থাকে, সংশোধনী এনে ঢোকানো যায়। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে লাইসেন্সটা আপনি যদি সই করাতে পারেন, বাকি কাজ চাখার সিং একাই করতে পারবে।'

'কোন ব্যাপারই না। প্রেসিডেন্ট সাফারি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আইভরি পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমার গালফস্ট্রীম তো রয়েছেই।'

'ধন্যবাদ, স্যার ট্যাফোর্ড। এবার বলুন, বিনিময়ে আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'কিছু তো একটা চাইবই,' সহাস্যে বললেন স্যার ট্যাফোর্ড, পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'তার আগে অন্য এক প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলি।' 'প্রকৃতি

প্রেমিক'-দের প্রসঙ্গটা তুললেন তিনি। কিভাবে তারা তাঁকে বিব্রত করছে। মনিকা রিভেরার কথা বললেন। বললেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণের জন্যে কি রকম উদার হস্তে খরচ করছে স্টার। ডকুমেন্টারী ছবির প্রসঙ্গও উঠল। তারপর তিনি বললেন, 'এ-সব ঝামেলা একা তাকে অর্থাৎ স্টারকে পোহাতে হচ্ছে।' তাইওয়ান ইউরোপের কোন দেশ নয় বলে 'প্রকৃতি প্রেমিক'-রা তাঁকে অর্থাৎ চণ্ডকিণ্ড গণ্ডকে বিরক্ত করতে পারছে না। 'কাজেই আমি চাই, সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিত্ব করুক রেড ড্রাগন। আমি চাই, আমার সেরা একজন লোক ওখানে গিয়ে অপারেশন পরিচালনা করুন। আমি জিওলজিস্ট, ফরেস্ট এক্সপার্ট আর আর্কিটেক্ট যোগান দেব, আপনি দেবেন চীনা বিশেষজ্ঞ। হংকংে বেনামে অনেক কোম্পানী আছে আমার, ধীরে ধীরে আমার শেয়ারগুলো ওদের কাছে বেচে দেব আমি। আপনার সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখা হবে, একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে সিণ্ডিকেট পরিচালনা করা যায়। তবে স্টার ধীরে ধীরে দৃশ্যপট থেকে সরে যাবে।'

'ভারি চমৎকার প্রস্তাব,' রাজি হলেন চণ্ডকিণ্ড গণ্ড। 'প্রকৃতি প্রেমিকদের এড়াবার জন্যে আপনাকে আমি সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করব, স্যার ট্যাফোর্ড।' ইতিমধ্যে হলরুমে ফিরে এসেছেন ওঁরা, আবার যে যার আসনে বসেছেন।

'আপনার প্রতিনিধি হিসেবে উবোমোয় কাকে আপনি পাঠাচ্ছেন?'

চণ্ডকিণ্ড গণ্ডের ছেলেরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'সেটা জানাতে এক হপ্তা সময় নেব আমি, স্যার ট্যাফোর্ড। ফোন করে জানাব আপনাকে।'

'ঠিক আছে। কাল আমি সিডনি যাচ্ছি। ওখান থেকে নাইরোবি হয়ে কাহালি, উবোমোর রাজধানীতে পৌঁছুব প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারির সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তবে আমার প্লেনে ডাইরেক্ট স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন আছে। যখন খুশি আপনি আমাকে ফোন করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, স্যার ট্যাফোর্ড।'

আফ্রিকা থেকে বাবার জন্যে মূল্যবান উপহার এনেছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তবে এখনও বাবাকে দেননি সে-সব, অপেক্ষা করছেন শুভ মুহূর্তের জন্যে। স্যার ট্যাফোর্ড তাইপে ত্যাগ করার পর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেছে, উবোমোয় কাকে পাঠানো হবে সে ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেননি চণ্ডকিণ্ড গণ্ড। ছেলেরা জানেন, তাঁদের একজনকেই পাঠানো হবে। কিন্তু কাকে?

বৃদ্ধকে খুশি করার জন্যে সব ছেলেই সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। সব ছেলের উপহারই হাসিমুখে গ্রহণ করছেন বৃদ্ধ, কিন্তু কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না। ক'দিন খুব ব্যস্ত সময় কাটছে তাঁর। বাড়ির সামনের লনের এক ধারে বিশাল এক মন্দির তৈরি হচ্ছে। ওটা হবে তাঁর সমাধি। রোজই একবার ওখানে তাঁকে যেতে হয়, দেখতে হয় মন্দিরকে পেঁচিয়ে থাকা ড্রাগনটা ঠিকমত তৈরি হচ্ছে কিনা।

এরকম একদিন মন্দিরের কাজ দেখছেন তিনি, চণ্ডমণ্ড গণ্ড বাবার সামনে

দাঁড়িয়ে মাথা নোয়ালেন। 'আপনার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছি আফ্রিকা থেকে, বাবা।'

'কই দেখি।'

'এমন উপহার, বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

রোলস-রয়েসে তুলে রেড ড্রাগনের সাত নাম্বার ওয়্যারহাউসে বাবাকে নিয়ে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। চিউইউই ন্যাশনাল পার্ক থেকে লুঠ করা প্রতিটি আইভরির গায়ে সরকারী সীল মারা আছে, তারমানে ওগুলো বৈধ আইভরি। উপহার দেখে আনন্দে কনিষ্ঠ পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ। ভেজা চোখে বললেন, 'এ-সব যে যোগাড় করতে পারে, তার সাহসের আমি প্রশংসা করি। সে যা চায় তা খুন করে পেতে হলেও দ্বিধা করে না। কবে যেন পড়লাম জিম্বাবুইয়ে আইভরি গোডাউন লুঠ হয়েছে···।'

বাবাকে থামিয়ে দিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ড বললেন, 'এরকম একটা খবর আমিও পড়েছি।' চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

'তুমি আমার শক্তি আর সাহস পেয়েছ,' বৃদ্ধ ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। 'প্রার্থনা করি সব কাজে বিজয়ী হও। রেড ড্রাগনের প্রতিনিধি হিসেবে উবোমোয় আমি তোমাকেই পাঠাব, বাছা!'

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সুখবরটা দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সোফায় বসে তাকিয়ে থাকলেন টেলিফোনটার দিকে। এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে কল্পনা করে উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

নাম্বারটা মুখস্থ আছে তাঁর। ডায়াল করলে এক মহিলা ধরবে। মহিলা তাকে বলেছে, এটা একটা গোপন নাম্বার, মাত্র পাঁচ কি ছয়জনকে দেয়া হয়েছে।

ক্রেডলের দিকে হাত বাড়ালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, লক্ষ করলেন হাতটা কাঁপছে। ডায়াল করলেন তিনি। নিজের পরিচয় দিলেন, 'সবুজ পাহাড়।'

'অনেক দিন পর আপনার ফোন পেলাম, সবুজ পাহাড়।'

'আমি বাইরে ছিলাম। আজ আসতে চাই।'

'আপনি কি স্পেশাল জিনিস চান?'

'হ্যাঁ,' বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, অনুভব করলেন তলপেটের ভেতরটা শিরশির করছে।

'দাম অনেক বেশি পড়বে। কম বয়েসী?'

'হ্যাঁ। একেবারে কম বয়েসী, খুব কচি, অক্ষত।'

'কখন আসবেন আপনি?'

'আপনি যখন বলবেন।'

'আজ রাত দশটায়। আগে নয়, পরে নয়, ঠিক দশটায়।'

সন্ধের খানিক পর শহরে তাঁর একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। এখানে তিনি গোসল করলেন। কাপড়চোপড় পরে বেরুলেন আবার, গাড়ি না পেয়ে হাঁটছেন। ইস্ট গার্ডেন এলাকায় চলে এলেন তিনি, ঢুকলেন সরু একটা

গলিতে। বৃদ্ধ গণক গত দশ বছর ধরে ভাগ্য বলে দিচ্ছে তাঁর । চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখে এক গাল হাসল সে। তার পরনে ঢোলা পোশাক, মাথায় ম্যাণ্ডারিন ক্যাপ। 'আমি খুব বড় একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি,' বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমি চাই আত্মারা আমাকে পথ দেখান।'

পঞ্জিকায় নক্ষত্রের অবস্থান ইত্যাদি দেখে নিয়ে পারদ ভরা একটা কাপ দিল গণক চণ্ডমণ্ড গণ্ডের হাতে, বিড়বিড় করছে আপন মনে। কাপের পারদ ঢালতে শুরু করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। পাঁচটা কাপে একটু একটু করে ঢাললেন তিনি। কাজটা শেষ হতে প্রতিটি কাপে উঁকি দিল গণক। 'কাজটা তাইওয়ানে নয়,' বলল সে। 'সাগর পেরিয়ে দূরদেশে যেতে হবে আপনাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'কাজটা খুব জটিল, অনেক লোক জড়িত–অনেক বিদেশী শয়তান জড়িত।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'আমি অনেক শক্তিশালী শত্রু দেখতে পাচ্ছি, তবে শক্তিশালী মিত্ররাও আছে।'

'বন্ধুদের আমি চিনি, কিন্তু শত্রুদের চিনি না।'

মাথা নাড়ল গণক। 'তা সত্যি নয়। আপনি এই শত্রুকে চেনেন। আপনার সঙ্গে আগেও শত্রুতা করেছে। সেবার তাকে আপনি হারিয়ে দেন।'

'তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

মাথা নাড়ল গণক। 'আবার দেখা হলে আপনি তাকে চিনতে পারবেন।'

'কবে সেটা?'

'ভৌতিক মাসে ভ্রমণ করবেন না।'

'ঠিক আছে। আমি এই শত্রুকে আগেরবারের মত হারাতে পারব?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আরও আয়োজন দরকার আমার, খরচ পড়বে তিন গুণ।'

'ঠিক আছে।'

আধ ঘণ্টা পর গণক তার আয়োজন শেষ করে বলল, 'শত্রু আসলে দু'জন। পুরুষটিকে আপনি চেনেন, কিন্তু মেয়েটিকে এবারই প্রথম চিনবেন। ওরা দু'জন মিলে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।'

'আমি কি জিতব?'

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের হাতের তালুতে লাল টকটকে তরল রঙ ঢালল গণক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই রঙের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথা আর গভীর বনভূমি দেখতে পাচ্ছি। ওটাই হবে আপনাদের যুদ্ধক্ষেত্র। ওখানে পাজি আত্মারা আছে, আছে শয়তানরা।'

'আর কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি?'

'এই-ই। আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' পকেট থেকে দু'হাজার তাইওয়ান ডলার বের করে গণকের হাতে গুঁজে দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমার কি হবে?'

'সাবধানে থাকলে কিছুই হবে না।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে চণ্ডমণ্ড গণ্ড দেখলেন মাত্র আটটা বাজে। দশটার আগে

মাদাম সুসেমির কাছে যাওয়া যাবে না। কি করা যায় ভাবছেন। হঠাৎ মনে পড়ল সর্পরাজ-এর কথা। গলিটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

গলিটার ভেতর সারি সারি সাপ ও পাখির দোকান, দ্রুত পায়ে সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গলির মাথায় এসে একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। এটা একটা বাড়ি, যদিও ভেতরে সাপ আর পাখিই বিক্রি হয়। বাড়ির মালিককে অনেক দিন থেকে চেনেন তিনি, অনেকবার আফ্রিকার দুষ্প্রাপ্য পানি এনে দিয়েছেন তাকে।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখে ওঝা লোকটা শ্রদ্ধা ও বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠল। তাঁকে দেখেই বুঝে নিয়েছে সে, কি দরকার তাঁর। বাড়িতে কোন লোক নেই, থাকলে বের করে দিত সে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড তার সবচেয়ে সম্মানী ক্রেতা।

জাল দিয়ে ঘেরা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন একটা মামবা সাপ। এক গাল হাসল ওঝা। ইস্পাতের আঙটা দিয়ে সাপটাকে খাঁচা থেকে বের করল সে। হিসহিস করে উঠল সাপ, ইস্পাতের আঙটা পেঁচিয়ে ধরছে।

এক হাতের মুঠোয় সাপের মাথাটা ধরল ওঝা, আঙটা খুলে নিল। এবার ওঝার হাতটাকে পেঁচিয়ে ধরল সাপ। পুরোপুরি ছ'ফুট লম্বা ওটা, চোয়াল সবটুকু খুলে হাঁ করে আছে। দাঁতের ডগা থেকে স্বচ্ছ বিষ গড়াচ্ছে। মসৃণ একটা পাথরের ওপর সাপের মাথা রেখে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল ওঝা, ভর্তা হয়ে গেল খুলিটা, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে সাপ। সেটাকে একটা হুকের সঙ্গে গাঁথল লোকটা, তারপর ক্ষুর দিয়ে চিরে ফেলল পেট। চীনামাটির একটা বাটিতে পড়ল সবটুকু রক্ত। মামবার গলা থেকে বিষ ভরা থলিগুলো বের করে রাখা হলো কাচের একটা পাত্রে। লিভার আর গল্লব্লাডার ঠাঁই পেল অন্য একটা বাটিতে।

এরপর সাপের ছাল ছাড়াল ওঝা, এমন দক্ষতার সঙ্গে, যেন কোন মেয়ের পা থেকে মোজা খুলে নিল। ছাল ছাড়ানো সাপটা লাল, চকচক করছে। হুক থেকে খুলে টেবিলের ওপর রাখা হলো সেটা, ছোরার কয়েকটা আঘাতে টুকরো করা হলো, ফেলে দেয়া হলো সুপ কেটলিতে। কেটলিটা গ্যাসের চুলোয় বসানো রয়েছে, টগবগ করে ফুটছে পানি। কেটলির ভেতর এরপর গাছের শিকড় আর মসলা ফেলল সে।

'আপনি কি টাইগার জুস পান করতে চান?' চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে জিজ্ঞেস করল ওঝা।

এ হলো মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। জিভে বা গলায় যদি সামান্য ক্ষত থাকে, পেটে যদি থাকে সামান্য একটু আলসার, মামবার বিষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ডেকে আনবে। সেটা হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

ইতিমধ্যে মেশিনে ঢুকিয়ে গল্লব্লাডারটাকে নরম মণ্ড বানিয়ে ফেলেছে ওঝা। রক্ত ভরা চীনামাটির বাটিতে ফেলা হলো মণ্ডটা, চামচ দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে নিঃশেষে মিশে গেল রক্তের সঙ্গে। তিনটে বোতল থেকে বাটিতে তিন রকম ওষুধ ঢালল সে। জিনিসটা দেখতে হলো ঘন মধুর মত, তবে রঙটা কালো। সবশেষে

বাটিতে বিষ ঢালল সে।

দম আটকে বাটির সবটুকু তরল পদার্থ খেয়ে ফেললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। স্বাদটা তিক্ত, বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। বাটিটা টেবিলে রেখে হাত দুটো ভাঁজ করলেন বুকে। চুপচাপ বসে থাকলেন, চেহারায় কোন আবেগ নেই। বিষটুকু যদি তাঁকে মেরে না ফেলে, তাঁর যৌনক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থেই ইস্পাতের মত হয়ে উঠবে জননেন্দ্রিয়। বিষক্রিয়া শুরু হয় কিনা দেখার জন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। অনুভব করলেন শরীর গরম হয়ে উঠছে তাঁর।

ওঝার সঙ্গে কিচেনে চলে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। কেটলি থেকে একটা বাটিতে ঢালা হলো সুপ। সুপে এবার সেদ্ধ করা সাপের মাংস ফেলা হলো। হাতে কাঠি নিয়ে খেতে শুরু করলেন তিনি।

হাতঘড়ি দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ন'টা বাজে। 'ধন্যবাদ,' বলে ওঝার হাতে তিন হাজার তাইওয়ান ডলার ধরিয়ে দিলেন।

'আশা করি ভেলভেটের বিছানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুস্তি লড়তে পারবেন আপনি।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গাড়ি নিয়ে আবার বেরুলেন, সী প্যাভিলিয়নে পৌঁছুতে লাগল চল্লিশ মিনিট। গোটা এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, শুধু খোলা সাগরের দিকটা বাদে। রঙিন কাগজের তৈরি ল্যাম্প জ্বলছে গেটে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড জানেন, ওগুলো বিশেষ ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই জ্বালা হয়েছে।

সশস্ত্র গার্ডরা জানে তিনি আসবেন। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। চওড়া গাড়িপথ ধরে এগোল রোলস-রয়েস, দু'পাশে সাগর। সামনে প্রাইভেট জেটি, জেটির মাথায় একটা মোটর-লঞ্চ নোঙর ফেলে রয়েছে। পরে দরকার হবে ওটা। তিনি জানেন, দু'ঘণ্টা পর মোটর লঞ্চটা গভীর সাগরে চলে যাবে, ইস্ট চীনা সাগরের তলায় নামিয়ে দেয়া হবে ভারি একটা বোঝা। বোঝাটা একটা মানুষের শরীর হতে পারে, তবে কেউ কোনদিন ওটার হদিস বের করতে পারবে না। মৃদু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। শারীরিক উত্তেজনা তাঁকে অস্থির করে তুলছে।

প্যাভিলিয়নে উঠে এলেন তিনি। দরজায় একজন ভৃত্য, ভেতরে নিয়ে এসে বসাল তাঁকে, চা খেতে দিল। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটার সময় কামরায় ঢুকল মাদাম সুসেমি। কিশোর বালকের মত রোগা সে, মাথায় ছেলেদের মত করে ছাঁটা চুল। 'ওয়েলকাম টু মাই হাউস, গ্রীন মাউন্টেন ম্যান,' বিড়বিড় করে বলল সে।

মাথা নোয়ালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি, মাদাম সুসেমি।' হাতের ব্রিফকেসটা টেবিলের ওপর তুললেন তিনি।

ইঙ্গিত পেয়ে ব্রিফকেসটা সরিয়ে নিয়ে গেল চীনা ভৃত্য। দ্বিতীয় টেবিলে ফেলে খোলা হলো সেটা। মাদামের সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে গল্প করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, ওদিকে টাকা গোণা হচ্ছে। এক সময় শেষ হলো কাজটা। মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল ভৃত্য।

'আপনার জন্যে দুটো জিনিস রাখা হয়েছে,' বলল মাদাম সুসেমি। 'যে-

কোন একটাকে বেছে নেবেন। তবে তার আগে একবার দেখে নিন, কামরাটা আপনার মনের মত সাজানো হয়েছে কিনা।'

প্যাভিলিয়নের পিছনে চলে এল ওরা, ঢুকলো বিশেষ ভাবে সাজানো একটা কামরায়। প্রধান ফার্নিচার হলো গাইনোকোলজিস্ট-এর একটা কাউচ, আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু সহ। কাউচটা প্লাস্টিক কাভার দিয়ে ঢাকা, পরে ওটা সরিয়ে ফেলা যাবে। মেঝেতেও প্লাস্টিক শিট রয়েছে। কামরার দেয়াল মোজাইক করা, পানি দিয়ে ধুলে কোন দাগ থাকবে না।

একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, ইন্সট্রুমেন্টগুলো এটার ওপরই সাজানো রয়েছে সব। ট্রের ওপর দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মাপের সিল্ক কর্ড। একটা কর্ডে আঙুল বুলালেন তিনি। তারপর টেবিলের অন্যান্য যন্ত্রপাতির দিকে তাকালেন। সবগুলোই স্টেইনলেস স্টীল-এর গাইনোকোলজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট।

'ভেরি গুড,' বললেন তিনি।

'আসুন,' বলে তার একটা হাত ধরল মাদাম সুসেমি। 'এবার আপনি বেছে নিন।'

পিছনের দেয়ালে ছোট একটা জানালা, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে নিয়ে সেটার সামনে এসে দাঁড়াল মাদাম সুসেমি। জানালায় কাঁচ রয়েছে, শুধু এদিক থেকে দেখা যাবে। কয়েক মিনিট পর এক মহিলা দুটো মেয়েকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল। দুটো মেয়েই সাদা কাপড় পরে আছে। চীনাদের কুসংস্কার বলে, সাদা হলো মৃত্যুর প্রতিনিধিত্বকারী রঙ। দু'জনেরই লম্বা কালো চুল, বিনুনি করা। কচি মুখ, পবিত্র চেহারা। সম্ভবত বাংলাদেশ অথবা কম্বোডিয়া থেকে কিনে আনা হয়েছে।

'ওদের পরিচয়?'

'এতিম। নাম নেই, দেশ নেই। কেউ জানে না ওরা বেঁচে আছে কিনা, কিংবা কোথায় আছে। কেউ ওদের খোঁজ করবে না।'

মহিলা সহকারিণী মেয়ে দুটোকে বিবস্ত্র করছে। একটা মেয়ের বয়স হবে খুব বেশি হলে চোদ্দ। ফুল নয়, এখনও কুঁড়ি। স্তনযুগল মাত্র উঁচু হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় মেয়েটার বয়স হবে ষোলো বা সতেরো।

'ছোটটা,' ফিসফিস করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমি ছোটটাকে চাই।'

'হ্যাঁ, আমারও ধারণা ছিল আপনি ওকে চাইবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার কামরায় আনা হচ্ছে। যতক্ষণ খুশি সময় নিতে পারেন আপনি। কোন তাড়াহুড়ো নেই।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাদাম সুসেমি। তারপর হঠাৎ করে লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে এল চাইনীজ মিউজিকের কান ফাটানো আওয়াজ। এই আওয়াজে সব চাপা পড়ে যাবে–ছোট একটা মেয়ের আর্তচিৎকার শুনবে না কেউ।

নয়

কাহালি প্রেসিডেন্ট ভবনে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। আর্মি ল্যাণ্ডরোভার থেকে নামার সময় চারদিকের আলোকসজ্জা দেখে হাঁ হয়ে গেল সোফিয়া ক্যারল। 'রানা, এ-সব তোমার সম্মানে?'

লনে ও বারান্দায় গিজগিজ করছে আমন্ত্রিত অতিথিরা। মৃদু হেসে রানা বলল, 'আমাকে যেমন বলা হয়েছে, আমার ধারণা বাকি সব অতিথিকেও একই কথা বলা হয়েছে–আপনারই সম্মানে এত সব আয়োজন।'

ওদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল ক্যাপটেন শোল। সোফিয়ার স্কার্ট আর নগ্ন পায়ের ওপর চোখ, কথা বলল রান্যর সঙ্গে। 'এদিকে আসুন, মি. রানা। মি. প্রেসিডেন্ট আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি তাঁর বিশেষ মেহমান।'

হলরুমে ঢুকেই প্রেসিডেন্টকে চিনতে পারল রানা। হিটা অফিসারদের মধ্যেও সবার চেয়ে লম্বা তিনি, পরে আছেন পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক। ক্যাপটেন শোল ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

'মি. মাসুদ রানা! আমার প্রিয় মেহমান! স্যার, আমি আপনার শিল্পকর্মের দারুণ এক ভক্ত।' রানার হাতটা তো ধরলেনই, ওকে টেনে নিজের বুকে জড়িয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি। 'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, ইয়েস, মি. রানা? আমি আমার দেশটাকে বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসতে চাই, আপনার মত গুণী ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়...।'

নিজেকে অনেক কষ্টে প্রেসিডেন্টের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করল রানা।

'আপনি তো সেই স্বনামধন্যা ফটোগ্রাফার,' সোফিয়ার দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মি. মরিস ট্যাফোর্ড আমাকে আপনার আর্কটিক ড্রিম-এর একটা টেপ পাঠিয়েছেন। দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি!' রানা লক্ষ করল, ক্যাপটেন শোলের মত স্বয়ং প্রেসিডেন্টকেও সোফিয়ার দৈহিক গড়ন জাদু করেছে। প্রকাশ্যেই সোফিয়ার শরীরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন তিনি। 'আপনি যদি উবোমোয়ও ওভাবে ছবি তোলেন, ভারি খুশি হব, মিস সোফিয়া।'

'আপনি অত্যন্ত দয়ালু, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি আমার সাধ্যমত করব। বিশেষ করে আপনি, স্বয়ং উবোমোর প্রেসিডেন্ট যখন অনুরোধ করছেন।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' খুশিতে নেচে উঠল সিমন সাফারির চোখ। 'বিদেশীদের মধ্যে আপনিই প্রথম আমাকে প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করলেন। আপনার প্রতি সদয় হবার প্রয়োজন হলে আমাকে শুধু একবার জানাবেন, মিস সোফিয়া।'

আবার রানার দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। 'ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোকও আজ এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, মি. রানা। আমি নিশ্চিত, তাঁকে আপনি সম্মান দেখাতে চাইবেন।' ক্যাপটেন শোলের দিকে তাকালেন তিনি। 'ক্যাপটেন,

প্লীজ, মি. রানাকে স্যার মাইকেল ডাফের কাছে নিয়ে যাও।'

রানাকে অনুসরণ করল সোফিয়া, কিন্তু তার যাওয়া হলো না। প্রেসিডেন্ট আলতোভাবে তার বাহু ধরে বললেন, 'এখুনি যাবেন না, মিস সোফিয়া। কয়েকটা বিষয় আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই–এই যেমন, উহালি আর হিটাদের মধ্যে আসলে পার্থক্য কোথায়।'

বারান্দা থেকে আলোকিত লনে নেমে এল রানা, ভিড়ের মধ্যে পরিচিত কাঠামোটা দেখতে পেয়ে হাসল, দ্রুত এগিয়ে এসে তার একটা হাত চেপে ধরল। 'স্যার মাইকেল!' পরবর্তী শব্দটা কানের কাছে ঠোঁট রেখে, 'শালা!' চারদিকে চোখ বুলাল ও। 'ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর, নো লেস! এত সব ঘটল কখন শুনি?'

ব্রিটিশ কেতা ও কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে রানার কনুই আঁকড়ে ধরল মাইকেল ডাফ। 'তুমি আমার চিঠি পাওনি? একেবারে হঠাৎ, দোস্ত। কিন্তু আমার চিঠি তুমি...?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কংগ্রাচুলেশন্স, স্যার মাইকেল। অনেকদিন আগেই পাওনা হয়েছে। এ তোমার প্রাপ্য।' চারদিকে আবার একবার চোখ বুলাল রানা। 'নোরা কোথায়?'

'জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে লুসাকায় ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। নতুন যে ভদ্রলোক আছেন ওখানে, কথা দিয়েছেন তোমার ল্যাণ্ডক্রুজার আর ইকুইপমেন্ট দেখেশুনে রাখবেন। নোরা দু'হপ্তার ভেতর চলে আসবে–ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

'নোরা জানে, এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার?' রানা অবাক।

'স্যার ট্যাফোর্ড আমাদেরকে জানিয়েছেন উবোমোয় তাঁর কাজ নিয়ে আসছ তুমি।'

'ভদ্রলোককে চেনো তুমি?'

'আফ্রিকায় সবাই টাফ ট্যাফোর্ডকে চেনে। সুপ, জুস, মধু–প্রতিটি পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে রেখেছেন। তোমার ওপর একটা চোখ রাখার জন্যে অনুরোধ করেছেন ভদ্রলোক। তোমার কাজ সম্পর্কেও বলেছেন। সিমন সাফারির ওপর ছবি তুলতে যাচ্ছ তুমি, তাই না? প্রেসিডেন্ট আর স্টার-এর ইমেজ যাতে সুন্দর দেখায়, ঠিক?'

'ব্যাপারটা আরও একটু জটিল, মাইকেল।'

'জটিলতা তো থাকতেই হবে, যেখানে মাসুদ রানা জড়িত।' রানাকে টেনে লনের নিরিবিলি এক কোণে নিয়ে এল মাইকেল ডাফ। 'তার আগে বলো, সাফারিকে কেমন লাগছে তোমার?'

'এখুনি মন্তব্য করা কঠিন,' বলল রানা। 'তবে চারদিকে শুধু সামরিক অফিসারদের দেখছি–তারা সবাই হিটা, অথচ উহালিরা সংখ্যায় বেশি।'

'তুমি তো জানো না, উহালিদের উনি প্রকাশ্যে গালিগালাজ করেন–একজন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কেউ তা আশা করে না। শোনা যাচ্ছে, উহালিদের ওপর স্টীম রোলার চালাবার প্ল্যান করছেন তিনি। ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটা সমর্থন

করবে না। ভাল কথা, তোমার বন্ধুদের খবর শুনবে?'

'বন্ধু?'

'রেড ড্রাগন। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এখানে অপারেশন চালাবার জন্যে কাকে ওরা পাঠাচ্ছে।'

'চণ্ডমুণ্ড গণ্ড।' এ হতে বাধ্য, ভাবল রানা। সেজন্যেই উবোমোয় ওর আসা। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরেছে ও। এখানেই আবার চণ্ডমুণ্ড গণ্ডের সঙ্গে দেখা হবে ওর।

'তুমি আমার চিঠিগুলো ঠিকমত পড়েছ,' বলল মাইকেল ডাফ। 'আগামী হপ্তায় আসছেন তিনি। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আজকের মত আরেকটা পার্টি দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সাফারি। যে-কোন অজুহাত পেলেই হয়, পার্টি দিচ্ছেন। কি হলো, রানা? তোমার চেহারা এমন থমথমে হয়ে গেল কেন?'

'না, কিছু হয়নি।' কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিউইউই-এ ফিরে গিয়েছে রানার মন। চোখের সামনে ভেসে উঠল আলি শাহের বেডরূম। রুমানা আর তার মেয়েদের ক্ষতবিক্ষত শরীরগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল। স্মৃতিটা অসুস্থ করে তুলল ওকে।

বেশ অনেক রাতে শেষ হলো পার্টি। ফেরার সময় সোফিয়াকে অনেক খুঁজেও পেল না রানা। বাধ্য হয়ে ল্যাণ্ডরোভারে উঠে বসল একা। জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না, ক্যাপটেন শোলই যেচে পড়ে তথ্যটা দিল ওকে। 'মিস সোফিয়া ক্যারলকে দেখলাম সরকারী একটা মার্সিডিজে চড়ে কোথায় যেন গেলেন, তা প্রায় এক ঘণ্টা আগের ঘটনা।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। ক্ষীণ আশা ছিল গেস্ট হাউসে ফিরে দেখবে নিজের কামরায় শুয়ে আছে সোফিয়া, কিন্তু হতাশ হতে হলো। সোফিয়ার কামরায় তালা ঝুলছে।

নিজের কামরায় ফিরে রাত জেগে বসে থাকল রানা। মেয়েটা গেল কোথায়!

আরও দু'ঘণ্টা পর, রাত প্রায় তিনটের দিকে গাড়ির শব্দ পেল রানা। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নীল একটা মার্সিডিজ থেকে নামছে সোফিয়া। টলতে টলতে বারান্দায় উঠল সে। মার্সিডিজ বেরিয়ে গেল গেট পেরিয়ে।

দরজা খুলে বারান্দায় বেরুল রানা। 'দাঁড়াও,' ডাকল ও।

দাঁড়াল সোফিয়া, টলছে। 'কে, রানা নাকি?'

'কি ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছ, তোমার ধারণা আছে, সোফিয়া?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইল রানা। 'এটা আফ্রিকা। চার অক্ষরের যে শব্দটার কথা ভাবছ তুমি ওটা ছাড়াও আরও একটা শব্দ আছে–এইডস। এখানে বড় বেশি ছড়ায় ওটা।'

'নিজের চরকায় তেল দাও, রানা। আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।' কামরার তালা খুলল সোফিয়া, ভেতরে ঢুকে রানার দিকে ফিরল। 'দেয়ার মত অনেক কিছু আছে আমার, রানা। এ-কথা বলতে পারবে না যে তোমাকে আমি বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছি। তোমার বোঝা উচিত ওপরে ওঠার সুযোগ পেলে আমার মত মেয়ে ছাড়ে না। তবু এখনও তোমার প্রতি আমি সদয়। ইচ্ছে হলে ভাগ বসাতে পারো। চাও, রানা?'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে এল নিজের কামরায়।

পরদিন সকালে তিনজন সৈনিকসহ ক্যাপটেন শোল এল ওদেরকে নিয়ে যেতে। রানার ওপর এখনও রেগে আছে সোফিয়া, ট্রাকের ক্যাবে ক্যাপটেনের পাশে বসল সে। রানা থাকল সশস্ত্র হিটা সৈনিক ও ভিডিও ইকুইপমেন্টের সঙ্গে পিছনে।

রাজধানী কাহালি রানা আগেরবার যেমন দেখেছে তেমনই আছে। চওড়া রাস্তাগুলো খানা-খন্দে ভরা, মেরামত করা হয়নি। পুরানো ওয়েস্টার্ন ছবিতে যে-ধরনের বাড়ি-ঘর দেখা যায়, এখানেও তাই দেখছে ও। তবে চোখে পড়ার মত ব্যাপার হলো, দোকান-পাটগুলোয় বসে আছে হিটারা–আগে ওখানে দেখা যেত উহালিদের। তারপর খেয়াল করল রানা, ফুটপাতেও প্রায় একই দৃশ্য। উহালিরা যেন হঠাৎ করে রাজধানী থেকে গায়েব হয়ে গেছে। দু'চারজন যা-ও আছে, তাদেরকে ভিখারি বা ভবঘুরে বলে মনে হলো রানার।

জেটিতে এসে গানবোটে চড়ল ওরা। ভিডিও ইকুইপমেন্টগুলো তুলে দিল নীল ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন নাবিক। নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাপটেন করমর্দন করল রানার সঙ্গে। 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, যেখানে বলবেন সেখানে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে, মি. মাসুদ রানা।'

বন্দর ছেড়ে উত্তর দিকে ছুটল গানবোট, লেক-এর তীর ঘেঁষে। ফোরডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা, গাঢ় নীল পানির ওপর রোদের খেলা দেখছে। মুখে জলকণার ছিটা, পশ্চিম দিকে তাকাল ও। চাঁদের পাহাড়, রোমান্টিক একটা নাম। কিন্তু না, নীলচে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে, দেখা গেল না। গানবোটের খোলা ব্রিজ-এর দিকে তাকাল ও। ছবি তুলছে সোফিয়া। কাঁধের সনি ক্যামেরা তীরের দিকে তাক করেছে সে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে মনে প্রশংসা করল মেয়েটার। আর যা-ই হোক, কাজের প্রতি আন্তরিকতা আছে। সত্যিকার প্রফেশনাল।

ব্রিজের নিচে চার্টরূমে ঢুকল রানা। স্টার ওকে সার্ভে ম্যাপ সরবরাহ করেছে, সেটা মেলে ধরল টেবিলে। হোটেল আর ক্যাসিনোর জন্যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে কাহালি বন্দর থেকে সাত মাইল দূরে। রানা চওড়া একটা খাঁড়ি দেখল, প্রবেশপথটা পাহারা দিচ্ছে একটা দ্বীপ। উবোমো নদী, বরফ ঢাকা পাহাড় থেকে নেমে ও গভীর বনভূমি পেরিয়ে, ওই খাঁড়িতে এসে মিলিত হয়েছে। ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। এখানে একটা হলিডে কমপ্লেক্স দারুণ ব্যবসা করবে। রানার দৃষ্টিতে একটাই সমস্যা ধরা পড়ল। খাঁড়ির পাশে বিরাট একটা জেলে পাড়া রয়েছে। জংলী আফ্রিকানদের সঙ্গে সৈকত ব্যবহার করতে রাজি হবে না ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টরা। স্যার ট্যাফোর্ড বা চণ্ডমুণ্ড গণ্ড এ-ব্যাপারে কি ভেবেছেন কে জানে! তবে হলিডে কমপ্লেক্সের নামটা এরইমধ্যে ঠিক করা হয়েছে–ছায়া ঢাকা সৈকত।

ওপর থেকে ডাকল ক্যাপটেন। চার্টরূম থেকে বেরিয়ে খোলা ডেকে উঠে এল রানা। ছায়া ঢাকা সৈকত নামটা কেন রাখা হয়েছে বুঝতে পারল ও। খাঁড়ির মুখে দ্বীপটা ঘন বনে ঢাকা। লেকের মিষ্টি স্বচ্ছ পানি পেয়ে মেহগনি গাছগুলো

আকাশের অনেক উঁচুতে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আকাশে বাসা বেঁধেছে
অসংখ্য ঈগল পাখি, প্রায় প্রতিটি ডালে বসে থাকতে দেখা গেল ওগুলোকে।
রাবারের ভেলায় চড়ে দ্বীপটায় নামল ওরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঈগল
পাখিদের ছবি তুলল ওরা, তারপর ফিরে এল গানবোটে। আবার ছুটল গানবোট।
খাঁড়ির তিন দিকে নিরেট পাথরের পাহাড়-প্রাচীর, সরাসরি পানি থেকে মাথাচাড়া
দিয়েছে, অদ্ভুত রোমাঞ্চকর লাগল দেখতে। উবোমো নদীর মুখে জেলেদের
গ্রামটাও দেখতে পেল রানা। পনেরো বিশটা মাছ ধরার নৌকা বাঁধা রয়েছে।
সৈকতে খেলা করছে উলঙ্গ ছেলেরা। এক ধারে জাল শুকাতে দেয়া হয়েছে।
আবার রাবারের ভেলায় চড়ল ওরা, এবার নামল উবোমো নদীর মুখের
কাছাকাছি সৈকতে। সোফিয়াকে জেলেদের গ্রামের ছবি তোলার নির্দেশ দিল
রানা। 'এই গ্রামটার কি হবে?' পাহাড়-প্রাচীরে উঠে আসার পর জিজ্ঞেস করল ও।
'ক্যাপটেন হয়তো বলতে পারবে,' জবাব দিল সোফিয়া। 'গানবোটে ফিরে
জিজ্ঞেস কোরো।'
কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। দিগন্তের কাছাকাছি লাল ধুলো
উড়ছে কেন? সোফিয়ার কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে টেলিফটো লেন্সে চোখ
রাখল ও। যানবাহনের একটা কনভয় এগিয়ে আসছে দেখে হার্টবিট বেড়ে গেল
ওর। 'আর্মি ট্রাক কনভয়,' বলল ও। 'সঙ্গে ট্র্যান্সপোর্টার···ওপরে রয়েছে
বুলডোজার! মাই গড!' ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিল ও। লেন্সে চোখ রেখে সোফিয়াও
দেখল দৃশ্যটা।
'কোন ধরনের সামরিক অভিযান, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, রুদ্ধশ্বাসে।
'তুমি চাও, ছবি তুলি আমি?'
'প্রেসিডেন্ট সাফারি আমাদের দলে, কাজেই ভয় পাবার কোন কারণ নেই–
তোলো!'
দৃশ্যটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নিষ্ঠুর। কনভয়টা আসছে দেখে বাচ্চা
ছেলেমেয়েরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। গ্রামের সব পুরুষ জড়ো হলো এক
জায়গায়, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, থরথর করে কাঁপছে। হিটা
অফিসার নির্দেশ দিল, সৈনিকরা ঘিরে ফেলল পুরুষদের। পাহাড়-প্রাচীর থেকে
অফিসারের গলা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। সরকারের তরফ থেকে অভিযোগ
করছে সে, উহালিদের এই গ্রামে রাষ্ট্রদ্রোহী দুষ্কৃতকারীরা লুকিয়ে আছে। তারা
সরকারকে উৎখাত করার জন্যে তৎপরতা চালাচ্ছে। কাজেই সরকার সিদ্ধান্ত
নিয়েছেন দেশের উন্নতি ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে এই গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা
হবে জেলেদের। তাদেরকে নতুন জায়গা দেয়া হবে গভীর বনভূমিতে, যেখানে
তারা চাষাবাদ করে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।
এরপর কয়েক পশলা ফাঁকা গুলি করা হলো। হিটা সৈনিকরা বাড়ি-ঘরের
দরজা ভাঙছে, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনছে উহালি তরুণীদের। ঠেলা-ধাক্কা
দিয়ে ট্রাকের ওপর তোলা হচ্ছে তাদের। গ্রামের শেষ প্রান্তের কয়েকটা ঘরে
প্রথম আগুন দেয়া হলো। হাহাকার করে উঠল জেলেরা, কয়েকজন মৃত্যু ভয়কে
উপেক্ষা করে ছুটে গেল সেদিকে। এই সময় আবার গর্জে উঠল এ/কে

ফরটিসেভেন। এবার সরাসরি টার্গেট প্র্যাকটিস। মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল
তিনজন জেলে।
'গড! ওহ্ গড!' ছবি তোলার ফাঁকে বিড়বিড় করছে সোফিয়া। 'এ ছবি
ইউরোপে দেখাতে পারলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, রানা!'
জবাব দেবে কি, নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করছে রানা। উবোমোর সামরিক
বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি নেই ওর। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া
কি-ই বা করতে পারে। গ্রামের একটা দিক বুলডোজার দিয়ে সমান করা হলো,
সৈনিকদের অপর একটা দল এসে আগুন ধরিয়ে দিল ধ্বংসস্তূপে। জেলেরা যারা
পালাবার চেষ্টা করল, খুব কমই, কুকুরের মত গুলি করে মারা হলো তাদের।
শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। সব মিলিয়ে মাত্র পঁয়ত্রিশ
মিনিট লাগল। জেলেদের নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল আর্মি কনভয়।
'ভাগ্য ভাল যে ফিল্ম শেষ হয়নি, সবটুকু বন্দী করা গেছে ক্যামেরায়,' বলল
সোফিয়া। 'রানা, ক্যাপটেন সোল!'
সোফিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা দেখল, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছে
ক্যাপটেন, এখনও আধ মাইল দূরে সে।
'এটা ডিনামাইট, সোফিয়া,' বলল রানা। 'কারও জানা চলবে না ছবি তুলেছি
আমরা।' পাহাড়ের কিনারা থেকে পিছিয়ে এল ও, দেখাদেখি সোফিয়াও।
'না,' একমত হলো সোফিয়া।
'টেপটা আমাকে দাও,' বলল রানা। 'বলা যায় না, চেক করে দেখতে পারে
ওরা তুমি ছবি তুলেছ কিনা।'
ক্যামেরা থেকে টেপটা খুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোফিয়া। জার্সির সঙ্গে
জড়িয়ে ওর ব্যাগের ভেতর দিকে গুঁজে রাখল রানা ওটা। 'এবার চলো, শোল
ব্যাটা দেখে ফেলার আগেই সরে যাই এখান থেকে।'
ভিডিও ইকুইপমেন্ট তুলে নিয়ে রানাকে অনুসরণ করল সোফিয়া। গ্রামের
দিকে না নেমে নির্জন সৈকতের দিকে নামছে ওরা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অর্ধেক
পথও নামেনি ওরা, ঢালের মাথায় ক্যাপটেন শোলকে দেখা গেল। চিৎকার করে
ওদেরকে থামতে বলছে সে।
'আমরা ছবি তুলেছি কিনা জানে না,' বলল রানা। 'চিন্তায় প্যান্ট খারাপ
করার অবস্থা হয়েছে ওর।'
দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এল ক্যাপটেন শোল। 'কোথায়
ছিলেন আপনারা?' কর্কশকণ্ঠে জানতে চাইল সে।
'ক্যাসিনো সাইট-এর ছবি তুলছিলাম। এখন যাচ্ছি নদীর মুখে হোটেল
সাইট-এর ছবি তুলতে, জেলেদের গ্রামে···।'
'না-না, যথেষ্ট হয়েছে!' রানার বাহু আঁকড়ে ধরল ক্যাপটেন শোল। 'আর
ছবি তোলার দরকার নেই। আজকের মত শেষ করুন।'
ঝাপটা দিয়ে হাতটা সরাল, তারপর কিছুক্ষণ তর্ক করল রানা। এক সময়
কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনে নিল, অনুসরণ করল ক্যাপটেনকে। গানবোটে চড়ল ওরা।
খোলা ব্রিজে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে আলাপ করল

শোল। তীরের দিকে ক্যামেরা তাক করে ছবি তুলতে যাচ্ছে সোফিয়া, ছুটে এসে বাধা দিল সে। 'না, ছবি তুলবেন না। গ্রামের ছবি তুলবেন না!'

'কেন?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'দাবাগ্নির ছবি তুলতে অসুবিধে কি?'

'না! হ্যাঁ! দাবাগ্নিই। কিন্তু এটা ক্লাসিফায়েড ম্যাটার।' সোফিয়ার হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিল সে।

'আ টপ সিক্রেট বুশ ফায়ার?' হেসে উঠল রানা।

সন্ধের দিকে জেটিতে ভিড়ল গানবোট। ভিডিও ক্যামেরা ও অ্যালুমিনিয়াম কেস, যেটার ভেতর টেপ থাকে, দুটোই থাকল ক্যাপটেন শোলের দখলে। তার সঙ্গে তর্ক করল সোফিয়া, হুমকি দিয়ে বলল প্রেসিডেন্ট সাফারিকে রিপোর্ট করবে সে, তবে কোন কাজ হলো না। গেস্টরুমে খালি হাতেই ফিরতে হলো তাকে।

পরদিন সকালে গেস্টরুমে এল ক্যাপটেন শোল। ক্ষমা চাইল সে, ফিরিয়ে দিল ইকুইপমেন্টগুলো। সে চলে যাবার পর রানা বলল, 'আমার ব্যাগটা সার্চ করার কথা ভুলে গেছে ওরা। তবে এখানে ওটা নিরাপদ নয়, সোফিয়া।'

'কি করবে বলে ভাবছ?'

'চলো ব্রিটিশ অ্যামব্যাসিতে রেখে আসি ওটা।'

'তুমি যাও, আমার এনগেজমেন্ট আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'সম্ভবত তোমার নতুন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, তাই না? সাবধান, সোফিয়া। ভদ্রলোককে তুমি যা ভাবছ উনি তা নন।'

'সাফারি একজন সম্মানী মানুষ,' ফোঁস করে উঠল সোফিয়া। 'ওই সামরিক অভিযান সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তুমি যা খুশি বিশ্বাস করতে পারো, তবে টেপটার কথা কাউকে বোলো না। এমনকি স্যার ট্যাফোর্ডকেও না।'

স্থির পাথর হয়ে গেল সোফিয়া। সমস্ত রক্ত এক নিমেষে নেমে গেছে মুখ থেকে। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'নাইরোবি থেকে তুমি তাঁর বাড়িতে ফোন করেছিলে, আমি জানি, সোফিয়া। আমার ওপর চোখ রাখার জন্যে কত টাকা পাচ্ছ তুমি?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এল রানা। টেপটা আগেই বুশ জ্যাকেটের পকেটে ভরে নিয়েছে, যাচ্ছে ব্রিটিশ এমব্যাসীতে।

প্রেসিডেন্ট সাফারির ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা পাহারা দিচ্ছে ব্রিটিশ দূতাবাস। নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে অভ্যর্থনা জানাল মাইকেল ডাফ।

'মর্নিং, স্যার মিকি।'

'নটি বয়। কাল রাতে নোরার সঙ্গে ফোনে কথা হলো, সবকিছুর আগে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল তুমি কেমন আছ!'

'আসছে কবে?'

'আমার শ্বাশুড়ি অসুস্থ, কাজেই আসতে আরও কয়েক হপ্তা সময় নেবে ও।' রানাকে নিয়ে নিজের অফিস কামরায় ঢুকল মাইকেল ডাফ, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। 'তোমার জন্যে খবর আছে হে। চীনা ভদ্রলোক পৌঁছে গেছেন

স্টার-এর এক্সিকিউটিভ জেট আজ সকালে ল্যাণ্ড করেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টার-এর হেডকোয়ার্টার, লেক হাউসে চলে গেছেন তিনি—সিণ্ডিকেট-এর হেড হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে। শুক্রবার রাতে তাঁর সম্মানে পার্টি দিচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাফারি।'

'ভদ্রলোককে আবার দেখার জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছি আমি,' বলল রানা। 'তোমার সময় নষ্ট করব না। কথাটা বলেই ফেলি। তোমার ব্যক্তিগত সেফে আমার একটা টেপ রাখতে পারবে?'

'বেশি কথা না বলে কি দেবে দাও।' সীল করা এনভেলাপটা রানার কাছ থেকে নিয়ে স্ট্রংরুমে ভরে রাখল মাইকেল ডাফ।

দশ

সাইরেন বাজিয়ে মোটরসাইকেল এসকর্ট ঢুকে পড়ল প্রেসিডেন্ট ভবনে। পিছনে রয়েছে কালো একটা মার্সিডিজ। লেক হাউস থেকে সম্মানিত মেহমানকে আনার জন্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পাঠিয়েছিলেন ওটাকে। গাড়ি থেকে লাল গালিচায় নামলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। সামরিক অফিসাররা পথ দেখিয়ে চওড়া বারান্দায় নিয়ে এল তাঁকে, যত্ন করে বসাল একটা আর্মচেয়ারে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসলেন প্রেসিডেন্ট সাফারি।

'আমি চেয়েছি, আমাদের প্রথম সাক্ষাৎটা অনানুষ্ঠানিক হবে,' বললেন তিনি। 'সেজন্যেই আমার মিসট্রেসদের কাউকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মি. গণ্ড।'

'অফকোর্স, ইওর এক্সেলেন্সী।' অরেঞ্জ জুস-এর গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আপনার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি।'

'স্যার ট্যাফোর্ড আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আমার কাছে। তিনি এমন একজন মানুষ, যাঁর কথায় গুরুত্ব দিই আমি।'

পরবর্তী প্রায় দশ মিনিট প্রশংসা ও পাল্টা প্রশংসা চলল, তারপর পকেট থেকে মোটা একটা এনভেলাপ বের করে প্রেসিডেন্টের দিকে বাড়িয়ে দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমার বাবা এবং আমি চাই, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি জানুন যে আপনার দেশের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি অটল থাকবে। আমি আশা করব, এটা আপনি বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করবেন।'

সিমন সাফারি জানেন, এনভেলাপটায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা রয়েছে। প্রথম কিস্তি দেয়া হয়েছে প্রায় দশ মাস আগে। মোট কত টাকা দেয়া হবে সেটা কঠিন দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ব্যবসা হাত করার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম ছিল না, তবে স্টার ও রেড ড্রাগন সিণ্ডিকেট হাতিয়ে নিয়েছে কাজগুলো। স্যার ট্যাফোর্ড-এর প্রভাব এক্ষেত্রে কাজ করেছে জাদুর মত।

এনভেলাপ খুলে দুটো ডকুমেন্ট বের করলেন প্রেসিডেন্ট। একটা হলো

সুইটজারল্যাণ্ডের এক ব্যাংকে জমা দেয়া টাকার রসিদ। দশ মিলিয়ন ইউএস ডলার, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। অপরটা হলো ট্রান্সফার ডকুমেন্ট। রেড ড্রাগন সিণ্ডিকেটের শতকরা ত্রিশ ভাগ শেয়ার এখন সিমন সাফারির নামে। সিণ্ডিকেটের আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয়েছে 'দা উবোমো ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন'।

কাগজগুলো আবার ভরে এনভেলাপটা স্পোর্টস শার্টের পকেটে রেখে দিলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'কাজ কিন্তু খুব ঢিমে তালে এগোচ্ছে, মি. গণ্ড। আশা করি আপনি আসার পর পরিস্থিতি বদলাবে।'

'আমার ফিল্ড ম্যানেজার হপ্তাখানেক আগে কাহালি পৌঁছেছে,' বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'কাজ যে এগোচ্ছে না, সে রিপোর্ট তার কাছ থেকে পেয়েছি আমি। এর জন্যে দায়ী মি. ডানকান, স্টার থেকে পাঠানো ফিল্ড ম্যানেজার। তাকে লণ্ডনে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দায়িত্ব এখন আমার ফিল্ড ম্যানেজারের ওপর। এবার দেখবেন কাজ কেমন এগোয়। তবে, তার রিপোর্ট থেকে জানলাম, সমস্যা হলো লেবার। কথা ছিল, ত্রিশ হাজার শ্রমিক দেয়া হবে। কিন্তু এ-পর্যন্ত পেয়েছি মাত্র দশ হাজার।'

'আগামী মাসের শুরুতে পাবেন ওদের,' কথা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আর্মিকে নির্দেশ দিয়েছি, রাজনৈতিক বন্দী আর উহালি ভবঘুরেদের ধরে সাইটে নিয়ে যেতে হবে।'

চণ্ডমণ্ড গণ্ড হাসলেন। 'আমার ফিল্ড ম্যানেজার জানিয়েছেন, উহালিরা শ্রমিক হিসেবে খুব ভাল। খেতে না দিলেও কিছু বলে না।'

সিমন সাফারিও হাসলেন। 'ওরা হিটাদের মত তিনবেলা খেয়ে অভ্যস্ত নয়। উহালিরা নিকৃষ্ট উপজাতি, বেঁচে থাকার উপকরণ ব্যবহার করতে শেখেনি এখনও, কাজেই খুব কম মজুরি দিলেই চলে।'

'ঠিক এরকম লোকই দরকার আমাদের।'

'এবার ছায়া ঢাকা সৈকত হলিডে কমপ্লেক্স প্রসঙ্গ। মি. ডানকানকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়ার পরদিনই এলাকাটা খালি করা হয়েছে। জেলেদের একটা গ্রাম, দুষ্কৃতকারীরা আস্তানা গেড়েছিল। চারশো লোককে ধরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে জঙ্গলে—আপনার লেবারদের সঙ্গে যোগ দেবে তারা।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট,' হাতঘড়ি দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, এবার আমাকে উঠতে দিন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'উঠবেন কি! আপনি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন, মি. গণ্ড। লাঞ্চে আরেকজন মেহমান আছেন আমার, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপনি খুশি হবেন বলেই আমার ধারণা। ভদ্রমহিলা একটা ফিল্ম টিমের সদস্যা। ওদেরকে ভাড়া করেছেন স্যার ট্যাফোর্ড।'

'হ্যাঁ, স্যার ট্যাফোর্ড বাবাকে বলেছেন বটে—উবোমোয় তিনি একটা ফিল্ম কোম্পানীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের অপারেশন সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের ভাল-মন্দ কিছু না জানাটাই নিরাপদ। প্রজেক্টটা বাতিল করে দেব আমি, ওদেরকে উবোমো ছেড়ে চলে যেতে বলব।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব বা উচিত হবে?' পরবর্তী দশ মিনিট যুক্তি দিয়ে চণ্ডমণ্ড

গণ্ডকে বোঝানো হলো, ফিল্ম ইউনিটটাকে উবোমোয় কাজ করতে দিলে কি লাভ।

তারপর ক্যাপটেন শোল প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌঁছে দিয়ে গেল সোফিয়া ক্যারলকে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। চণ্ডমণ্ড গণ্ডও সম্মান দেখিয়ে দাঁড়ালেন। প্রেসিডেন্ট লক্ষ করলেন, সোফিয়ার দিক থেকে ভদ্রলোক চোখ ফেরাতে পারছেন না। ব্যাপারটা সোফিয়াও লক্ষ করল।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ড উবোমো ডেভলপমেন্ট করপোরেশন-এর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, টেকনিক্যালি তোমার বস্, সোফিয়া।'

গা দুলিয়ে হেসে উঠল সোফিয়া। 'ভেরি গুড, মি. প্রেসিডেন্ট।' চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকাল সে। 'হাই, বস্! আমার প্রথম রিপোর্ট, ছবি তোলার কাজ চমৎকার এগোচ্ছে। রাজধানী কাহালি আর লেকের ওপর কাজ করছি আমরা। নতুন হোটেল আর ক্যাসিনো সাইট-এর ছবি তোলার কাজ আগেই শেষ করেছি…।'

'এরপর কোথায় যাবেন আপনারা?' জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন সোফিয়ার স্তনযুগল তাকে জাদু করেছে।

'এরপর যাব ফরেস্টে। এলাকাটার নাম শেঙ্গি শেঙ্গি—শেঙ্গি শেঙ্গি ঠিক আছে, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'ঠিক আছে, মাই ডিয়ার মিস সোফিয়া।'

'আপনারাও চলুন না, স্যার! প্লীজ!' ছোট্ট মেয়ের মত আবদার শুরু করল সোফিয়া। 'আপনারা গেলে, স্যার, ব্যাপারটা সাংঘাতিক গুরুত্ব পাবে।'

'আমি খুব ব্যস্ত একজন মানুষ, মিস সোফিয়া,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'চিন্তা করে দেখুন, মি. প্রেসিডেন্ট,' জেদ ধরল সোফিয়া। 'আপনার ব্যক্তিগত ইমেজ ও উবোমো, দুটোর জন্যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের লোক জানবে, সব কাজ আপনি নিজে তদারক করছেন। তাছাড়া, এত সুন্দর চেহারা আপনার, টিভিতে আপনার আসা দরকার।'

প্রশংসায় গলে গেলেন সিমন সাফারি। 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন, ভেবে দেখব…।'

'আপনি হেলিকপ্টার নিয়ে শেঙ্গি শেঙ্গিতে নামবেন, মি. প্রেসিডেন্ট। মাত্র আধবেলার ব্যাপার, তার বেশি লাগবে না—অবশ্যি আপনি যদি দু'একদিন ওখানে থেকে যেতে চান তাহলে আলাদা কথা। আগেই বলে রাখি, আমার তাতে কোন আপত্তি থাকবে না।'

চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও প্রেসিডেন্ট সাফারি পরস্পরের দিকে একবার তাকালেন।

কাহালি থেকে রওনা হলো রানা ও সোফিয়া, সঙ্গে বরাবরের মত ক্যাপটেন শোল। দূরত্ব দুশো মাইলের সামান্য বেশি হলেও পৌঁছুতে দু'দিন লেগে গেল ওদের। ছবি তোলার জন্যে পথে অনেক জায়গায় থামতে হলো। হিটা উপজাতিদের গ্রাম দেখলেই ল্যাণ্ডরোভার থামাবার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন শোল। রানা অনুরোধ করল উহালিদেরও ছবি তোলা হোক, কিন্তু ওর কথায় কান দিল না সে। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ব্যাখ্যা দিল, 'যা কিছু সুন্দর ও মার্জিত, তাই

একটা দেশ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। হিটারা সুন্দর, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে, কাজেই ওদের ছবি আপনাকে তুলতেই হবে। কিন্তু উহালিরা এখনও অনেক পিছিয়ে, আর পিগমিদের তো এখনও বন্য প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়। ওদের ছবি দেখলে দুনিয়ার লোকের কাছে আমাদের মুখ থাকবে-না।'

হিটারা যে সুন্দর তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তরুণ ও তরুণীরা। সোফিয়া দারুণ উৎসাহের সঙ্গে ওদের ছবি তুলল।

মেইন রোডে উঠে এল ওরা। উল্টোদিক থেকে অসংখ্য ট্রাক আর লগিং ট্রেইলর আসছে। বারোটা বেজে গেছে রাস্তার, লালচে মিহি ধুলোয় আশপাশের এলাকা ঢাকা পড়ে আছে সারাক্ষণ। অবশ্য মেরামতের কাজও চলছে। শ্রমিকরা সবাই উহালি উপজাতির লোক।

দ্বিতীয় দিন ফেরি পেরোলো ওরা, পৌঁছে গেল বিশাল বনভূমির কিনারায়। বৃক্ষ সারির দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেখে এমন কি সোফিয়াও স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'ওগুলো যেন খুঁটি, আকাশটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছে,' বনভূমির দিকে ক্যামেরা তাক করে বলল সে।

মেইন হাইওয়ে ধরে ছুটল ল্যান্ডরোভার, রাস্তার দু'পাশে এক মাইল খোলা ঘাসজমি। পঞ্চাশ মাইল এগোবার পর নতুন রাস্তায় পড়ল গাড়ি, বনভূমি কেটে সদ্য তৈরি করা হয়েছে। বনভূমির যত ভেতরে ঢুকল ওরা, দেখল রাস্তার দু'পাশে ক্রমশ সরে এসেছে গাছের সারি, তারপর এক সময় দু'পাশের শাখা-প্রশাখা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো, গাড়ি ছুটল সবুজ টানেলের ভেতর দিয়ে।

উল্টোদিক থেকে এখনও ট্রাক ও ট্রেইলর বহর আসছে। রাস্তা মেরামতের কাজও চলছে পুরোদমে। এদিকটায় শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি।

'কারা ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কয়েদী,' ক্যাপটেন সোলের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর। 'বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর চেয়ে সমাজের কাজে লাগাচ্ছি আমরা ওদেরকে।'

'এত ছোট একটা দেশে এত বেশি কয়েদী?' রানা বিস্মিত। 'উবোমোয় তাহলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ভাল নয়।'

'উহালিরা চোর, ডাকাত, লম্পট আর খুনী,' ঘৃণায় হিসহিস করে উঠল শোল। 'এই এলাকাটাই অভিশপ্ত। বাস করে শুধু বাঁদর আর তাদের আত্মীয়স্বজন—বামবুটি পিগমিরা।' শব্দ করে থুথু ফেলল সে।

'আমরা কি পিগমিদের দেখতে পাব?' আগ্রহ দেখাল সোফিয়া।

'পোষ মানা কিছু দেখতে পাবেন রাস্তায় কাজ করছে। ওদের বউ-ঝিদেরও দেখতে পাবেন, ট্রাক ড্রাইভারদের দেহদান করছে। তবে বুনোগুলো জঙ্গলের অধিবাসী, কেউ তাদেরকে দেখতে পায় না।' শিউরে মত উঠল হিটা ক্যাপটেন। 'এই জায়গাটাকে আমি ঘৃণা করি। সমস্ত গাছ কেটে বিক্রি করে দেয়া হবে, তারপর ফাঁকা জায়গায় ঘাস গজানো হবে, যাতে গরু-মোষের সংখ্যা বাড়ে।'

'কিন্তু গাছ কেটে ফেললে তো বৃষ্টি হবে না, আর বৃষ্টি না হলে শুকিয়ে যাবে নদী ও লেক। প্রকৃতির সমস্ত জিনিস একে অপরের ওপর নির্ভর করে। আপনি

যদি একটাকে নষ্ট করেন, আসলে সবগুলোকে নষ্ট করা হবে সেটা।'

'আরে রাখেন আপনার লেকচার। উহালিদের জঙ্গল কেটে সাফ করলে বৃষ্টি হবে না, এ একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হলো?'

অবশেষে ওরা শেঙ্গি শেঙ্গিতে পৌঁছুল। বনভূমির মাঝখানে একটা বসতি গড়ে উঠেছে। বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তবে ছোট গাছ আর ঝোপ-ঝাড় কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্যে আলাদা দোচালা, পাশেই মেশিন-ওঅর্কশপ। আরেক পাশে প্রশাসনিক ভবন। মেইন অফিস বিল্ডিঙের সামনে ল্যান্ডরোভার থামল। ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠল ওরা। শোল বলল, 'আসুন, ইউডিসি-র ফিল্ড ম্যানেজারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'ইউডিসি মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উবোমো ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন,' বলল ক্যাপটেন, তারপর আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওরা রিসেপশনে ঢুকতেই ফিল্ড-ম্যানেজারের সেক্রেটারি মেয়েটা টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে তাকাল।

বিশ-বাইশ বছরের হিটা তরুণী, সম্ভবত কাহালি টেকনিক্যাল কলেজ থেকে সদ্য পাস করে বেরিয়েছে। পশ্চিমা সংস্কৃতি ভর করে আছে হিটা যুবসম্প্রদায়কে, এই মেয়েটিও তার ব্যতিক্রম নয়। জিনসের প্যান্ট আর হাফ-শার্ট পরে আছে সে। 'আপনারা নিশ্চয় ছবির লোকজন,' সোয়াহিলি ভাষায় বলল সে। 'আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'পৌঁছুতে দেরি করে ফেলেছি আমরা...,' শুরু করেও থেমে গেল ক্যাপটেন। ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফিল্ড-ম্যানেজার, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা।

'শেঙ্গি শেঙ্গিতে স্বাগতম,' বলল সে, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। 'আপনাদের না গতকাল পৌঁছুনোর কথা?'

রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন শোল, সে তার ছ'ফুটের ওপর দৈর্ঘ্য নিয়ে ফিল্ড ম্যানেজারের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে রানাকে। এতক্ষণে একপাশে সরে দাঁড়াল সে, ফিল্ড ম্যানেজার আর রানা এবার সামনাসামনি হলো।

দাড়িঅলা শিখ এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন কাঁচের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে।

'মি. চাখার সিং,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'আবার আপনাকে দেখব বলে আশা করিনি। দারুণ খুশি লাগছে আমার।'

'আপনারা পরস্পরকে চেনেন?' জানতে চাইল ক্যাপটেন শোল। 'বাহ, ভারি মজা তো!'

'আমরা পুরানো বন্ধু,' জবাব দিল রানা। 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের দু'জনেরই আগ্রহ আছে, এই যেমন হাতি আর চিতা।' মুখে হাসি, চাখার সিং-এর দিকে হাত বাড়াল ও। 'আপনি আছেন কেমন, মি. চাখার? শেষবার যখন দেখা হলো আমাদের, আপনি একটা দুর্ঘটনায় ভুগছিলেন, তাই না?'

সাদা হয়ে গেছে চাখার সিং-এর চেহারা, তবে অনেক কষ্টে হলেও বিস্ময়ের

ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে সে। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল তার, রানার মনে হলো লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরমুহূর্তে রানার হাতটা গ্রহণ করল সে, চেষ্টা করল হাসতে–দেখে মনে হলো একটা পশু দাঁতে দাঁত ঘষছে।

হাত বাড়াল সে, তবে বাম হাতটা। তার ডান দিকের আস্তিন খালি, ভাঁজ করে ওপরে তোলা হয়েছে, তারপর আটকানো হয়েছে পিন দিয়ে। তার দাড়ি এখনও আগের মত লম্বা, মোচড় খাইয়ে তোলা হয়েছে পাগড়ির দিকে। পাগড়িটাও আগের মত ধবধবে সাদা।

'সত্যি, দারুণ খুশির ব্যাপারই বটে, মি. মাসুদ রানা, আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো,' বলল চাখার সিং। 'সদয় সহানুভূতি জানাবার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। দ্রুত সেরে উঠেছি আমি, শুধু একটা বাহু হারাতে হয়েছে। তবে এর জন্যে যে দায়ী তার কাছ থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করব আমি।'

রানার হাতটা ধরেই ছেড়ে দিল সে, সোফিয়া আর ক্যাপটেনের দিকে ফিরল। ওদের সঙ্গে কথা বলার পর আবার রানার দিকে তাকাল সে, এখন আর হাসছে না। 'আপনি তাহলে আমাদের সবাইকে ফিল্মস্টার বানিয়ে ছাড়বেন, তাই না, মি. রানা? বেশ, বেশ।'

বিস্ময়ের ধাক্কা শিখ লোকটাকে যেমন লেগেছে, তেমনি রানাকেও লেগেছে। মাইকেল ডাফ ওকে বলেছিল বটে যে চিতার আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে চাখার সিং, তবে সেটা কয়েক মাস আগের কথা। তাছাড়া, উবোমোয় তাকে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি ও, শেষ বার যেখানে দেখা হয়েছিল সেখান থেকে হাজার মাইল দূরে। তবে একটু চিন্তা করতেই বুঝল রানা, আসলে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল ওর। কারণ ওর জানা আছে চণ্ডমণ্ড গণ্ড আর চাখার সিং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উবোমোয় যদি দায়িত্ব পালন করতে আসেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, সহকারী হিসেবে চাখার সিংকে তো তিনি আনতে চাইবেনই। চাখার সিংকেই তাঁর সবচেয়ে বেশি দরকার হবে উবোমোয়। বিভিন্ন দেশে এজেন্ট আছে শিখ লোকটার, নির্ঘাৎ উবোমোয়ও আছে। গোটা সেন্ট্রাল আফ্রিকার মাস্টার পোচার সে, জানে কাকে ঘুষ দিলে কাজ হবে, কাকে ভয় দেখালে।

চাখার সিং চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ছায়া হিসেবে থাকবে, এটা ভাবা উচিত ছিল ওর। বোঝা উচিত ছিল, লোকটা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। লোকটার চোখ দেখার দরকার নেই, ব্যাপারটা দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে ও।

শেঙ্গি শেঙ্গি থেকে কেটে পড়ার একটাই রাস্তা, বনভূমির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ওই রাস্তার প্রতিটি মাইল নিয়ন্ত্রণ করে কোম্পানী গার্ড ও অসংখ্য মিলিটারি রোড-ব্লক।

চাখার সিং ওকে খুন করার চেষ্টা করবে। এর কমে সন্তুষ্ট হবে না সে। নিজের কথা ভাবল রানা–ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই, কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবারও সম্ভাবনা নেই। গোটা মাঠ নিয়ন্ত্রণ করছে চাখার সিং, যে-কোন জায়গায় যখন খুশি আঘাত করবে সে।

রানার দিকে পিছন ফিরে সোফিয়া ও ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলছে চাখার সিং। 'একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে, কাজেই আজ আর আপনাদের নিয়ে বেরুচ্ছি না আমি। তাছাড়া, আপনাদের জন্যে সুখবর আছে। কাহালি প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এই মাত্র একটা ফ্যাক্স পেয়েছি–মহামান্য প্রেসিডেন্ট আসছেন শেঙ্গি শেঙ্গিতে, তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে আসছেন ইউডিসি-র এক্সিকিউটিভ অফিসার মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ড।'

***

নরপিশাচ-৩

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৪

এক

আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো।

ওদের জন্যে আলাদা কোয়ার্টার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল চাখার সিং-এর সেক্রেটারি। বিল্ডিংগুলোর ছাদে ঝমাঝম একটানা শব্দ করছে বৃষ্টি, ভিজে মাটি থেকে বাষ্প উঠছে প্রচুর—গোধূলির ম্লান আলোয় পাতায় ছাওয়া বনভূমিতে নীল ধোঁয়ার মত লাগছে।

ভবনগুলোর মাঝখানে কাঠের তক্তা ফেলে আসা-যাওয়ার পথ করা হয়েছে। সেক্রেটারি ওদের প্রত্যেককে একটা করে সস্তা প্লাস্টিকের ছাতা দিল।

অতিথিদের কোয়ার্টার মানে এক সারি ঘর—লম্বা একটা একচালাকে মাঝখানে পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরে একটা করে বিছানা, চেয়ার, ডেস্ক আর কাবার্ড। একচালার মাঝখানে সবার জন্যে একটাই বাথরুম।

নিজের কামরাটা সাবধানে পরীক্ষা করল রানা। দরজার তালা এতই বাজে মনে হলো, জোরে টান দিলে নির্ঘাৎ খুলে যাবে। তাছাড়া, ওর কোন সন্দেহ নেই, একটা চাবি অবশ্যই নিজের কাছে রেখেছে চাখার সিং। বিছানার ওপর মশারি তো আছেই, মশারির কাপড় দিয়ে তৈরি পর্দাও রয়েছে জানালায়। দেয়ালগুলো এত পাতলা, পাশের কামরায় ক্যাপটেন শোল-এর হাঁটাচলা পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল, সেঙ্গি সেঙ্গিতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে ওকে। ওকে সাহায্য করার কেউ নেই, ওর সঙ্গে কোন অস্ত্রও নেই। রানার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক বাঁকা হাসি, ভাবছে অসম এবং বিপজ্জনক একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ওকে খতম করার প্রথম চেষ্টাটা কখন করবে চাখার সিং। রানা তাকে চিতাবাঘের মুখে ছেড়ে আসায় একটা হাত হারিয়েছে বেচারা, সেই হাতের বদলে রানার প্রাণ তো কেড়ে নিতে চাইবেই সে। তবে, এখুনি হয়তো নয়। মঞ্চে চণ্ডমণ্ড গণ্ড না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে। তাছাড়া, প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি স্বয়ং প্রজেক্ট সাইট দেখতে আসছেন, তাঁর উপস্থিতিতে খুন-খারাবির মধ্যে যাবে বলে মনে হয় না। তবে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে আলাদা কথা।

সিনিয়র স্টাফদের মেসে ডিনার পরিবেশন করা হলো। দ্বিতীয় একটা একচালাকে বার ও ক্যানটিন হিসাবে সাজানো হয়েছে। সোফিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, তাইওয়ানিজ চীনা আর ইংরেজরা আগেই প্রায় সব চেয়ার দখল করে ফেলেছে। নিজেদের ভাষায় একযোগে কথা বলছে সবাই, সিগারেটের ধোঁয়ায় দম আটকে আসার অবস্থা। ওরা সবাই এঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান—চীনারা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের লোক, ইংরেজরা স্যার ট্যাফোর্ডের। ইউডিসি অর্থাৎ

উবোমো ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে যৌথ ব্যবসা শুরু করেছেন ওরা, উদ্দেশ্য দেশটাকে নিঙড়ে ছিবড়ে বানানো। প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারিও ওঁদের সঙ্গে মধু খাচ্ছেন, তিনিও প্রতিষ্ঠানটার গোপন অংশীদার।

ওরা ঢুকতে সবাই একবার করে রানার দিকে তাকাল বটে, তবে তাদের দৃষ্টি কেড়ে নিল উদ্ভিন্নযৌবনা সোফিয়া। ব্রিটিশরা টেবিলে বসে তাস খেলছে ও মদ্যপান করছে, তাদের কেউ কেউ শিসও দিল।

রানা লক্ষ করল, তাইওয়ানিরা আলাদা জায়গায় বসেছে। ওর মনে হলো, দুটো দলের মধ্যে ঠাণ্ডা একটা উত্তেজনার ভাব আছে। ওর সন্দেহ যে সত্যি সেটা প্রমাণিত হলো একজন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারের অভিযোগ শুনে। রানাকে সে জানাল, ইউডিসি-র দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজারদের বরখাস্ত করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তাদের বদলে নিজের দেশের চীনাদের চাকরি দিচ্ছেন।

একটু পরই ইংরেজদের সঙ্গে ভিড়ে গেল সোফিয়া ক্যারল, ডিনারের পর তাকে রেখেই মেস থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখে জুয়ার টেবিল ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল সে, হাতে মদের গ্লাস। রানার পথ আগলে দাঁড়াল সে, সহাস্যে ফিসফিস করল, 'যাও, রানা, খালি বিছানা উপভোগ করো।' রানা তাকে একাধিক বার প্রত্যাখ্যান করায় এখনও খুব খেপে আছে সে।

নিঃশব্দে হাসল রানা, বলল, 'এরকম ভিড় আর হৈ-চৈ আমি সহ্য করতে পারি না।'

কাদায় পিচ্ছিল হয়ে আছে কাঠের তক্তাগুলো, ওগুলোর ওপর দিয়ে অন্ধকারে হাঁটার সময় ওর পিঠের একটা জায়গা শিরশির করতে লাগল। ওই জায়গাটায় ওর পিছু নেয়া কোন লোক একটা ছুরি গাঁথতে পারে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা।

নিজের কামরার সামনে এসে থামল ও। তালা খুলে কবাট ধাক্কা দিল, হাঁ হয়ে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে থাকল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল না। অন্ধকার কামরায় ওর অপেক্ষায় থাকতে পারে কেউ। এক মিনিট পর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু একটা হাত ঢোকাল রানা, চৌকাঠের পাশটা হাতড়ে খুঁজে নিল সুইচবোর্ড। আলো জ্বালার পরও সাবধানে ভেতরে ঢুকল ও। দুর্বল দরজায় তালা দিল, পর্দা টানল জানালার, তারপর বিছানায় বসে জুতোর ফিতে খুলল।

কাজটা অনেকভাবেই করতে পারে চাখার সিং। সবদিক থেকে নিজেকে পাহারা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই সব ভাবছে, হঠাৎ রানা অনুভব করল চাদরের নিচে কি যেন নড়ছে। নড়ার গতি অত্যন্ত মন্থর ও সতর্ক, আলতো ঘষা খাওয়ার একটা ভাব রয়েছে: পাতলা চাদরের ভেতর থেকে ওর উরু স্পর্শ করল। ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত উঠে এল শিরদাঁড়া বেয়ে, শরীরের প্রতিটি পেশীকে আড়ষ্ট করে দিল।

এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবে আছে, এ-ধরনের সাপকে সাংঘাতিক ভয় পায় রানা। কোত্থেকে হঠাৎ ছোবল মারবে, নিজেকে রক্ষা করার কোন সুযোগই পাওয়া যাবে না। এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে ধরে নিল ও, চাদরের তলায় একটা সাপই নড়াচড়া করছে। বুঝতে পারল, চাখার সিং বা তার কোন লোক ওটাকে রেখে

গেছে এখানে। জানা কথা, মারাত্মক বিষধর কোন সাপই হবে–গোক্ষুর, মামবা অথবা কেউটে; আবার অ্যাডারও হতে পারে।

বিছানা ছেড়ে লাফ দিল রানা, চরকির মত আধপাক ঘুরল। হাতে কিছু পাবার জন্যে দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। খপ করে তুলে নিল পাতলা কাঠের চেয়ারটা, মেঝেতে আছাড় মেরে ভাঙল সেটা, অস্ত্র হিসেবে বাগিয়ে ধরল একটা পায়া। হাতে অস্ত্র পেয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে দেখে লজ্জা পেল। নিজের কনসেশনে বাঘ, হাতি, মোষ, গণ্ডার আর সিংহ মেরেছে যে লোক, যে-লোক প্যারাশুট নিয়ে শত্রুদের এলাকায় নেমে খালি হাতে লড়েছে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাতে ভেলায় চড়ে একা পাড়ি দিয়েছে উন্মত্ত সাগর, সেই লোকই কিনা এখন কল্পনায় সাপ দেখে এভাবে কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে!

চাদরের তলায় ওটা কি দেখার জন্যে বিছানার দিকে এগোতে হবে ওকে। নিজেকে শক্ত করল রানা, সাবধানে এগোল। বাম হাত দিয়ে চাদরের একটা কোণ ধরল, অপর হাতে ধরা চেয়ারের পায়াটা তুলল মাথার পাশে, তারপর দ্রুত উঁচু করল চাদরের প্রান্তটা।

ডোরাকাটা বুনো একটা ইঁদুর বসে রয়েছে বিছানার মাঝখানে। তার গোঁফগুলো সাদা ও লম্বা, বোতাম আকৃতির চোখগুলো হঠাৎ আলো পড়ায় মিটমিট করছে।

হাতের পায়াটা আগেই নেমে আসতে শুরু করেছে, কোনরকমে সেটাকে থামাল রানা। ইঁদুর আর ও, পরস্পরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। তারপর ওর কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, নার্ভাস হাসির সঙ্গে ঝাঁকি খেল সারা শরীর। চিঁচিঁ করে বিছানা ছেড়ে নেমে গেল ইঁদুরটা, মেঝের কিনারা ধরে ছুটল, বেরিয়ে গেল চৌকাঠের ফাঁক গলে। বিছানায় ধপাস করে বসে পড়ল রানা, এখনও হাসছে। 'মাই গড, চাখার সিং!' মনে মনে ভাবছে ও। 'তারমানে তুমি নাছোড়বান্দা! ইঁদুর পাঠিয়ে তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ, কেমন? আমাকে বিড়াল সাজতে বলছ?'

হেলিকপ্টারটা এল পুবদিক থেকে। গভীর বনভূমির পাতায় ছাওয়া ছাদে একটা ফাঁক রয়েছে, সেই ফাঁকে দেখতে পাবার অনেক আগেই ওটার রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ফাঁকা জায়গাটায় এমন ভঙ্গিতে নামল, যেন মোটা এক ভদ্রমহিলা তাঁর সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব ও আত্মমর্যাদা বজায় রেখে শৌচাগারে বসলেন।

ফরাসীদের তৈরি একটা পুমা, চেহারা দেখেই বোঝা যায় অনেক ধকল গেছে ওটার ওপর দিয়ে, সম্ভবত উবোমোয় পৌঁছুনোর আগে একাধিক এয়ারফোর্সে সার্ভিস দিয়েছে।

এঞ্জিন বন্ধ করল পাইলট, ধীরে ধীরে গতি হারিয়ে থেমে গেল রোটর। মেইন হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি। তাঁর নড়াচড়ার মধ্যে ক্ষিপ্রতার একটা আভাস আছে, যেন প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিকে লাগাম পরিয়ে বেঁধে রেখেছেন। পরনের কমব্যাট ফ্যাটিগ ও প্যারাশুটিস্ট'স বুট তাঁর চেহারায় এনে

দিয়েছে অজেয় বীরযোদ্ধার ভাব। ক্যামেরা নিয়ে সামনে বাড়ল সোফিয়া, বুকে সাঁটা মেডেল রিবনের মতই উজ্জ্বল ও চওড়া হাসি দিলেন তিনি। চাখার সিং-এর নেতৃত্বে এক সারিতে দাঁড়ানো রিসেপশন কমিটির দিকে এগোলেন।

তাঁর পিছনে পুমা থেকে নামার জন্যে বোর্ডিং ল্যাডারটা ব্যবহার করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। তাঁর পরনে ক্রীম কালার ট্রপিক্যাল সুট। টীনা ধনকুবেরের পৈশাচিক দৃষ্টি মাত্র এক পলকের জন্যে স্থির হলো রানার মুখে–যেন বিষধর কেউটের জিভ চেটে দিল। তাঁর চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। রানাকে চিনতে পারার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না আচরণে, তবে রানা খুব ভাল করেই জানে যে চাখার সিং কোন না কোনভাবে তার গুরুকে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দিয়েছে। রানা যে উবোমোয়, এটা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের জন্যে নতুন কোন খবর নয়।

নিজের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বিস্মিতই হলো রানা। হেলিকপ্টারে যে চণ্ডমণ্ড গণ্ড থাকবেন, ও জানত। দেখা হতে যাচ্ছে, কাজেই শরীরটাকে শক্ত করে রেখেছিল ও, কিন্তু তারপরও শারীরিক আঘাতের মত প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, কেউ যেন পাঁজরে ঘুসি মেরেছে। প্রেসিডেন্টের বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাবার সময় মুখে হাসি ফোটাতে রীতিমত চেষ্টা করতে হলো ওকে।

'এই যে, আমাদের ভালমানুষ মিস্টার মাসুদ রানা–দেখতেই পাচ্ছেন, প্রিয় নবী নিজেই পাহাড়ের কাছে চলে এসেছেন। আপনার ছবি তোলার কাজে সহযোগিতা করার জন্যে আজকের বিকেলটা আলাদা করে রেখেছি। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি। আপনার নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় এক পায়ে খাড়া।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। সব মিলিয়ে আপনার পাঁচ ঘণ্টা সময় নেব আমরা–তার মধ্যে মেকআপ আর রিহার্সেলও ধরা হয়েছে...,' চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না রানা।

তবে ওকে বাধা দিল চাখার সিং। 'মি. রানা, আসুন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউডিসি-এর হেড, মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাড়ানো হাতটা ধরার সময় রানার মনে হলো, গোটা ব্যাপারটা স্বপ্নের ভেতর ঘটছে যেন। জোর করে হাসল ও। বলল, 'পরস্পরকে আমরা চিনি। জিম্বাবুইয়ে দেখা হয়েছিল, আপনি যখন ওখানে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আপনার বোধহয় মনে পড়ে না?'

'মাফ করবেন।' মাথা নাড়লেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'অফিশিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সবার কথা কি মনে রাখা সম্ভব!' হাসিমুখে ভান করলেন রানাকে তিনি চিনতে পারছেন না। বিশ্বাস করা কঠিন মনে হলো যে এই ভদ্রলোককে জাম্বেজি উপত্যকার ঢালে শেষবার দেখেছে রানা, আলি শাহ আর তার পরিবারের ক্ষতবিক্ষত লাশ আবিষ্কার করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। মনে হলো, এতদিন চেপে রাখায় ওর ভেতর শোক আর ক্রোধ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, 'শালা কসাই।' ইচ্ছে করল শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে লোকটার মুখে ঘুসি মারে, বদলে দেয়

চেহারা, হাড় ভাঙার শব্দ শোনে, বাঁকা আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনে চোখের মণি। ইচ্ছে হলো চণ্ডমণ্ড গণ্ডের রক্তে নিজের হাত ধোয়।

যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই প্রথম ওর বিবেক নির্দেশ দিল, কি করতে হবে ওকে। লোকটা যাতে শাস্তি পায় সেজন্যে আইনের সাহায্য চাওয়ার দরকার নেই। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে নিজের হাতে খুন করতে হবে। হয় খুন করতে হবে, নয়ত তাঁর হাতে খুন হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

এটা ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নয়। পবিত্র একটা দায়িত্ব। প্রতিজ্ঞাপূরণ। বন্ধু আলি শাহের লাশ ছুঁয়ে উচ্চারণ করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা। এই প্রতিশোধ হবে বন্ধুত্বের দাবি।

'আপনাদের মনে হতে পারে আমি একটা যুদ্ধজাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি...,' ক্যামেরার লেন্সে তাকিয়ে হাসলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি, 'কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বলছি, তা আমি দাঁড়িয়ে নেই। এটা আসলে এক নম্বর মোবাইল মাইনিং ইউনিটের কমাণ্ড প্ল্যাটফর্ম, সংক্ষেপে আদর করে ডাকা হয় মোমু বলে।'

ক্যামেরায় সোফিয়া একা শুধু সিমন সাফারিকে ধরে রাখলেও, প্ল্যাটফর্মের বাকি অংশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমাণ্ড অফিসাররা। চীফ এঞ্জিনিয়ার ও জিওলজিস্ট ব্রিফ করেছেন প্রেসিডেন্টকে, টেকনিক্যাল বিবরণগুলো তিনি যাতে ঠিকমত বুঝতে পারেন। ইউনিটের ক্রুরা এখনও মোমু কমাণ্ড কনসোল-এ যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে, এমন কি রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সফরের সময়ও জটিল মেশিনটা অচল রাখা যাবে না।

সিকোয়েন্সটা পরিচালনা করছে রানা, চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও চাখার সিং স্রেফ দর্শক, যদিও পিছন দিকে তাঁদের চেহারা দেখা যাচ্ছে। সিমন সাফারির মেকআপ করেছে সোফিয়া নিজে। মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবেও রানা তাকে মূল্য দেয়।

'আমি দাঁড়িয়ে আছি মাটি থেকে সত্তর ফুট ওপরে,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'এবং আমি সামনে ছুটছি তীব্র গতিতে, ঘণ্টায় একশো গজ।' নিজের কৌতুকে নিজেই হাসলেন তিনি।

মনে মনে স্বীকার করল রানা, ভদ্রলোক দক্ষ অভিনেতা, ক্যামেরার সামনে কোন রকম দ্বিধায় ভুগছেন না। এই ড্রেস আর চেহারা নিয়ে দুনিয়ার যে-কোন জায়গার মহিলা দর্শকদের মনোযোগ কেড়ে নেবেন।

'যে ভেহিকেলে আমি চড়েছি তার ওজন এক হাজার টন...।'

সিমন সাফারি কথা বলছেন, নিজের শিডিউলে এডিটিং নোট নিচ্ছে রানা। এই পর্যায়ে স্ক্রীনে প্রেসিডেন্টের বদলে দৈত্যাকৃতি মোমু ভেহিকেলকে দেখানো হবে, অনেকগুলো ট্র্যাক-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইস্পাতের ট্র্যাক, সব মিলিয়ে বারোটা আলাদা সেট, প্রতিটি দশ ফুট করে চওড়া–অত্যন্ত দুর্গম এলাকাতেও ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম। ইস্পাতের অনেকগুলো হাইড্রোলিক র‍্যাম মেইন প্ল্যাটফর্মটাকে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে, ভেহিকেলের তলাটা যাতে ভারসাম্য না হারায়। বনভূমির উঁচু ঢাল বেয়ে ওঠা-নামা বা পিছলে যাবার

সময় ট্র্যাকগুলো উন্মাদের মত আচরণ করে, সেই আচরণের সঙ্গে তাল বজায় রেখেই ভারসাম্য রক্ষা করে র‍্যামগুলো।

সিমন সাফারি কিছু বাড়িয়ে বলেননি, মেশিনটার আকার যুদ্ধজাহাজের চেয়ে ছোট হবে না। লম্বায় ওটা দেড়শো গজের বেশি, চওড়ায় চল্লিশ গজ।

ঘাড় ফেরালেন সিমন সাফারি, হাত বাড়িয়ে রেইলিং-এর ওদিকটা দেখালেন। 'ওই নিচের দিকে,' বললেন তিনি, 'দানবটার চোয়াল আর থাবা দেখতে পাবেন আপনারা। চলুন, চাক্ষুষ করা যাক।'

ক্যামেরায় কথাটা বলা সহজ, কিন্তু এর মানে হলো সুবিধেজনক ও নিরাপদ কোথাও নামতে হবে ওদেরকে, ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে পজিশন ঠিক করতে হবে, ক্যামেরা চালু করার আগে বুঝিয়ে দিতে হবে কার কি ভূমিকা। তবে সিমন সাফারির সঙ্গে কাজ করে শান্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। একবার বলে দিলেই কি করতে হবে বুঝে ফেলেন। সময়জ্ঞানও নিখুঁত। অভিনয়ে কোন আড়ষ্ট ভাব নেই। মেশিনারির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করতে হবে তাঁকে, এ-কথা বলে দেয়ারও প্রয়োজন হলো না।

উন্নতমানের সিনেমায় এ-ধরনের শট দেখা যায়। একসকাভেইটর অর্থাৎ মাটি খোঁড়ার যন্ত্রগুলো রয়েছে গ্যানট্রি অর্থাৎ প্রকাণ্ড এক কাঠামোর ওপর। একস্কাভেইটরগুলোকে দেখে মনে হলো এক পাল ইস্পাতের জিরাফ যেন গলা লম্বা করে ডোবা থেকে পানি খাচ্ছে, প্রতিটি স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করছে, উঠছে ও নামছে। ওগুলোর ব্লেড বিপুলবেগে ঘুরছে, মাটি কেটে ছুঁড়ে দিচ্ছে পিছন দিকের কনভেয়র বেল্টে।

'এই একস্কাভেইটরগুলো মাটির গা থেকে ত্রিশ গজ নিচে পর্যন্ত নাগাল পেতে পারে। এই মুহূর্তে ওগুলো ষাট গজ চওড়া একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে–মাটি সরাচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় দশ হাজার টনেরও বেশি। ওগুলো কখনও থামে না। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আবর্জনা সরাচ্ছে।'

লাল মাটি খুঁড়ে মোমু যে খাদটা তৈরি করছে, উঁকি দিয়ে সেই ফাঁকটার ভেতর তাকাল রানা। এই বিশাল গর্তের ভেতর একটা লাশ লুকিয়ে ফেলা খুবই সহজ–বিশেষ করে ওর লাশটা। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল ও। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও চাখার সিং, দু'জনেই ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। এখনও তারা ওর কাছ থেকে সত্তর ফুট ওপরে কমাণ্ড প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। দুটো মাথা কাছাকাছি, প্রায় ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে। কথা বলছে, বোধহয় ওকে নিয়েই। একটানা বজ্রপাতের মত শব্দ করছে কনভেয়র বেল্টগুলো, ঘুরন্ত একস্কাভেইটরের মাথাগুলোও গর্জন করছে, কথাগুলো শুনতে পাবার প্রশ্ন ওঠে না। তবে চেহারায় হিংস্র ভাব দেখে বোঝা গেল নিষ্ঠুর কোন সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে ওরা। চোখাচোখি হলো মুহূর্তের জন্যে, তারপর দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল, একটু পর সরে গেল রেইলিং-এর কাছ থেকে।

এরপর স্বভাবতই কাজে মন দেয়া কঠিন হয়ে উঠল রানার। অথচ সিমন সাফারি যতক্ষণ কাছাকাছি আছেন, প্রতিটি মিনিট ওর কাজে লাগানো দরকার।

আবার একবার ক্যামেরা ক্রুরা ইস্পাতের মই বেয়ে মোমুর সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্মে

উঠল। চণ্ডমণ্ড গণ্ড আর চাখার সিং অদৃশ্য হয়েছে। ওদেরকে চোখের সামনে না দেখে রানার অস্বস্তি আরও বাড়ল।

উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচের টিউব মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাণ্ড আকৃতির চারটে ইস্পাতের ড্রাম, ফিট করা হয়েছে মোমুর ডেকে, বনবন করে ঘুরছে সবগুলো। প্রতিটি ড্রাম চল্লিশ গজ লম্বা, ভেতরে একশো টন ওজনের অসংখ্য লোহার বল আছে। সদ্য খোঁড়া খাদ থেকে তোলা মাটি কনভেয়র বেল্ট বয়ে নিয়ে এসে ফেলে দিচ্ছে ড্রামগুলোর খোলা মুখের ভেতর। লোহার বলগুলো পাথর আর শক্ত মাটিকে পিষে মিহি পাউডারে পরিণত করছে, টিউব মিলের আরেক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে সেই লাল পাউডার আলাদা ট্যাংকে ঠাঁই করে নিচ্ছে।

ইস্পাতের ক্যাটওয়াক ধরে খানিকটা নিচে নামল ক্যামেরা ক্রুরা, সেপারেটর-এর খানিক ওপরে এসে থামল ওরা। ক্যামেরার দিকে মুখ করে আবার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি।

'দুটো মূল্যবান খনিজ পদার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করছি আমরা–দুটোই হয় খুব ভারি নয়তো ম্যাগনেটিক। দুর্লভ আর্থ মোনাজাইট সংগ্রহ করা হয় শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে।' মেশিনের গর্জনে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারে রানা অবশ্য উদ্বিগ্ন নয়। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে আরেকবার তাঁর বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে নেবে ও। তারপর ডাব করবে টেপ, ফলে টিভির দর্শকরা স্পষ্ট শুনতে পাবে তাঁর গলা।

'মোনাজাইট বের করে নেয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে তা চলে যায় সেপারেটর ট্যাংকে। ওটার ভেতর হালকা পদার্থগুলোকে ভেসে উঠতে দিই আমরা, সংগ্রহ করি ভারি প্লাটিনাম ওর,' বলে চলেছেন সিমন সাফারি। 'অপারেশনের এই অংশটা সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। সেপারেটর ট্যাংকে আমরা যদি কেমিক্যাল ক্যাটালিস্ট ও রিজেন্ট ব্যবহার করি, শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি প্লাটিনাম উদ্ধার করা সম্ভব। তবে ট্যাংক থেকে যে বর্জ্য বেরুবে সেটা হবে বিষাক্ত। মাটি শুষে নেবে সেই বর্জ্য, বৃষ্টির পানির সঙ্গে পৌঁছে যাবে নদীতে, ফলে মারা পড়বে পশু, পাখি, মাছ, পোকা-মাকড় ও উদ্ভিদ। ডেমোক্রাটিক পিপল'স রিপাবলিক অব উবোমোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে প্লাটিনাম মাইনিং অপারেশনের কাজে এ-দেশে কোন রকম কেমিক্যাল রিজেন্ট ব্যবহার করা যাবে না।' থামলেন সিমন সাফারি, ক্যামেরার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। 'এ-ব্যাপারে আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণ আশ্বাস ও সহযোগিতা আপনারা পাবেন। রিজেন্ট ব্যবহার না করলে ওর সংগ্রহ পঁয়ষট্টি পার্সেন্টে নেমে আসবে। তারমানে দাঁড়াবে, দশ বা বিশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি। তবু আমি ও আমার সরকার এই ক্ষতি মেনে নিতে রাজি, কারণ আমরা চাই না আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ুক। আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে, আপনাদের সন্তানদের জন্যে দূষণ মুক্ত পরিবেশ চাই।'

তাঁর বাচনভঙ্গিতে জাদু আছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলেন। আশ্বাস দেয়ার সময় তাঁর চেহারায় গভীর আন্তরিকতা ফুটে উঠল, দেশের জন্যে তাঁর

অন্তরে দরদ যেন উথলে উঠছে। কে বলবে, কে বিশ্বাস করবে দেশটাকে উনি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

'কাট,' নির্দেশ দিল রানা। 'মার্ভেলাস, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি এবার মেসে ফিরে যেতে পারেন। এখানের কাজ শেষ করি আমরা, তারপর বিকেলে ম্যাপ আর মডেল সহ ফাইন্যাল সিকোয়েন্স-এর ছবি তুলব।'

আবার উদয় হলো চাখার সিং, যেন আলাউদ্দিনের চেরাগ থেকে আবির্ভূত হলো পাগড়ি পরা জিন। মোমু থেকে সিমন সাফারিকে নিয়ে গেল সে, প্রেসিডেন্টের সম্মানে বেস ক্যাম্পে বিরাট খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছে। আগেই খবর পেয়েছে রানা, পুমা হেলিকপ্টার করে কাহালি থেকে আনা হয়েছে খাবার আর পানীয়।

সবাই চলে যাবার পর রানা আর সোফিয়া মোমুর ওপর শেষ সিকোয়েন্সটার কাজ শুরু করল, এখানে সিমন সাফারির কোন ভূমিকা নেই। ওরা ছবি তুলল, হেভী প্লাটিনাম পরিচ্ছন্ন ও গাঢ় একটা স্রোতের মত ওর বিন-এ পড়ছে। প্রতিটি বিন-এর ধারণক্ষমতা একশো টন, ভরে গেলে নিজে থেকেই নেমে যাচ্ছে অপেক্ষারত টেইলর-এ, তারপর টেনে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে টেইলরটাকে।

বেলা তিনটের দিকে মোমুতে শেষ হলো ওদের কাজ। বেস ক্যাম্প সেঙ্গিসেঙ্গিতে যখন পৌঁছুল ওরা, প্রায় শেষ হতে চলেছে প্রেসিডেনশিয়াল লাঞ্চ।

হেডকোয়ার্টার ভবনের কনফারেন্স রুমে মাইনিং কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সহ একটা স্কেল মডেল আছে, তাতে মোমুর ভূমিকাও দেখানো হয়েছে। মডেলটা এমনভাবে তৈরি, একবার নজর বুলালেই গোটা প্রজেক্ট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। স্যার ট্যাফোর্ডের টেকনিশিয়ানরা লণ্ডনে বসে বানিয়েছে ওটা, দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণই পাওয়া যাবে। প্রতিটি জিনিসের মাপ, আকৃতি, ওজন এবং একটার সঙ্গে অপরটির দূরত্বেরও নিখুঁত হিসেব করে দেয়া আছে।

মডেল, মোমু আর বনভূমি, এই তিনটেকে পালা করে দেখানোর ইচ্ছে রানার। পুমা হেলিকপ্টার থেকে বনভূমির ছবি তুলবে ও, দর্শকদের দেখাবে কিভাবে কাজ করছে মোমু।

স্কেল মডেলে দেখানো হয়েছে মাইনিং ট্রাক ষাট গজ চওড়া। মোমুর সামনে জঙ্গল কেটে রাস্তাটা তৈরি করছে কাঠুরেদের টিম। মাটি সরাচ্ছে অনেকগুলো বুলডোজার। গাছ কাটার কাজটারও ছবি তোলার ইচ্ছে রানার। আকাশ ছোঁয়া বৃক্ষসারির পতন দেখার মত দৃশ্য। দৈত্যাকৃতি হলুদ বুলডোজারগুলো কাটা গাছগুলোকে টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে জঙ্গল থেকে, শ্রমিকরা সেগুলোকে ট্রাকে তুলছে–এ-সব না দেখালে ছবিটা হবে অসম্পূর্ণ।

তার আগে আজকের ছবি তোলার কাজ সিমন সাফারিকে সঙ্গে নিয়ে শেষ করতে হবে রানাকে। সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, প্রেসিডেন্টকে ঘিরে চঞ্চল বাছুরের মত নাচানাচি করছে সে, কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করছে, আবার কখনও হেসে উঠছে খিলখিল করে–রঙ ও পাউডার লাগাচ্ছে সিমন সাফারির মুখে। উপস্থিত সবাইকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে সোফিয়া, পরস্পরকে

ভালবাসে তারা-সম্পর্কটা প্রেমের। প্রচুর মদ খাওয়ায় নিজের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে ততটা সতর্ক নন সিমন সাফারি, প্রকাশ্যেই আদর করছেন সোফিয়াকে, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে শ্বেতাঙ্গিনীর বিশাল স্তনযুগলকে যেন গিলছেন। সোফিয়াও তার নাকের ডগায় ঠেলে দিচ্ছে ওগুলোকে।

বিপজ্জনক পথ থেকে সরে আসার জন্যে সোফিয়াকে অনেকবার সাবধান করেছে রানা। কিন্তু ওর কথায় কান দেয়নি সে। মেয়েটার জন্যে এখনও রানা উদ্বেগ বোধ করে, তবে উদ্বেগের চেয়ে এখন করুণাই বেশি হয়। ও বুঝতে পারে, সোফিয়া নিজেকে উবোমোর ফার্স্ট লেডি হিসেবে কল্পনা করছে। ঘটনাটা ঘটলে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু থাকবে না, কারণ আফ্রিকার কালো নেতাদের অনেকেরই ফর্সা ইউরোপিয়ান স্ত্রী আছে। কিন্তু সোফিয়া জানে না হিটারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করে। বরং ব্যাপারটা ঘটলেই ভাল, ভাবল রানা। যে সর্বনাশই ঘটুক তার, নিজেই সেটা ডেকে আনছে সে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, দৃষ্টিকটু মাখামাখিতে বাধা দিল। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি রেডি হয়ে থাকেন, তাহলে এখানটায় দাঁড়ান, এই টেবিলটার পাশে। সোফিয়া, আমি চাই তুমি শটটা এখান থেকে নেবে। ফোকাসে যেন প্রেসিডেন্ট ও মডেলটা থাকে....।'

উঠে এসে রানার দেখিয়ে দেয়া জায়গায় দাঁড়ালেন সিমন সাফারি। মাত্র কয়েক মিনিট রিহার্সেল হলো। প্রথমবারেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন তিনি।

'ভেরি গুড, মি. প্রেসিডেন্ট। আমরা তাহলে এবার শুরু করতে পারি। সোফিয়া, তুমি রেডি তো?'

সিমন সাফারির হাতে ছড়িটা পালিশ করা আইভরি আর গণ্ডারের শিং দিয়ে বানানো, শ্যাফট-এর মাথাটাকে খুদে একটা হাতির আকৃতি দেয়া হয়েছে। ছড়িটা দেখতে একজন ফিল্ড মার্শালের ব্যাটন-এর মত। কর্নেল ছিলেন, ক্ষমতা দখল করে জেনারেল হয়েছেন, হয়তো আবার নিজেকে প্রমোশন দেয়ার ইচ্ছে রাখেন।

এই মুহূর্তে ছড়িটা তাঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখা মডেলের বিভিন্ন বস্তু চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করলেন সিমন সাফারি। 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, বনভূমির ভেতর মাইনিং ট্র্যাক সরু একটা পথ, মাত্র ষাট গজ চওড়া। এ-কথা সত্যি যে পথটা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের আরও অনেক গাছ ও ঝোপ কেটে সাফ করে ফেলছি আমরা, মোমু যাতে সামনে এগোতে পারে।'

এক মুহূর্ত থেমে গম্ভীর হলেন সিমন সাফারি। 'এটাকে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস বলে না, বলে ফসল কেটে ঘরে তোলা। ধৈর্য ধরুন, প্লীজ, ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করছি।'

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে গেলেন সিমন সাফারি। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো-

সব মিলিয়ে একশো গজ চওড়া হচ্ছে পথটা, লম্বা হবে অনেক মাইল। এতে করে দেশের মোট বনভূমির শতকরা মাত্র এক ভাগ বা তারও কম আক্রান্ত হচ্ছে।

মোমু ট্রেঞ্চ কেটে এগোচ্ছে, তার পিছু পিছু আসছে এক ঝাঁক বুলডোজার-ওগুলো মাটি দিয়ে দ্রুত ভরে ফেলছে ট্রেঞ্চগুলোকে। মাটির যাতে অপচয় না ঘটে বা ধসে না পড়ে, সেদিকে গুরুত্ব থাকায় ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে জমিনের স্বাভাবিক ঢাল বা ঢিবিগুলোকে এড়িয়ে। পথটা আঁকাবাঁকা হবার সেটাই কারণ। ট্রেঞ্চগুলো মাটি দিয়ে ভরাট হওয়া মাত্র কচি চারা আর বীজ রোপণ করা হচ্ছে। ওগুলোর কোনটা দ্রুত বেড়ে উঠবে, কাজ করবে জমিনের আচ্ছাদন হিসেবে। বাকিগুলো বাড়বে ধীর গতিতে, তবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রতিটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে, হয়ে উঠবে আবার নিধনযোগ্য। 'তখন তা দেখার জন্যে আমি থাকব না, তবে আমার নাতি-নাতনীরা থাকবে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এই অপারেশনের প্ল্যান এমনভাবেই করা হয়েছে, প্রতি বছর কোনভাবেই বনভূমির শতকরা এক ভাগের বেশি গাছ কাটা হবে না। এটা বোঝার জন্যে অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত হবার দরকার নেই যে কাজটা শেষ করতে দু'হাজার নব্বুই সাল এসে যাবে। ওই সময়ের মধ্যে আজ উনিশশো নব্বুই সালে আমরা যে গাছ লাগাচ্ছি, ওগুলো হবে একশো বছরের পুরানো। তারমানে গাছ কাটার কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে পারব আমরা।' ক্যামেরার লেন্সে সরাসরি তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসলেন সিমন সাফারি। 'আজ থেকে এক হাজার বছর পরও উবোমোর বনভূমি অনাগত প্রজন্মের জন্যে এখনকার মত এতটাই বড় থাকবে, আজ যেমন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জন্যে স্বর্গ হয়ে আছে আমাদের এই অরণ্য, সেদিনও তাই থাকবে।'

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে যুক্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এরকমটি ঘটতেও দেখেছে ও। বন কেটে সরু একটা পথ তৈরি করলে কোন প্রজাতির অস্তিত্ব গুরুতর সংকটের মুখে পড়বে বলে মনে হয় না। সিমন সাফারি যে দর্শন বা ধারণার কথা বলছেন, ও নিজেও সেটা বিশ্বাস করে-প্রাকৃতিক সম্পদকে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো উচিত, যাতে প্রকৃতিই আবার দ্রুত ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

সিমন সাফারির প্রতি ওর মনে যে বিরূপ ধারণাটা ছিল, আপাতত সেটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। হাসিমুখে বলল ও, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার পারফরম্যান্স সত্যি দারুণ হয়েছে। ধন্যবাদ।'

দুই

ল্যাণ্ডরোভারের টেইলবোর্ড-এ বসে রয়েছে চাখার সিং, উরুর ওপর রেখে কাগজটা সমান করল। সে তার বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কাজ করায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। 'কাগজের টুকরোটা আমার সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিল,' মন্তব্য করল সে।

'কাগজটা আনন্দদানের জন্যে তৈরি করা হয়নি,' গম্ভীর সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'ওটা আমার বাবাকে সম্মান দেখিয়ে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে।

এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কাজ হয়।'

চোখ তুলে হাসল চাখার সিং, চেষ্টা করা সত্ত্বেও হাসিটায় আন্তরিকতার অভাব থেকে গেল। তাইপে থেকে আসার পর চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে অন্য রকম লাগছে তার। চীনা ভদ্রলোক কোত্থেকে যেন নতুন একটা শক্তি পেয়েছেন, আচরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ একটা ভাব এসে গেছে, বেড়ে গেছে আত্মবিশ্বাস। এর আগে এগুলো তার মধ্যে এই পরিমাণে ছিল না। এ-সব লক্ষণ ভাল ঠেকছে না চাখার সিং-এর। এই প্রথম উপলব্ধি করল সে, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে ভয় করে সে। অনুভূতিটা অস্বস্তিকর।

'তবু, আনন্দ থাকলে কাজ ভাল হয়,' নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাল চাখার সিং, তবে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের কঠিন দৃষ্টি অনুভব করে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে কাগজটা আরেকবার পড়ল।

প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি তাঁর অফিশিয়াল প্যাডে চিঠিটা লিখেছেন। কাগজের মাথায় লেখা রয়েছে–'পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ উবোমো'।

চিঠিটা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়:

'এই চিঠির বাহক মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে, কিংবা তাঁর অনুমোদিত এজেন্টকে, প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতাবলে উবোমোর যে-কোন স্থানে নিম্নে উল্লেখিত প্রাণী শিকার করার বা ফাঁদ পেতে ধরার অবাধ অধিকার দেয়া গেল। যেমন–হাতির পাঁচটা নমুনা।

'বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে উক্ত নমুনা সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখার, বিক্রি করার, বিদেশে রফতানি করার অধিকারও তাঁর থাকল। নমুনা বলতে শুধু জীবিত হাতি বোঝাবে না; বোঝাবে হাতির চামড়া, হাড়, মাংস ও আইভরি।'

নিচে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি।

লাইসেন্সটা তাড়াহুড়ো করে দেয়া হয়েছে। চণ্ডমণ্ড গণ্ডের অনুরোধে নিজের প্যাডেই লিখে দিয়েছেন সিমন সাফারি, তারপর সিল-ছাপ্পড় মারা হয়েছে।

'আমি একজন পোচার,' নিজের ক্ষোভের কারণটা ব্যাখ্যা করল চাখার সিং। 'আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ পোচার। কিন্তু এই কাগজের টুকরোটা সামান্য একজন এজেন্টে পরিণত করেছে আমাকে, পরিণত করেছে কসাইয়ের সহকারীতে...।'

ধৈর্য হারিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। শিখ লোকটা তাঁকে বড় জ্বালাতন করছে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছে তাঁর মাথা। ভেবে দেখার সময় কোথায় কার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল কি লাগল না। গাছ কেটে পরিষ্কার করা জায়গাটায় পায়চারি শুরু করলেন তিনি, চিন্তায় মগ্ন। মাটি নরম কাদা হয়ে আছে, পায়ের নিচে ডেবে যাচ্ছে। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভাব, ঝাপসা করে তুলছে তাঁর সানগ্লাসের লেন্স। ওগুলো খুলে ওপেন নেক শার্টের ব্রেস্ট পকেটে রেখে দিলেন। ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে নিরেট পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছপালা। তীক্ষ্ণ চোখ বুলালেন তিনি। বনভূমি তাঁর কাছে চিরকালই রহস্যময় আর অশুভ। ভয় ভয় ভাবটা গোপন করার জন্যে চোখের সামনে হাত-

ঘড়িটা তুললেন তিনি। 'তার আসার সময় পেরিয়ে গেছে। কখন আসবে সে?' প্রায় ধমকের সুরে জানতে চাইলেন।

কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং, এক হাতে ভাঁজ করল গেইম লাইসেন্সটা। 'তার সময়জ্ঞান আমাদের মত নয়। সে একজন পিগমি। তার সুবিধেমত আসবে সে। এমন হতে পারে হয়তো অনেক আগেই পৌঁচেছে, আড়াল থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর। কিংবা হয়তো কাল আসবে, অথবা পরশু।'

'কিন্তু আমি তো আর সময় নষ্ট করতে পারি না,' চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলায় ঝাঁঝ। 'আমার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে।'

'আপনার মহান পিতার উপহার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমার সেরকমই ধারণা হয়েছে,' বলে আবার হাসল চাখার সিং, এবার তার হাসিতে সামান্য হলেও ব্যঙ্গ থাকল।

'এই শালার আফ্রিকার কালো বর্বরগুলো জাহান্নামে যাক!' আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'ওদের কথার কোন দাম নেই। এক বিন্দু বিশ্বাস করা যায় না।'

'ওরা আসলে বাঁদর,' সায় দিল চাখার সিং, 'তবে উপকারী বাঁদর।'

ফাঁকা জায়গাটার শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে যেতে সাহস হলো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে চাখার সিং-এর সামনে দাঁড়ালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'রানার ব্যাপারটা কি হবে? কিছু ভেবেছেন? ওর একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।'

'ও, হ্যাঁ।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে শব্দহীন হাসল চাখার সিং। 'ওই কাজটায় আনন্দ আছে, সত্যি বলছি।' হারানো হাতের গোড়াটা বাঁ হাত দিয়ে ডলল সে। 'প্রায় এক বছর ধরে প্রতি রাতে মাসুদ রানাকে স্বপ্ন দেখি আমি। অথচ একবারও ভাবিনি যে ভগবান তাঁকে সেঙ্গি সেঙ্গিতে আমার সামনে এভাবে পরিবেশন করবেন। ডানা কাটা একটা পাখির মত, নেভার মাইণ্ড।'

'লোকটা এখানে থাকতেই তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে,' নির্দেশের সুরে বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'এই জায়গা ছেড়ে জীবিত যেন পালাতে না পারে।'

'এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কোনরকম মাথা ঘামাবেন না,' বলল চাখার সিং। 'এ-ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত মেধা নিয়ে গবেষণা করছি। ভালমানুষ মাসুদ রানার প্রস্থানটা হবে একাধারে দৃষ্টান্তমূলক এবং ব্যথাবহুল, আবার একই সঙ্গে দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্য হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়ার উপযোগী।'

'আমি চাই না খুব বেশি সময় নেন আপনি,' সতর্ক করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'আমার হাতে পাঁচদিন সময় আছে,' শান্ত গলায় বলল চাখার সিং। 'ছবির শিডিউল দেখেছি। পাঁচদিনের আগে সেঙ্গি সেঙ্গির কাজ শেষ করতে পারবেন না মাসুদ রানা...।'

'আর তার সহকারিণী মেয়েটার কি হবে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন চীনা ধনকুবের।

'আপাতত তাকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট সাফারি সামান্য মৌজ-ফূর্তি করছেন, তবে আমি মনে করি সর্বশেষ দীর্ঘযাত্রায় তাকেও মাসুদ রানার সঙ্গিনী হিসেবে রাখা

দরকার...,' হঠাৎ থেমে ল্যাণ্ডরোভারের টেইলগেট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল
চাথার সিং।
নিবিড় বনভূমির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে সে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড
কথা বলতে যাচ্ছেন দেখে ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলল তাঁকে। ঝাড়া প্রায় এক
মিনিট মাথাটা একদিকে কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। তারপর
ফিসফিস করে বলল, 'আমার ধারণা, সে এসেছে।'
'কিভাবে বুঝলেন?' নিজের অজান্তেই নিচু গলায় কথা বলছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড,
বনভূমির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন।
'কান পাতুন,' বলল চাথার সিং। 'পাখিরা।'
'আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'
'ঠিক তাই, কোন শব্দ হচ্ছে না,' মুচকি হেসে বলল চাথার সিং। 'পাখিরা চুপ
মেরে গেছে।' সবুজ পাঁচিলের দিকে এগোল সে, গলা চড়িয়ে সোয়াহিলি ভাষায়
বলল, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অরণ্যের সন্তান। সামনে বেরিয়ে এসো,
আমরা যাতে পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে অভ্যর্থনা জানাতে পারি।'
আলোর রহস্যময় কারসাজির মত গাছপালার প্রায় নিরেট পাঁচিলের একটা
ফাঁকে উদয় হলো পিগমি লোকটা। চকচকে সবুজ পাতা দিয়ে তার প্রায় পুরোটা
শরীরই ঢাকা, ফাঁকা জায়গাটাকে ঘিরে থাকা গাছগুলোর মগডাল ছুঁয়ে নেমে আসা
রোদ লেগেছে তার ফোলা পেশীগুলোয়। তার চামড়াকে কালো আলো বলা যায়।
মানুষটা অত্যন্ত ছোট, কিন্তু একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায় গায়ে প্রচণ্ড শক্তি
রাখে। শরীরের তুলনায় মাথাটা যেন আরও ছোট, তবে সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন।
নাকটা চওড়া ও চ্যাপ্টা, মুখে ছাগলদাড়ি।
'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, মহান শিকারি ওজি হাবিব,' বলল চাথার
সিং।
সাবলীল ভঙ্গিতে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এল খর্বকায় মানুষটা। 'তামাক
এনেছেন আমার জন্যে?' সোয়াহিলি ভাষায় জানতে চাইল সে, বাচ্চা ছেলের মত
সরাসরি।
হেসে উঠে তামাক ভরা একটা কৌটা বের করল চাথার সিং, বাড়িয়ে ধরল
তার দিকে।
কৌটার মুখটা খুলল ওজি হাবিব। দু'আঙুলে খানিকটা তামাক নিয়ে মুখের
ভেতর ভরল, গুঁজে রাখল ওপরের ঠোঁটের ভেতর। আনন্দে হেসে উঠল সে।
'আমি ভেবেছিলাম আরও ছোটখাট হবে লোকটা,' মন্তব্য করলেন চণ্ডমণ্ড
গণ্ড। 'গায়ের রঙটাও যেন কেমন!'
'ও বোধহয় ঠিক পুরোপুরি বামবুটি নয়,' ব্যাখ্যা করল চাথার সিং। 'ওর বাপ
হিটা। হিটারা সাধারণত খ্রিস্টান হয়। ওর বাপ ওর মাকে বিয়ে করার জন্যে
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অন্তত এরকমই শুনেছি আমি।'
'শিকারি হিসেবে ভাল?' জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, গলায় সন্দেহ। 'হাতি
শিকার করতে পারবে?'
হেসে উঠল চাথার সিং। 'ওর গোত্রের সবচেয়ে নামকরা শিকারী ও। তবে

সেটা কথা নয়। কথা হলো, ওর আরও অনেক গুণ আছে-উহালি রক্ত থেকে
পায়নি, পেয়েছে হিটা রক্ত থেকে।'
'কি সেগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।
'টাকার কি মূল্য বোঝে সে,' ব্যাখ্যা দিল চাথার সিং। 'বামবুটিদের কাছে
টাকা বা সম্পত্তির কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু ওজি হাবিবের ব্যাপারটা আলাদা।
লোভী হবার মত যথেষ্ট সভ্য সে।'
ওদের কথা শুধু শুনে যাচ্ছে ওজি হাবিব। ইংরেজি বোঝে না, যখন যে কথা
বলছে তার দিকেই মাথা ঘুরিয়ে আপনমনে তামাক চিবাচ্ছে। পশুর ছোট্ট এক
টুকরো চামড়ায় তার শুধু উরুসন্ধি ঢাকা পড়েছে, পরনে আর কিছু নেই-তবে সারা
শরীর শুকনো সরু লতা দিয়ে প্যাঁচানো, সবুজ পাতাগুলো সেই লতার সঙ্গে
আটকে নিয়েছে। কোমরে একটা ম্যাচেটি, ধনুকটা কাঁধ ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে রয়েছে
পিছনে। হঠাৎ করেই ওদের আলোচনায় বাধা দিল সে। 'আপনার সঙ্গে ওই
লোকটা কে?'
'উনি একজন নামকরা সর্দার। প্রচুর টাকার মানুষ,' আশ্বস্ত করল চাথার সিং।
হাতের পেশী ফুলিয়ে দেখাল ওজি হাবিব, খাটো পায়ে এক চক্কর নাচল,
বলল, 'নামকরা সর্দারের কাজ করতে ভালবাসি আমি। আমি টাকা ভালবাসি।'
তারপর মুখ তুলে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল সে।
'গায়ের রঙ দেখে মনে হয় ওর ম্যালেরিয়া হয়েছে,' মন্তব্য করলেন চীনা
ব্যবসায়ী। 'চোখ দুটো সাপের মত।'
না বুঝলেও, খিকখিক করে হাসল ওজি হাবিব, থুতু ফেলল পায়ের সামনে।
'লোভী হলেও, লোকটা সভ্য মানুষদের সম্মান করতে শেখেনি।'
'বামবুটিরা এরকমই,' চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে ঠাণ্ডা করতে চাইল চাথার সিং।
'ছেলেমানুষদের মত, যেটা ভাল লাগে চিন্তা-ভাবনা না করে সেটাই করে বসে।'
'ওকে আপনি হাতির কথা জিজ্ঞেস করুন,' নির্দেশ দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।
ওজি হাবিবের দিকে ফিরে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল চাথার সিং। 'ওজি হাবিব,
আমি এসেছি তোমার মুখে হাতির খবর জানতে,' বলল সে।
খসখস করে উরুসন্ধি চুলকাল ওজি হাবিব। 'হাতি সম্পর্কে কি জানি আমি?'
'বামবুটিদের মধ্যে তুমিই সেরা শিকারি,' প্রশংসার সুরে বলল চাথার সিং।
'ওজি হাবিবের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বনভূমিতে কিছুই নড়ে না।'
'সে-কথা অবশ্য সত্যি,' স্বীকার করল ওজি হাবিব, এখনও কৌতূহলী চোখে
চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখছে সে। 'নামকরা সর্দার, প্রচুর টাকা, কেমন? তাহলে বলেই
ফেলি-সর্দারের হাতে ওই ব্রেসলেটটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে,' বলল সে।
'হাতি নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে সর্দারের উচিত ওটা আমাকে উপহার হিসেবে
দান করা।'
'ওজি আপনার হাতঘড়িটা চায়,' চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে বলল চাথার সিং।
'বুঝতে পেরেছি!' খেঁকিয়ে উঠলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'লোকটা বেয়াদপ! ওর মত
বাঁদর একটা গোল্ড রোলেক্স নিয়ে কি করবে?'
'সম্ভবত পানির দামে কোন ট্রাক-ড্রাইভারের কাছে বেচে দেবে,' জবাব দিল

চাখার সিং, চীনা বন্ধুর রাগ আর হতাশা উপভোগ করছে সে।

'ওকে জানিয়ে দিন, আমাকে ব্ল্যাকমেইল করা যাবে না। এটা আমার শখের জিনিস, দেয়া সম্ভব নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং। 'আপনি যা ভাল মনে করেন। কিন্তু এর মানে হবে, বাবাকে আপনি উপহারটা পাঠাতে পারবেন না।'

রেগেমেগে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন চণ্ডমণ্ড গড। লাল হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। গোল্ড ব্রেসলেটটা কব্জি থেকে খুলে পিগমির বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

ঘড়িটা দু'হাতে ধরে উল্টেপাল্টে দেখছে ওজি হাবিব, ডায়ালের চারদিকে বসানো হীরার টুকরোগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে তার চোখে। 'সুন্দর জিনিস,' বলল সে। 'এত সুন্দর যে হঠাৎ করে আমার হাতির কথা সব মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে বলো আমাদের,' তাগাদা দিল চাখার সিং।

'গোনডালার কাছাকাছি ত্রিশটা বাচ্চা আর মাদী হাতি আছে,' বলল ওজি হাবিব। 'ওই পালেই আছে দুটো মদ্দা। তাদের আছে সাদা আর লম্বা দাঁত।'

'কত লম্বা?' জিজ্ঞেস করল চাখার সিং, আগ্রহের সঙ্গে ওদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন চণ্ডমণ্ড গড।

'একটা হাতি অপরটার চেয়ে আকারে বড়। তার দাঁতগুলো এরকম লম্বা,' বলল ওজি হাবিব, কাঁধ থেকে ধনুক তুলে মাথার ওপর উঁচু করল, দাঁড়াল পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে। 'এতটা লম্বা,' আবার বলল সে। 'আমার ধনুক যতদূর নাগাল পায়–দাঁতের গোড়া থেকে ঠোঁট পর্যন্ত, তবে খুলির ভেতর লুকিয়ে থাকা অংশটা বাদে।'

'মোটা কি রকম?' ভাঙা ভাঙা সোয়াহিলিতে জানতে চাইলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত, লোভে বেসুরো হয়ে উঠল তাঁর গলার আওয়াজ।

তাঁর দিকে ফিরল ওজি হাবিব, তাঁকে ঘিরে ঘুরে এল এক চক্কর। খাটো হাত দিয়ে নিজের কোমরে একটা অর্ধবৃত্ত আঁকল সে। 'এরকম মোটা,' বলল সে। 'আমার মত মোটা।'

'তারমানে ওটা বিশাল একটা হাতি,' অবিশ্বাসে বিড়বিড় করল চাখার সিং।

রাগের ভান করে পিছিয়ে গেল ওজি হাবিব, তারপর মারমুখো হয়ে ছুটে এসে আবার নিজের জায়গায় থামল। 'সব হাতির রাজা সে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার কথা যে অবিশ্বাস করে, আমি তার পায়ে বসে হাগি। আমি, ওজি হাবিব বলছি, সব হাতির সেরা হাতি সেটা।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আর পা নোংরা করতে হবে না, বিশ্বাস করলাম তোমার কথা,' বলল চাখার সিং। 'আমি চাই ওই হাতিটা মারো তুমি, মেরে তার শিংগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'

মাথা নাড়ল ওজি হাবিব। 'এই হাতি এখন গোনডালায় নেই। জঙ্গলে লোহার হলুদ মেশিন আসার পর ধোঁয়া আর শব্দে ভয় পেয়ে যায় সে। পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে যদি যায়ও, তুমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে,' বলল চাখার সিং। 'তুমি হলে ওস্তাদ শিকারী। তা কোথায় পালিয়েছে হাতিটা?'

'চলে গেছে পবিত্র মধ্যভূমিতে, যেখানে কোন মানুষ শিকার করবে না। জনক ও জননীর নিষেধ আছে। মধ্যভূমিতে এই হাতিকে মারা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'হাতিটার দাঁত আমার খুবই দরকার,' বলল চাখার সিং। 'বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে পারি।' লোভ দেখাল সে।

কথা না বলে মাথা নাড়ল ওজি হাবিব।

'বলুন এক হাজার ডলার দেয়া হবে,' ইংরেজিতে বললেন চণ্ডমণ্ড গড।

তাঁর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল চাখার সিং। 'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' সাবধান করল সে। 'ব্যস্ততা দেখালে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।' ওজি হাবিবের দিকে ফিরল আবার। সোয়াহিলি ভাষায় বলল, 'মেয়েমানুষরা রঙচঙে কাপড় ভালবাসে। তাদের মন জয় করতে হলে কাঁচের পুঁতিও দরকার। আমি তোমাকে দশ থান রঙিন কাপড় দেব। আরও দেব পঞ্চাশ মুঠো কাচের পুঁতি–এক-হাজার কুমারীকে পটাবার জন্যে যথেষ্ট।'

আগের মতই মাথা নাড়ল ওজি হাবিব। 'জঙ্গলের মধ্যভূমি অত্যন্ত পবিত্র,' বলল সে। 'ওখানে আমি শিকার করলে জনক ও জননী আমার ওপর রাগ করবে।'

'কাপড় আর পুঁতি ছাড়াও তোমাকে আমি দশটা কোদাল আর দশটা ছোরা দেব, ছোরাগুলোর পাত হবে তোমার হাতের মত লম্বা।'

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সারা শরীর ঝাঁকাল ওজি হাবিব, যেন ভিজে বিড়াল গা থেকে পানি ঝরাচ্ছে। 'আইনে মানা আছে। নিষেধ আছে গোত্রের। আমার গোত্র আমাকে ঘৃণা করবে। আমাকে তাড়িয়ে দেবে।'

'আরও পাবে দশ বোতল জিন,' বলল চাখার সিং। 'সঙ্গে থাকবে তামাক, যতটা তুমি দু'হাত ধরে তুলতে পারো।'

আবার উরু সন্ধি চুলকাল ওজি হাবিব। 'কি বললেন? আবার বলুন। যতটা তামাক আমি দু'হাতে তুলতে পারি?' লোভে ও উত্তেজনায় তার গলা বেসুরো শোনাল। 'এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব না। ওরা মোলিমোকে ডাকবে। জনক আর জননীর অভিশাপ লাগবে আমাকে।'

'তাছাড়াও আমি তোমাকে একশোটা রুপোর মারিয়া থেরেসা ডলার দেব,' বুশ জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে এক মুঠো খুচরো পয়সা বের করল চাখার সিং। দু'হাতে নাড়াচাড়া করল ওগুলো, ঝন ঝন শব্দ উঠল।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ওজি হাবিব। তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে লাফ দিল সে, কোমর থেকে এক টানে বের করল ম্যাচেটিটা। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল চাখার সিং ও চণ্ডমণ্ড গড। তবে না, ওদের আক্রমণ করল না। সবেগে ঘুরল সে, মাথার ওপর ম্যাচেটি তুলে ছুটল বনভূমির পাঁচিল লক্ষ্য করে। প্রথম ঝোপটায় কোপ মারল সে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল পাতা আর কচি ডাল। একের পর এক, ঘন ঘন ম্যাচেটির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কয়েকটা ঝোপ। তারপর এক সময় শান্ত হলো ওজি হাবিব, ম্যাচেটির ওপর ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন উঁচু-নিচু হচ্ছে চওড়া বুক, ঘামের ধারাগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে তার দাড়ি। ফোঁপাতে শুরু করল সে, ক্লান্তি ও আত্মধিক্কারে।

একসময় সিধে হলো, আগের জায়গায় ফিরে এসে চাখার সিংকে বলল, 'আপনার জন্যে এই হাতিটাকে মারব আমি, তার দাঁত এনে দেব আপনাকে। বিনিময়ে ও-সব জিনিস আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন, যা যা দেবেন বলেছেন। কোন কারচুপি করবেন না। বিশেষ করে তামাক যেন কম না হয়।'

ফেরার পথে সাবধানে ল্যাণ্ডরোভার চালাচ্ছে চাখার সিং। প্রধান সড়কে পৌঁছুতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল তার। শ্রম শিবিরের শ্রমিকরা কাজ করছে রাস্তায়, প্রকাণ্ড আকারের ওর-ক্যারিয়ার আর লগিং ট্রাকগুলো সগর্জনে ছুটে যাচ্ছে খানিক পর পর। বাঁক ঘুরে সেঙ্গি সেঙ্গির পথ ধরল ওরা। পাশে বসা বন্ধুর দিকে ফিরে হাসল চাখার সিং। 'আপনার বাবার উপহারের ব্যবস্থা করা হলো। এবার আমার উপহারের কথা চিন্তা করা যাক।'

'আপনার উপহার?'

'মাসুদ রানার মুণ্ডু,' বলল চাখার সিং। 'তার কম কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হব না। ওটা আমাকে পরিবেশন করতে হবে রুপোর প্লেটে। মুখে থাকতে হবে একটা পাকা আপেল।'

তিন

সুযোগটা এল হঠাৎ।

মোমুর উঁচু কমাণ্ড ডেকে রয়েছে রানা, ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। ভেজা বাতাস নীলচে আর ভারি হয়ে রয়েছে, পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ ফুটের ওদিকে দৃষ্টি চলে না। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় কমাণ্ড কেবিন, ভেতরে ঢুকে গা বাঁচাচ্ছে সোফিয়া, বৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মূল্যবান ভিডিও ইকুইপমেন্টগুলো। দু'জন হিটা গার্ড ছিল, আপাতত তারা নিচের ডেকে নেমে গেছে। আপার ডেকে রানা একা।

অহরহ বৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। সেঙ্গি সেঙ্গিতে আসার পর দেখা যাচ্ছে প্রায় সারাক্ষণই ভিজে আছে ওর কাপড়চোপড়। এই মুহূর্তে কমাণ্ড কেবিন আর ফ্লাইং ব্রিজ-এর কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, কমাণ্ড কেবিনের ইস্পাতের দেয়াল আংশিক রক্ষা করছে ওকে বৃষ্টি থেকে। দমকা বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে বৃষ্টির পানি ভিজিয়ে দিচ্ছে, চোখ দুটো ওর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ করে কমাণ্ড কেবিনের দরজা খুলে ফ্লাইং ব্রিজে বেরিয়ে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। রানাকে তিনি দেখতে পাননি, ক্যানভাস সানশেডের নিচে দিয়ে সামনে এগোলেন, দাঁড়ালেন ফরওয়ার্ড রেইলিং-এর সামনে, উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে প্রকাণ্ড একস্‌কেভেইটর ব্লেডগুলোর দিকে তাকালেন। সত্তর ফুট নিচে মাটি কাটছে ওগুলো।

এরকম সুযোগ শুধু ভাগ্যগুণে পাওয়া যায়। এই প্রথম অপরাধী মি. গণ্ডকে

একা পেয়েছে ও। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অসহায় তিনি।

'তোমাকে মারছি আলির বদলে,' আপনমনে বলল রানা, এগোবার সময় রাবার সোল থেকে কোন শব্দ হলো না। ব্রিজের স্টীল প্লেট পিচ্ছিল হয়ে আছে ভিজে, খুব সাবধানে পা ফেলছে ও। চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল।

রানাকে এখন শুধু ঝুঁকে মি. গণ্ডের গোড়ালি দুটো ধরতে হবে। ঝট করে ওপর দিকে তুলে ঠেলে দিতে হবে সামনের দিকে। রেইলিং টপকে নিচে পড়বেন ভদ্রলোক, পড়বেন ব্লেডগুলোর ওপর। মৃত্যু হবে তাৎক্ষণিক। চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তাঁর গোটা শরীর, মাংসের টুকরোগুলো ঢুকে যাবে টিউব মিলে, লোহার বলগুলো পিষে ওগুলোকে মণ্ড তৈরি করবে, মিশিয়ে দেবে কয়েক শো টন মিহি পাউডারের মত মাটির সঙ্গে।

আরও এক পা এগিয়ে হাত বাড়াল রানা ধরার জন্যে। নিজের অজান্তেই ইতস্তত করল এক সেকেণ্ড, যেন হঠাৎ নিজের কাপুরুষতা উপলব্ধি করে হতভম্ব হয়ে গেছে। এটা তো স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন। এর আগেও ওর হাতে অনেক মানুষ মারা গেছে, তবে এভাবে নয়। নিজের প্রতি অদ্ভুত এক ধিক্কার জাগল মনে। প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগ না দিয়ে এভাবে চোরের মত আঘাত হানা কাপুরুষতা নয় তো কি!

আলি শাহের লাশটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। নিজেকে শক্ত করল রানা। না, কাজটা ওর এখুনি সেরে ফেলা দরকার। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, হঠাৎ ঝট করে ওর দিকে ঘুরলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

এত ক্ষিপ্র মনে হলো তাঁকে, যেন সাপ দেখে রুখে দাঁড়ানো একটা বেজি। তাঁর হাত দুটো উঁচু হলো, শক্ত কঠিন আঙুলসহ ওগুলো হয়ে উঠল মার্শাল আর্ট-এর ভঙ্গি নিয়ে ইস্পাতের পাত। কালো চোখে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে।

এক মুহূর্ত পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল ওরা, তারপর ফিসফিস করে চণ্ডমণ্ড গণ্ড বললেন, 'আপনার সুযোগ আপনি হারিয়েছেন, মি. মাসুদ রানা। আর কখনও পাবেন না।'

পিছিয়ে এল রানা। কোমল হৃদয় ও বিবেক ওকে ওর পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়েছে। আলি শাহের কাছে যেন ছোট হয়ে গেল ও। কোমল হৃদয় বা বিবেক, এ-সব তো এক ধরনের দুর্বলতা, ওর পেশায় একেবারেই অচল। অথচ ওর বেলায় এরকম প্রায়ই ঘটে। মানুষ নামের অযোগ্য নিষ্ঠুর পিশাচদের শায়েস্তা করার সময়ও মানবিক গুণগুলোকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে না। একদিন হয়তো ওর এই দুর্বলতার কারণেই চরম মূল্য দিতে হবে ওকে। চোখ-কান বুজে চীনা ক্রিমিন্যালকে খুন করা উচিত ছিল ওর। এখন আর তা সম্ভব নয়, সতর্ক হয়ে গেছে শত্রু। এই ঘটনার ফলে আগের চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

পিছিয়ে এসে ঘুরল রানা, তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হিটা গার্ডদের একজন চিতার মত নিঃশব্দে মই বেয়ে উঠে এসেছে ওপরে। ব্রিজের শেষ মাথার রেইলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, মেরুন রঙের বেরেট নেমে এসেছে একটা চোখের ওপর, কোমরের কাছে ধরা উজি সাবমেশিন গান রানার পেটে তাক করা। গোটা ব্যাপারটা চুপচাপ দেখছিল সে।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত ঘুম এল না রানার। সন্দেহ নেই, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও আজ। দৃশ্যটা মন থেকে মুছতে পারছে না, নার্ভাস লাগছে নিজেকে। আরও একটা কথা ভেবে অসুস্থ বোধ করল ও–চণ্ডমণ্ড গণ্ডের প্রতি ওর সীমাহীন আক্রোশ। ভদ্রবেশী শয়তানটার ওপর ওর ঘৃণা আর রাগ এত বেশি যে তাকে একা ও অসহায় দেখে অন্যায় সুযোগ নেয়ার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল।

বিবেক বাধা দিলেও, প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছাটা এতটুকু দুর্বল হয়নি ওর মনে। ভোরে ঘুম ভাঙার পর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের প্রতি আগের মতই ঘৃণা আর আক্রোশ অনুভব করল ও। শুধু মেজাজটা খিঁচড়ে আছে, নার্ভাস লাগছে খানিকটা।

বোধহয় সে-কারণেই সোফিয়ার সাথে একচোট হয়ে গেল ওর। দিনের কাজ শুরু করতে দেরি করে ফেলল মেয়েটা, রানাকে প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করিয়ে রাখল সে।

'তোমাকে ভোর পাঁচটার কথা বলেছিলাম, বিকেল পাঁচটার কথা নয়,' সোফিয়াকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল রানা।

মহা আনন্দে আছে সোফিয়া, রানার রাগ তাকে প্রথমে স্পর্শই করল না। হাসিতে উদ্ভাসিত লাল গোলাপ হয়ে আছে মেয়েটা। 'প্রভু, কি করতে বলেন আমাকে আপনি, হারা-কিরি?'

'জানতে পারি, এভাবে আমাকে দেরি করিয়ে দেয়ার কি কারণ?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রেগে আছো,' এখনও হাসছে সোফিয়া। 'আমি একটা মেয়ে, তা-ও আবার তরুণী ও যৌবনবতী, সকালে সামান্য দেরি করে ঘুম তো ভাঙতেই পারে।'

'এরকম অশ্লীল কথা বলতে তোমার লজ্জা লাগে না?'

'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা?' বাঁকা হাসি ফুটল সোফিয়ার ঠোঁটে। 'তুমি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ? ঈর্ষাকাতর, বন্ধু?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'এখন পস্তালে আর লাভ কি! এ-কথা বলতে পারবে না যে তোমাকে আমি সাধিনি। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার সঙ্গে আরও ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে তোমাকে, রানা। তোমার প্রতি দুর্বলতা থাকায় আমি হয়তো মাইণ্ড করব না, কিন্তু আমার ভক্তরা ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে না-ও নিতে পারেন!'

এভাবে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেবে সোফিয়া, ভাবতে পারেনি রানা। মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল ওর। কঠিন সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। হঠাৎ চিন্তা করল, সোফিয়া সম্ভবত গোসল না করে সরাসরি সিমন সাফারির বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। সন্দেহ হবার কারণ, মেয়েটার গা থেকে বেরুনো গন্ধটা। ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় কশিয়ে দেয় সোফিয়ার গালে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল ও, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সারাটা সকাল গম্ভীর হয়ে থাকল ও। ওর মেজাজ বুঝতে পেরে সোফিয়াও আর ওকে ঘাঁটাল না। মোমুর পথ তৈরি করার জন্যে বুলডোজার আর চেইন স' কাজ করছে, দৃশ্যটার ছবি তুলল ওরা। বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও কষ্টসাধ্য কাজ। বিপজ্জনকও বটে, চারদিকে একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছে

আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো। এ-সব মেজাজ ভাল করতে কোন সাহায্য করল না, তবু জিভটাকে সামলে রাখল রানা। কিন্তু দুপুরের দিকে আবার বিস্ফোরিত হলো।

সোফিয়া হঠাৎ করে বলল, তার টেপ শেষ হয়ে গেছে, কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। মেইন ক্যাম্পে ফিরে যেতে চায় সে, কোল্ড রুম থেকে টেপ আনতে হবে।

'কি রকম ক্যামেরা অপারেটর তুমি, শ্যুটিঙের মাঝখানে টেপ শেষ হয়ে যায়!' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা। 'তোমাকে নিয়ে এসে আমি দেখছি ভুলই করেছি।'

কোমরে হাত দিয়ে ওর মুখোমুখি হলো সোফিয়া। 'আমার ধারণাই ঠিক, রানা। ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে, সেটা কারণ নয়। কারণ হলো বঞ্চনা। সুস্বাদু ফ্রুটকেক তোমার কপালে জুটছে না। সিমন সাফারি ওই জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছেন, সেজন্যে তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছ না। এ সেই একচোখো দানব–ঈর্ষা!'

'চরিত্র বলে তো কিছু নেই-ই, তোমার ভেতর রুচি বলেও কিছু নেই,' হিসহিস করে উঠল রানা।

ব্যাপারটা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে গেল, রানার মুখের সামনে চিৎকার জুড়ে দিল সোফিয়া। 'জীবনে কেউ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি! তোমার চাকরির আমি নিকুচি করি!' পিচ্ছিল কাদার ওপর দিয়ে ল্যাণ্ডরোভারের দিকে ছুটল সে।

'ক্যামেরাটা ল্যাণ্ডরোভারে থাকবে,' চিৎকার করে বলল রানা। 'ভিডিও ইকুইপমেন্টগুলো সবই ভাড়া করা। লণ্ডনের রিটার্ন টিকেট তোমার সঙ্গেই আছে, পাওনা টাকার একটা চেক পাঠিয়ে দেব আমি। তোমাকে বরখাস্ত করা হলো।'

'জ্বী-না, লাভার বয়, তুমি আমাকে বরখাস্ত করছ না। আমি রিজাইন করছি!' ল্যাণ্ডরোভারের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করল সোফিয়া, স্টার্ট দিল এঞ্জিনে। চারটে চাকাই উন্মত্তের মত ঘুরতে শুরু করল, পিছন দিকে বিস্তৃত হলো কাদার চাদর। তারপর রাস্তা ধরে ছুটল ল্যাণ্ডরোভার।

সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করেছে সোফিয়া। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে সে। অন্ধ আক্রোশে ভাবছে, প্রতিশোধটা হওয়া চাই নিষ্ঠুর। সেঙ্গি সেঙ্গির কাছাকাছি পৌঁছে কি করতে হবে বুঝতে পারল সে। আপন মনে বিড়বিড় করল, 'আমাকে অপমান করার মজাটা তুমি টের পাবে, মাসুদ রানা।' বাঁকা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'উবোমোয় আর কোন ছবি তুলতে হবে না তোমাকে। তোমাকে বা আমার বদলে অন্য কোন ক্যামেরা অপারেটরকে সে সুযোগ দেয়া হবে না। দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।'

তাঁর শরীরটা লম্বা। আর এত নমনীয়, যে-কোন আকৃতি নিতে পারে। তাঁর চামড়া ধোয়া কয়লার মত চকচক করছে, প্রেম করার পর মিষ্টি ঘামে এখনও ভেজা ভেজা লাগছে। এলোমেলো সাদা চাদরে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন সিমন সাফারি, তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। তার মনে হচ্ছে, জীবনে সম্ভবত এত

সুন্দর পুরুষ আর দেখেনি সে।

ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে তাঁর নগ্ন বুকে মুখ রাখল সোফিয়া। বুকটা মসৃণ, কোন লোম নেই। কালো চামড়া খুব ঠাণ্ডা। মুখটা বুকের ওপর ঘষল সে, ঠোঁট বুলাল। প্রেমিক হিসেবে সিমন সাফারির তুলনা পাওয়া ভার, ভাবল সে। তার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ওঁর মত সুখ দিতে পারেনি তাকে। সে-ও ওঁকে যে ভালবাসা দিয়েছে, এরকম ভালবাসা আর কাউকে কোনদিন দিতে পারবে না। ওঁর জন্যে কিছু একটা করতে চায় সে।

'আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই,' সিমন সাফারির বুকে মুখ রেখে ফিসফিস করল সোফিয়া ক্যারল।

একটা হাত বাড়িয়ে তার মুখ থেকে চুলগুলো সরালেন সিমন সাফারি। 'কি কথা?' তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল, তবে প্রায় নির্লিপ্ত।

সোফিয়া জানে, এরপর যা বলবে সে, শুনে আঁতকে উঠবেন তার প্রেমিকপ্রবর। এই নির্লিপ্ত ভাবটা তখন আর থাকবে না। ইচ্ছে করেই কথাটা বলতে দেরি করছে সে। যতক্ষণ বলা না হয় ততক্ষণই তো উত্তেজনা আর মজা। মজাটা আসলে দু'ধরনের। কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে রানার ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে, সেই সঙ্গে সিমন সাফারির কাছে প্রমাণিত করা হবে নিজের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা।

'কি কথা?' আবার জানতে চাইলেন সিমন সাফারি। সোফিয়ার চুল মুঠোয় ধরে মোচড় দিলেন, যাতে ব্যথা পায় সে। আনন্দ দান ও আনন্দ গ্রহণের উপাদান হিসেবে ব্যথাকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে জানেন। উফ্ করে উঠল সোফিয়া, শুনে ধর্ষকামীর আনন্দ অনুভব করলেন তিনি।

'আমি যে সম্পূর্ণ আপনার, এটা প্রমাণ করার জন্যে কথাটা বলছি,' ফিসফিস করছে সোফিয়া। 'আমি চাই আপনি উপলব্ধি করুন কতটা গভীর ভাবে আপনাকে আমি ভালবাসি। আজ রাতের পর আমার আনুগত্য সম্পর্কে আপনার মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।'

সোফিয়ার মাথাটা এদিক ওদিক দোলালেন সিমন সাফারি, এখনও মুঠোর মধ্যে ধরে আছেন তার চুল। ব্যথা দিচ্ছেন, তবে সামান্য। 'সেটা বিচার করার ভার আমার ওপর থাক, প্রিয় গোলাপ। তোমার ভয়ংকর কথাটা শোনাও এবার।'

'ভয়ংকর তো বটেই, সিমন সাফারি। মাসুদ রানার নির্দেশে ফিশ ঈগল বে-র ঘটনাটা আমি ক্যামেরায় বন্দী করেছি।'

সিমন সাফারি হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করলেন। সোফিয়ার কানে তাঁর হৃৎপিণ্ড বিশবার ধকধক করল, তারপর ধীরে ধীরে দম ফেললেন তিনি, পালস রেট সামান্য বাড়ল। শান্ত গলায় বললেন, 'কি নিয়ে কথা বলছ বুঝলাম না। ব্যাখ্যা করো।'

'সৈনিকরা যখন জেলেদের গ্রামে এল, আমি আর রানা পাহাড়ের মাথায় ছিলাম। রানা আমাকে ওদের ছবি তোলার নির্দেশ দেয়।'

'কি দেখলে তোমরা?'

'প্রথমে গ্রামে আগুন দিল ওরা, তারপর পুড়িয়ে দিল বোটগুলো। গ্রামের লোকদের তোলা হলো ট্রাকে। কয়েকজনকে...।' ইতস্তত করে থেমে গেল সোফিয়া।

'বলো, থামলে কেন? আর কি দেখলে তোমরা?'

'আমরা দেখলাম, কয়েকজন লোককে গুলি করে মারল হিটা সৈনিকরা। লাশগুলো ওরা আগুনে ফেলে দিল।'

'এ-সব তোমরা ক্যামেরায় ধরেছ?' জানতে চাইলেন সিমন সাফারি। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে, হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সোফিয়া। অনিশ্চিত একটা ভাব জাগল তার মনে।

'গোটা ব্যাপারটার ছবি তুলতে রানা আমাকে বাধ্য করে।'

'এ-সব ঘটনা সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, বলতে হবে মারাত্মক একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে—আমার কোন নির্দেশ ছাড়াই।' গম্ভীর হলেন সিমন সাফারি।

স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল সোফিয়া, তাঁর কথা বিশ্বাস করছে সে। 'আপনি যে কিছু জানেন না, এ আমি তখনই বুঝতে পারি।'

'ফিল্মটা আমাকে দেখতে হবে,' বললেন সিমন সাফারি। 'যারা অপরাধটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ওটা একটা প্রমাণ হিসেবে কাজ দেবে। ওদেরকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। ফিল্মটা কোথায়?'

'রানার কাছে।'

'কোথায় রেখেছেন তিনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট, কর্কশ ও কঠিন শোনাল তাঁর গলা।

'আমাকে বলল, কাহালিতে রেখেছে, ব্রিটিশ দূতাবাসে।'

'ব্রিটিশ দূতাবাসে!' প্রায় আঁতকে উঠলেন সিমন সাফারি।

'রাষ্ট্রদূত স্যার মাইকেল ডাফ রানার পুরানো বন্ধু।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন সিমন সাফারি, তারপর জানতে চাইলেন, 'রাষ্ট্রদূতকে ছবিটা দেখিয়েছেন মি. রানা?'

'মনে হয় না। আমাকে শুধু বলল, জিনিসটা ডিনামাইট, সময় না হলে ওটা সে ব্যবহার করবে না।'

'তারমানে শুধু তুমি আর মি. রানা ছাড়া আর কেউ ব্যাপারটা জানে না? ফিল্মটার যে অস্তিত্ব আছে, তা-ও আর কেউ জানে না, কেমন?'

ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে চিন্তা করেনি সোফিয়া। সিমন সাফারির কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করল সে। 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। যদি না রানা আর কাউকে জানিয়ে থাকে। আমি কাউকে বলিনি।'

'গুড।' সোফিয়ার চুল ছেড়ে দিয়ে তার গালে আঙুল বুলিয়ে আদর করলেন সিমন সাফারি। 'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। সত্যি আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি যে আমার প্রতি অনুগত, এটা প্রমাণ হয়েছে।'

'শুধু অনুগত নই, সিমন সাফারি। কোন পুরুষমানুষ এভাবে আমাকে দুর্বল করতে পারেনি। আপনার জন্যে জীবন দিতে হলেও দ্বিধা করব না। আমি

আপনাকে ভালবাসি।'

'জানি,' ফিসফিস করলেন প্রেসিডেন্ট, সোফিয়ার মাথা তুলে চুমো খেলেন ঠোঁটে। 'সত্যি তুমি দারুণ এক মেয়ে। প্রতি মুহূর্তে তোমার ওপর আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছি আমি। একেই বোধহয় ভালবাসা বলে।'

কৃতজ্ঞতায় তাঁর গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল সোফিয়া। খসখসে গলায় বলল, 'আপনাকে আমার কি যে ভাল লাগে!'

'স্যার মাইকেলের কাছ থেকে ফিল্মটা যেভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে, সোফিয়া। এই দেশের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে ওটা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমারও সর্বনাশ করে দিতে পারে।'

'আমার উচিত ছিল আরও আগে আপনাকে জানানো,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু তখন আমি বুঝিনি আপনাকে কতটা ভালবাসি।'

'এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি,' তাকে আশ্বস্ত করলেন সিমন সাফারি। 'কাল সকালে মি. রানার সঙ্গে কথা বলব আমি। তাঁকে আমি প্রতিশ্রুতি দেব, অপরাধীরা সবাই উপযুক্ত শাস্তি পাবে। কাজেই প্রমাণ হিসেবে ফিল্মটা তাঁর আমাকে না দিলেই নয়।'

'রানা ওটা আপনাকে দিতে চাইবে বলে মনে হয় না আমার,' বলল সোফিয়া। 'টেপটা আসলে একটা বোমা। তার কাছে ওটার দাম কয়েক মিলিয়ন। সহজে সে দিতে চাইবে না।'

'সেক্ষেত্রে ওটা পাবার জন্যে আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। এ তো সত্যি যে ওটা তোমার তোলা ফিল্ম। আমার প্রিয় গোলাপ, বলো আমাকে তুমি সাহায্য করবে।'

'আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি,' বিড়বিড় করল সোফিয়া। 'বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে আমি মরতেও পারি।' নিজের অজান্তে নিজের নিয়তির লিখন পাঠ করছে সে।

আর কোন কথা হলো না, সিমন সাফারি ও সোফিয়া আবার মিলিত হলো।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সোফিয়া।

বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল তার। ভীতিকর সবুজ নরকটায় যেন সারাক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছে, ভাবল সে। ভিআইপি গেস্ট বাংলোর ছাদে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে একটানা। চারদিক গভীর ও গাঢ় অন্ধকার।

বিছানাটা হাতড়াল সোফিয়া। তার পাশে জায়গাটা খালি, কেউ নেই। সিমন সাফারি গেলেন কোথায় এই মাঝরাতে? যেখানে শুয়েছিলেন, সোফিয়ার পাশে চাদরটা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। তারমানে অনেকক্ষণ আগেই বিছানা ছেড়েছেন তিনি। বাথরূমে গেলেন নাকি? বাথরূমের কথা ভাবতে নিজের ব্লাডারে চাপ অনুভব করল সোফিয়া। বুঝল, সেজন্যেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকে সিমন সাফারির ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে সে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। বিছানার ওপর বসল সোফিয়া। অন্ধকার, মশারির বাইরে কিছুই দেখা যায় না। আরও দু'মিনিট পর মশারি তুলে বেরিয়ে এল বাইরে। অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে এগোল বাথরূমের দিকে। ধাক্কা খেল

একটা চেয়ারের সঙ্গে, খালি পায়ের একটা আঙুল প্রায় থেঁতলে গেল। তারপর আলো জ্বালল সে।

বাথরূমে কেউ নেই। তবে টয়লেট সীট-এর ঢাকনি তোলা রয়েছে দেখে বোঝা গেল তার আগে সিমন সাফারি ভেতরে ঢুকেছিলেন। ঢাকনিটা নামিয়ে বসল সোফিয়া। তার পরনে কোন কাপড় নেই। চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে। এলোমেলো মাথার চুল প্রায় ঢেকে রেখেছে চোখ দুটো।

বাইরে এখনও তুমুল বৃষ্টি। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় আলোকিত হয়ে উঠছে জানালাটা। পাশের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে টয়লেট পেপার নিতে গেল সোফিয়া, বাংলোর পাতলা পার্টিশনের কাছাকাছি চলে এল তার কান। গলার আওয়াজ পেল সে। অস্পষ্ট, তবে পুরুষালি। পাশের কামরা থেকে আসছে।

ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠছে সোফিয়া। মাথাচাড়া দিল কৌতূহল। পার্টিশনের গায়ে কান ঠেকাল সে, এবার সিমন সাফারির গলা চিনতে পারল। তাঁর কথার উত্তর দিল কেউ একজন, যদিও বৃষ্টির শব্দে ভাল করে শোনা গেল না।

তারপর আবার সিমন সাফারির গলা শোনা গেল। 'না,' বললেন তিনি। 'আজ রাতে। আমি চাই কাজটা এখুনি করা হোক।' এতক্ষণে সতর্ক হয়ে উঠেছে সোফিয়া। আর ঠিক তখনই নাটকীয় ভাবে থেমে গেল বৃষ্টি। নিস্তব্ধতা নেমে আসায় ওদের কথা এবার পরিষ্কার শুনতে পেল সে। সিমন সাফারি থামতে আরেকজন কথা বলল। পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'আপনি কি ওয়ারেন্টে সই করবেন, মি. প্রেসিডেন্ট?' প্রশ্ন করল চাথার সিং। 'আপনার সৈনিকরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে পারবে।'

'বোকার মত কথা বলবেন না, মি. সিং। আমি চাই কাজটা গোপনে সারা হবে। স্রেফ খতম করুন ওকে। ক্যাপ্টেন সোলের সাহায্য নিতে পারেন, তবে দেরি করবেন না। কোন প্রশ্ন উঠবে না, লিখিত কিছু থাকবে না। স্রেফ গায়েব করে দিন ওকে।'

'ও, আচ্ছা—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বলা হবে জঙ্গলে উনি ছবি তুলতে গেছেন। পরে আমরা একটা সার্চ পার্টি পাঠাব, কিন্তু তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। কিন্তু মেয়েলোকটার কি হবে? ফিশ ঈগল বে-তে আমরা যে আয়োজন করেছিলাম, সে-ও তার একজন সাক্ষী। আপনি কি চান আমি তারও একটা ব্যবস্থা করি?'

'না! আপনি বোকা নাকি, মি. সিং! দূতাবাস থেকে ফিল্মটা উদ্ধারের জন্যে তার সাহায্য দরকার হবে আমাদের। পরে, টেপটা আমার হাতে এসে পৌছুলে, মেয়েলোকটার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব আমি। তার আগে আপনি শুধু মি. রানাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খতম করুন। পারবেন তো? আপনার ওপর ভরসা রাখতে পারি আমি?'

'সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন। বিশ্বাস করুন, মি. প্রেসিডেন্ট, কাজটা করে আনন্দ পাব আমি। এ আনন্দের কোন তুলনা হয় না। সোলের সঙ্গে বসে

আয়োজনটা চূড়ান্ত করতে এক ঘণ্টা লাগবে আমার। তবে সকাল হবার আগেই কাজটা শেষ করব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

মেঝেতে ঘষা খেল একটা চেয়ার, তারপর শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। একটা দরজা বন্ধ হলো। বাংলোর সিটিংরূমে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

স্থির পাথর হয়ে গেছে সোফিয়া। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাগুলো সত্যি শুনেছে সে। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে দাঁড়াল, ছুটে গিয়ে অফ করল বাথরূমের আলো। তাড়াতাড়ি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বেডরূমে চলে এল সে, মশারি তুলে ঢুকে পড়ল বিছানায়। চাদরের তলায় আড়ষ্ট হয়ে থাকল তার শরীর, জানে যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবেন সিমন সাফারি।

তার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে। কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছে না। এ-ধরনের কিছু যে ঘটতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সে।

তার ধারণা ছিল, সিমন সাফারি টেপটা সংগ্রহ করবেন, আর সম্ভবত গ্রেফতার করা হবে রানাকে, তারপর অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে উবোমো থেকে বের করে দেয়া হবে ওকে–বা এ-ধরনের কিছু। আসলে রানাকে নিয়ে কি করতে পারেন প্রেসিডেন্ট, এ-ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি সে। কিন্তু ভুলেও ধারণা করেনি যে ওকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করবে কেউ। কোন বিচার না, অনুশোচনা না, স্রেফ একটা পোকার মত পিষে মেরে ফেলার কথা বলবে কেউ। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ যেন তার চৈতন্য ফিরে এসেছে, বুঝতে পারছে কি সাংঘাতিক একটা বোকামি করে বসেছে সে।

আঘাতটা সামলে উঠতে পারছে না সোফিয়া, মনে হচ্ছে দম আটকে মারা যাবে সে। রানাকে আসলে সে কোনদিনই ঘৃণা করেনি। এরকম একজন মানুষকে কেউ কোনদিন ঘৃণা করতে পারে না। ওর মধ্যে ঋষিতুল্য এমন কিছু গুণ আছে, তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও ওকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। ঘৃণা করার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং ওর প্রতি অদ্ভুত একটা স্নেহ আছে তার। যদিও একসময় রানা তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। এ-কথাও সত্যি যে ওর জীবনে সিমন সাফারি আসার পর রানা তাকে অপমান করেছে, এমন কি বরখাস্ত করেছে, তবু ওর আচরণের পিছনে সঙ্গত কিছু কারণ আছে জানে বলে ওকে ঘৃণা করার প্রশ্ন কখনোই ওঠেনি। রানা খুন হোক, এটা কিভাবে চাইতে পারে সে!

'ব্যাপারটা থেকে দূরে সরে থাকো,' নিজেকে সাবধান করল সোফিয়া। 'যে ভুল করেছ তা আর সংশোধন করার সময় নেই। রানা ওর ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিক।'

বিছানায় শুয়ে সিমন সাফারির জন্যে অপেক্ষা করছে সে, কিন্তু তিনি ফিরে না আসায় আবার রানার কথা ভাবল। অল্প যে-ক'জন লোককে অন্তর থেকে ভাল লেগেছে তার, তাদের মধ্যে রানা একজন। কেন যেন, দেখলেই ভাল লাগে। এমনকি রানা তাকে প্রত্যাখ্যান করার পরও এই ভাল লাগার অনুভূতিটা হারিয়ে যায়নি ওর মন থেকে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভদ্র সে, সুদর্শন, বিবেচক···চিন্তার

ধারাটা দ্রুত বদলাল সোফিয়া।

হৃদয়টাকে রক্তাক্ত কোরো না। তুমি যেভাবে ভেবেছিলে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটছে না, তবে এটাকে বলতে হবে রানার দুর্ভাগ্য।

কিন্তু আরেকটা কথা। সিমন সাফারি যা বললেন, তার প্রতি যেন প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি আছে। তিনি বললেন, 'টেপটা আমার হাতে এসে পৌঁছুলে, মেয়েলোকটার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব আমি।' আমি একটা মেয়েলোক? ওর বা তার বলতে পারতেন। মেয়েলোক তো তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করলে বলা হয়। আমি একটা সমস্যা? কিন্তু আমি যে এত বড় একটা উপকার করলাম?

সিমন সাফারি এখনও আসছেন না। বিছানায় বসে কান পাতল সোফিয়া। অনেক আগেই থেমে গেছে বৃষ্টি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মশারি থেকে বেরিয়ে এল সে। বিছানার নিচের দিক থেকে ম্যাক্সিটা তুলে নিয়ে পরল। দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ছিটকিনি খুলে তাকাল বারান্দায়।

কাউকে দেখা গেল না। কিছুই নড়ল না। নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। তারপর বারান্দা ধরে সামনে এগোল। সিটিংরূমের জানালা থেকে আলো এসে পড়েছে বারান্দার মেঝেতে। জানালাটার পাশে ছায়ায় দাঁড়াল সে। সাবধানে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল।

সিটিংরূমের আরেক প্রান্তে, দেয়ালের দিকে মুখ করে একটা ডেস্কে বসে রয়েছেন সিমন সাফারি, তার দিকে পিছন ফিরে। পরে আছেন খাকি টি-শার্ট আর ক্যামোফ্লেজ ট্রাউজার। হাতে সিগারেট, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কাগজ-পত্রে চোখ বুলাচ্ছেন। দেখে মনে হলো কাজের ভেতর একেবারে ডুবে আছেন।

গেস্ট বাংলোগুলো কম্পাউণ্ড-এর পুবদিকে, ওখানে গিয়ে নিজের বেডরূমে ফিরে আসতে মিনিট দশেক সময় লাগবে সোফিয়ার।

কাঠের ক্যাটওয়াক ভিজে লাল কাদায় পিচ্ছিল হয়ে আছে। তার পায়ে জুতো নেই। গিয়ে হয়তো দেখা যাবে ওর কামরায় নেই রানা। মনে মনে না যাবার অজুহাত তৈরি করছে সোফিয়া। সে সাবধান করলেও, রানা হয়তো তার কথায় কোন গুরুত্ব দেবে না।

রানার কাছে কোন ভাবে ঋণী নই আমি, ভাবল সে। তারপর আবার সিমন সাফারির নির্দেশটা মনে পড়ে গেল, '···আপনি শুধু মি. রানাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খতম করুন···।'

আলোকিত জানালার পাশ থেকে পিছিয়ে এল সোফিয়া, এখনও জানে না ঠিক কি করবে সে। তারপর কখন যে ক্যাটওয়াক ধরে ছুটতে শুরু করেছে, নিজেও বলতে পারবে না। গাছের ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে নিচে। তক্তার ওপর পিছলে গেল পা, ছিটকে পড়ল কাদার ওপর। উঠল, ছুটল আবার। ম্যাক্সির সামনের দিকটা লাল কাদায় ভরে গেল।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে সারি সারি গেস্টরূমগুলো দেখতে পেল সোফিয়া। মাত্র একটা রূমে আলো জ্বলছে, বাকিগুলো অন্ধকার। কাছাকাছি এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, আলোটা রানার কামরায় জ্বলছে।

গেস্ট হাউসের বারান্দায় উঠল না, তক্তা ফেলা পথের ওপর থেকে লাফ দিয়ে

নেমে ভবনটার পিছন দিকে চলে এল সোফিয়া। রানার জানালায় পর্দা ঝুলছে। লোহার জাল নখ দিয়ে আঁচড়াল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাঠের মেঝেতে চেয়ার সরাবার শব্দ হলো।

আবার নখ ঘষে আওয়াজ করল সোফিয়া। নিচু গলায় ভেতর থেকে জানতে চাইল রানা, 'কে?'

'ফর গডস সেক, রানা, আমি সোফিয়া! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'ভেতরে এসো, দাঁড়াও, দরজা খুলছি।'

'না-না! সময় নেই! তুমি বেরিয়ে এদিকে চলে এসো। তা না হলে ওরা আমাকে দেখে ফেলবে! জলদি, রানা, জলদি!'

আধ মিনিট পর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ ও চওড়া একটা কাঠামো, আলোকিত জানালাটা তার পিছনে।

'রানা, ফিশ ঈগল বে টেপ সম্পর্কে সিমন সাফারি জানেন!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সোফিয়া।

'কিভাবে জানলেন?'

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'তুমি তাঁকে বলেছ, তাই না?'

'জাহান্নামে যাও···তোমাকে আমি সাবধান করতে এসেছি। উনি নির্দেশ দিয়েছেন, এই মুহূর্তে তোমাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ক্যাপটেন সোলকে নিয়ে এখুনি তোমার কাছে আসছে চাখার সিং। ওরা তোমাকে জঙ্গলে নিয়ে যাবে। ওরা কোন প্রমাণ রাখতে চায় না।'

'এ-সব তুমি জানলে কিভাবে?'

'বোকার মত প্রশ্ন করবে না! বিশ্বাস করো, আমি জানি। সময় নেই, আমি যাই। আমাকে না দেখলে সিমন সাফারি বুঝে ফেলবেন আমি তোমাকে সাবধান করতে এসেছি।' ফেরার জন্যে ঘুরল সোফিয়া।

তার একটা হাত ধরে আবার নিজের দিকে ফেরাল রানা। 'ধন্যবাদ, সোফিয়া,' বলল ও। 'নিজেকে যতটা ভাল মনে করো তারচেয়ে অনেক ভাল মেয়ে তুমি। চাও, আমার সঙ্গে তুমিও পালাবার একটা সুযোগ নেবে?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। কেন যেন তার কান্না পাচ্ছে। 'আমার কিছু হবে না,' বলল সে। 'তুমি যাও। সময় কিন্তু খুব কম, রানা। দেরি কোরো না, এখুনি বেরিয়ে পড়ো।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে আবার ছুটল সোফিয়া, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। লম্বা সাদা ম্যাক্সিতে দেবীর মত লাগছে তাকে।

'অদ্ভুত এক দেবীই বটে,' বিড়বিড় করল রানা, অন্ধকারে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। কি করবে ভাবছে।

শুধু চাখার সিং আর চণ্ডমণ্ড গণ্ড হলে কথা ছিল, ওদের দুজনের সঙ্গে গোপন লড়াইয়ে তবু জেতার একটা সম্ভাবনা ছিল রানার। ওর মতই, তাদেরকেও যা কিছু করার গোপনে করতে হত। দু'দলের কেউই প্রতিপক্ষকে

প্রকাশ্যে আক্রমণ করতে পারত না। কিন্তু তাদের দলে সিমন সাফারি যোগ দেয়ায় ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়েছে। ওকে খুন করার লাইসেন্স পেয়ে গেছে চাখার সিং, লাইসেন্সটা দিয়েছেন এ-দেশের প্রেসিডেন্ট। নেকড়ের মত নীরস হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। লাইসেন্স পাওয়ামাত্র চাখার সিং কাজে নেমে পড়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সোফিয়ার কথাই ঠিক। সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে পালাতে হবে ওকে, খুনীরা এসে পৌঁছুবার আগেই। তারমানে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে ওর হাতে।

ভবনের কোণ থেকে বারান্দা ও কমপাউণ্ড-এর চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চুপিসারে নিজের কামরায় ফিরে এল ও। কাবার্ড থেকে ছোট ট্রাভেল ব্যাগটা নামাল। ভেতরে ওর ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র রয়েছে–পাসপোর্ট, এয়ারলাইন টিকেট, ক্রেডিট কার্ড ও ট্রাভেলার্স চেক। টয়লেট ব্যাগ আর কাপড়চোপড় ছাড়া আর তেমন কিছু নেই কামরায়।

লাইট উইওচিটার পরল রানা, ল্যাণ্ডরোভারের চাবি পকেটে আছে কিনা দেখে নিল। তারপর আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বারান্দার শেষ মাথার দিকে রয়েছে ল্যাণ্ডরোভার, নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও। দরজা খুলে ব্যাগটা প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর রাখল। ভাড়া করা সবগুলো ভিটিআর ইকুইপমেন্ট পিছনের কমপার্টমেন্টে প্যাক করা অবস্থায় রয়েছে, আর লকারে আছে ফার্স্ট-এইড ও ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট। তবে কোন অস্ত্র নেই, পুরানো হান্টিং নাইফটা ছাড়া।

ল্যাণ্ডরোভার স্টার্ট দিল রানা। অন্ধকারে এঞ্জিনের শব্দ বড় বেশি জোরাল লাগল কানে। হেডলাইট না জ্বেলে ধীরে ধীরে ক্লাচ ছাড়ল ও, এঞ্জিনের লাগাম টেনে ধরে রাখল। অন্ধকার উঠান ধরে মেইন গেটের দিকে মন্থরবেগে এগোল ল্যাণ্ডরোভার। ও জানে, রাতে গেট কখনও বন্ধ করা হয় না, তবে একজন গার্ড ওখানে ডিউটি দেয়।

ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না ও, জানে রানা। সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে একটাই রাস্তা উবোমো রিভার ফেরীর দিকে চলে গেছে। রাস্তাটায় প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর একটা করে রোড ব্লক।

সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে রেডিওর সাহায্যে সতর্ক করা হবে প্রতিটি রোড-ব্লককে। এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে সৈনিকরা। উঁহু, প্রথম রোড-ব্লকটা পেরুতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে রানা, তারপর ঢুকতে হবে জঙ্গলে। চিন্তাটা সুখকর নয়। রেইন ফরেস্ট-এ পথ হারিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তবে অন্য কোন উপায়ও নেই।

প্রথম কাজ সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে কেটে পড়া। তারপর যখন যে সমস্যায় পড়বে তখন সেটার সমাধান করতে হবে।

আর এটাই হলো প্রথম সমস্যা, মেইন গেটের ফ্লাডলাইট হঠাৎ জ্বলে উঠতে দেখে ভাবল রানা। গোটা উঠান দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল।

ব্যারাক এলাকা থেকে পাঁচ-সাতটা মূর্তি ছুটে আসছে, ওদিকেই থাকে গার্ডরা। দেখেই বোঝা যায়, তাড়াহুড়োর মধ্যে কাপড় পরেছে তারা, কেউ কেউ শুধু আণ্ডারভেস্ট আর শর্টস পরে আছে। চাখার সিং আর ক্যাপটেন সোল, দু'জনকেই চিনতে পারল রানা।

সোলের হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল, তার পিছু নিয়ে দৌড়াচ্ছে চাখার সিং, হঠাৎ গতি বেড়ে ওঠা ল্যাণ্ডরোভারের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে চিৎকার করছে থামার জন্যে। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার মাথার পাগড়িটা। গার্ডদের একজন গেটটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে তৈরি লোহার জাল ঢাকা গেটের একটা পাল্লা এরই মধ্যে রাস্তার প্রায় মাঝখানে এনে ফেলেছে সে।

ল্যাণ্ডরোভারের হেডলাইট জ্বালল রানা, হর্নের বোতামে চেপে রাখল একটা হাত, গতি আরও বাড়িয়ে দিল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একদিকে লাফ দিল গার্ড, গেটের তালা না লাগানো পাল্লা ল্যাণ্ডরোভারের ধাক্কায় পুরোপুরি খুলে গেল। সগর্জনে বেরিয়ে এল গাড়ি।

পিছন থেকে ভেসে এল অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ। ল্যাণ্ডরোভারের অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে চার-পাঁচটা বুলেট লাগল, হুইলের নিচে মাথা নামিয়ে আত্মরক্ষা করল রানা, অ্যাকসিলারেটরে চেপে রেখেছে পা।

প্রথম বাঁকটা সবেগে ছুটে এল ওর দিকে। আরও এক পশলা গুলি লাগল ল্যাণ্ডরোভারের পিছনে। পিছনের জানালা বিস্ফোরিত হলো, মেরুদণ্ডের কাছে একটা ধাক্কা খেল রানা। আগেও গুলি খেয়েছে ও, অনুভূতিটা কি রকম হয় জানে। পিঠের ওপর দিকে ঢুকেছে বুলেট, শিরদাঁড়ার কাছাকাছি—ডাক্তারদের ভাষায়, মারাত্মক আঘাত। সারা শরীর আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল রানার, আশঙ্কা করল শিরা ছিঁড়ে যাওয়ায় রক্তক্ষরণ শুরু হবে ফুসফুসে।

যত দূর সম্ভব সরে যাও, নিজেকে পরামর্শ দিল রানা। গতি না কমিয়ে বাঁক ঘুরল ও। দু'চাকার ওপর ভর দিয়ে মোড় নিল ল্যাণ্ডরোভার, একটুর জন্যে ওল্টাল না।

রিয়ার-ভিউ মিররে যখন তাকাল রানা, গাছপালার আড়ালে ক্যাম্পের আলো অস্পষ্ট দেখাল। অন্ধকারে আলোর একটা আভা মাত্র।

রক্তের গরম স্রোত পিঠ বেয়ে নেমে আসছে। গলায় এখনও কোন বাধা অনুভব করছে না বা কাশি পাচ্ছে না। নিজেকে ওর দুর্বলও লাগছে না। তবে পরে কি হবে কে জানে। ক্ষতটা অসাড় হয়ে আছে। পরিষ্কার কাজ করছে মাথা। থামার কোন দরকার নেই, এগিয়ে যেতে পারবে ও।

প্রথম রোড-ব্লকটা কোথায় জানে রানা। 'প্রায় পাঁচ মাইল সামনে,' মনে করিয়ে দিল নিজেকে। 'প্রথম নদী পারাপারে।'

রাস্তাটা কিভাবে ওখানে পৌঁচেছে মনে করার চেষ্টা করল। গত তিন দিন ছবি তোলার কাজে ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে বেশ ক'বার ওদিকে যাওয়া হয়েছে ওর। রাস্তার প্রতিটি মোচড় আর বাঁক মনে করতে পারছে।

একটা সিদ্ধান্তে এল রানা। হেলান দিল সীটের গায়ে। হঠাৎ পিঠে কেউ যেন

ছুরি মারল। এখনও রক্ত গড়াচ্ছে, তবে আগের চেয়ে কম।

রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভেতরে, ভাবল রানা। এ-যাত্রা তোমার রক্ষা নেই হে।

তবু ল্যাণ্ডরোভারের গতি ধরে রাখল ও। দুর্বল হয়ে পড়ার আগে যত দূর সম্ভব সরে যেতে হবে।

প্রথম রোড-ব্লকের আগে মেইন হাইওয়ে থেকে পাঁচটা লগিং রোড বেরিয়েছে। কোন কোনটায় আগাছা জন্মেছে, ব্যবহার করা হয় না। তবে অন্তত দুটোয় প্রতিদিন ভারি যানবাহন চলাচল করে। এই দুটোর প্রথমটাকে বেছে নিল রানা, সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে দু'মাইল দূরে। শাখা রোডটায় ঢুকে পশ্চিম দিকে এগোল ল্যাণ্ডরোভার। ওদিকে জায়ারে সীমান্ত, নব্বুই মাইল দূরে। লগিং ট্রাকগুলো অবশ্য বনভূমির ভেতর দিয়ে মাইল পাঁচেকের বেশি এগোয় না, তার আগেই পেয়ে যায় মোমুর তৈরি খাদ।

ল্যাণ্ডরোভারটা কোথাও লুকিয়ে রেখে বাকি আশি মাইল পায়ে হেঁটে এগোতে হবে রানাকে। এই জঙ্গল সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই। শেষ দিকটায় উঁচু পাহাড় পড়বে সামনে, পেরুতে হবে বরফ ঢাকা প্রান্তর। পিঠে গাঁথা বুলেটের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুঝল, স্বপ্ন দেখছে ও। এই দূরত্ব পাড়ি দেয়া ওর পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে না।

রাস্তাটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। গর্তগুলো কোথাও কোথাও হাঁটু সমান গভীর। লাল ধুলোর মেঘ প্রায় ঢেকে দিল উইণ্ড স্ক্রীন, ঝাপসা করে দিল হেডলাইটের আলো। সামনের রাস্তা মাত্র বিশ ফুট পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও।

পিঠের ক্ষতটা ব্যথা দিতে শুরু করেছে। তবে মাথাটা এখনও পরিষ্কার। হাত দুটো চোখের সামনে তুলল রানা—না, কাঁপছে না।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, গাছপালার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। একটা লগিং ট্রাক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওটাকে দেখেই একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ল্যাণ্ডরোভারের গতি কমিয়ে রাস্তার দু'পাশের ঝোপগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। একটা ফাঁক দেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে, নিভিয়ে দিল হেডলাইট।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ এগিয়ে এসে থামল ল্যাণ্ডরোভার, ঘন আর উঁচু ঝোপ প্রায় ঢেকে রেখেছে ওটাকে, রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, কান পেতে শুনল লগিং ট্রাকটা ওর ফেলে আসা রাস্তা ধরে সেঙ্গি সেঙ্গির দিকে চলে গেল।

ট্রাকের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পর সিটে বসেই সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, পিঠের ক্ষতটা পরীক্ষা করবে। ভয়ে ভয়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হাত পিঠে তুলল, আঙুলগুলো একটু একটু করে এগোল ক্ষতটার দিকে।

হঠাৎ চিৎকার করল রানা, 'আরে!' যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ক্ষতের মুখ থেকে সরে এল হাতটা। ভেতরের আলো জ্বালল ও, তারপর আবার আঙুলের ডগা দিয়ে ক্ষতটার মুখ পরীক্ষা করল। মসৃণ কি যেন ঠেকছে আঙুলে, মসৃণ আর পিচ্ছিল। চারপাশে আঙুল বুলাতে মনে হলো জিনিসটা লম্বাটে টিউব আকৃতির। স্বস্তিতে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। বুলেটই ঢুকেছে ওর পিঠে, তবে চামড়ার নিচেই লুকিয়ে রয়েছে ওটা, পাঁজরের হাড় ভেঙে গভীরে ঢুকতে পারেনি। একটু

চেষ্টা করলে হয়তো নখ দিয়ে খুঁটলেই বের করে আনা যাবে।

শরীরটা শক্ত করে নখ দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল রানা। ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে এল ওর। প্রথমে সামান্য একটু নড়ল বুলেটটা, তারপর যেন আরও একটু ভেতর দিকে ঢুকে গেল। একবার যখন শুরু করেছে, হাল ছাড়ার পাত্র নয় ও। মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করার পর ঠিকই মাংসের ভেতর থেকে বের করে আনল ওটাকে। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, তবে নিজেকে অভয় দিল রানা, এতে তুমি মরবে না। বুলেটটা জানালা দিয়ে ঝোপের ভেতর ফেলে দিল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফার্স্ট এইড কিটটা।

ক্ষতটা পিঠে, যত্ন নেয়া কঠিন। তবু প্রচুর পরিমাণে বেটাডিন অয়েন্টমেন্ট লাগাল রানা, কোন রকমে একটা ব্যাণ্ডেজও বাঁধল, গিটটা থাকল ওর বুকের মাঝখানে।

কাজ করার সময় সারাক্ষণ রাস্তার দিকে কান পেতে ছিল রানা, তবে শুধু পোকা-মাকড় আর জীব-জন্তুর ক্ষীণ আওয়াজ পেয়েছে।

হাতে টর্চ নিয়ে রাস্তায় উঠে এল রানা। ও যেমন আশা করেছিল, লগিং ট্রাকের ভারি চাকা ল্যাণ্ডরোভারের তৈরি সমস্ত দাগ বদলে দিয়েছে। অক্ষত দাগ দেখা গেল শুধু ঝোপগুলোর কাছাকাছি, যেগুলো ভেঙে জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছে ওটা। পাতাসমেত একটা ভাঙা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে জায়গাটা ঝাড়ু দিল ও, তারপর কাদার ওপর শুকনো মাটি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। এখন আর দাগগুলো চেনা যাবে না। গাছের ডালটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিল রানা, এই সময় দেখতে পেল সেঙ্গি সেঙ্গির দিক থেকে আরেকটা লগিং ট্রাক আসছে।

মুখে খানিকটা কাদা মেখে পিছিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকল রানা, মাটিতে শুয়ে তাকিয়ে থাকল রাস্তার দিকে। ওর পরনের উইণ্ডচিটার সবুজ রঙের, ঝোপের পাতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে, হেডলাইটের আলোয় আলাদাভাবে চেনা যাবে না। একটু পরই পরীক্ষায় ফেলা হলো রানাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল লগিং ট্রাক। কাছাকাছি আসার পর দেখল, না, লগিং ট্রাক নয়—আর্মি ট্রান্সপোর্ট, খয়েরি ও সবুজ রঙ করা। পিছনে গিজ গিজ করছে হিটা সৈনিক। ড্রাইভারের ক্যাব-এ চাখার সিং-এর সাদা পাগড়ি দেখা গেল। পিছন থেকে একজন সৈনিক রাস্তার দু'পাশের ঝোপের ওপর স্পটলাইটের আলো ফেলছে। কোন সন্দেহ নেই, ওকেই তারা খুঁজতে বেরিয়েছে।

মাথা নামিয়ে হাতের ভাঁজে মুখ লুকাল রানা, ওর সামনে দিয়ে ছুটে গেল স্পটলাইটের আলো। গতি না কমিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ট্রাকটা। খানিক পর আবার নিস্তব্ধতা নামল বনভূমিতে।

মাটি থেকে উঠে ল্যাণ্ডরোভারের কাছে ফিরে এল রানা। দ্রুত হাতে লকার থেকে কয়েকটা দরকারী জিনিস বের করল, ওগুলোর মধ্যে একটা কম্পাসও রয়েছে। জিনিসগুলো ছোট একটা ব্যাগে ভরল। ফার্স্ট এইড কিট থেকে নিল ফিল্ড ড্রেসিং অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ট্যাবলেট। ল্যাণ্ডরোভারে কোন খাবার নেই। জঙ্গলে যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে ওকে। ব্যাগটা

কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলো ও।

ভোরের আলো ফোটার আগেই মোমু ট্র্যাক পেরুতে হবে ওকে, ভাবল রানা। ট্র্যাকটা পেরুবার সময় খোলা জায়গায় থাকবে ও, সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। তারপর পাওয়া যাবে বনভূমির আড়াল।

একে অন্ধকার, তার ওপর ঘন জঙ্গল, দিক ঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কয়েকশো গজ পর পর টর্চ জ্বালতে বাধ্য হলো রানা, দেখে নিতে হলো কম্পাস। পায়ের নিচে নরম হয়ে আছে কাদা, পথটাও আঁকাবাঁকা, ফলে দ্রুত এগোনো যাচ্ছে না। মোমুর তৈরি খাদে যখন পৌঁছুল, খোলা আকাশ আলোকিত হতে শুরু করেছে।

ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকের গাছপালা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল রানা। হপ্তা কয়েক আগে এই জায়গার কাজ শেষ করে পাঁচ-সাত মাইল উত্তরে এগিয়ে গেছে মোমু। জঙ্গলের এদিকটা নির্জন থাকারই কথা, যদি না ওকে বাধা দেয়ার জন্যে ক্যাপটেন সোল সৈনিকদের পাঠিয়ে থাকে।

ঝুঁকিটা নিতে হবে ওকে। জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটা পেরুতে শুরু করল রানা। লাল কাদায় ডেবে গেল জুতো সহ গোড়ালি। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, 'হল্ট!' বলে চিৎকার শুনতে পাবে, কিংবা ধাক্কা খাবে বুলেটের। উল্টোদিকের গাছপালার আড়ালে পৌঁছে গেল ও, কোন বিপদ হলো না। তবে ক্লান্তিতে হাঁপাতে শুরু করেছে।

আরও এক ঘন্টা হাঁটার পর প্রথমবার বিশ্রামের জন্যে থামল রানা। এরইমধ্যে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, শর্টস আর বুট ছাড়া বাকি সব খুলে ফেলল গা থেকে। কাপড়গুলো গোল পাকিয়ে নরম ঘাসের ওপর রেখে দিল। ঝড়-বৃষ্টি-রোদে থাকার অভ্যেস আছে ওর, তাতে করে চামড়ার স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি অনেকটা বেড়ে গেছে, পোকামাকড়ের হুল বা কাঁটা সহজে তেমন ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি সেৎসি মাছির কামড়ও সহ্য করতে পারে ও। পিঠের ক্ষতটা ঢাকা থাকলেই চলবে, বিপদের আর কোন ভয় আপাতত নেই।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো রানা। কম্পাস আর হাতঘড়ির ওপর নজর রাখছে, হিসাব রাখছে দশ কদম এগোতে সময় লাগছে কতক্ষণ। প্রতি দু'ঘন্টা পর পর দশ মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নিল ও। সন্ধের সময় আন্দাজ করল, দশ মাইলের মত এগিয়েছে। এই গতিতে হাঁটলে জায়ারে সীমান্তে পৌঁছুতে আটদিন লাগবে ওর। অবশ্যই এই গতি ধরে রাখা সম্ভব হবে না। সামনে পাহাড় আছে, আছে গ্লেসিয়ার ও বরফ ঢাকা প্রান্তর। শুকনো পাতা জড়ো করে বিছানা তৈরি করল রানা, শোয়ার সময় মনিকার কথা ভাবল। কে জানে এই মুহূর্তে কোথায় কি করছে মেয়েটা। তারপরই মনে পড়ল সোফিয়ার কথা।

মেয়েটাকে ওর সঙ্গে আসার জন্যে জোর করা উচিত ছিল। লোভ আর মাত্রা ছাড়ানো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এই দুটোই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সোফিয়ার। ও জোর করলেও সে আসত বলে মনে হয় না। জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ওকে সাবধান করে দিয়েছে সে, সেজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও। কিন্তু মনটা খারাপ লাগছে তার পরিণতির কথা ভেবে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা না অকালে প্রাণ

হারায়।

ঘুম ভাঙার পর রানা দেখল, ভোর হতে শুরু করেছে। খিদে পেয়েছে ওর, পিঠের ক্ষতটায় টান ধরায় ব্যথা করছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ফুলে আছে জায়গাটা, আগুনের মত গরম। মনে ভয় ধরে গেল–ইনফেকশন নাকি? যতটা সম্ভব নতুন করে যত্ন নিল ক্ষতটার।

দুপুরের দিকে অসহ্য হয়ে উঠল খিদে। কয়েকটা গাছের মগডালে চড়ে পাখির ডিম খুঁজল। পেল বটে, কিন্তু মাত্র একজোড়া ছোট ডিমে পেট ভরল না। আবার রওনা হলো পশ্চিমে, হাতে কম্পাস। বিকেলের দিকে ব্যাঙের ছাতা খেল। খানিক পর সামনে পড়ল ছোট একটা ঝর্ণা।

ঝর্ণার কিনারায় বসে পানি খাচ্ছে, দেখতে পেল জলাশয়ের তলায় গাঢ় চুরুট আকৃতির কি যেন একটা শুয়ে রয়েছে। লম্বা একটা ডাল কুড়িয়ে আনল রানা, ছুরি দিয়ে চেঁছে চোখা করল ডগাটা। তারপর খুঁজে বের করল পিঁপড়েদের একটা কলোনি। একটা শুকনো পাতায় কয়েকটা পিঁপড়ে নিল ও, সেগুলোকে ফেলে দিল ঝর্ণার পানিতে, তারপর পিছিয়ে এল কিনারা থেকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পানির তলা থেকে উঠে এল মাছটা, টপাটপ খেতে শুরু করল পিঁপড়েগুলোকে। সদ্য তৈরি বর্শাটা সবেগে ছুঁড়ল রানা, পেটে গেঁথে পানি থেকে তুলে আনল মাছটাকে। প্রায় ওর হাতের মত লম্বা একটা ক্যাটফিশ। আগুনে সেদ্ধ করে খানিকটা খেল রানা, বাকিটা পাতায় জড়িয়ে রেখে দিল। অন্তত দিন দুয়েক চলে যাবে ওর।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করল রানা। পিঠের ক্ষতটা দপ দপ করছে, গ্যাস ও ডিসেন্ট্রিতে ফুলে আছে পেট–কারণটা ঝর্ণার পানি, নাকি ব্যাঙের ছাতা বুঝতে পারল না। দুপুরের মধ্যে ক্ষতটায় ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠল। অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে ও। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। এতটা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ ডায়েরিয়া।

শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কেউ যেন জ্বলন্ত এক টুকরো কয়লা চেপে ধরে আছে।

প্রায় এরকম সময়েই প্রথম একটা অনুভূতি হলো রানার, কেউ যেন অনুসরণ করছে ওকে। ব্যথা ও জ্বর সত্ত্বেও ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ সজাগ। পিছন দিকে যতবার তাকাল রানা, দেখতে না পেলেও কোন মানুষের উপস্থিতি অনুভব করতে পারল ও। উপলব্ধি করল, শিকারি শিকার করার অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষায় আছে সুযোগের।

অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে ওকে, ভাবল রানা। তাতে অবশ্য এগোনোর গতি অনেক কমে যাবে। অনুসরণরত লোকটা বাস্তব হোক বা কল্পনা, অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিলে খসানো সম্ভব হবে তাকে। অবশ্য লোকটা যদি অনুসরণে দক্ষ হয়, বনভূমির এদিকটা যদি তার চেনা এলাকা হয়, এক সময় ঠিকই রানাকে ধরে ফেলবে সে।

সামনে নদী দেখে পানিতে নামল রানা, অনেক দূরে উঠল পায়ের কোন ছাপ না রেখে। এরপর থেকে সমস্ত দাগ ও ছাপ মুছতে মুছতে এগোল ও। হাঁটার গতি

আরও অনেক কমে গেল। জ্বরটা বাড়ছে। পেটের অসুখটাও ভালর দিকে যাচ্ছে না। পিঠের ক্ষতে সংক্রমণ শুরু হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। দু'বার বমি করল রানা। নিশ্চিতভাবে জানে, ফেউটা এখনও লেগে আছে পিছনে, প্রতি ঘণ্টায় কাছে চলে আসছে আরও।

চার

দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পোচিং-অপারেশন-এর সঙ্গে জড়িত চাখার সিং। পোচার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ সে। শিকারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে তার। কোন কোন এলাকায় যোগাযোগ করাটা সহজ। জাম্বিয়া বা মোজাম্বিকে তাকে শুধু কোন গ্রামে গিয়ে কারও বউ বা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তারাই তার হয়ে খবর পৌঁছে দেয় শিকারীকে। বতসোয়ানা বা জিম্বাবুইয়েতে নির্ভর করে সে লোকাল পোস্টাল কর্তৃপক্ষের ওপর, একটা চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠায়। কিন্তু উবোমোয় বর্বর একজন পিগমির সঙ্গে রেইন ফরেস্টে যোগাযোগ করাটা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এক্ষেত্রে একটাই উপায় আছে। মেইন হাইওয়ে থেকে নেমে প্রতিটি দোকানে ঢুঁ মারতে হবে, কিংবা পথে যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই ঘুষ দিয়ে অনুরোধ করতে হবে সে যেন ওজি হাবিবকে খবর দেয়। গভীর, দুর্ভেদ্য বনভূমিতে পিগমিরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে পিগমিরা গল্প করতে ভালবাসে, ভালবাসে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে। এক গোত্রের কোন লোক হয়তো মধু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আরেক গোত্রের কোন মহিলার, যে কিনা নিজের এলাকা থেকে বহুদূরে চলে এসেছে ওষধি গাছ-গাছড়ার সন্ধানে। এভাবেই খবর পৌঁছে যায়, পাহাড়চূড়া থেকে তীক্ষ্ণ অথচ সুরেলা কণ্ঠে চিৎকার করে কেউ, উপত্যকা থেকে শোনে কোন ভবঘুরে অথবা শিকারী, আবার কখনও বা বিশাল নদীর মাঝখানে এক ক্যানু থেকে আরেক ক্যানুতে পৌঁছে যায় খবর। যার খবর তার হয়তো পেতে সময় লেগে যায় কয়েক হপ্তা, তবে ভাগ্য ভাল হলে দু'চারদিনের মধ্যেও পেয়ে যায়।

এবার চাখার সিংকে খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে। নদী পারাপারে একদল পিগমি মেয়েলোককে খবরটা দেয়ার দু'দিন পরই বনভূমির নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হলো ওজি হাবিব। তার যা বৈশিষ্ট্য, সবুজ পাঁচিল ফুঁড়ে যেন ভোজবাজির মত উদয় হলো সে, এসেই তামাক ও অন্যান্য উপহার দাবি করল।

'তুমি আমার হাতি মেরেছ?' জানতে চাইল চাখার সিং।

নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে ময়লা পরিষ্কার করল ওজি হাবিব, খসখস করে উরুসন্ধি চুলকাল। 'আপনি আমাকে না ডেকে পাঠালে হাতিটা এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত।'

'কিছু মরেনি,' বলল চাখার সিং। 'কাজেই কোন উপহারও পাওনা হয়নি তোমার।'

'সামান্য একটু তামাক?' আবেদন জানাল ওজি হাবিব। 'আমি তো আপনার বিশ্বস্ত গোলাম। আমার হৃদয় আপনার প্রতি ভালবাসায় ভরপুর। বেশি না, এক মুঠো তামাক শুধু?'

আধ মুঠোরও কম তামাক দিল তাকে চাখার সিং। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মুখের ভেতর তামাক ভরল ওজি হাবিব। চাখার সিং বলল, 'এর আগে তোমাকে যে-সব উপহার দেব বলেছিলাম, তার দ্বিগুণ উপহার দেব তুমি যদি আরেকটা জানোয়ারকে খুন করতে পারো। খুন করে ওটার মাথা এনে দিতে হবে আমাকে।'

'কি জানোয়ার? সিংহ না চিতা?' সতর্ক হলো ওজি হাবিব, তীক্ষ্ণ হলো তার দৃষ্টি। 'নাকি এটাও একটা হাতি?'

'না,' বলল চাখার সিং। 'এটা একটা মানুষ।'

'আপনি আমাকে মানুষ খুন করতে বলেন!' লাফ দিয়ে সিধে হলো ওজি হাবিব। 'ওরে বাপরে বাপ! মানুষ মারলে আর রক্ষে নেই, পুলিস এসে আমার গলায় রশি পরাবে।' আড়চোখে ক্যাপটেন সোলের দিকে তাকাল সে।

'না, শোনো। এই যে দেখছ আমার ডান হাতটা নেই, নেই ওই লোকটার কারণে—সেজন্যেই তাকে আমি জানোয়ার বলছি। আর পুলিসের কথা বলছ?' হাসল চাখার সিং। 'এটা তো পুলিসেরই কাজ, বোকা! সরকার তোমাকে এই কাজের জন্যে পুরস্কার দেবে। লোকটা নাম্বার ওয়ান হারামি। সরকারের অনেক ক্ষতি করে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে।' পাশে দাঁড়ানো ক্যাপটেন সোলের দিকে তাকাল সে। 'কি, ঠিক বলিনি?'

'জ্বী, ঠিক বলেছেন,' সাক্ষী দিল ক্যাপটেন সোল। 'যে লোকটাকে তুমি খুন করবে সে সাদাও নয়, আবার কালোও নয়। সরকারের তরফ থেকে আমরা তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব।'

ক্যাপটেনকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল ওজি হাবিব। ইউনিফর্ম, আগ্নেয়াস্ত্র, রঙিন সানগ্লাস ইত্যাদি দেখে তার মনে হলো, সরকারের বড় কোন কর্মকর্তাই হবে লোকটা। কাজেই প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল সে। যুবা বয়েসে জায়ারেতে সাদা সরকারী কর্মকর্তাদের একজনকে খুন করেছিল সে, তবে সেটা ছিল যুদ্ধের সময়। কাজটা খুব সহজ ছিল, কালো নেতাদের কাছ থেকে ভাল পুরস্কারও পেয়েছিল সে। বিদেশী লোকদের পিছু নেয়া সহজ, জঙ্গলের ভেতর অসহায়বোধ করে তারা। 'লোকটা কি বিদেশী?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল চাখার সিং, বুঝতে পারল ওজি হাবিবের চিন্তাধারা কোন পথে এগোচ্ছে। 'জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে যাওয়া অসহায় একটা শিশু বলতে পারো তাকে।'

'কতটা তামাক পাব আমি?'

'আমার কাছ থেকে পাবে যতটা তুমি বইতে পারবে,' বলল চাখার সিং।

'ওই পরিমাণ আমিও দেব, যতটা তুমি বইতে পারবে,' বলল ক্যাপটেন সোল।

'তাকে কোথায় পাব আমি?' জানতে চাইল ওজি হাবিব।

কোথায় খুঁজতে হবে বলে দিল চাখার সিং, জানাল রানা কোনদিকে যাচ্ছে বলে তার ধারণা।

'আপনারা শুধু তার মুণ্ডুটা চান? খাবেন বলে?' জিজ্ঞেস করল পিগমি ওজি হাবিব।

'আরে না!' হেসে উঠল চাখার সিং। 'মুণ্ডুটা দেখে আমরা বুঝতে চাই তুমি ঠিক তাকেই মেরেছ কিনা।'

'প্রথমে আমি এই লোকটার মুণ্ডু কেটে আনব,' আনন্দে নাচতে নাচতে বলল ওজি হাবিব, 'তারপর আনব হাতির দাঁত। তখন আমার হাতে যত তামাক থাকবে, অত তামাক দুনিয়ার কারও হাতে থাকবে না।' কালো একটা ভূতের মতই এক নিমেষে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সকালের দিকে, তাপ এখনও ছড়ায়নি, গোনভালা ক্লিনিকে বসে কাজ করছে মনিকা রিভেরা। অন্যান্য দিনের চেয়ে রোগীর সংখ্যা আজ বেশি তার। বেশিরভাগেরই গায়ে ফোসকা পড়েছে। এমন একটা ঘা, চিকিৎসা না করালে হাড় পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। বাকি লোকগুলো ম্যালেরিয়ার শিকার। এইডস-এর দু'জন নতুন রোগীও আছে। লক্ষণ চেনার জন্যে রক্ত পরীক্ষার দরকার নেই তার, ফোলা লিমফগ্ল্যাণ্ড আর জিভ ও গলার ভেতর সাদা ঘা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে।

ব্যাপারটা নিয়ে ড. শেখ ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে আলোচনা করেছে মনিকা। রোগী দু'জনের ওপর নতুন ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি। সিলেপি গাছের ছাল থেকে তৈরি করা ভেষজ, ইতিমধ্যে ওদের মধ্যে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে। ওষুধ তৈরি ও মাত্রা নির্ধারণে মনিকাকে সাহায্য করলেন তিনি। কি পরিমাণে ওষুধ খাওয়ানো দরকার, এটা রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে আলোচনা সাপেক্ষ একটা ব্যাপার। আলোচনা চলছে, এই সময় বাইরে হৈ-চৈ শোনা গেল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'তোমার সেই খুদে বন্ধু হাজির হয়েছে,' মনিকাকে বললেন তিনি। আনন্দে হেসে উঠল মনিকা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোদজি হাবিব আর তার স্ত্রী পারুমা, রোগীদের সঙ্গে হাসাহাসি ও গল্প করছে। মনিকাকে দেখে বুড়ো-বুড়ি প্রতিযোগিতা শুরু করল, কে কার আগে ওর কাছে পৌঁছুতে পারে। ছুটে এসে দু'জনেই মনিকার একটা করে হাত চেপে ধরল, একজনের চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল অপরজনের উল্লাসধ্বনি। শেষবার দেখা হবার পর ওদের গোত্রে উত্তেজনাকর কি কি ঘটেছে, সব এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলার ইচ্ছে তাদের। বারান্দার ওপরের ধাপটায় বসল মনিকা, বুড়ো-বুড়িকে দু'পাশে নিয়ে।

'পুইদির একটা মেয়ে হয়েছে। পূর্ণিমার পর একদিন তোকে দেখাতে নিয়ে আসবে,' বলল পারুমা।

'জাল দিয়ে শিকার ধরার বিরাট আয়োজন চলছে, গোত্রপ্রধানরা সবাই সভায়

বসবে…,' নিজের কথা বলে চলেছে লোদজি হাবিব।

'গাছের শিকড় চেয়েছিলি, মনে আছে? এক গাদা নিয়ে এসেছি…,' অকারণেই খিল খিল করে হেসে উঠল বুড়ি, মুখে একটা দাঁতও নেই। বয়েসের আঁচড় মাকড়সার জাল এঁকে রেখেছে চামড়ায়, এমন ঝুলে আছে যে চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

'আমি দুটো বাঁদর মেরেছি,' সগর্বে জানাল লোদজি হাবিব। 'একটার চামড়া এনেছি তোর জন্যে, ওটা দিয়ে তুই সুন্দর একটা হ্যাট বানাতে পারবি।'

'তোমার খুব দয়া, লোদজি,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মনিকা। 'কিন্তু যেজন্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, সেঙ্গি সেঙ্গির খবর কি বলছ না যে? সেই হলুদ মেশিনগুলোর কথা বলো, যেগুলো মাটি খায়, জঙ্গলের গাছগুলোকে ফেলে দেয়। মায়াভরা চোখ, সেই বিদেশী লোকটার কথা বলো। মাথা ভর্তি চুল, অনেক লম্বা। আর সেই মেয়েটার কথা বলো–আগুনের মত চুল, কালো বাক্সের ভেতর তাকিয়ে থাকে সব সময়।'

'অদ্ভুত,' চেহারা গম্ভীর করে বলল লোদজি হাবিব। 'অদ্ভুত খবর আছে। লম্বা মানুষ, মায়াভরা চোখ, সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে পালিয়েছে। জঙ্গলে ঢুকে লুকিয়ে পড়েছে সে।' পারুমা বলে ফেলবে, এই ভয়ে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে সে। 'আরও অদ্ভুত খবর, সেঙ্গি সেঙ্গির সরকারী কর্তা আমার ভাই ওজি হাবিবকে প্রস্তাব দিয়েছে ওই লোককে খুন করতে পারলে তাকে বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল মনিকা। 'কি বললে?'

'লোকটার খুব বিপদ,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল লোদজি হাবিব। 'ধরে নে মায়াভরা চোখের মুণ্ডু নেই। আমার ভাই ওজি হাবিব ওটা কেটে ফেলবে।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা। মাথাটা ঘুরে উঠল তার, অসুস্থ বোধ করছে। ওকে হাঁপাতে দেখে ভয়ে চুপ করে গেল লোদজি হাবিব, বুড়ো-বুড়ি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'খুন করবে? ওজি হাবিব রানাকে খুন করবে? ওহ্ গড!' বিড় বিড় করছে মনিকা, অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল বারান্দায়। 'এখন আমি কি করব!'

'কারও কিছু করার নেই গো, আপামণি,' ভয়ে ভয়ে বলল পারুমা। 'ওজি হাবিব হারামির হাড়। পুরস্কারের লোভে নিজের মাকেও খুন করতে তার হাত কাঁপবে না।'

'এ আমি হতে দেব না!' পায়চারি থামিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াল মনিকা। 'যেভাবে হোক এ আমি ঠেকাব। কিন্তু… কিভাবে…। লোদজি হাবিব, তুমি আমার বাপ! ওই মায়াভরা চোখ, যার কথা আলোচনা করছি আমরা, তাকে তুমি যেভাবে পারো বাঁচাও! সে আমার মনের মানুষ, লোদজি হাবিব!' মনিকার চোখ ভিজে গেছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল লোদজি হাবিব ও পারুমা। 'যেভাবে হোক ওজি হাবিবকে বাধা দাও তুমি। লোকটাকে অবশ্যই উদ্ধার করে গোনডালায় নিয়ে আসবে তুমি। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ, লোদজি হাবিব? এখুনি বেরিয়ে পড়ো। যাও, তাড়াতাড়ি যাও! আমিও আরেক দিকে যাচ্ছি। তাকে আমরা খুঁজে বার করব…।'

'তোর আদেশ যাতে পালন করে সেটা দেখার জন্যে আমিও ওর সঙ্গে যাব,' বারান্দার ধাপ ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে দাঁড়াল পারুমাও। 'তুই তো জানিস, আপামণি, স্বামীটা আমার বোকা আছে–জঙ্গলের ভেতর ধিঙ্গি কোন মেয়ে দেখলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়, সব ফেলে তার পিছনে ছোটে।' স্বামীর দিকে ফিরল সে। 'আয় রে মিনসে, তাড়াতাড়ি ছুট লাগা।' কনুই দিয়ে বুড়োর পাঁজরে খোঁচা মারল বুড়ি। 'আপামণি কি বলল, জানি তোর লোকটা ওর মনের মানুষ আছে রে। চল তাকে খুঁজে বের করি, আপামণিকে এনে দিই। দেরি করলে ওজি শয়তানটা তার মুণ্ডু কেটে সেঙ্গি সেঙ্গিতে…।'

দাঁড়াল ওজি হাবিব, বনভূমির চারদিকে চোখ বুলাল, তারপর ভাঁজ করা একটা হাঁটু গাড়ল মাটিতে। ঝুঁকে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে সে। কিছুক্ষণ পর উঁচু করল মাথা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠোঁটে প্রশংসার হাসি ফুটে উঠেছে। 'লোকটা জানে আমি তার পিছু নিয়েছি,' আপনমনে বিড় বিড় করল সে। 'কিন্তু জানল কিভাবে? তারমানে জঙ্গলে তার আসা-যাওয়া আছে।' আবার ঝুঁকে দাগটা স্পর্শ করল সে। পানি থেকে উঠে এখানেই প্রথম পা ফেলেছিল রানা। দাগটা মুছে রেখে গেছে ও, ক্ষীণ আভাস রয়ে গেছে শুধু মোছার দাগটার–যা শুধু ওজি হাবিবের মত অভিজ্ঞ কোন লোকের চোখেই ধরা পড়ার কথা।

'হ্যাঁ, তুমি জানো আমি তোমার পিছু নিয়েছি।' মাথা ঝাঁকাল ওজি হাবিব। 'কিন্তু প্রায় একজন বামবুটির মত পায়ের ছাপ লুকানোর কৌশল কোত্থেকে শিখলে তুমি?'

মাটিখেকো হলুদ মেশিন বনভূমি সাফ করে যে চওড়া পথ তৈরি করেছে, সেই পথের ওপরই প্রথম রানার পায়ের ছাপ দেখতে পায় সে। ওখানে মাটি খুব নরম, বিদেশী লোকটা যে ছাপ রেখে এসেছে তা একজন অন্ধও অনুসরণ করতে পারবে। ওজি হাবিব বুঝতে পারে, পশ্চিম অর্থাৎ পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে সে–ঠিক যেমন চাখার সিং আন্দাজ করেছে।

ওজি হাবিব ধরে নেয়, রানা খুব সহজ একটা শিকার। ব্যাঙের কয়েকটা ছাতা ভাঙা দেখে তার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারে সে, ওগুলো বিষাক্ত। ভাঙা একটা ব্যাঙের ছাতায় রানার দাঁতের ছাপও দেখতে পায় সে। আপনমনে হাসতে থাকে, বিড়বিড় করে বলে, 'তোমার বাপু পেটের অসুখ করেছে। জঙ্গলের ভেতর তুমি নদী বইয়ে দেবে।'

রাতে রানা যেখানে ঘুমিয়েছে, জায়গাটা খুঁজে বের করল ওজি হাবিব। ডায়রিয়া বাধাবার পর প্রথম যেখানে সাড়া দিল প্রকৃতির ডাকে, সে জায়গাটাও পেয়ে গেল পিগমি শিকারী। মনে মনে আওড়াল, 'এখন আর তুমি খুব বেশি দূর যেতে পারবে না। এবার তোমাকে ধরা পড়তে হবে, বাপধন। আর ওজি হাবিবের হাতে ধরা পড়া মানেই খতম।'

দ্রুত সামনে বাড়ছে সে, গভীর বনভূমির ছায়া আর নানা রঙের ভেতর ক্ষীণ একটু কালো ধোঁয়ার মত। ছাপগুলো অনুসরণ করছে রানার দ্বিগুণ বেগে। প্রকৃতির ডাকে আরও অনেক জায়গায় সাড়া দিয়েছে রানা, প্রায় সবগুলো দেখতে

পেল সে। পায়ের ছাপ তারপর পৌঁচেছে ছোট্ট একটা ঝর্ণার কিনারায়। পানিতে নেমে গেছে শিকার, তারপর আর কোন ছাপ নেই তার।

কোন বিরতি না নিয়ে প্রায় আধ বেলা খোঁজাখুঁজি করল ওজি হাবিব, জলাশয়ের দুই তীরের প্রতি ইঞ্চি মাটি পরীক্ষা করতে হলো তাকে, তারপর পেয়ে গেল ছাপগুলো। 'তুমি ভারি চালাক হে,' প্রশংসা করল সে। 'তবে ওজি হাবিবের মত নও।' আবার অনুসরণ করল সে, তবে এবার সতর্ক হয়ে আছে, এগোচ্ছে ধীর গতিতে। তার শিকার যে বুদ্ধিমান, এটা বোঝার পর বিপদের আশঙ্কা করছে সে। 'তোমাকে খুন করায় মজা আছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণ হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু আমি তো অন্য কেউ নই, স্বয়ং ওজি হাবিব।'

দ্বিতীয় দিন শেষ বিকেলে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল ওজি হাবিব, এই প্রথম দেখতে পেল তার শিকারকে। উল্টোদিকের পাহাড়ের নিচে প্রথমে ওটাকে একটা হরিণ বলে মনে করেছিল সে। উপত্যকার ওপর, প্রায় এক মাইল দূরে, গাছপালার ভেতর ক্ষীণ একটু কাঁপন মাত্র। ওজি হাবিবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এক পলকের জন্যে ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়নি ওখানে কোন মানুষ নড়ে উঠল। বনভূমির কিনারায়, লম্বা গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল আবছা মত কি যেন। হারিয়ে যাবার পর ওজি হাবিব উপলব্ধি করল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় ঢেকে নিয়েছে লোকটা, মাথায় পরেছে পাতা আর ডালের তৈরি হ্যাট, ফলে কাঠামো বা আকৃতি মানুষের সঙ্গে মেলে না।

'বারে বা!' উরুতে চাপড় মারল ওজি হাবিব, খানিকটা তামাক বের করে মুখে ভরল। 'ওস্তাদি ভালই জানো দেখছি। সন্ধের আগে তোমাকে ধরতে পারছি না বটে, তবে কাল সকালে তোমার মাথা আমি ঠিকই কাটব।'

রাতটা কাটাল ওজি হাবিব ফাঁকা জায়গাটার কিনারায়, যেখানে শেষবার দেখা গেছে রানাকে। কোন আগুন জ্বালল না সে। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই আবার ধাওয়া শুরু করল।

কে বিশ্বাস করবে কিংবদন্তীর নায়ক মাসুদ রানা সদ্যজাত শিশুর মতই অসহায় ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে। ঘণ্টা দুয়েক অনুসরণ করার পরই ওকে পেয়ে গেল ওজি হাবিব। বর্বর পিগমিটা ওর সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না। তার কাছে রানা স্রেফ একটা সহজ শিকার মাত্র। কার নিয়তি কখন কোন দিকে বাঁক নেয়, কার মৃত্যু কিভাবে হয়, এ-সব আগে থেকে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। রানাকে যারা চেনে তাদের মধ্যে অনেকে এমনকি উবোমোর নামও শোনেনি, তাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে উবোমোর গভীর অরণ্যে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও যে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কেও ওর কোন ধারণাই নেই।

আকাশ-ছোঁয়া একটা আফ্রিকান মেহগনির নিচে শুয়ে রয়েছে রানা। প্রথমে ওজি হাবিবের মনে হলো, তার শিকার বোধহয় মারা গেছে। দূর থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, দেখল তাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে গাছের পাতা দিয়ে নিজেকে ঢাকার হাস্যকর চেষ্টা করেছে বিদেশী লোকটা।

খুব সাবধানে, একটু একটু করে সামনে বাড়ল ওজি হাবিব। তার ম্যাচেটির পাত খুব চওড়া, সেটা বাগিয়ে ধরে আছে ডান হাতে। সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করছে সে, কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না। তার ম্যাচেটির ফলা ক্ষুরের মত ধারাল।

তারপর এক-সময় রানার সামনে এসে পৌঁছুল সে, দেখল অসুস্থ হলেও এখনও মরেনি ও। জ্ঞান হারিয়েছে রানা, গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। অসুস্থ একটা কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ও, গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে গাছের পাতা। মাথাটা বাঁকা হয়ে রয়েছে একদিকে, ঘামে ধুয়ে গেছে চোয়ালের নিচের কাদা, স্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে সাদাটে একটা রেখা। রেখাটা ম্যাচেটির লক্ষ্যস্থল হতে পারে, দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করার জন্যে।

ম্যাচেটির ফলাটা আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করল ওজি হাবিব। এত ধার, এটা দিয়ে সে তার দাড়ি কামাতে পারবে। দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলল ওটা। সাধারণত হরিণ শিকার করে সে, লোকটার গলা সেগুলোর চেয়ে মোটা নয়। ম্যাচেটির ফলা মাংস ও হাড় অনায়াসে ভেদ করে যাবে, ধড় থেকে লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে দূরে ছিটকে পড়বে মুণ্ডুটা। ঘন কালো চুল গাছের ডালে বাঁধবে সে, ঘণ্টাখানেক ঝুলিয়ে রাখবে, যাতে কাটা গলা থেকে সমস্ত রক্ত ঝরে যায়। তারপর সবুজ পাতা ও শিকড়ে আগুন ধরিয়ে, আগুনের ধোঁয়া লাগাবে ওটার গায়ে, তাহলে আর পচে যাবার ভয় থাকবে না। তার কাছে ছোট একটা জাল আছে, লতাপাতা দিয়ে তৈরি, সেটায় ভরে মুণ্ডুটা নিয়ে যাবে তার পোচিং মাস্টার চাখার সিং-এর কাছে। চাখার সিং তাকে পুরস্কার দেবে…।

ম্যাচেটিটা রানার গলার ওপর নামিয়ে আনবে এবার, দম বন্ধ করেছে, এই সময় ওজি হাবিবের মন একটু খারাপ হয়ে গেল। সে একজন সত্যিকার শিকারী বলেই হয়তো, খুন করার ঠিক আগের মুহূর্তে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব জাগে তার মনে। যে পশুকে তারা হত্যা করবে, সেই পশুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকতে হবে–তাদের গোত্রের এটা একটা প্রচলিত রীতি বা ঐতিহ্য–বিশেষ করে শিকার যদি সহজে হার না মানে, বা মূল্যবান হয়।

সহজে হার মানলেও ওজি হাবিবের আজকের শিকার অত্যন্ত মূল্যবান। যতটুকু বইতে পারবে তার দ্বিগুণ তামাক পাবে সে। 'বিদায়, বন্ধু। তাড়াতাড়ি মারা যাও!' প্রার্থনার সুরে বিড়বিড় করল ওজি হাবিব, আবার দম আটকাল, ম্যাচেটি নামিয়ে আনার জন্যে শক্ত করল পেশী।

তার পিছন থেকে শান্ত একটা গলা ভেসে এল, 'একটু থামো, ভাই। তা না হলে এই বিষাক্ত তীর তোমার লিভার ফুটো করে দেবে।'

চমকে উঠল ওজি হাবিব, লাফ দিল শূন্যে, ঘুরল আধপাক।

পাঁচ কদম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোদজি হাবিব। তার ধনুক বাঁকা হয়ে রয়েছে, তীরটা টেনে চোয়ালের কাছে নিয়ে গেছে, তীরের ডগায় টফির মত চকচক করছে কালো বিষ, সরাসরি ওজি হাবিবের বুকের দিকে তাক করা।

'তুমি আমার আপন ভাই!' বিস্ময়ে হাঁপাতে শুরু করেছে ওজি হাবিব।

'আমরা একই মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছি। তোমার তীর আমার দিকে কিভাবে উড়ে আসবে?'

'মায়ের পেট থেকে আমরা দু'জন একই জিনিস বেরুইনি। আমাদের আপামণি এই বিদেশী লোকটাকে জীবিত উদ্ধার করে নিয়ে যেতে বলেছে। তার যদি এক ফোঁটা রক্তও তুমি ঝরাও, তীরটা তোমার বুক ফুটো করে শিরদাঁড়া ছুঁয়ে পিঠ দিয়ে বেরুবে।'

'লবণ মাখানো জোকের মত মোচড় খাবে তোমার শরীর,' লোদজি হাবিবের পিছন থেকে, বনভূমির ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলল পারুমা, 'আমি তখন তোমাকে ঘিরে তা ধিন তা ধিন নাচব আর গাইব।'

তাড়াতাড়ি পিছু হটল ওজি হাবিব। সে জানে, ভাইকে বোকা বানানো তেমন কঠিন নয়, কিন্তু পারুমা বিপজ্জনক ও কঠিন পাত্রী। ভাবীকে তো সে ভয় করেই, ভয় মেশানো খানিকটা শ্রদ্ধাও করে। 'এই লোককে শিকার করতে পারলে অনেক পুরস্কার পাব আমি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সে। 'যত তামাক বইতে পারব, তার দ্বিগুণ। ঠিক আছে, অর্ধেকটা তোমরা নিয়ো…।'

'দেরি কোরো না গো, তোমার ভাইকে তীর মারো,' মিনতির সুরে আবেদন জানাল পারুমা। 'প্রথমে মারো পেটে, মরতে যাতে খানিকটা সময় নেয়-ছট করে মরে গেলে নেচে আমি একটুও মজা পাব না।'

'তুমি বলছ, তীর ছুঁড়ব?' ধনুক টেনে রাখায় হাত কাঁপছে লোদজি হাবিবের, এক চোখ বন্ধ করে লক্ষ্যস্থির করল সে।

'দাঁড়াও!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওজি হাবিবের গলা থেকে। 'ভাবী, আমার প্রিয় ভাবী, আমি তোমাকে ভালবাসি! আমার এই বোকা ভাইটাকে থামতে বলো। তোমার প্রিয় দেবরকে বাঁচাও!'

'নাকে নস্যি নিচ্ছি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল বুড়ি। 'একটা হাঁচি দেব। হাঁচির পর যদি দেখি তুমি আছো, তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না…।'

'চলে যাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল ওজি হাবিব, দশ পা পিছাল। 'এখুনি চলে যাচ্ছি আমি!' একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল সে। তীরটা এখন তার দিকে তাক করা নয়, দেখেই গালাগাল শুরু করল সে, 'তোর মুখে পেচ্ছাব করি আমি, বুড়ি মাগী…।'

প্রচণ্ড হতাশায় ও রাগে ম্যাচেটি দিয়ে ঝোপ-ঝাড় কাটছে ওজি হাবিব, শুনতে পেল ওরা। এখনও তার গলা ভেসে আসছে, 'লোদজি একটা ঘেয়ো কুত্তীকে বিয়ে করেছে…।' ধীরে ধীরে তার গলার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। তীর নামিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরল লোদজি হাবিব।

'আজ যে রকম আনন্দ পেলাম, এরকম আনন্দ আরেকদিন পেয়েছিলাম,' বুড়িকে বলল সে। 'মোষ ধরার জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেছিল ওজি। মোষটা ঠিকই পড়ল খাদের ভেতর, তবে ওটার পিঠে সে নিজেও পড়ল।' মাথা চুলকাল বুড়ো। 'তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে, তোমার একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সে।'

অন্য সময় হলে কি ঘটত বলা যায় না, তবে এই মুহূর্তে স্বামীর কথায়

কান না দিয়ে রানার দিকে এগোল বুড়ি। ধুলো আর পাতার মধ্যে অর্ধেক ডুবে রয়েছে রানা, জ্ঞান নেই। ওর পাশে হাঁটু গাড়ল পারুমা, দ্রুত অথচ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ওকে-নাকের ফুটো ও চোখের কোণ থেকে দু'আঙুলে ধরে তুলে আনল কয়েকটা পিঁপড়ে। 'আপামণির জন্যে একে বাঁচাতে হবে,' বিড় বিড় করল সে। 'মানুষের কি আর দাম, একটা মরলে আরেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু মনের মানুষ মরলে আর পাওয়া যায় না। এটাকে যদি মরতে দিই, আপামণির মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

পাঁচ

রানার চারপাশে গাছের ডাল পুঁতে দেয়াল তৈরি করল লোদজি হাবিব, ডালেরই একটা ফ্রেম তৈরি করে দেয়ালগুলোর ওপর তুলে ঢেকে দিল পাতা দিয়ে। তারপর শীত আর মশা তাড়াবার জন্যে রানার পাশে আগুন জ্বালল সে। দোরগোড়ায় বসে স্ত্রীর কাজ দেখছে এখন।

লতাপাতা ও গাছের শিকড় দিয়ে ওষুধ বানায় পারুমা, বামবুটিরা বিশ্বাস করে তার ওষুধে কাজ হবেই হবে। প্রথমে রানার পিঠের ক্ষতটা পরিষ্কার করল সে, তারপর সেদ্ধ করা পাতা ও শিকড় বেটে মলম তৈরি করে লাগাল। ফুটন্ত পানিতে শুকনো পাতা ফেলল, সেই পানি ঠাণ্ডা হবার আগেই প্রায় জোর করে খেতে বাধ্য করল রানাকে। জ্ঞান না ফিরলে কি হবে, কাজ করার সময় ওকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে বুড়ি। মাঝে মধ্যে ঝুঁকে পরীক্ষা করছে ওকে, রানার গালে ঠেকে যাচ্ছে নগ্ন ও ঝুলে পড়া শুকনো স্তন। তার গলায় একটা হার রয়েছে, আইভরি আর পুঁতি দিয়ে তৈরি, নড়াচড়ার সময় টুন টুন শব্দ করছে সেগুলো।

তিন ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরল রানার। ঘরের ভেতর ধোঁয়া, ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল দু'জন জংলী মানুষ ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে। সোয়াহিলি ভাষায় জিজ্ঞেস করল ও, 'তোমরা…?'

'আমি লোদজি হাবিব,' বলল বুড়ো। 'বিখ্যাত শিকারী এবং বীর-বামবুটি বীর।'

'আর আমি পারুমা, উবোমো অরণ্যের সবচেয়ে কুখ্যাত মিথ্যুকটার বউ,' বলেই হি হি করে হেসে উঠল বুড়ি।

পরদিন সকালে ডায়রিয়া প্রায় ভাল হয়ে গেল রানার। বানরের মাংস দিয়ে রান্না করা ঝোল খেতে দেয়া হলো ওকে। ভেষজ ওষুধও খানিক পর পর ঢেলে দেয়া হলো গলায়। আরও একদিন কাটল, পিঠের ক্ষতটায় টান ধরল সামান্য, আগের মত আর দুর্বল বোধ করছে না। ওকে নিয়ে গোনডালার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল লোদজি হাবিব আর পারুমা।

প্রথম দিকে খুব ধীরে ধীরে এগোল রানা, হাতে ছড়ি থাকলেও মনে হলো

পড়ে যাবে। ওর পাশে সারাক্ষণ সতর্ক থাকল পারুমা, যদিও তার বকবকানি মুহূর্তের জন্যেও থামল না। সব সময় ওদের সামনে থাকল লোদজি হাবিব, ওদেরকে পথ দেখাল, সুযোগ পেলে শিকারও করল।

ইতিমধ্যে পারুমা তার আপামণি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছে রানাকে। সেই আপামণির নির্দেশেই তারা ওকে উদ্ধার করতে এসেছে। আপামণিটা কে হতে পারে, আন্দাজ করে নিয়েছে রানা।

সন্ধের খানিক আগে আবার উদয় হলো লোদজি হাবিব, পিঠে শিকার করা একটা হরিণ ঝুলছে। রাতে ওরা হরিণের লিভার পুড়িয়ে খেল। পরদিন সকালে হাতের ছড়িটা ফেলে দিল রানা, ওটার সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারবে এখন। এরপর হাঁটার গতিও আগের চেয়ে অনেকটা বাড়ল ওর।

পরদিন বিকেলে গোনডালায় পৌঁছুল ওরা। পিগমি বুড়ো-বুড়ি আগে থেকে কিছু জানায়নি, ফলে হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল রানা। সামনের দৃশ্যটাকে মনে হলো অবাস্তব ও স্বপ্ন। সুন্দর, সাজানো একটা আদর্শ গ্রাম যেন জায়গাটা। এক পাশে রয়েছে একটা ঝর্ণা, আরেক পাশে খোলা বাগান, পিছনে বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড়।

'রানা!' ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠছে ওরা, একটা কামরা থেকে বেরিয়ে এল মনিকা। রানাকে দেখে একটুও আশ্চর্য হয়নি সে। পারুমা আর লোদজি হাবিব রানার খোঁজে বেরিয়ে যাবার পর সে-ও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেনি, একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। দু'জোড়া পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সে, জানত না ওগুলো পারুমা আর লোদজি হাবিবের। ওরা যখন রানাকে দেখতে পায়, প্রায় একই সময়ে জঙ্গলের আরেক কিনারা থেকে সে-ও ওকে দেখতে পেয়েছিল, বোধহয় কয়েক মুহূর্ত আগেই। কোন কারণে লোদজি হাবিব তীর ছুঁড়তে দেরি করলে, মনিকার রাইফেলের গুলি ওজি হাবিবের খুলি উড়িয়ে দিত। লোকটা পালাবার পর পারুমা বুড়ি রানার যত্ন নিচ্ছে দেখে, একাই আবার নিজেদের ডেরায় ফিরে এসেছে সে। জানত, ওদের হাতে নিরাপদেই থাকবে রানা। কোন সন্দেহ নেই, তার এরকম আচরণের পিছনে অভিমানের একটা ভূমিকা আছে। 'রানা!' তার গলায় বিস্ময় নয়, আনন্দের সুর ধরা পড়ল।

রানার ধারণা ছিল মনিকাকেই দেখতে পাবে, তবু হঠাৎ এভাবে দেখতে পাবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। সামনে তাজা একটা ফুল, সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তবে এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার সময় মনিকার হাব-ভাবে একটা সতর্ক ভাব লক্ষ করল রানা। ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছাল সে। বলল, 'গড, কি চেহারা হয়েছে তোমার! কি ঘটেছিল বলো তো?'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা, ঠোঁট টিপে হাসল। 'কি ঘটেছিল মানে? বলো কি ঘটেনি!'

'এসো, ক্লিনিকে এসো। আগে তোমাকে পরীক্ষা করি।'

'প্রথমে গোসল করা দরকার না? আমি নিজেই নিজের পাশে টিকতে পারছি না।'

হেসে উঠল মনিকা। 'তোমার নাক! এসো, কিছু আসে যায় না, তোমার গন্ধ আমি চিনি–কোনদিন বলিনি খারাপ লাগে!'

ক্লিনিকে নিয়ে এসে রানাকে টেবিলে শুইয়ে দিল মনিকা। পিঠের ক্ষতটা পরীক্ষা করে বলল, 'যা করার পারুমাই করে রেখেছে, আমি শুধু তোমাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেব। একটা ব্যাণ্ডেজও লাগবে, তবে গোসল করার পর। সেলাই করা উচিত ছিল, তবে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আরও অনেক পুরানো দাগের সঙ্গে নতুন একটা যোগ হলো তোমার শরীরে,' বেসিনে হাত ধোয়ার সময় বলল মনিকা। 'দেখে মনে হলো, কারো সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে তোমার।'

'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ,' মনিকাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আমার রাশিটাই বোধহয় খারাপ, মানুষ হয় আমাকে মেরে ফেলতে চায় নয়তো কোন কারণ ছাড়াই রাগ করে দূরে সরে যায়। এই যেমন তুমি–শেষবার যখন দেখা হলো, তুমি আমাকে কিছু ব্যাখ্যা করারও সুযোগ দিলে না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি মোটর সাইকেল ছেড়ে দিয়েছ...।'

'জানি। এই রাগ আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।'

'ব্যাপারটা কি এখন আমি ব্যাখ্যা করতে পারি?'

'তার আগে গোসল করে নিলে হয় না?'

বেড়া দিয়ে ঘেরা বেশ বড় বাথরুম, ক্যাম্পের চাকরবাকররা গরম পানি রেখে গেছে। ওর জন্যে কাপড়ের ব্যবস্থাও করেছে মনিকা–খাকি শর্টস আর শার্ট, সদ্য ইস্ত্রি করা। চামড়ার তৈরি একজোড়া স্যাণ্ডেলও পেয়ে গেল রানা। কাদা মাখা বুট আর রক্ত মাখা শর্টস একজন চাকর এসে নিয়ে গেল।

সার্জারিতে ফিরে এসে রানা দেখল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মনিকা। 'বাহ্, কি পরিবর্তন!' হেসে উঠল মনিকা। 'এসো, পিঠটা মেরামত করি।'

একটা চেয়ারে বসল রানা, ওর পিছনে দাঁড়াল মনিকা। মেয়েলি আঙুলের নরম ছোঁয়া ঠাণ্ডা লাগল রানার। কথা বলার সময় নাকে তার গায়ের গন্ধ ও নগ্ন ঘাড়ে নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল। 'আমাকে উদ্ধারের জন্যে পিগমিদের পাঠিয়েছিলে, সেজন্যে এখনও তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি,' বলল ও।

'বলতে পারো রুটিন ওঅর্ক,' হাসি চেপে বলল মনিকা। 'এখানে এরকম অনেককেই বাঁচাবার চেষ্টা করছি আমরা। ভুলে যাও।'

'আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম।'

'ঋণ শোধ করার প্রস্তাব পাবে, তৈরি থেকো।'

'পারুমার বর্ণনা শুনে তোমার কথাই মনে হয়েছিল আমার। এ-দেশে তুমি ঢুকলে কিভাবে বলো তো? এখানে তুমি করছটাই বা কি? সিমন সাফারি তোমাকে পেলে সামরিক অফিসারদের টার্গেট প্র্যাকটিস করার নির্দেশ দেবে, তা জানো?'

'ও, আচ্ছা! তার মানে সিমন সাফারি সম্পর্কে তোমার মোহ তাহলে ভেঙেছে! তুমি তো তাকে দেবতা বলে ধরে নিয়েছিলে!'

'আবার লাগবে মনে হচ্ছে! এখনও আমি খুব দুর্বল, নিজেকে রক্ষা করতে পারব না।'

'একটা গণ্ডারের মত দুর্বল তুমি। এত সব পেশী কি বলে? বেশ, বাদ দাও–এসো, এবার ইঞ্জেকশনটা দিই তোমাকে। বিছানায় শুয়ে কোমর থেকে শর্টস নামাও।'

'অ্যাই! হাতে দিতে অসুবিধে কি?'

'আগে দেখিনি এমন কিছু নেই তোমার। টেবিলে শোও বলছি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে টেবিলে উঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, কোমর থেকে অর্ধেকটা নামিয়ে আনল শর্টস।

'বেশ ভাল আকৃতি, লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই,' রানাকে আশ্বস্ত করল মনিকা, সুইটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল মাংসের ভেতর। 'ব্যস, হয়ে গেল। কাপড় পরে ডিনারে বসবে চলো। তোমার জন্যে আরও একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ডিনারে তোমার সঙ্গী হবেন এক ভদ্রলোক–অনেক বছর তাঁকে তুমি দেখনি।'

সূর্য ডুবছে, ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরোল ওরা, চলে এল লিভিং কোয়ার্টারে। পথে একবার থামল রানা, চাঁদের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখল। রানার পাশ থেকে মনিকা ফিসফিস করে বলল, 'এই সৌন্দর্য আমি সারাজীবন স্মৃতিতে ধরে রাখব।' রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে।

মনিকার বাংলোয় ডিনারের আয়োজন। বারান্দায় লম্বা একটা টেবিল ফেলা হয়েছে। টেবিলে বসে আছেন নিঃসঙ্গ এক ভদ্রলোক। ওদেরকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'মি. মাসুদ রানা! হাউ গুড টু সী ইউ এগেন!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর দ্রুত এগোল ভদ্রলোকের দিকে। 'কিন্তু আমি শুনেছি আপনি মারা গেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট! আমাকে বলা হয়েছে হয় আপনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন, নয়তো সিমন সাফারি আপনাকে গুলি করে মেরেছেন।'

'গুজবে কান দিতে নেই,' হাসিমুখে বললেন ড. শেখ ফাহিম ফয়সল, রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ঝাঁকালেন।

'আমার মেডিকেল চেস্টে একটা হুইস্কির বোতল পেয়েছি,' বলল মনিকা। 'আজ রাতে ওটা সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।' তিনটে গ্লাসে অল্প করে হুইস্কি ঢালল সে। যে যার গ্লাস তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরল। 'উবোমোর শুভ কামনায়! অত্যাচারীর হাত থেকে দেশটা যেন শিগগির মুক্তি পায়।'

নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, আর বাগানে আছে তাজা তরি-তরকারি–সে-সবই রান্না করা হয়েছে। কিভাবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে উৎখাত করা হলো, খেতে খেতে তার একটা বর্ণনা দিলেন ড. শেখ ফাহিম ফয়সল। বললেন এখানে তিনি কিভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন। জানালেন, সিমন সাফারির বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছেন তাঁরা। সবশেষে বললেন, 'মনিকার সাহায্যে গোনডালাকে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে সিমন সাফারির ডিকটেটরশিপ-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি আমি।'

তিনি থামতেই মনিকা বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, ক্ষমতা দখলের পর সিমন

সাফারি দেশটাকে নিয়ে কি করছেন রানাকে জানান। ওর জানা দরকার, কারণ সাফারির পক্ষ নিয়ে উবোমোর ফিচার ফিল্ম তৈরি করতে এসেছে ও···।'

'না, মনিকা,' বাধা দিল রানা। 'আসলে তা সত্যি নয়। ব্যাপারটা আরও জটিল। এখানে ছবি তোলার প্রস্তাবে প্রথমে আমি ব্যক্তিগত কারণে রাজি হই।' আলী শাহ ও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলল ও। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে চণ্ডমণ্ড গণ্ড কিভাবে জড়িত তা-ও ব্যাখ্যা করল। ব্যাখ্যা করল চাখার সিং-এর ভূমিকা। 'প্রথম যখন এলাম, সিমন সাফারি বা উবোমোর সমস্যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি। আমি আসলে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। ছবি তোলার প্রস্তাবটা গ্রহণ করার সেটাই একমাত্র কারণ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে জানতে পারি উবোমোয় আসলে কি ঘটছে···।' ফ্রিশ ঈগল বে-র ঘটনাটা ওদেরকে জানাল রানা।

ড. ফাহিম ফয়সল ও মনিকা দৃষ্টি বিনিময় করল। রানার দিকে ফিরে ভদ্রলোক বললেন, 'মাইন আর লগিং ক্যাম্পে ত্রিশ হাজার উহালিকে ধরে নিয়ে গেছে সিমন সাফারি। মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। আক্ষরিক অর্থেই ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। পোকামাকড়ের মত মারা যাচ্ছে তারা–কেউ খাবার না পেয়ে, কেউ গুলি খেয়ে।'

'গাছ কেটে বন উজাড় করে ফেলছেন সিমন সাফারি,' বলল মনিকা। 'এরই মধ্যে কয়েক মিলিয়ন একর রেইন ফরেস্ট নষ্ট করে ফেলেছেন···।'

'মাইনিং ইউনিট কিভাবে কাজ করছে আমি দেখেছি,' বলল রানা। 'দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সাবধানে ব্যবহার করলে ক্ষতিটা প্রকৃতিই আবার পূরণ করে দেয়···।'

চোখে অবিশ্বাস, দু'জনেই ওরা রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তুমি কি পাগল হলে, রানা? সিমন সাফারির আচরণ তুমি সমর্থন করছ? উনি স্রেফ রেপ করছেন প্রকৃতিকে। তুমি দেখছি সত্যি বদলে গেছ, রানা! তোমার সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটাই তাহলে ঠিক ছিল···।'

'থামো, মনিকা!' একটা হাত তুলে বাধা দিলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'মাথা ঠাণ্ডা করো। মি. রানাকে বলতে দাও কি দেখেছেন তিনি।'

চুপ করল বটে, তবে মনিকার চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে। 'ঠিক আছে, মাসুদ রানা, সিমন সাফারি কি দেখিয়েছেন তোমাকে শোনাও আমাদের···।'

'মোমু ইউনিট কিভাবে কাজ করে···,' শুরু করল রানা।

'মোমু ইউনিট? মোমু ইউনিটগুলো নয়?' চিৎকার করে জানতে চাইল মনিকা।

'প্লীজ, মনিকা!' আবার বাধা দিলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'মি. রানাকে শেষ করতে দাও!'

আবার চুপ করল মনিকা, উত্তেজনায় ও রাগে হাঁপাচ্ছে সে।

'সোফিয়া আর আমি মোমু কিভাবে কাজ করে তার ছবি তুললাম,' বলল রানা। 'সিমন সাফারি ব্যাখ্যা করলেন মোমু মাটি কাটার পর কিভাবে আবার খাদ ভরা হবে, তারপর সেখানে নতুন করে গাছের চারা লাগানো হবে···।'

'মাই গড!' তোমাকে বোকা বানিয়েছেন সিমন সাফারি!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল মনিকা। 'তিনি কি বলেছেন যে কয়েক হপ্তা ধরে প্ল্যাটিনাম পরিশোধনের কাজে কেমিক্যাল রিএজেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, মোমুর টিউব মিল থেকে বেরুবার সময়?'

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'তিনি বরং বলেছেন, কোন রিএজেন্ট বা ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করা হবে না।'

'আর তুমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'বিশ্বাস না করার কি আছে, নিজের চোখেই তো দেখলাম সব…।'

লাফ দিয়ে টেবিল ছাড়ল মনিকা, পাশের কামরা থেকে একটা ম্যাপ নিয়ে এল। রানার সামনে মেলে ধরল সেটা। 'দেখাও আমাকে, কোথায় কাজ করছে মোমু?'

ম্যাপে চোখ রেখে কিছুক্ষণ খুঁজল রানা, তারপর এক জায়গায় আঙুল রাখল। 'এখানে। ক্যাম্প থেকে কয়েক মাইল উত্তরে।'

'বোকা!' রানার দিকে ঝুঁকে মুখে ঝড় তুলল মনিকা। 'সিমন সাফারি তোমাকে গাধা বানিয়েছেন। তিনি তোমাকে পাইলট স্কীম দেখিয়েছেন। গোটা ব্যাপারটার আয়োজন করা হয়েছে শুধু তোমাকে বোকা বানাবার জন্যে।' ম্যাপের গায়ে আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে আঙুল রাখল সে। 'এখানে, এই ওয়েঙ্গুতে চলেছে আসল অপারেশন। এখানে গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম…।'

'অন্যরকম মানে?' রানার গলায় ঝাঁঝ। 'দেখো, কেউ আমাকে বোকা বলুক এটা আমার পছন্দ নয়।'

'তুমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলে না,' গলার আওয়াজ আগের চেয়ে নরম করল মনিকা। 'ওখানে কি চলছে শোনো তাহলে…।'

'থামো, মনিকা,' বাধা দিলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'এখুনি ওঁকে কিছু বোলো না। তোমার কথা উনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন যদি নিজের চোখে দেখেন…।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মনিকা বলল, 'চমৎকার! ধন্যবাদ, ড. ফয়সল। ওকে ওয়েঙ্গুতে নিয়ে যাব, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। চলো, রানা—বেজন্মা সিমন সাফারি আসলে কি করছেন তার ছবি তুলবে তুমি। তোমার প্রিয় বন্ধু স্যার ট্যাফোর্ডের কীর্তিও চাক্ষুষ করার সুযোগ হবে তোমার…।'

রানা বলল, 'কিন্তু আমি ঠিক ক্যামেরাম্যান নই…।'

'ক্যামেরাম্যান নও তো কি হয়েছে? এতদিন ধরে ফিল্ম তৈরি করছ, চালাতে তো জানোই।'

'বেশ, জানি। কিন্তু এই জঙ্গলের মাঝখানে কোথায় তুমি ভিটিআর ইকুইপমেন্ট পাবে, শুনি?'

'তোমার বান্ধবী সোফিয়া যেটা ব্যবহার করছিল, সেটা কোথায়?' জানতে চাইল মনিকা।

প্রতিবাদ করল রানা, 'সোফিয়া আমার বান্ধবী নয়। তোমার শুধু কথায় কথায় অভিযোগ।'

'আমি জানতে চাইছি তোমাদের ভিটিআর কোথায়?'

'ল্যাণ্ডরোভারে ফেলে রেখে এসেছি,' বলল রানা। 'সিমন সাফারির লোকজন এখনও যদি ওটা খুঁজে না পেয়ে থাকে, ওখানেই আছে সেটা।'

'সেক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছো তুমি,' বলল মনিকা। 'ওগুলো নিয়ে আসছ। তোমার সঙ্গে আমি লোদজি হাবিবকে পাঠাব।'

'আপনার কথা মত বিদেশী জানোয়ারের মুণ্ডু এনেছি আমি,' নাটকীয় সুরে ঘোষণা করল শিকারী ওজি হাবিব, কাঁধ থেকে জালটা নামিয়ে ফেলে দিল পায়ের কাছে।

জাল থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গড়িয়ে গেল মাথাটা। লাফ দিয়ে পিছু হটল চাখার সিং, বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা, তাকিয়ে আছে মানুষের মাথাটার দিকে। মাথায় চামড়া বলতে কিছু নেই। কাঁচা মাংসে পচন ধরেছে, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। 'কি করে বুঝব এটা সেই লোকের মাথা?' জানতে চাইল সে।

'আমি, ওজি হাবিব বলছি, কাজেই বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে।'

'ইউ আর আ লায়ার, নেভার মাইণ্ড!' ইংরেজিতে বলল চাখার সিং। তারপর সোয়াহিলি ভাষায় বলল, 'এই লোকটা অনেক দিন আগে মারা গেছে। পিঁপড়ে আর পোকায় খেয়ে ফেলেছে তার অর্ধেকটা। তুমি তাকে মারোনি, ওজি হাবিব।'

'না,' স্বীকার করল ওজি হাবিব। 'বোকা লোকটা বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়েছিল, আমি তাকে খুঁজে পাবার আগেই মরে ভূত হয়ে গেছে। পিঁপড়েগুলো তাকে খেয়েছে, সত্যি বটে, তবে তার মাথাটা আমি আপনার কাছে ঠিকই এনেছি। এই কাজটাই আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।' চাখার সিং-এর সামনে হাত পাতল সে। 'এবার আমাকে পুরস্কার দিন। বিশেষ করে প্রথমে আমি তামাক চাই।'

প্রায় মিথ্যে একটা আশা, ওজি হাবিব জানে। মাথাটা সংগ্রহ করার জন্যে কবরস্থানে অভিযান চালাতে হয়েছে তাকে। লগিং ক্যাম্পে ক্রীতদাসরা মারা যাচ্ছে গুলি খেয়ে, তাদেরকে হিটো সৈনিকরা চুপিচুপি মাটি চাপা দেয়, সেই মাটি খুঁড়ে একটা লাশ চুরি করতে হয়েছে তাকে।

'তুমি ঠিক জানো এ সেই বিদেশী লোকটার মাথা?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। ওজি হাবিবের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। তবে তার নিজের সমস্যা হলো, চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারিকে সন্তুষ্ট করতে হবে। রানা সম্ভবত পালিয়ে গেছে, এ আশঙ্কার কথা কোনভাবেই তাঁদেরকে শোনানো যাবে না। ওজি হাবিব তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সহজ একটা উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে।

'অবশ্যই এ সেই লোক,' জোর দিয়ে বলল ওজি হাবিব। 'তা না হলে মাথাটা এত কষ্ট করে কেন আমি নিয়ে আসব!'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর চাখার সিং বলল, 'নিয়ে যাও এটা।' জুতোর ডগা দিয়ে কাটা মাথাটায় খোঁচা দিল সে। 'নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে কোথাও পুঁতে ফেলো।'

'কিন্তু আমার পুরস্কার? বিশেষ করে তামাক?' তীক্ষ্নকণ্ঠে জানতে চাইল ওজি হাবিব।

'তুমি গোটা মাথাটা আনতে পারনি। চামড়া নেই, চুলও নেই। কাজেই সবগুলো পুরস্কার তোমার পাওনা হয়নি। দেব, সবই দেব, তবে আগে তুমি হাতির দাঁতগুলো নিয়ে এসো।'

হঠাৎ দুর্বোধ্য চিৎকার বেরিয়ে এল ওজি হাবিবের গলা থেকে, এক টানে কোমর থেকে ম্যাচেটি নামাল সে।

'হাতের ওটা সরিয়ে রাখো,' চাখার সিং বলল। 'তা না হলে গুলি করে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।' ওজি হাবিবকে একটা টোকারেভ পিস্তল দেখাল সে, তার বুশ জ্যাকেটের ভেতর লুকানো রয়েছে।

খিকখিক করে হাসল ওজি হাবিব। 'সামান্য একটু ঠাট্টা করলাম, প্রভু। আমি তো আপনার বিশ্বস্ত চাকর।' কোমরের খাপে ম্যাচেটিটা ভরে রাখল সে। 'আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছি আবার। হাতির দাঁত নিয়ে আসব।' বিচ্ছিন্ন মাথাটা তুলে জালে ভরল সে, জালটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। দ্বিতীয়বার চাখার সিং-এর দিকে না তাকিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে।

একা হতেই আবার কোমর থেকে ম্যাচেটি বের করল ওজি হাবিব। সামনে ঝোপ-ঝাড় যা পেল সব কেটে ফেলছে। 'ওজি হাবিবকে কেউ ঠকাতে পারে না!' আপনমনে বিড়বিড় করছে সে। 'কেউ ঠকালে ওজি হাবিব তাকে খুন করে। তুমি আমার কাছে একটা মাথা চেয়েছ, বিদেশী কুত্তা! ঠিক আছে, তোমাকে একটা মাথা উপহার দেব আমি। তোমার নিজের মাথা।'

'মাসুদ রানা মারা গেছে,' ওদেরকে বলল চাখার সিং। 'বামবুটি শিকারী তার মাথা নিয়ে এসেছিল। জঙ্গলে মারা গেছে সে।'

'কোন সন্দেহ নেই তো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি।

'কোনই সন্দেহ নেই,' তাঁকে আশ্বস্ত করল চাখার সিং। 'আমি নিজের চোখে মাথাটা দেখেছি।'

'এখন তাহলে জীবিত সাক্ষী বলতে শুধু ওই মেয়েটা,' বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। 'আপনার উচিত এখুনি তার একটা ব্যবস্থা করা, ইওর এক্সেলেন্সী। মেয়েটাও জঙ্গলে হারিয়ে গেলে ভাল হয়, ঠিক মি. মাসুদ রানার মত।'

খালি গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঝাঁকালেন সিমন সাফারি, বরফের টুকরোগুলো আওয়াজ তুলল। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে গ্লাসটা চেয়ে নিল ক্যাপটেন সোল। কামরার আরেক দিকে ছোট একটা বার রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে গ্লাসটায় হুইস্কি ভরল সে।

'ভিডিও টেপটার কথা ভুলে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে?' জানতে চাইলেন সিমন সাফারি, ক্যাপটেন সোলের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে গ্লাসটা নিলেন।

'না, ভুলছি না,' বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'দূতাবাস থেকে ওটা উদ্ধার করে

আনার পরপরই মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'আপনি বললে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যবস্থা করতে পারি।'

গ্লাসের কিনারা থেকে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন সিমন সাফারি। ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'ও, হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'আমি শুনেছি আপনার একটা অদ্ভুত শখ আছে—নারীদের নিয়ে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।' আড়ষ্ট হয়ে গেছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আমি শুধু প্রস্তাব দিচ্ছি কাজটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কোন সুতো আলগা রেখে দেয়া উচিত হবে না।'

'ঠিক বলেছেন, মি. গণ্ড,' একমত হলেন সিমন সাফারি। 'মেয়েটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তার ওপর আমার আর কোন আগ্রহ নেই। টেপটা উদ্ধার হবার পর তাকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। শুধু লক্ষ রাখবেন, কোথাও যেন কোন ভুল না হয়।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি যেমন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমিও ঠিক তেমনি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমরা পার্টনার, তাই না?'

'রানার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, ও নিজে এসে টেপটা নিয়ে যাবে,' স্যার মাইকেল ডাফ বলল, হাতের নখগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে। তারপর জানালার সামনে দাঁড়াল সে, নিজের অফিস কামরা থেকে ব্রিটিশ দূতাবাসের উঠনটা দেখল। 'আমার পজিশন আপনাকে বুঝতে হবে, মিস... মিস সোফিয়া।'

খালি হাতে সিমন সাফারির কাছে ফিরে গেলে কি ঘটতে পারে কল্পনা করে শিউরে উঠল সোফিয়া। যেমন করে হোক টেপটা নিয়ে যেতে হবে তাকে। আবার এ-ও সত্যি, বেশি আগ্রহ দেখালে আরও সাবধান হয়ে যাবে মাইকেল ডাফ। 'এ-ধরনের কোন সমস্যা হতে পারে, আমি ভাবিনি।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'রানার উচিত ছিল আমাকে একটা নোট দিয়ে পাঠানো। আমিও চাইনি, কারণ টেপটার তেমন কোন গুরুত্ব আছে বলে আমার জানা নেই। যাই হোক, আপনি সময় দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, স্যার মাইকেল। রানা হয়তো আমার ওপর রাগ করবে, তবে কেন আপনি আমাকে বিশ্বাস করেননি বুঝিয়ে বললে বুঝবে ও...'

'না, ব্যাপারটা আপনাকে বিশ্বাস করা বা না করার নয়।' জানালার দিকে পিছন ফিরল মাইকেল ডাফ।

'নয় বলছেন? কিন্তু আমি তো তাই বুঝলাম!'

নাকের পাশটা চুলকাল মাইকেল ডাফ। 'আপনি রানার অ্যাসিস্ট্যান্ট, একেবারে অচেনা কেউ নন...একটা রশিদ দিতে পারবেন তো, মিস সোফিয়া?'

ব্রিটিশ দূতাবাসের লেটার প্যাডে খস খস করে কয়েকটা কথা লিখল মাইকেল ডাফ, তাতে সই করল সোফিয়া ক্যারল। নামের পাশে নিজের পাসপোর্ট

নম্বরটাও বসাল। পাশের কামরায় ঢুকল মাইকেল ডাফ, একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল আবার।

'রানাকে আমার সালাম জানাবেন,' দূতাবাসের সদর দরজা পর্যন্ত সোফিয়ার সঙ্গে হেঁটে এল মাইকেল ডাফ। 'সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে কবে ফিরছে সে?'

'আজ বিকেলে হেলিকপ্টারে চড়ে ওর কাছে যাচ্ছি আমি···।' নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখছে সোফিয়া, কথা বলছে হাসিমুখে। দরজার কাছে পৌঁছে হ্যাণ্ডশেক করল ওরা।

রাস্তার এক ধারে আর্মি ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ক্যাপটেন সোল। সীটে বসে হেলান দিল সোফিয়া। চোখ বুজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মাইকেল ডাফের দেয়া প্যাকেটটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে।

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনার জন্যে ইয়টে অপেক্ষা করছেন, মিস সোফিয়া,' ল্যাণ্ডরোভার ছেড়ে দিয়ে বলল ক্যাপটেন সোল। লেকসাইড রোড ধরে হারবারের দিকে ছুটল গাড়ি।

ফিশ ফ্যাক্টরী ছাড়িয়ে আরও খানিক সামনে নৌ-বাহিনীর জেটিতে নোঙর ফেলেছে ইয়টটা। ধনী এক এশিয়ান ব্যবসায়ীর শখের জিনিস ছিল ওটা, ক্ষমতায় আসার পর উবোমো থেকে তাকে বহিষ্কার করেছেন সিমন সাফারি। আগেই তার সমস্ত সম্পত্তি ও ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করা হয়, তার মধ্যে এই ইয়টটাও ছিল।

পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা একটা ক্যাসপার অ্যাণ্ড নিকলসন ওটা, আরাম ও বিলাসের সব রকম উপকরণ দিয়ে ভেতরটা সাজানো। মেইন কেবিনে এই মুহূর্তে মাত্র দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। ইউডিসি-র মাসিক লাভ-লোকসানের রিপোর্ট দেখছেন সিমন সাফারি, টেবিলের ওদিক থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, চোখে প্রত্যাশা। রিপোর্টটা রেখে দিয়ে মুখ তুললেন সিমন সাফারি। হাসলেন তিনি, সাড়া দিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ডও মৃদু হাসলেন।

'আমি মুগ্ধ, মি. গণ্ড,' বললেন প্রেসিডেন্ট, মাথা নত করে সম্মান দেখালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'উবোমোয় এসে কোম্পানীর দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন মাত্র অল্প ক'দিন হলো, এরই মধ্যে দারুণ লাভ হতে শুরু করেছে।'

'আপনি অত্যন্ত সদয় ব্যক্তি, মি. প্রেসিডেন্ট, ইওর এক্সেলেন্সী। তবে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আগামী মাসগুলোয় লাভের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে।'

'ভেহিকেল মেইনটেন্যান্স ডিপো সম্পর্কে বলুন দেখি। এ-ব্যাপারে আমি উদ্বেগে আছি।'

'মোমু বাদ দিয়ে আমাদের রয়েছে এক হাজার ভারি ভেহিকেল। আমি যখন দায়িত্ব নিই, মেইনটেন্যান্স কস্ট ছিল প্রতি মাসে তিন মিলিয়ন ডলার। রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছেন, ওটা আমি শতকরা চল্লিশ পার্সেন্ট কমিয়ে এনেছি।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। তারপর হালকা পায়ের শব্দ ভেসে এল কেবিনের বাইরে থেকে। নক হলো দরজায়।

'কে?' জিজ্ঞেস করলেন সিমন সাফারি।

'ক্যাপটেন সোল, মি. প্রেসিডেন্ট।'

চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকালেন সিমন সাফারি। স্রেফ করে মাথা ঝাঁকালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। লেক হাউসের বোর্ড রুমে মীটিঙে না বসে এখানে বসার পিছনে কারণ আছে। 'কাম ইন,' নির্দেশ দিলেন সিমন সাফারি। দরজা একপাশে সরে গেল, মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকল ক্যাপটেন সোল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুট করল।

'ডকে, ল্যাণ্ডরোভারে মিস সোফিয়াকে বসিয়ে রেখে এসেছি আমি,' রিপোর্ট করল সে।

'ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে প্যাকেটটা এনেছে সে?'

'জ্বী, স্যার। তার কাছেই রয়েছে ওটা।'

আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন সিমন সাফারি ও চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তবে এবার দু'জনেই হাসছেন।

'ঠিক আছে, সোল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সিমন সাফারি। 'কি করতে হবে তুমি জানো।'

'জ্বী, জানি, মি. প্রেসিডেন্ট। মি. গণ্ড ও মিস সোফিয়ার সঙ্গে লামু দ্বীপে যেতে হবে আমাকে, তারপর আমাকে···।'

'নতুন করে বলার দরকার নেই, ক্যাপটেন সোল,' বাধা দিলেন সিমন সাফারি। 'তবে প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন হওয়া চাই। এবার তুমি মিস সোফিয়াকে এখানে আনতে পারো।'

তিন মিনিট পর ঝড়ের বেগে কেবিনে ঢুকল সোফিয়া। সরাসরি সিমন সাফারির দিকে এগোল সে, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকালই না। 'এনেছি, সিমন!' আনন্দে ও উত্তেজনায় টগবগ করে যেন ফুটছে সে। 'এই নাও!' সিমন সাফারির সামনে এনভেলাপটা রাখল সে।

এনভেলাপ খুলে ভিডিও টেপটা বের করলেন সিমন সাফারি। 'তুমি ঠিক জানো এটাই সেটা?'

'অবশ্যই সেটা। লেবেলে আমার নোট লেখা রয়েছে না!'

'ওয়েল ডান। তোমার ওপর সাংঘাতিক খুশি আমি।' হাসছেন সিমন সাফারি। 'এসো, আমার পাশে বসো, ডার্লিং।'

প্রায় ছুটে এসে সিমন সাফারির পাশে বসে পড়ল সোফিয়া। টেবিলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার উরু স্পর্শ করলেন তিনি। 'ক্যাপটেন সোল, ফ্রিজে একটা শ্যাম্পেনের বোতল আছে। এত বড় সাফল্য অর্জনের পর একটু আনন্দ না করলে চলে না।'

বার-এর সামনে এসে বোতলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাপটেন সোল। কোন গ্লাসটা সোফিয়াকে দেয়া হবে তা আগেই ঠিক করে রেখেছে সে। সাদা পাউডার মেশাবার পরও শ্যাম্পেনের রঙ আগের মতই থাকল। খেতে একটু তেতো লাগলেও, কোন অভিযোগ করল না সোফিয়া। তার গ্লাসটা দ্বিতীয়বার ভরে দিল ক্যাপটেন সোল।

ধীরে ধীরে সিমন সাফারির গায়ে হেলান দিল সোফিয়া। তাঁর কি একটা কথায় হাসি পেল, হাসলও, তবে অনুভব করল মুখের চামড়া কেমন যেন অসাড় লাগছে।

সিমন সাফারি প্রস্তাব দিলেন, 'চলো, ইয়ট নিয়ে খানিক দূরে যাই, সূর্যাস্ত দেখা যাবে।'

'দারুণ!' বলার চেষ্টা করল সোফিয়া, শব্দটা জড়িয়ে গেল মুখের ভেতর। হঠাৎ সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করল সে, পালা করে সিমন সাফারি আর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকাল। তার মাথার ভেতর কি রকম অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। আবার সিমন সাফারির গায়ে হেলান দিল সে।

সিমন সাফারির ভারি গলা শুনতে পেল সোফিয়া, মনে হলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। 'গুড বাই, মাই ডিয়ার!'

সোফিয়া জ্ঞান হারাবার পর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। ইতিমধ্যে সোফিয়াকে ধরে কেবিনের মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছে ক্যাপটেন সোল। টেবিল থেকে কাগজ-পত্র গুছিয়ে ব্রিফকেসে ভরে নিলেন সিমন সাফারি। দরজা খুলে ধরল ক্যাপটেন সোল, কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজার কাছে একবার থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন কেবিনের ভেতর। চণ্ডমণ্ড গণ্ড এখনও তাঁর চেয়ারে বসে আছেন, তাকিয়ে আছেন অজ্ঞান সোফিয়ার দিকে। তার চোখে অদ্ভুত এক লোভাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

জেটির শেষ মাথায় পৌঁছে ক্যাপটেন সোলকে সিমন সাফারি বললেন, 'এখানে আবার ফিরিয়ে আনার আগে দেখে নিয়ো ইয়টটা ভাল করে ধোয়া হয়েছে কিনা। প্রেশার হোস কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, জানো তো?'

'জ্বী, স্যার, জানি।'

মার্সিডিজে চড়ে বিদায় নিলেন সিমন সাফারি।

ইয়টের এঞ্জিন আগে থেকেই সচল রাখা হয়েছে। নোঙর তুলে হুইলে চলে এল ক্যাপটেন সোল, জেটি থেকে রওনা হয়ে গেল ওরা। হারবার-এর প্রবেশমুখের দিকে যাচ্ছে।

লামু দ্বীপে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগল। ইতিমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। নোঙর ফেলার পর ক্যাপটেন সোল বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি, স্যার।'

'একটু সাহায্য করুন, প্লীজ, ক্যাপটেন।'

কেবিনে চলে এল ক্যাপটেন সোল। সোফিয়া এখনও শুয়ে আছে মেঝেতে। ধরাধরি করে খোলা ককপিটে আনা হলো তাকে। সোল খাড়া করে ধরে রাখল, চণ্ডমণ্ড গণ্ড স্টেনলেস স্টীল রেইলিং-এর সঙ্গে তার কব্জি ও গোড়ালি স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধলেন। সোফিয়ার নিচে নাইলনের একটা শিট বিছালেন তিনি, চাদরটার একটা প্রান্ত ইয়টের পিছন দিকে ঝুলে থাকল, এতে করে ডেকটা হোস পাইপের পানি দিয়ে ধোয়া সহজ হবে।

'আমার আর কোন সাহায্যের দরকার নেই,' ক্যাপটেন সোলকে বললেন তিনি। 'রাবার ডিঙ্গি নিয়ে দ্বীপে চলে যান আপনি। আমি না ডাকা পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন। কানে যা-ই শুনুন, এদিকে আসার কোন দরকার নেই।

বুঝতে পারছেন তো?'

'জ্বী, মি. গণ্ড।'

ডিঙ্গি নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাপটেন সোল, ইয়টের পিছনে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। দ্বীপের গায়ে ভিড়ল তার ডিঙি, আউটবোর্ড মোটর বন্ধ হলো, নিভে গেল টর্চের আলো।

সোফিয়ার দিকে ফিরলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ঝুলে পড়েছে সে, স্ট্র্যাপগুলোয় টান পড়েছে। ককপিটের আলোয় অত্যন্ত ম্লান দেখাচ্ছে তাকে, এলোমেলো হয়ে আছে মাথার চুল।

একা হবার পর মুহূর্তগুলো দারুণ উপভোগ করছেন তিনি। শারীরিক অর্থে সোফিয়া তাঁকে আকৃষ্ট করে না, তাঁর পছন্দের চেয়ে মেয়েটার বয়েস অনেক বেশি, তাসত্ত্বেও অনুভব করলেন ধীরে ধীরে বাড়ছে উত্তেজনা। একটু পরই এত মগ্ন হয়ে পড়বেন, এতটা বদলে যাবেন যে এ-ধরনের সামান্য বিষয়ের কোন গুরুত্ব থাকবে না।

চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি, কোন তাড়াহুড়ো নেই। পরিবেশটা দেখে নিচ্ছেন। লামু দ্বীপ মেইনল্যাণ্ড থেকে বারো মাইল দূরে, লেকের পানিতে গিজগিজ করছে হিংস্র কুমীর। পানিতে কিছু একটা ফেলা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে ওগুলো, যাই ফেলা হোক কয়েক মিনিটের মধ্যে তার আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তাছাড়া, খোদ এ-দেশের প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখছেন।

সোফিয়ার কাছে ফিরে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। মেয়েটার বাহুতে একটা টুর্ন্যারনিকেই লাগানো হয়েছে, সেটা অ্যাডজাস্ট করলেন তিনি। যন্ত্রটার কাজ হলো রক্তবাহী শিরাকে ফোলানো। সোফিয়ার কনুইয়ের নিচের দিকটা ম্যাসেজ করতে শুরু করলেন, যতক্ষণ না শিরাগুলো মোটা ও নীল হয়ে উঠল। তাঁর সঙ্গে অ্যান্টিডোট ও ডিজপোজেবল সিরিঞ্জ সব সময়ই থাকে, কারণ ওষুধটা ব্যবহার করার সুযোগ প্রায়ই আসে।

ইঞ্জেকশনটা দেয়ার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই চোখ মেলল সোফিয়া ক্যারল। চোখ মিট মিট করে তাঁর দিকে তাকাল সে। 'গুড ইভিনিং, মিস ক্যারল,' উত্তেজনায় খসখসে শোনাল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলা। 'আমি আর আপনি সামান্য একটু ফূর্তি করব এখন।'

ছয়

লুকানো ল্যাণ্ডরোভার থেকে ভিটিআর ইকুইপমেন্টগুলো নিয়ে এল রানা, যাবার বা আসার পথে কোন বিপদ ঘটল না। ড. ফাহিম ফয়সল হেডকোয়ার্টারে একটা জেনারেটর বসিয়েছেন, ভিডিওর ব্যাটারি রিচার্জ করতে কোন অসুবিধে হলো না। ঠিক হলো, পরদিন ছবি তোলার জন্যে রওনা হবে ওরা।

ড. ফাহিম ফয়সল জেদ ধরলেন, তিনিও ওদের সঙ্গে যাবেন।

কিন্তু মনিকা বলল, 'এ-ধরনের ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন না, ড. ফয়সল। আপনার কিছু হলে গোটা আন্দোলনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

রানাও তার সঙ্গে একমত হলো। ড. ফাহিম ফয়সলের বয়স সত্তরের ওপর। অত্যন্ত দুর্গম এলাকা পেরোতে হবে ওদেরকে। ওয়েঙ্গু এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। কিন্তু এ-সব যুক্তি শুনলেন না ড. ফয়সল, বললেন, 'উবোমো আমার দেশ। আমি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমার লোক আর আমার মাটির ওপর সিমন সাফারি কি অত্যাচার করছে তা আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।'

এরপর আর কোন তর্ক চলে না। পরদিন সকালে যখন রওনা হলো ওরা, ওদের সঙ্গে ড. ফয়সল থাকলেন। লোদজি হাবিব আটজন লোককে পোর্টার হিসেবে চাকরি দিয়েছে, তাদের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পারুমা। সে জানে, বামবুটিরা কোন কাজেই বেশিক্ষণ আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না, পোর্টাররা মাথার বোঝা ফেলে পিছন দিকে দৌড় দিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—তাকে লক্ষ রাখতে হবে সে-ধরনের কিছু যাতে না ঘটে। আশার কথা হলো, সবাই ওরা পারুমার জিভকে সাংঘাতিক ভয় পায়।

তিন দিনের দিন প্রথম লাল নদীটার সামনে পৌঁছুল ওরা। মাথার বোঝা নামিয়ে পোর্টাররা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাড়ে। কারও মুখে হাসি বা কথা নেই। এমনকি পারুমাও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে।

লাল কাদা, পশু-পাখির লাশ, বিষাক্ত আগাছা পেরিয়ে নদীর কিনারায় নামল রানা, ঝুঁকে এক মুঠো কাদা তুলে নিল। নাকের সামনে তুলে গন্ধ শুঁকল, তারপর ফেলে দিল ছুঁড়ে, চেষ্টা করল হাতের দাগ মোছার। 'জিনিসটা কি বলো তো, মনিকা?' উঁচু পাড়ের দিকে ফিরে জানতে চাইল ও। 'এর কারণ কি?'

'এটা হলো সেই রিএজেন্ট, সিমন সাফারি যেটা ব্যবহার করছেন না বলে তোমাকে জানিয়েছেন।' মনিকার পরনে শুধু একটা টি-শার্ট আর শর্টস, মাথায় পরেছে রঙিন হেডব্যাণ্ড। রাগে তার শরীরটা যেন কাঁপছে।

'এই রিএজেন্টে কি আছে?'

'আর্সেনিক!'

রানার চোখে অবিশ্বাস। 'কি বলছ! এ তো স্রেফ পাগলামি!'

'শয়তানি সঠিক শব্দ। এই লোকগুলো সুস্থ নয়, রানা। এদের কোন দায়িত্ববোধ নেই। টাকার লোভে গোটা বনভূমি বিষাক্ত করে ফেলেছে এরা।'

উঁচু পাড়ে উঠে এল রানা, মনিকার সামনে দাঁড়াল। 'বাস্টার্ডস,' বিড়বিড় করে বলল ও। ওর চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে দেখে কাছে সরে এল মনিকা, ওর একটা হাত ধরল।

'এখনও তুমি সবটা দেখোনি, রানা,' বলল সে। 'এখান থেকে মাত্র শুরু হলো। ওয়েঙ্গুতে পৌঁছে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার। চলো, নিজের চোখেই দেখবে।'

আবার রওনা হলো ওরা। কোথাও না থেমে পাঁচ ঘণ্টা ধরে হাঁটছে, এমন সময় হঠাৎ বামবুটি পোর্টাররা দাঁড়িয়ে পড়ল, যে যার মাথা থেকে ফেলে দিল বোঝাগুলো।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন ড. ফয়সল।

ব্যাখ্যা দিল মনিকা। 'বামবুটিদের নির্দিষ্ট একটা সীমানা আছে, যার বাইরে তারা শিকার করতে পারে না। আমরা সেই সীমানার কাছে চলে এসেছি। সীমানার ওপারটা পবিত্র মধ্যভূমি, ওখানে শিকার করলে বামবুটিরা মনে করে মহা পাপ হবে। কাজেই ওরা সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে।'

'ওদেরকে রাজি করানোর উপায় কি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল মনিকা। 'আমরা কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবার বেশি সম্ভাবনা। ব্যাপারটা পারুমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পারুমা বুড়ি তার অভিনয় প্রতিভার সবটুকু কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। কখনও তেড়ে মারতে যাচ্ছে, আবার কখনো আদর করে হাত বুলাচ্ছে মুখে বা মাথায়, কথা বলছে কানে কানে। এক ফাঁকে একটা গানও গাইল। তারপর মন্ত্র আওড়ে ফুঁ দিল সবার গায়ে। কয়েক পাক নাচল। সবশেষে গাছের ছাল উঁচু করে দেখিয়ে দিল নিজের পিছনদিকটা। আশ্চর্যই বলতে হবে, এত বয়েসেও যেমন মসৃণ তেমনি সুগঠিত তার নিতম্ব।

এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর হঠাৎ একজন পোর্টার তার বোঝাটা মাটি থেকে মাথায় তুলল। দেখাদেখি বাকি সবাইও। শান্তভাবে পবিত্র মধ্যভূমিতে প্রবেশ করল ওরা।

পরদিন ভোরে মেশিনের আওয়াজ পেল ওরা। যতই এগোল, ততই বাড়ল আওয়াজটা। ইতিমধ্যে অনেকগুলো নদী পেরুতে হয়েছে ওদেরকে, সবগুলোর কাদা মধুর মত লালচে। মেশিনের আওয়াজ ছাড়া বনভূমিতে আর কোন শব্দ নেই। কোন হরিণ বা পাখি, বানর বা খরগোস কিছুই চোখে পড়ল না। পোর্টাররা সবাই খুব ভয় পেয়েছে, পরস্পরের কাছাকাছি থাকছে তারা, ঘন ঘন চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

দুপুরের দিকে থামল লোদজি হাবিব, মনিকার কানে কানে কথা বলল। হাত তুলে পুবদিকটা দেখাল সে। রানা ও ড. ফয়সলকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল মনিকা। 'লোদজি হাবিব বলছে, আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। বনভূমিতে শব্দ খুব রহস্যময়—মেশিনগুলো কাজ করছে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। আর সামনে বাড়া উচিত হবে না, কারণ বনভূমির কিনারায় ওদের পাহারা আছে।'

'এখন তাহলে করণীয় কি আমাদের?' জানতে চাইলেন ড. ফয়সল।

'লোদজি হাবিব বলছে, পুবদিকে কয়েকটা পাহাড় আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে মাইনিং ও লগিং এরিয়া দেখতে পাব আমরা। পোর্টারদের নিয়ে এখানে থাকবে পারুমা। আমরা শুধু চারজন যাব।'

প্যাকেট খুলে ভিটিআর বের করল রানা।

এক লাইনে পাহাড়ে চড়ল ওরা, পথ দেখাল লোদজি হাবিব। চূড়ায় ওঠার

পরও দেখা গেল, বনভূমি ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। ওদের নিচ থেকে ভেসে আসছে ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ। 'এবার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখান থেকে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে আরও খানিক সামনে নিয়ে এল লোদজি হাবিব। আশপাশের গাছ প্রত্যেকটি প্রকাণ্ড, ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা মোটা ও লম্বা সেটার গোড়ায় থামল ওরা। 'পরস্পরের হাত ধরে থাকা বিশজন পিগমিও, গাছটাকে বেড় দিতে পারবে না,' ফিসফিস করল মনিকা। 'কল্পনা নয়, চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। এটা বামবুটি গোত্রের পবিত্র গাছ।' গাছের গায়ে খাঁজ কাটা হয়েছে, সিঁড়ির ধাপের মত, হাত তুলে দেখাল সে।

ধাপ বেয়ে প্রথমে উঠল লোদজি হাবিব। কয়েকটা ধাপ ঢালু হয়ে গেছে, কোনটায় পচন ধরেছে। নতুন করে ধাপ বানাতে হলো তাকে। গাছের গায়ে খাঁজ তো আছেই, গাছটাকে ঘিরে লতাপাতা দিয়ে তৈরি একটা মইও উঠে গেছে ওপর দিকে। লোদজি হাবিবকে অনুসরণ করে একশো ফুট ওপরে উঠে এল বাকি তিনজন। ড. ফয়সলকে মাঝখানে রাখল রানা ও মনিকা, মাঝে মাঝে থেমে উঠতে সাহায্য করল তাঁকে।

আরও ওপরে উঠল লোদজি হাবিব, গাছের কাণ্ড এদিকটায় গোড়ার তুলনায় অর্ধেক মোটা। যত ওপরে উঠল ওরা, ততই বদলে গেল আলো। তারপর হঠাৎ ওরা বেরিয়ে এল রোদের মধ্যে।

পবিত্র হানি ট্রি-র মগডালে উঠে এসেছে দলটা। নিচের দিকে তাকিয়ে বনভূমির ছাদ দেখতে পেল ওরা। বিশাল সমুদ্রের মত বিস্তৃত হয়ে আছে চারদিকে—সবুজ ও নিশ্ছিদ্র, শুধু উত্তর দিকটা বাদে। ওদিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল ওদের, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল সবাই।

উত্তর দিকে বনভূমি বলতে কিছুই নেই। ওদের নিচে পাহাড়, পাহাড়ের গোড়া থেকে যতদূর দৃষ্টি গেল, সেই বরফ ঢাকা প্রান্তর পর্যন্ত, সব ফাঁকা ও খালি, একটা গাছও দেখা যাচ্ছে না। যেখানে বনভূমি ছিল সেখানে এখন শুধু রয়েছে লাল মাটি।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. ফয়সল। 'মাই গড! এ তো অক্ষমনীয় অপরাধ! এত নির্মম সে হলো কিভাবে! এই ক্ষতি পরিমাপ করবে কে?'

'ক্ষতির হিসাব করা সম্ভব নয়,' বিড়বিড় করল মনিকা। 'পাঁচ লাখ একর, এক মিলিয়ন একর···আমি জানি না। মনে রাখতে হবে, এখানে প্রায় এক বছর ধরে এই কাজ করছে ওরা। আজ থেকে আরও এক বছর পর জঙ্গলের চেহারা কি দাঁড়াবে, কল্পনা করুন। ওই দানবগুলো যদি···,' হাত তুলে মোমু ভেহিকেলের সারিটাকে দেখাল সে। বনভূমির কিনারায় একযোগে কাজ করছে ওগুলো।

'এখানে দশটা মোমু মেশিন কাজ করছে!' ফিসফিস করে বলল রানা।

মাথা নাড়লেন ড. ফয়সল। 'মাত্র দশটা মেশিন জঙ্গলের এত বড় একটা এলাকা এভাবে সাফ করতে পারে না!'

মোমুগুলোর সামনে এক সারি ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর সচল রয়েছে, মোমুকে এগোবার সুযোগ করে দিচ্ছে গাছগুলোকে ফেলে দিয়ে। কাঁপতে কাঁপতে আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো ধরাশায়ী হচ্ছে একের পর এক।

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো রানা। ওর পাশে একটা ডালে বসে ফোঁপাতে শুরু করেছে লোদজি হাবিব। কাঁধ থেকে ভিডিওর নামাল রানা, চোখের সামনে তুলে তৈরি হলো ছবি তোলার জন্যে।

সন্ধে পর্যন্ত পবিত্র হানি ট্রি-র মগডালে থাকল ওরা। বনভূমি উজাড় করার প্রতিটি কর্মকাণ্ড ক্যামেরায় বন্দী করল রানা। তারপর বৃষ্টি নামল, থামার কোন লক্ষণ নেই বুঝতে পেরে পিচ্ছিল মই বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কোন বিপদ হলো না, গাছ থেকে নেমে পারুমা আর পোর্টারদের কাছে ফিরে এল দলটা। সকালে রওনা হলো গোনডালার উদ্দেশে। ফেরার পথে লাল নদীগুলোর ছবি তুলল রানা।

পবিত্র মধ্যভূমিতে এসে একটা হাতির পায়ের ছাপ দেখতে পেল লোদজি হাবিব। হাতিটাকে চিনতেও পারল সে, নাম বলল—এক কানওয়ালা বুড়া। পোর্টাররাও তার সঙ্গে একমত হলো। হাতিটার নাকি একটা কান নেই। ক'দিন পর এই প্রথম হাসল তারা, যেন বনভূমির মাঝখানে পুরানো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তাদের। কিন্তু তাদের মুখের হাসি একটু পরই মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করল পোর্টাররা। কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। লোদজি হাবিবের সামনে ছুটে এল মনিকা, জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, বুড়ো বাপ?'

'রক্ত,' জবাব দিল লোদজি হাবিব। 'হাতিটার রক্ত আর পেচ্ছাব। এক কানওয়ালা বুড়া আহত হয়েছে। মারা যাচ্ছে সে।'

'কেন, কি কারণ?' চিৎকার করছে মনিকা। সে-ও এই হাতিটাকে চেনে, ভালবাসে পুরানো বন্ধুর মত।

'কোন মানুষ তাকে আঘাত করেছে। পবিত্র মধ্যভূমিতে কেউ তাকে শিকার করছে। এ-ধরনের কাজ ভয়ানক অপরাধ, গোত্রের তরফ থেকে কড়া নিষেধ আছে। এই দেখ, হাতির পায়ের ছাপগুলো দেখ, ওগুলোর ওপর মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছে—দেখছিস?'

হঠাৎ নিজের কপালে চটাস চটাস চাপড় মেরে কাঁদতে শুরু করল পারুমা। কান্নার ফাঁকে বলল, 'এই পায়ের ছাপ আমি চিনি। এই মানুষকে আমি চিনি! এটা সেই গু-খেকো হারাম-খোর ওজি হাবিবের পায়ের ছাপ!'

দুই হাতে মুখ ঢেকে বামবুটিরা অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল। একটা হাতির জন্যে মানুষ এভাবে শোকে কাতর হয়ে পড়তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করত না রানা। ওদের কান্না দেখে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। পারুমা কাঁদছে আর কথা বলছে। তার কথা থেকে জানা গেল, বনভূমির দেবতা ওদের সবার ওপর প্রতিশোধ নেবেন।

আজ তিন দিন ধরে হাতিটাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে ওজি হাবিব। গভীর

জঙ্গলে, ঘন ঝোপের ভেতর ঘুমাচ্ছে হাতি, এই প্রথম ওটাকে দেখতে পেল সে। প্রায় দশ মিনিট এক চুল নড়ল না, তারপর সাবধানে ও নিঃশব্দে এগোল। তবু তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেল বুড়া, ঘুম থেকে জেগে উঠল বিশাল দৈত্য। তবে কোন শব্দই তার কানে ঢোকেনি, কারণ ওজি হাবিব অত্যন্ত সতর্ক ও দক্ষ শিকারী।

শুঁড় লম্বা করল বুড়া, বাতাস টানল, সেই বাতাস ধীরে ধীরে গ্রহণ করল মুখের ভেতর। তার ওপরের ঠোঁটে ওলফ্যাক্টরি গ্ল্যাণ্ড গোলাপ কুঁড়ির মত খুলে গেল, বাতাসের স্বাদ নিল সে। বাতাসের উল্টোদিকে রয়েছে ওজি হাবিব, রয়েছে মাটি ঘেঁষে, কাজেই তার কোন গন্ধ বুড়া পেল না।

তারপর হাতি একটা শব্দ করল। কোমল, গুড়গুড় শব্দ, শব্দটা হচ্ছে তার পেটে, তার সঙ্গে যোগ হলো কাঁপা কাঁপা একটা আওয়াজ, করুণ সুরে বাঁশি বাজার মত, বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। এটা হলো হাতির গান। আশপাশে আরেকটা হাতি আছে, নাকি পরম শত্রু কোন মানুষ আছে বোঝার জন্যে গান গাইছে বুড়া।

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছে ওজি হাবিব, শুনতে পেল গান গাইছে হাতি। মুঠা করা একটা হাত তুলল সে মুখের সামনে, তারপর নকল করল হাতির সুর।

ওজি হাবিব হাতির গান গাইছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল হাতি, তারপর গানের সুরটা বদলাল, অদৃশ্য উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। কান পেতে নতুন সুরটা শুনল ওজি হাবিব, নকল করল সেটাও। এবার নিশ্চিন্ত হলো বুড়া, বিশ্বাস করল আশপাশে আরেকটা হাতি আছে। কানটা ঝাপটাল সে, বোঝাতে চাইল সে খুশি হয়েছে। তারপর ঝোপ ভেঙে এগোল সামনে।

ইস্পাতের একটা লম্বা রড জোগাড় করেছে ওজি হাবিব, সেটাকে গরম করে পিটিয়েছে, ডগাটা পাথরে ঘষে ধারাল করে নিয়েছে বর্শার মত। ঝোপের ভেতর শুয়ে রডটা বাগিয়ে ধরে আছে সে, দেখতে পেল তার মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে বাঁকানো একজোড়া আইভরি। রডটা লম্বায় ওজি হাবিবের দ্বিগুণ, খুব ভারিও বটে। এটা দিয়ে সে হাতির ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারবে না। আর মাথার তো নাগালই পাবে না। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, ছুটে ঢুকে পড়ল বুড়ার পেটের নিচে। দাঁড়াল হাতির পিছন দিকের দু'পায়ের মাঝখানে, ওপর দিকে। অর্থাৎ হাতির উরুসন্ধিতে সবেগে গাঁথল রডটা। ঝুলে থাকা চামড়া ভেদ করে গেল ধারাল বর্শা, চিরে দিল ব্লাডার। গরম ও হলুদ প্রস্রাব ঝর্ণার মত সবেগে বেরিয়ে এল। ব্যথায় মোচড় খেল বুড়ার শরীর, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। তারপর তুফান তুলে ছুটল সে।

রক্তাক্ত বর্শায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওজি হাবিব। এক সময় হাতির চিৎকার মিলিয়ে গেল দূরে। রক্ত আর প্রস্রাব অনুসরণ করল সে, হাঁটছে ধীর পায়ে। সে জানে, আঘাতটা মোক্ষম জায়গায় লেগেছে, এতেই মৃত্যু হবে বুড়ার। এত বড় একটা শিকার করেও তার মনে কিন্তু আনন্দ নেই। বরং একটা

অপরাধবোধ জাগছে। বন দেবতাকে অসন্তুষ্ট করেছে বলে ভয়ও লাগছে তার।

পরদিন সকালে বুড়ার লাশ দেখতে পেল ওজি হাবিব। হাঁটু গেড়ে বসে আছে, দাঁত দুটো নরম মাটিতে গাঁথা। দেখে মনে হলো বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু খোলা চোখ দুটোয় কোন প্রাণ নেই, এতটুকু নড়ছে না। হাতের বর্শা ফেলে দিয়ে বনদেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনাসূচক গান গাইতে শুরু করল ওজি হাবিব, তবে থেমে গেল মাঝপথে। তার মনে হলো, যে অপরাধ সে করেছে, এরপর আর দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাওয়ার কোন অধিকার তার নেই।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে হাতির মাংস সেদ্ধ করে খেল সে। তারপর ম্যাচেটির সাহায্যে আইভরিগুলো কাটতে শুরু করল। তখনও কাটা শেষ হয়নি, তার গোত্রের লোকেরা তাকে দেখতে পেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এসেছে তারা, সবার আগে রয়েছে লোদজি হাবিব ও পারুমা। ওজি হাবিবকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। মুখ তুলে তাদেরকে দেখতে পেল সে। হাত থেকে পড়ে গেল ম্যাচেটি। ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে, তাদের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। 'আমি তোমাকে পুরস্কারের অর্ধেক ভাগ দেব, বড় ভাই,' বলল সে, কিন্তু কেউ তার কথায় সাড়া দিল না।

এক এক করে তার দিকে পিছন ফিরল বামবুটিরা, অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর বনভূমিতে। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেছে তারা, একা শুধু লোদজি হাবিব রয়ে গেছে। 'তোমার এই অপরাধের কারণে বনদেবতা আমাদের সবাইকে শায়েস্তা করবেন। মোলিমোকে পাঠাবেন তিনি।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল ওজি হাবিব, চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

সিমন সাফারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন প্রতিদিন নতুন শক্তি অর্জন করছে। শহর থেকে রোজই স্থানীয় নেতারা ড. ফয়সলের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আসছেন। আন্দোলন করছে বেশিরভাগ উহালিরাই, তবে কিছু কিছু হিটাও আসতে শুরু করেছে। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে, কাজেই ড. ফয়সলের খুব ব্যস্ত সময় কাটছে। তাঁর ভাইপো, শেখ ফারুক ফয়সল, রানাকে প্রস্তাব দিল হিটাদের লেবার ক্যাম্পে যে নির্মম নির্যাতন চলছে তার ছবি তোলার। প্রস্তাবটা শুনেই লুফে নিল রানা। সেদিন বিকেলেই রওনা হয়ে গেল ওরা, সঙ্গে থাকল লোদজি হাবিব ও কয়েকজন পোর্টার। ছবি তুলে চারদিন পর ফিরে এল ওরা।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ভিডিও টেপটা ওদেরকে দেখাল রানা। একটা দৃশ্যে দেখা গেল, হাত বাঁধা উহালি শ্রমিকদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হিটা সৈনিকরা। অনেক দূর থেকে তোলা ছবি, তবু শ্রমিকদের হাড় বেরিয়ে থাকা চেহারা পরিষ্কার দেখা গেল। তারপর সাক্ষাৎকারের দৃশ্য। প্রিজন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা শ্রমিকরা লেন্সের দিকে তাকিয়ে বলল, তাঁদেরকে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার খেতে দেয়া হয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে গুলি করে, শ্রমের বিনিময়ে কোন মজুরি দেয়া হয়নি। এক তরুণী জানাল, প্রতি

রাতে হিটা সৈনিকরা ধর্ষণ করেছে তাকে।

শেষ দৃশ্যটা দেখাবার আগে সাবধান করে দিল রানা, 'মনিকা, তোমার বোধহয় না দেখাই উচিত।'

'না, দেখব,' জেদ ধরল মনিকা।

শেষ দৃশ্যে দেখা গেল একদল উহালিকে খাদের কিনারায় দাঁড় করানো হয়েছে। দেখেই বোঝা গেল তারা সবাই অসুস্থ। হিটা সৈনিকরা তাদের সঙ্গে কৌতুক করছে, ফলে এরপর কি ঘটবে আন্দাজ করা সম্ভব হলো না। গুলিবর্ষণ শুরু হলো একেবারে হঠাৎ। হ্যাচকা টান দিয়ে কাঁধ থেকে অটোমেটিক রাইফেল নামাল হিটারা, ব্রাশ ফায়ার শুরু করল। উহালিরা পড়ে গেল খাদের ভেতর। তৈরি হয়েই ছিল কয়েকটা বুল ডোজার, এগিয়ে এসে খাদটা মাটি দিয়ে ভরে ফেলল ড্রাইভাররা।

ভিটিআর-এর সুইচ অফ করল রানা, খালি হয়ে গেল স্ক্রীন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল মনিকা, বেরিয়ে গেল বারান্দায়। ঘরে থাকল শুধু রানা ও ড. ফয়সল। কিছুক্ষণ পর কাঁধে তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করল ও। ড. ফয়সল শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদেরকে সাহায্য করুন, মি. রানা। আমার লোকদের সাহায্য করুন। প্লীজ।'

সাত

বনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা, মোলিমো আসছে। বামবুটিদের সবগুলো গোত্র থেকে লোকজন আসতে শুরু করল গোনডালায়। জলপ্রপাতের নিচে সভা করার জন্যে একটা জায়গা আছে, দূর-দূরান্ত থেকে এসে সেখানেই জড়ো হচ্ছে সবাই।

কেউ কেউ এসেছে দুশো মাইল দূর থেকে, জায়ারে সীমান্ত পেরিয়ে। বামবুটিরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও দ্বারা চিহ্নিত সীমানা মানে না। বনভূমির নিকট ও দূরতম প্রান্ত থেকে এল তারা, এল একা, এল দলবেঁধে। মোলিমোর আগমন উপলক্ষে প্রায় এক হাজার খুদে মানুষ মিলিত হলো।

মহিলারা তাদের পাতার তৈরি ঘর বানাল, যে ঘরের দরজা থাকল কোন প্রিয় মানুষ বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের দরজার দিকে মুখ করে। গোটা এলাকায় হেসে-খেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই—মোলিমোর আগমন একটা হুমকি হলেও, তাদের প্রাণচঞ্চল স্বভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি।

সবশেষে যারা এল, তাদের মধ্যে রয়েছে ওজি হাবিব। পিছু পিছু এল তার তিন বউ, তামাক ভরা বস্তার ভারে কুঁজো হয়ে আছে তিনজনই। স্ত্রীদের নির্দেশ দিল ওজি হাবিব, ঘর বানাতে হবে তার ভাইয়ের দরজার দিকে মুখ করে। কিন্তু ঘরটা তৈরি হবার পর দেখা গেল পারুমা তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, আরেক দিকের দেয়াল খুলে বানিয়ে নিয়েছে নতুন দরজা।

পুরানো বন্ধুদের ডাকল ওজি হাবিব, 'দেখো, কত তামাক আমার কাছে। এসো, তোমরাও নাও। যত খুশি নাও। সবাই তোমাদের পোঁটলা ভরো। এই দেখো, বোতলে কত মদ। এসো, আমার সঙ্গে বসে খাও।' কিন্তু বামবুটিদের একজন লোকও তার ডাকে সাড়া দিল না।

সন্ধের দিকে বিখ্যাত শিকারীরা গোল হয়ে বসেছে, মাঝখানে রয়েছে লোদজি হাবিব। একপাশে আগুন জ্বলছে। অন্ধকার থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এল ওজি হাবিব। কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে নিজের বসার জায়গা করল সে। জিন-এর খোলা বোতল থেকে পান করল, বোতলটা বাড়িয়ে ধরে পাশের লোককে, বলল, 'তুমি খাও, তারপর তোমার পাশের লোককে দাও।'

কথা না বলে উঠে গেল লোকটা। এক এক করে বাকি সবাইও উঠল, ওজি হাবিবের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল তারা। থাকল শুধু লোদজি হাবিব। 'কাল মোলিমো আসছে,' ছোট ভাইকে নরম সুরে সাবধান করল সে। তারপর সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

আগুনের ধারে একা বসে থাকল ওজি হাবিব।

পরদিন সকালে রানাকে ডাকার জন্যে ল্যাবরেটরিতে এল লোদজি হাবিব। তার পিছু নিয়ে বনভূমিতে ঢুকল রানা, কাঁধে ক্যামেরা।

শুরুতে মাত্র দু'জন হাঁটল ওরা, তারপর দেখা গেল একজন-দু'জন করে মিলিত হচ্ছে ওদের সঙ্গে। কখনও পিছন থেকে এল তারা, কখনও দু'পাশ থেকে, আবার সামনেও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাই এগোচ্ছে, কেউ কোন শব্দ করছে না। এই প্রথম বামবুটিদের গম্ভীর হতে দেখল রানা। গভীর বনভূমিতে পৌঁছুল ওরা, থামল একটা সিল্ক-কটন ট্রি-র গোড়ায়। গাছটাকে ঘিরে বামবুটিরা গুটি মেরে বসে পড়ল সবাই। রানাও বসল, ছবি তুলল শান্ত সমাহিত মুখগুলোর। সবাই তারা মুখ তুলে সিল্ক-কটন ট্রি-র ওপর দিকে তাকিয়ে আছে।

'এটা হলো মোলিমোর বাড়ি,' নিচু গলায় বলল লোদজি হাবিব। 'তাকে আমরা নিতে এসেছি।'

লোকজনের ভিড় থেকে কেউ একজন চিৎকার করে কারও নাম বলল। 'আরারি!' ভিড় থেকে উঠে দাঁড়াল এক লোক, এগিয়ে গিয়ে গাছের পাশে দাঁড়াল সে।

ভিড়ের আরেক দিক থেকে আবার চিৎকার শোনা গেল, 'লোদজি হাবিব!' এবার লোদজি হাবিব প্রথম বাছাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

খানিক পর দেখা গেল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পনেরো জন লোক। তাদের কেউ বুড়ো, কেউ যথেষ্ট নামকরা, আবার কেউ সাধারণ একজন পিগমি। মোলিমো উৎসবে অংশগ্রহণের অধিকার সবার সমান।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল লোদজি হাবিবের গলা চিরে। বাছাই করা পনেরোজন লোক তরতর করে গাছ বেয়ে উঠল। পাতা ও শাখা-প্রশাখার আড়ালে হারিয়ে গেল তারা, শুধু তাদের চেঁচামেচি আর গানের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে

নিচে থেকে। তারপর তারা নেমে এল, বয়ে নিয়ে এল একটা বাঁশ।

বাঁশটা গাছের গোড়ায় নামিয়ে রাখল তারা। এগিয়ে এসে ওটা পরীক্ষা করল রানা। বাঁশটা পনেরো ফুটের বেশি লম্বা হবে না। পরিচ্ছন্ন, শুকনো বাঁশ, সন্দেহ নেই বহু বছর আগে কাটা হয়েছে। ওটার গায়ে জটিল সব আঁচড় কাটা হয়েছে, আঁকা হয়েছে পশু-পাখির ছবি। তবে সাধারণ একটা বাঁশ ছাড়া আর কিছু নয় ওটা।

‘এটাই কি তোমাদের মোলিমো?’ বাঁশটাকে ঘিরে হৈ-চৈ করছে বামবুটিরা, লোদজি হাবিবের কানে ফিসফিস করল রানা।

‘হ্যাঁ, বাপজান, এটাই আমাদের মোলিমো।’

‘মোলিমো আসলে কি?’ জানতে চাইল রানা।

‘মোলিমো বনভূমির কণ্ঠস্বর,’ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে লোদজি হাবিব। ‘মোলিমো হলো জনক ও জননীর আওয়াজ। তবে কথা বলাবার আগে মোলিমোকে পানি খাওয়াতে হবে।’

বাছাই করা লোকগুলো মাটি থেকে তুলে নিল মোলিমোকে, বয়ে নিয়ে এল ঝর্ণার ধারে। জলাশয়ের ঠাণ্ডা ও গাঢ় পানিতে ডোবানো হলো সেটা। কয়েক ঘণ্টা আগেই জলাশয়ের উঁচু পাড়ে জড়ো হয়েছে নারী ও শিশুরা–সবাই তারা চুপচাপ, নগ্ন ও মনোযোগী। আরও এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল সবাই, মোলিমো পানি খাচ্ছে। তারপর আরও এক ঘণ্টা পেরোল। অবশেষে পানি থেকে তোলা হলো মোলিমোকে।

বাঁশটা চকচক করছে, পানি ঝরছে গা থেকে। ওটার খোলা প্রান্তে ঠোঁট ছোঁয়াল লোদজি হাবিব। শ্বাস টানার ফলে ফুলে উঠল তার বুক। তারপরই টিউবটা থেকে কথা বলে উঠল মোলিমো। অদ্ভুত মিষ্টি গলায় যেন কোন তরুণী বনভূমির মাঝখানে গান গাইছে। বামবুটিদের সবাই দুলে উঠল। ভিড়টা এমনভাবে দোল খেতে শুরু করল যেন কোন গাছের পাতায় হঠাৎ বাতাস লেগেছে।

তারপর মোলিমো তার সুর বদল করল। জালে ধরা পড়া আতঙ্কিত হরিণের তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। এরপর শোনা গেল ভয় পেয়ে উড়ে যাওয়া পাখির গলা। বনভূমির সমস্ত শব্দ মোলিমোর গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। লোদজি হাবিবের জায়গায় আরেকজন লোক ফুঁ দিল বাঁশের খোলা প্রান্তে, তারপর আরেকজন।

তারপর হঠাৎ মোলিমোর গলা চিরে খেপা হাতির আওয়াজ বেরিয়ে এল। শব্দটা শুনে বামবুটিদের ভিড়টা সামনে এগোল। মোলিমোকে ঘিরে ফেলল তারা, সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। সাধারণ বাঁশের টুকরোটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারপরও সেটা থেকে বেরিয়ে আসছে গর্জন ও হুংকার, তীক্ষ্ণ চিৎকার ও করুণ আর্তনাদ।

এরপর অদ্ভুত একটা দৃশ্য চাক্ষুষ করল রানা। ভিড়টার আকৃতি হঠাৎ করেই যেন বদলে গেল। কেউ আর বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকল না, কারণ পরস্পরের গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে আছে তারা। সবাই যেন একটা প্রাণীতে পরিণত

হয়েছে। তারাই এখন মোলিমো। বনভূমির দেবতা এখন তাদের ওপরই ভর করেছেন।

খেপে উঠেছে মোলিমো। বনভূমির ভেতর ঝড় তুলে ছুটছে সে। কয়েকশো পা মাটির সঙ্গে শুইয়ে দিচ্ছে ঝোপ-ঝাড়, সবাই একই সঙ্গে দিক বদলে এমনভাবে ছুটছে যেন ওটা একটাই প্রাণী। নদী পেরুল মোলিমো, সাদা ফেনা ছড়াল চারদিকে। এবার মোলিমোর গতি কমে এল। আবার দিক বদলে গোনডালার দিকে যাচ্ছে সে, যাচ্ছে জলপ্রপাতের নিচে ঐতিহাসিক সভাস্থলের দিকে।

গ্রামের মেয়েরা শুনতে পেল মোলিমো আসছে। রান্নার আগুন থেকে লাফ দিয়ে সরে এল তারা, খপ করে ধরে তুলে নিল শিশুদের, ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তারা, বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে বাচ্চাকে।

গ্রামে ঢুকে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করল মোলিমো, তারপর হঠাৎ দিক বদল করল। ওজি হাবিবের স্ত্রীরা শুনতে পেল মোলিমো আসছে। ঘর ফেলে জঙ্গলে পালাল তারা। তবে ওজি হাবিব ঘর থেকে বেরুল না। মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে থাকল সে। জানে, পালাবার কোন উপায় নেই তার। বনদেবতার শাস্তি তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

মোলিমো এল ঝড় তুলে। চোখের নিমেষে ওজি হাবিবের কুঁড়েটা মিশে গেল মাটির সঙ্গে। তার সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে গেল। কয়েক বস্তা তামাক মিশে গেল ধুলোর সঙ্গে নিঃশেষে, বোতলের মদ শুষে নিল মাটি। পায়ের ধাক্কায় তার হাতঘড়ি ছিটকে পড়ল আগুনে। নিজেকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই ওজি হাবিব করল না।

সবশেষে তাকে ধরল মোলিমো। হাঁটু ও কনুই দিয়ে গুঁতো মারল তাকে। দাঁত ভাঙল, নাক ভাঙল। ভাঙল পাঁজর আর আঙুল। তারপর হঠাৎই তাকে ছেড়ে বনভূমিতে ফিরে গেল মোলিমো। তার গলার সুর বদলে গেছে। করুণ বিলাপের মত শোনাচ্ছে আওয়াজটা। বনভূমিতে বিষ ঢালায়, বামবুটিরা পাপ করায় কাঁদছে মোলিমো। ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল তার কান্নার শব্দ।

আরও অনেকক্ষণ পর মেঝেতে উঠে বসল ওজি হাবিব। সঙ্গে কিছুই নিল না সে, নিল শুধু তীর আর ধনুকটা। হাতির দাঁত ও ম্যাচেটি পড়ে থাকল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

একা গেল ওজি হাবিব। স্ত্রীরা এখন আর তার সঙ্গে যাবে না। কারণ তারা বিধবা হয়ে গেছে। আবার অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হবে তাদের। ওজি হাবিব মারা গেছে। বামবুটিরা কেউ আর কোনদিন তাকে দেখতে পাবে না। এমনকি যদি তার ভূতকে বনভূমিতে ঘুরে বেড়াতে দেখে কেউ, মুখ ফিরিয়ে নেবে সে, দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকাবে না।

তার গোত্রের দৃষ্টিতে ওজি হাবিব মারা গেছে।

‘আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, মি. রানা?’ ড. শেখ ফাহিম ফয়সল জানতে

চাইলেন।
'অবশ্যই সাহায্য করব,' বলল রানা। 'টেপগুলো লণ্ডনে নিয়ে যাব আমি। লণ্ডন, প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের পাবলিক টেলিভিশন থেকে ওগুলো প্রচার করার ব্যবস্থা করব...।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আরও বড় সাহায্য পাব বলে আশা করি আমি,' বললেন ড. ফয়সল।

'যেমন?'

'আপনি একজন সৈনিক, অন্তত সেরকমই শুনেছি আমি। অত্যাচারীকে হটিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছি, আমি আশা করি আপনি আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য করবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রানা। আড়চোখে মনিকার দিকে তাকাল ও। বুঝল, ওদিক থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ড. ফয়সল আবার বললেন, 'উহালিরা শান্তিপ্রিয়, আধুনিক অস্ত্র চালাবার কোন ট্রেনিং নেই তাদের। আমাদের অস্ত্রও দরকার। দরকার ট্রেনিং দেয়ার জন্যে দক্ষ লোক। উহালি তরুণদের পাবেন আপনি, আমার ডাকে কয়েক হাজার তরুণ ছুটে আসবে। কিন্তু...কে তাদের নেতৃত্ব দেবে সশস্ত্র সংগ্রামে?'

'দেখুন...,' শুরু করল রানা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে ড. ফয়সল বললেন, 'এখুনি কিছু বলার দরকার নেই। বিছানায় শুয়ে আজ রাতে চিন্তা করুন আপনি। কাল সকালে জানান আমাকে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'গুড নাইট, মি. রানা।' ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিলেন তিনি, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'কি করবে তুমি?' খানিক পর নরম সুরে জানতে চাইল মনিকা।

'জানি না। সত্যি জানি না।' দাঁড়াল রানা। 'কাল তোমাকে জানাব। এখন আমি ড. ফয়সলের কথা মত শুতে যাচ্ছি।'

'বেশ,' বলে রানার পাশে মনিকাও দাঁড়াল। ওর খুব কাছাকাছি রয়েছে সে, মুখটা রানার দিকে তোলা। রানা তাকে চুমো খেল। দীর্ঘস্থায়ী হলো চুমোটা।

নিজেকে কয়েক ইঞ্চি সরিয়ে নিয়ে মনিকা অস্ফুটে বলল, 'এসো।' পথ দেখিয়ে রানাকে নিজের বেডরুমে নিয়ে এল সে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। মশারির ভেতর শুয়ে আছে মনিকার পাশে। তার নগ্ন একটা বাহু ওর বুকের ওপর। ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙল তার, অনুভব করল রানা। বলল, 'ড. ফয়সলের অনুরোধ রাখব বলে ঠিক করেছি আমি।'

এক সেকেণ্ড পর মনিকা বলল, 'ব্যাপারটা ঘুষ ছিল না।'

'আমি জানি,' বলল রানা।

'কাল রাতে যা ঘটল,' বলল মনিকা, 'বহু বছর ধরে চাইছি এটা ঘটুক। সেই প্রথমবার ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে। তারপর তোমাকে টিভিতে দেখে। তারপর তোমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সময়। সবশেষে এখানে। সব সময় চেয়েছি, ব্যাপারটা ঘটুক।'

'আমি কৃতজ্ঞ,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'তোমার ভালবাসা পাওয়া আমার জন্যে পরম ভাগ্য।'

'পেয়েও এত তাড়াতাড়ি হারাতে হবে তোমাকে, আমার ভাল লাগছে না,' বলল মনিকা। 'শিগগির ফিরে এসো, রানা। তুমি পাশে না থাকলে আমার কষ্ট হবে।'

দু'দিন পর গোন্ডালা ত্যাগ করল রানা। লোদজি হাবিব চারজন পোর্টারকে নিয়ে ওর সঙ্গে থাকল। পাহাড়ের নিচু ঢালগুলো পেরোবার সময় বনভূমির অন্যান্য সমস্ত গাছ জায়গা ছেড়ে দিল বাঁশঝাড়কে। মাইলের পর মাইল এরপর শুধু বাঁশবন। মাথার ওপর বাঁশের ছাউনি সম্পূর্ণ নিরেট ও নিশ্ছিদ্র। কোথাও কোথাও এত ঘন, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো ওদেরকে।

তারপর এক সময় পাহাড়ের উঁচু ঢালে পৌঁছুল ওরা, সী লেভেল থেকে বারোশো ফুট ওপরে। সামনে একটা গিরিপথ, সেখানে পৌঁছুবার আগেই লোদজি হাবিব আর তার দলকে ফিরে যেতে বলল রানা। কিছুক্ষণ তর্ক করার পর ওর কথা মেনে নিল লোদজি হাবিব। কথা হলো, বাঁশবনে ওর জন্যে দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে সে। কতদিনে ফিরবে ও, তার একটা ধারণা দিল রানা।

জ্যাকেটের পকেটে মূল্যবান কয়েকটা টেপ, বরফ ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এবার একা এগোল রানা। লোদজি হাবিব বিদায় নেয়ার দু'দিন পর জায়ারে সীমান্ত পেরোল ও। মুতসোরা-র ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সজ্জন ব্যক্তি, পাহাড় থেকে নেমে আসা রিফিউজিদের দেখে অভ্যস্তও বটেন। রানার পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট সম্মান করলেন তিনি। দু'দিন পর একটা স্টিমারে তুলে দেয়া হলো ওকে। আরও দশ দিন পর লণ্ডনে পৌঁছুল রানা। টেপগুলো এখনও ওর পকেটে।

লণ্ডনে নিজের ফ্ল্যাট ও স্টুডিও থেকে উবোমোর রাজধানী কাহালিতে, মাইকেল ডাফকে ফোন করল রানা।

'গুড লর্ড, রানা। আমরা শুনলাম তুমি আর সোফিয়া ক্যারল সেঙ্গি সেঙ্গির কাছে জঙ্গলে হারিয়ে গেছ। উবোমো সেনাবাহিনী তোমাদেরকে খোঁজার জন্যে সার্চ পার্টি পাঠিয়েছে।'

'লাইনটা নিরাপদ, ডাফ?'

'খুব একটা নয়।'

'সেক্ষেত্রে দেখা হলে সব কথা শুনো। মনে আছে, তোমাকে একটা প্যাকেট রাখতে দিয়েছিলাম? ওটা এখন দরকার আমার। ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।'

'থামো, রানা! ওটা তো আমি সোফিয়া ক্যারলকে দিয়ে দিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে, তুমিই তাকে পাঠিয়েছ!'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'বোকা মেয়ে! ওরা তাকে পুতুল বানিয়ে খেলিয়েছে। যাক, এখন আর কিছু করার নেই কারও। সে মারা

গেছে, মাইক, কোন সন্দেহ নেই। প্যাকেটটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছে সে, ওরা তাকে মেরে ফেলেছে।'

'ওরা কারা?'

'এখন নয়, মাইক। পরে।'

'প্যাকেটটার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত---।'

'তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ওটার বদলে আরও কড়া ওষুধ পেয়েছি আমি।'

'তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কখন?'

'শিগগির। তোমাকে আমি জানাব।'

হাতে সময় কম, কয়েকটা দিন রাত জেগে স্টুডিওতে কাজ করল রানা। কাজ করার সময় সোফিয়ার জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। ভিডিওর শেষ টেপটা একেবারে নিখুঁত করার কোন দরকার নেই, সোয়াহিলি সংলাপগুলো ইংরেজিতে ডাব না করলে চলে–ড. শেখ ফাহিম ফয়সলকে ইংরেজিতেই প্রশ্ন করেছে রানা, তিনিও একই ভাষায় উত্তর দিয়েছেন।

তিনদিন পর হল্যাণ্ড পার্ক-এ এল রানা। ব্রিটিশ ওভারসীজ স্টীম শিপ কোম্পানীর হেড অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল স্যার টাফ ট্যাফোর্ডের অপেক্ষায়। আধ ঘণ্টা পরই তাঁর রোলস রয়েসটাকে আসতে দেখল ও। ধাপ বেয়ে হেড অফিসে উঁচু বারান্দায় উঠছেন তিনি, রানাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'রানা···মি. মাসুদ রানা! আমি শুনেছি উবোমোয় হারিয়ে গেছেন আপনি!' তার বিস্ময় যে নির্ভেজাল, চেহারাই বলে দিল।

'সত্যি নয়, ট্যাফোর্ড। আপনি আমার মেসেজ পাননি? অন্তত ছ'বার আপনার অফিসে ফোন করেছি আমি।'

'ওরা আমাকে জানায়নি। এরকম কত ফোনই তো আসে।'

'উবোমোয় তোলা কিছু ছবি আছে আমার কাছে, আপনাকে দেখাতে চাই,' বলল রানা।

ইতস্তত করে হাতঘড়ি দেখলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

রানা বলল, 'আমাকে এড়িয়ে গেলে নিজের ক্ষতি করা হবে, ট্যাফোর্ড। টেপগুলো আপনাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আপনাকে এবং আপনার কোম্পানীকে।'

চোখ দুটো সরু হয়ে গেল, কড়া সুরে স্যার ট্যাফোর্ড জানতে চাইলেন, 'শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন?'

'না, স্রেফ সৎ পরামর্শ।'

'ঠিক আছে, আসুন ভেতরে।' সদর দরজা খুললেন তিনি। 'দেখা যাক কি নিয়ে এসেছেন।'

ডেস্কের পিছনে বসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দেখলেন স্যার ট্যাফোর্ড, এক চুল নড়লেন না। এক সময় খালি হয়ে গেল স্ক্রীন। রানার দিকে ফিরলেন তিনি, এই প্রথম মুখ খুললেন, 'ইট'স জেনুইন। এ জিনিস নকল করা সম্ভব নয়।'

'আপনি জানেন জেনুইন,' বলল রানা। 'লগিং ও মাইনিং অপারেশন সম্পর্কে

সবই জানেন আপনি। কীর্তিটা আপনার কোম্পানীর। এ-সব আপনার নির্দেশে ঘটেছে।'

'আমি লেবার ক্যাম্প আর আর্সেনিক ব্যবহারের কথা বলছি। এ-সব ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না।'

'কে আপনার কথা বিশ্বাস করবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'ড. ফয়সল তাহলে বেঁচে আছেন।'

'হ্যাঁ। শুধু কি বেঁচে আছেন? আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া।'

স্যার ট্যাফোর্ড আবার প্রসঙ্গ বদলালেন। 'জানা কথা, এই টেপের আরও কপি আছে।'

'বোকার প্রশ্ন,' মন্তব্য করল রানা।

'তারমানে এটা সরাসরি একটা হুমকি?'

'এটাও,' বলল রানা।

'আপনি টেপটা টিভিতে দেখাবেন?'

'পরপর তিনটে।' গম্ভীর হলো রানা। 'অবশ্যই পাবলিককে দেখাব। শুধু একটা জিনিস আমাকে ঠেকাতে পারে। মানে, আপনি যদি আমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসেন।'

'কি ধরনের চুক্তিতে আপনি আসতে চান?'

'আমি আপনাকে সরে আসার জন্যে সময় দেব। উবোমোয় আপনার কোন রকম স্বার্থ থাকতে পারবে না। যে স্বার্থ আছে, তা আপনি রেড ড্রাগন বা অন্য কারও কাছে বেচে দেবেন।'

জবাব দিতে দেরি করলেন না স্যার ট্যাফোর্ড, তবে তাঁর চোখে ক্ষীণ স্বস্তির ছায়া দেখতে পেল রানা।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'বিনিময়ে?'

'ড. শেখ ফাহিম ফয়সলের নেতৃত্বে উবোমোয় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে, এর সমস্ত খরচ আপনি যোগাবেন। এর আগেও আফ্রিকার একাধিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আপনি সহযোগিতা করেছেন, আমি জানি।'

'তাতে কি রকম খরচ পড়বে আমার?'

'এই টেপটা টিভিতে দেখালে আপনার যে ক্ষতি হবে, তার তুলনায় নগণ্য। ইচ্ছে করলে আজ সন্ধ্যায় বিবিসি থেকে এটা দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারি আমি।'

'কত?' আবার জানতে চাইলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'দশ মিলিয়ন পাউণ্ড, নগদ। পেমেন্ট করতে হবে একটা সুইস অ্যাকাউন্টে, কোন রকম দেরি না করে।'

'অ্যাকাউন্টটা আপনার নামে হবে?'

'আমার ও ড. ফয়সলের নামে,' বলল রানা।

'আর কি?'

'আপনার সঙ্গে জায়ারের প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক খুব ভাল। তিনি আপনার বন্ধু,

তবে সিমন সাফারির বন্ধু নন। আমি চাই, জায়ারের সীমান্ত দিয়ে উবোমোয় কিছু অস্ত্র ঢুকবে, কিন্তু কেউ বাধা দেবে না। প্রেসিডেন্টকে আপনি বলবেন, তাঁকে শুধু ক'টা দিন চোখ বুজে থাকতে হবে।'

'ব্যস, আর কিছু নয়?'

'আর কিছু নয়।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি,' স্যার ট্যাফোর্ড বললেন। 'অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিন, কাল বিকেলের আগেই টাকাটা জমা করব আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'মন খারাপ করবেন না, ট্যাফোর্ড। আপনি সব হারাননি। অত্যাচারী সিমন সাফারির জায়গায় ড. ফয়সল আসছেন, তিনি আপনার এই বদান্যতা অবশ্যই মনে রাখবেন। এবার কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তবে উবোমোয় ব্যবসা করার সুযোগ আবার আপনি পাবেন।'

রানা চলে যাবার পর পিকাসোর ছবিটার দিকে ঝাড়া পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকলেন স্যার ট্যাফোর্ড। তারপর তিনি হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। লণ্ডন আর তাইপের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নয় ঘণ্টা। ইন্টারন্যাশনাল কোড ডায়াল করলেন তিনি, তারপর ডায়াল করলেন চঙকিঙ গঙ-এর প্রাইভেট নম্বর। তাঁর বড় ছেলে ফোন ধরলেন, রিসিভার দিলেন বাবাকে। 'খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রস্তাব আছে আমার,' বৃদ্ধ চীনা ব্যবসায়ীকে বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'তাইপেতে আসছি আমি, আপনার সামনে বসে কথা বলব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। আপনি থাকবেন তো?'

আরও দুটো ফোন করলেন স্যার ট্যাফোর্ড। পাইলটকে বললেন, গালফ স্ট্রীম জেট যেন তৈরি রাখা হয়। জুরিখের ক্রেডিট সুইস ব্যাংকে বলে রাখলেন, দু'নম্বর নাম্বারড অ্যাকাউন্ট থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ মিলিয়ন স্টার্লিং ট্রান্সফার করবেন তিনি, কোড কার্ড ইন্সট্রাকশন পাবার পর যেন দেরি করানো না হয়।

স্যার ট্যাফোর্ড ভাবছেন, ইউডিসি-র শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার কি কারণ তিনি দেখাবেন চঙকিঙ গঙকে। বলবেন, হঠাৎ তার নগদ টাকার দরকার? কি বললে বিশ্বাস করবেন তিনি?

দামই বা কত চাওয়া যায়? বেশি চাইলে কিনতে রাজি হবেন না, আবার কম চাইলে সন্দেহ করবেন। ঠিক আছে, দামটা ঠিক করবেন প্লেনে বসে।

লেবার ক্যাম্প সম্পর্কে অবশ্যই জানতেন তিনি, তবে তাদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে তা জানতেন না। আসলে তিনি জানতে চাননি। আর্সেনিক রিএজেন্ট সম্পর্কেও জানতেন না তিনি, যদিও তাঁর সন্দেহ হয়েছিল চঙমঙ গঙ জিনিসটা ব্যবহার করছেন। প্ল্যাটিনাম সংগ্রহের হার খুব বেশি দেখেই সন্দেহটা হয় তাঁর। ব্যবসাটা যেহেতু অত্যন্ত লাভজনক, কাজেই বিক্রি করতে কোন অসুবিধে হবে না, ভাবলেন তিনি।

তিন মাস পর আবার সেই বাঁশবনের কিনারায় এসে থামল রানা। ওর সঙ্গে এবার কনজো গোত্রের ছয়শো পোর্টার রয়েছে। কনজোরা পাহাড়ী এলাকায় আসা-যাওয়ায় অভ্যস্ত, ভারি বোঝাও বইতে পারে। ছয়শো লোক, প্রত্যেকে বহন করছে

আশি পাউণ্ড বোঝা।

সব মিলিয়ে ছাব্বিশ টন আর্মস অ্যাণ্ড অ্যামুনিশন–একে ফরটিসেভেন আর উজি, আরপিডি লাইট মেশিন-গান আর আরপিজি রকেট লঞ্চার, টোকারেভ অটোমেটিক পিস্তল আর আমেরিকান এম-টোয়েন্টিসিক্স ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড।

সঙ্গে করে চারজন ইন্সট্রাকটর-ও নিয়ে এসেছে রানা। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে জিম্বাবুয়ে যেতে হয়েছিল ওকে। তারা সবাই কালো, সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলতে পারে। ইন্সট্রাকটরদের লিডার একজন ম্যাটাবেল বীর, নাম রাহান ফেলু। রামবা মোল নামে একজন জিম্বাবুইয়ান ক্যামেরাম্যানকেও সঙ্গে করে এনেছে রানা।

বাঁশবনের কিনারায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল লোদজি হাবিব।

'আপনাকে দেখে আমার ভাল লাগছে, প্রিয় বাপজান। আপামণি আপনাকে তার হৃদয় পাঠিয়েছে,' রানাকে বলল সে। 'আপামণি বলেছে, তার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে আপনাকে। বলেছে, আর অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

লোদজি হাবিবের লোকজন বাঁশবন কেটে চলার পথ তৈরি করে রেখেছে, ভারবাহী পোর্টারদের যাতে এগোতে কোন অসুবিধে না হয়। বাঁশবনের শেষ মাথায়, যেখানে বনভূমি শুরু হয়েছে, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ড. ফয়সল, তাঁর সঙ্গে রয়েছে বামবুটি ও উহালি তরুণদের বিরাট একটা দল। এই তরুণরাই সিমন সাফারির বিরুদ্ধে হিটা সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করবে। কনজো পোর্টারদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করল রানা, এখান থেকে উহালি আর বামবুটিরাই বোঝা বইবে।

মনিকার মেসেজ পাবার পর কনভয়ের সঙ্গে থাকল না রানা, লোদজি হাবিবকে নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেল। গোনডালায় পৌঁছে, জলপ্রপাতের নিচে মনিকার সঙ্গে দেখা হলো ওর।

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর ছুটে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। খিকখিক করে হেসে উঠল লোদজি হাবিব, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল তার হাসি।

গোনডালা জলপ্রপাতের সামনে, বনভূমির কিনারায় নতুন হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে ড. ফয়সলের নির্দেশে। বনভূমির আড়াল থাকায় আকাশ থেকে জায়গাটা দেখা যাবে না। দেয়ালগুলো ইঁটের, খড়ের ছাদ। এই মুহূর্তে একটা কামরার ভেতর উঁচু মঞ্চে বসে আছেন ড. ফয়সল, রানাকে পাশে নিয়ে।

বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে মীটিং চলছে ওদের, অনেককে এই প্রথম দেখছে রানা। সারি সারি লম্বা বেঞ্চে, মঞ্চের দিকে মুখ করে বসে আছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে সাঁইত্রিশ জন, বেশিরভাগই উহালি গোত্রের সর্দার। ছ'জন প্রভাবশালী হিটাও রয়েছেন। সিমন সাফারি দেশের সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন, এটা উপলব্ধি করার পর কি করা যায় ভাবছিলেন তাঁরা, এই সময় খবর পেলেন ড. ফয়সল বেঁচে

আছেন। কালবিলম্ব না করে গোনডালায় চলে এসেছেন তাঁরা, ড. ফয়সলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সিমন সাফারিকে উৎখাত করার জন্যে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করবেন। ড. ফয়সল ও রানা যে প্ল্যান তৈরি করেছে, তাতে এই হিটা অফিসারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওদের মধ্যে দু'জন সামরিক অফিসার, একজন পুলিস অফিসার, বাকি তিনজন সরকারী কর্মকর্তা। সরকারী কর্মকর্তা তিনজন ভ্রমণ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন, লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যু করার ক্ষমতা রাখেন। ওঁদের সবার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

মীটিঙের ছবি তোলা শুরু হতেই নেতাদের অনেকে প্রতিবাদ জানালেন। রানা যুক্তি দেখাল, প্রতিরোধ আন্দোলনের অস্তিত্ব আছে, বিদেশে এটা প্রমাণ করতে না পারলে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। এরপর আর ছবি তুলতে কোন অসুবিধে হলো না রামবা মোল-এর।

মীটিঙের শুরুতেই চারজন ম্যাটাবেল ইন্সট্রাক্টর-এর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল রানা। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়াল একজন করে ইন্সট্রাক্টর, তাদের কার কি কাজ ব্যাখ্যা করল ও। সবশেষে বলল, 'এরা চারজন হাজার হাজার তরুণকে যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছেন, যুদ্ধে সেই তরুণরা প্রতিবার বিজয়ী হয়েছে। ড্রিল, জুতোর পালিশ, ইউনিফর্মের ইস্ত্রি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন না। তাঁরা শুধু আমাদের তরুণদের অস্ত্র চালাতে শেখাবেন।' শেখ ফারুক ফয়সলের দিকে তাকাল ও। 'ফারুক, এদিকে এসে বলবে, ট্রেনিঙের জন্যে কত লোক জোগাড় হয়েছে তোমার?'

গত তিন মাস ব্যস্ত সময় কেটেছে ফারুক ফয়সলের। জানাল, পনেরোশো তরুণকে রিক্রুট করেছে সে।

'ওয়েল ডান, ফারুক। আমাদের আসলে এক হাজার লোক দরকার। চারটি ইউনিট, আড়াইশো করে লোক, প্রতিটি ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন একজন করে ইন্সট্রাক্টর। সংখ্যাটা এর বেশি হলে গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে বাকি তরুণদের নন-কমব্যাট্যান্ট ভূমিকা দেয়া যাবে।'

স্টাফ কনফারেন্স তিন দিন ধরে চলল। শেষ দিনে ইন্সট্রাক্টর ও নেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিল রানা।

আট

রাগ, ক্ষোভ ও ঘৃণায় দিশেহারা বোধ করছে ওজি হাবিব। কয়েক মাস হয়ে গেল বনভূমিতে একা বাস করছে সে–কোন লোকের সঙ্গে কথা হয়নি, হাসাহাসি হয়নি কোন মেয়ের সঙ্গে। গ্রাম থেকে অনেক দূরে পাতার ঘর বানিয়ে থাকছে সে, রাত জেগে স্ত্রীদের কথা ভাবে, ভাবে নিজের ভাগ্যের কথা। বিশেষ করে ছোট বউটার কথা ভুলতে পারে না সে। মাত্র ষোলো বছর

বয়স বউটার, শরীরে বাঁধ ভাঙা যৌবন।

দিনের বেলা কুঁড়েমিতে পায় তাকে, শুয়ে-বসে সময় কাটায়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এখনও শিকার করে বটে, তবে আগের মত আগ্রহ বা উত্তেজনাবোধ করে না। মাঝে মধ্যে কোন জলাশয়ের কিনারায় বসে গাঢ় পানির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। কানে আসে হরিণের ডাক, কিন্তু ধাওয়া করার উৎসাহ নেই। একবার বামবুটি মেয়েদের একটা দলকে দেখতে পায় সে, ব্যাঙের ছাতা আর শিকড় তুলতে এসেছিল। পাখির মত কিচিরমিচির করছিল তারা, হেসে গড়িয়ে পড়ছিল পরস্পরের গায়ে। হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি চলে এল সে, আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখল তাদের। মনে হলো, বুকটা ফেটে যাবে তার। ইচ্ছে হলো ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু জানে তা কোনদিন সম্ভব হবে না। তাকে দেখলেই ছুটে পালাবে মেয়েরা, কেউ তার সঙ্গে একটা কথাও বলবে না।

তারপর একদিন একদল লোকের পায়ের ছাপ দেখতে পেল ওজি হাবিব। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর বুঝল, দলটায় বিশজন ছিল। বনভূমির এই এলাকায় বামবুটি ছাড়া অন্য কোন গোত্রের লোক আসবে না, কারণ তারা বনদেবতা ও অশান্ত আত্মাদের সাংঘাতিক ভয় পায়। ওজি হাবিব কৌতূহলী হয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি জানা দরকার। কারা তারা? কোত্থেকে এল, গেলই বা কোথায়?

ছাপগুলো অনুসরণ করল সে। কয়েক ঘণ্টা পর পেয়েও গেল দলটাকে। তারপর আশ্চর্য একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল ওজি হাবিব।

গভীর বনভূমির মাঝখানে একটা ক্যাম্প দেখতে পেল সে। জায়গাটায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তাদের সবার কাছে একটা করে বন্দুক। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওজি হাবিব। লোকগুলো এক সারিতে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছে। এলাকার সব পাখি আর বানর পালিয়ে যাচ্ছে।

লোকগুলো হিটা গোত্রের নয়, বুঝতে পেরে ওজি হাবিবের বিস্ময় আরও বাড়ল। তার জানা মতে, একমাত্র হিটাদের কাছেই বন্দুক থাকার কথা। উহালিরা শান্তিপ্রিয় ভালমানুষ, অস্ত্র ধরতে ভয় পায়। অথচ এই লোকগুলো সবাই উহালি।

ক্যাম্পটা দেখার পর বেশ কদিন অন্যমনস্ক থাকল ওজি হাবিব। মোলিমো তাকে শাস্তি দেয়ার পর এই প্রথম তার মাথা ঠিকমত কাজ শুরু করল। চাথার সিং-এর কথা মনে পড়ল তার, ভাবল সশস্ত্র লোকগুলোর কথা বললে শিখ লোকটা তাকে তামাক দেবে কিনা। তামাকের কথা ভাবতেই জিভে পানি এসে গেল তার। অনেকদিন হলো তামাক নেই তার কাছে, যদিও নেশাটা রয়েই গেছে।

পরদিন চাথার সিংকে খুঁজতে বেরুল সে। অনেক দিন পর গান ধরল একটা, শিস দিল, গলা ছেড়ে হাসল আপনমনে। মোলিমো তাকে মেরে ফেলার পর আবার জ্যান্ত হয়েছে সে। পথে একবারই থামল, একটা বানর মারার জন্যে। আগ্রহ ফিরে পাওয়ায় শিকারে তার দক্ষতাও ফিরে এসেছে। নতুন বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে অনায়াসে মেরে ফেলল বানরটাকে, মাত্র দশ গজ দূর থেকে। তীর খেয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফ দিয়ে ছুটে পালাল বানরটা, তবে বেশি দূর যেতে পারল না, বিষক্রিয়া শুরু হতে অবশ হয়ে গেল তার শরীর, ডাল থেকে

খসে পড়ল মাটিতে। বিষের ব্যথায় থরথর করে কাঁপতে লাগল শিকার, তারপর মারা গেল। এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে ওজি হাবিব–মাংসও সংগ্রহ হলো, নতুন মাখানো বিষটাও পরীক্ষা করা হলো।

পেট ভরে মাংস খেল ওজি হাবিব, ভেজা ছালটা ভরে নিল জালের ভেতর, তারপর আবার রওনা হলো।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে চাখার সিং-এর জন্যে দু'দিন অপেক্ষা করল সে। বনভূমির এই ফাঁকা জায়গাটা এক সময় লগিং ক্যাম্প ছিল, এখন আগাছায় ভরে গেছে। চাখার সিং আসছে না দেখে চিন্তায় পড়ে গেল ওজি হাবিব। তবে কি মেইন হাইওয়ের দোকানদার লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি তার? লোকটা কি চাখার সিংকে পৌঁছে দেয়নি খবরটা? তা হয় কি করে, এর আগে তো প্রতিবার তার মাধ্যমেই চাখার সিংকে খবর পাঠিয়েছে সে।

আবার দোকানদারদের কাছে ফিরে যাবে কিনা ভাবছে ওজি হাবিব, দ্বিতীয় দিন বিকেলে হাজির হলো চাখার সিং। দূর থেকে ল্যাণ্ডরোভারের আওয়াজ পেল সে, নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

ওজি হাবিব স্মরণ করল, চাখার সিং কতবার তাকে ঠকিয়েছে। দেবে বলে কত জিনিস দেয়নি। ওজনে সব সময় কম হয়েছে তামাক। নেশার পানি ভরা বোতলের সংখ্যাও কোনবার ঠিক থাকেনি।

তারপর সে স্মরণ করল, হাতিটাকে মারতে চাখার সিংই বাধ্য করেছে তাকে। সে অনুভব করল, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে তার শরীর। তার ওপর মোলিমোর অভিশাপ নেমে এসেছে, সেজন্যে চাখার সিংই দায়ী। চাখার সিংই তার আত্মাকে খুন করেছে।

বনভূমির গভীরে সশস্ত্র লোকগুলোর কথা ভুলে গেল ওজি হাবিব। ভুলে গেল তার তামাক দরকার। চাখার সিং-এর জন্যে অপেক্ষায় থাকল সে।

কাদা মাখা ল্যাণ্ডরোভার ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল ফাঁকা জায়গাটায়। থামল গাড়িটা, দরজা খুলে নিচে নামল চাখার সিং।

বনভূমির চারপাশে চোখ বুলাল সে, সাদা রুমাল বের করে ঘাম মুছল মুখের। আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে ওজি হাবিব। চাখার সিং আগের চেয়ে খানিকটা মোটা হয়েছে বলে মনে হলো তার। হাতটা হারাবার আগে আরও অনেক রোগা ছিল সে। তার শার্টটা পিঠের দিকে ভিজে রয়েছে।

রুমালটা পকেটে রেখে দিয়ে মাথার পাগড়িটা ঠিকঠাক করে নিল চাখার সিং। তারপর গলা জড়িয়ে বলল, 'ওজি হাবিব! বেরিয়ে এসো।'

অদম্য হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠল ওজি হাবিবের শরীর, তবে কোন শব্দ হলো না। নিচু গলায় বিড়বিড় করল সে, 'ওজি হাবিব! বেরিয়ে এসো।'

চেহারায় বিরক্তি, বনভূমির চারদিকে দৃষ্টি বোলাল চাখার সিং। খানিক পর ট্রাউজারের জিপার খুলে ঝোপের ওপর প্রস্রাব করল সে। কাজটা শেষ করে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। 'ওজি হাবিব, তুমি এখানে আছো?' জানতে চাইল সে।

জবাব দিল না ওজি হাবিব।

রাগের সঙ্গে কি যেন বলল চাখার সিং। বুঝল না ওজি হাবিব, তবে ধরে নিল

তাকে গাল দিচ্ছে লোকটা।

'আমি তাহলে চলে যাচ্ছি,' চিৎকার করল চাখার সিং। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে পা বাড়াল ল্যাণ্ডরোভারের দিকে।

'হে প্রভু!' এবার সাড়া দিল ওজি হাবিব। 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি! আপনি যাবেন না!'

আধপাক ঘুরে বনভূমির দিকে তাকাল চাখার সিং। 'কোথায় তুমি?' চিৎকার করল সে।

'আমি এখানেই আছি, প্রভু। আপনার কাছে মহামূল্যবান, এমন একটা জিনিস আছে আমার কাছে। সেটা পেলে আপনি আনন্দে নাচতে শুরু করবেন।'

'কি সেটা?' জানতে চাইল চাখার সিং। 'কোথায় তুমি?'

'এই তো আমি এখানে,' ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওজি হাবিব, তার কাঁধের ওপর উঁকি দিচ্ছে তীর ও ধনুক।

'এটা কি ধরনের ঠাট্টা, শুনি?' খেঁকিয়ে উঠল চাখার সিং। 'তুমি লুকাচ্ছ কেন?'

'লুকাব কেন, পৌঁছুলামই তো এই মাত্র। আমাকে চিনতে পারছেন না, প্রভু? আমি তো আপনার সেই পুরানো ভৃত্য। হুজুর, আপনাকে আমি একটা অসম্ভব দামী জিনিস উপহার দিতে চাই।'

'কি উপহার? হাতির দাঁত?' জানতে চাইল চাখার সিং, লোভে চকচক করছে চোখ দুটো।

'হাতির দাঁত নয়, তারচেয়েও দামী। এ জিনিস আপনি জীবনে খুব কমই দেখেছেন।'

'কই, দেখাও আমাকে।'

'দেখাব, কিন্তু আগে বলুন, আপনি আমাকে তামাক দেবেন?'

'দেব, তবে উপহারটা আগে দেখব।'

'কতটা দেবেন, প্রভু? কতটা তামাক পাব আমি?'

'আগে উপহারটা দেখাও। সত্যি সেটা দামী কিনা বুঝতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, আসুন তাহলে। চলুন, দেখাই আপনাকে।'

'কোথায় সেটা? কত দূরে?'

'কাছেই, বেশি দূরে নয়–ওই ওখানে।' হাত তুলে আকাশের গায়ে দু'আঙুলে একটা বৃত্ত রচনা করল ওজি হাবিব। চাখার সিং আন্দাজ করল, হাঁটা পথে এক ঘণ্টা লাগবে পৌঁছুতে। তার চেহারায় দ্বিধা ফুটে উঠল।

'শুধু দামী নয়, অদ্ভুত সুন্দর একটা জিনিস,' লোভ দেখাল ওজি হাবিব। 'দেখলেই আপনি মজে যাবেন। এত খুশি হবেন যে আমি না চাইতেই পুরস্কার দ্বিগুণ করে দেবেন।'

'ঠিক আছে,' দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল চাখার সিং। 'চলো, দেখাও তোমার উপহার।'

ওজি হাবিব ধীর গতিতে এগোল, তার ঠিক পিছনে থাকার সুযোগ দিচ্ছে চাখার সিংকে। বনভূমির গভীর থেকে গভীরতম এলাকায় প্রবেশ করল সে,

তারপর একই জায়গাকে ঘিরে চক্কর দিল বারবার। একটা ঝর্ণা দু'বার পেরুল সে, চাখার সিং বুঝতেই পারল না। বনভূমির ভেতর সূর্য নেই, মাটির চিহ্ন ও নদী দেখে পথ চিনতে হয় মানুষকে।

একই নদী চাখার সিংকে দু'বার দেখাল ওজি হাবিব, নদীর ধারে দু'বার দু'দিক থেকে এল। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে শিখ লোকটা, খুদে পিগমির পিছু পিছু অন্ধের মত এগোচ্ছে, দূরত্ব বা দিক সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

দু'ঘণ্টা পর দেখা গেল দর দর করে ঘামছে চাখার সিং। ধপাস করে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল সে। 'আর কত দূর?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সে।

'খুব কাছে,' তাকে আশ্বস্ত করল ওজি হাবিব।

'এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই আমি,' পকেট থেকে রুমাল বের করে বলল চাখার সিং। মুখ মোছার পর আবার যখন চোখ তুলল, ওজি হাবিব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চাখার সিং ভয় পায়নি। বামবুটির এ-ধরনের আচরণের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। হঠাৎ অদৃশ্য বা উদয় হওয়া তার একটা স্বভাব। 'ওজি হাবিব, ফিরে এসো এদিকে,' নির্দেশ দিল সে।

কিন্তু ওজি হাবিব সাড়া দিল না।

গাছের গুঁড়ির ওপর অনেকক্ষণ বসে থাকল চাখার সিং। মাঝে মাঝে পিগমি লোকটাকে ডাকল সে। প্রতিবার তার গলা আরও চড়ছে। ধীরে ধীরে একটা আতংক গ্রাস করছে তাকে।

আরও এক ঘণ্টা কাটল। এবার কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করছে সে। 'ওজি হাবিব, ভাই আমার! যা চাইবে তা-ই দেব তোমাকে আমি। প্লীজ, ভাই! তোমার চেহারাটা একবার দেখাও আমাকে!'

হেসে উঠল ওজি হাবিব। তার হাসির শব্দ গাছগুলোর মাঝখানে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। লাফ দিয়ে দাঁড়াল চাখার সিং, উদভ্রান্তের মত ঘুরল চারপাশে, এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর হাসির শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল সে।

হাসির আওয়াজ থেমে গেল, থেমে গেল চাখার সিংও। এবার আরেক দিক থেকে এল শব্দটা। আবার সেদিকে পা বাড়াল চাখার সিং। সারাক্ষণ চিৎকার করছে সে, 'ওজি হাবিব, আমার কাছে ফিরে এসো!' হাসিটা এবার যেন আরও দূর থেকে ভেসে এল। ছ্যাঁৎ করে উঠল চাখার সিং-এর বুক। সে বুঝল, তাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছে ওজি হাবিব। ছুটল সে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল চাখার সিং। নিজের চারপাশে তাকাল। ঘামে ভিজে গেছে তার সারা শরীর। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে বাতাসে বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দ তার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে শব্দটা অনুসরণ করে এগোল, হোঁচট খেতে খেতে। এ যেন সামান্য একটু ধোঁয়া বা একটা চঞ্চল প্রজাপতিকে ধাওয়া করা। আওয়াজটা একবার আসছে ডান দিক থেকে, আরেকবার বাম দিক থেকে, কখনও পিছন থেকে,

আবার কখনও সামনে থেকে।

আতংক ও ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এল চাখার সিং। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে, পড়িমরি করে উঠে আবার ছুটল। এখন সে কাঁদছে। আলগা হয়ে গেল পাগড়িটা, একটা ডালে বেধে যাওয়ায় খসে পড়ল মাথা থেকে। সেটা কুড়োবার জন্যে থামল না সে। মাথা ভর্তি চুল আর মুখ ভর্তি দাড়ি ভিজে গেছে ঘামে, বাতাসে উড়ছে পিছন দিকে। আতংকে চিৎকার করছে সে। তার চিৎকার যত বাড়ছে ততই দূরে সরে যাচ্ছে ওজি হাবিবের হাসির আওয়াজ। তারপর এক সময় শব্দটা আর শুনতে পেল না সে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল চাখার সিং। 'প্লীজ, ভগবানের দোহাই!' বিড়বিড় করছে সে, চিৎকার করার শক্তি নেই। 'এখানে আমাকে ফেলে যেয়ো না!'

তার আবেদনে সাড়া দিল না কেউ।

দু'দিন তাকে অনুসরণ করল ওজি হাবিব। সারাক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে হাঁটল চাখার সিং, বারবার হোঁচট খেল, করুণ সুরে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। প্রতি ঘণ্টায় তাকে আরও দুর্বল হতে দেখল সে। একবার একটা ঝর্ণার পানিতে পড়ে গেল চাখার সিং, অনেকক্ষণ উঠল না। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। গায়ের কাপড়চোপড় বলতে প্রায় কিছুই নেই, ঝোপের তীক্ষ্ণ কাঁটা লেগে ছিড়ে গেছে সব, তারপর খসে পড়েছে। পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে ফুলে উঠেছে চামড়া, লালচে দাগে ভরে গেছে নগ্ন গা। প্রায় সারা শরীর থেকেই রক্ত ঝরছে। ক্ষতগুলোর লোভে ঝাঁক ঝাঁক মাছি সারাক্ষণ অনুসরণ করছে তাকে।

দ্বিতীয় দিন বিকেলের দিকে তার সামনে এল ওজি হাবিব। মেয়েলি চিৎকার বেরিয়ে এল চাখার সিং-এর গলা থেকে, মাটি ছেড়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। 'আমাকে একা ফেলে চলে যেয়ো না, ওজি হাবিব! প্লীজ! যা চাও তাই দেব। প্লীজ!'

'আপনার মতই, আমিও একা,' চাখার সিংকে বলল ওজি হাবিব, ঘৃণায় থুথু ফেলল সে। 'আমি মারা গেছি। মোলিমো আমাকে মেরে ফেলেছে। আপনি কথা বলছেন একজন মরা মানুষের সঙ্গে, একটা ভূতের সঙ্গে। আপনি যাকে খুন করেছেন তার ভূত আমি। একটা ভূতের কাছে আপনি দয়া চাইতে পারেন না।'

শান্তভাবে ছোট্ট ধনুকটায় তীর লাগাল ওজি হাবিব। তীরের ডগায় চকচক করছে কালো বিষ।

বোকার মত হাঁ করে থাকল চাখার সিং। 'কি করছ তুমি?' কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চাইল সে। তীরের ডগায় বিষ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছে সে। এই বিষ সম্পর্কে জানা আছে তার। জানে, বামবুটিদের এই বিষ মাখানো তীর বিঁধলে জঙ্গলের প্রাণীরা কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়।

ধনুকটা তুলল ওজি হাবিব, তীর টেনে চিবুকের কাছে নিয়ে এল।

'না!' হাত তুলে তীরটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করল চাখার সিং।

ধনুক থেকে ছুটে এল সেটা। ওজি হাবিব লক্ষ্যস্থির করেছে চাখার সিং-এর বুকে, কিন্তু লাগল তার হাতের তালুতে। তালুর মাঝখানটা নিখুঁতভাবে ফুটো করে

ভেতরে ঢুকল তীরের ডগা, তারপর আটকে গেল।

হাঁ করে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল চাখার সিং।

'এখন আমরা দু'জনেই মারা গেছি,' নরম সুরে বলল ওজি হাবিব, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর।

নড়ার শক্তি নেই, চোখে আতংক, তালুতে বেঁধা তীরটার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে চাখার সিং। যেখানটায় বিঁধেছে, এরই মধ্যে তার চারপাশের চামড়া বেগুনি হয়ে উঠেছে বিষের প্রভাবে। এরপর শুরু হলো ব্যথা। এরকম তীব্র ব্যথা জীবনে কখনও অনুভব করেনি চাখার সিং। তার রক্তে যেন আগুন ধরে গেছে। সে অনুভব করতে পারছে, বাহু বেয়ে বুকের দিকে উঠে যাচ্ছে বিষ। ব্যথাটা আরও বাড়ছে, ফলে চিৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে। শেষ একবার ওজি হাবিবকে ডাকল, কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না।

আরও এক মিনিট পর অসহ্য ব্যথায় মোচড় খেতে শুরু করল তার শরীর। তারপর, কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, আতঙ্কিত আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

তার সেই আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের জন্যে একবার থামল ওজি হাবিব। তারপর নিস্তব্ধতা নামল বনভূমিতে। আবার পা বাড়াল ওজি হাবিব।

নয়

'আমরা তৈরি,' শান্ত গলায় বলল রানা, তবে লম্বা কুঁড়ে ঘরে বসা প্রতিটি লোক শুনতে পেল ওর কথা।

গোনডালা হেডকোয়ার্টারে একমাস আগে এই লোকগুলোই মীটিং করেছিলেন, অথচ এখন তাঁদেরকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। এখন তাঁদের চেহারায় যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটে রয়েছে আগে তা ছিল না। এখন তাঁরা ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ লোক, কাকে কি করতে হবে পরিষ্কার ধারণা রাখেন।

মীটিঙে বসার আগে ম্যাটাবেল ইন্সট্রাক্টরদের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার। চারজনই তারা সন্তুষ্ট। অসুস্থ বা আহত না হলে ট্রেনিং ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়নি কেউ, বাদও পড়েনি।

'ওরা এখন আমাবুথো,' রানাকে বলেছে রাহাম ফেলু। ম্যাটাবেল ভাষায় আমাবুথো মানে বীর।

'আপনাদের সাফল্যে আমি খুশি,' ইন্সট্রাক্টরদের বলেছে রানা। 'এই অল্প সময়ের ভেতর যথেষ্ট করেছেন আপনারা।'

রানার পিছনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড খাড়া করা হয়েছে, সেটার দিকে ফিরল ও। কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে বোর্ডটা, সেটা সরাল। 'এখানে আপনারা আমাদের যুদ্ধ

পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছেন। গোটা প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করব আমি। একবার নয়, বারবার, যতক্ষণ না আপনাদের সবার মুখস্থ হয়ে যায়।'

ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে আঙুল রাখল রানা। 'এখানে আপনাদের চারটে দল রয়েছে। প্রতি দলে আড়াইশো করে সশস্ত্র যোদ্ধা। প্রতিটি দলের কাজ আলাদা, টার্গেট আলাদা। চারটে দল, তবে টার্গেট অনেকগুলো—মেইন আর্মি ব্যারাক, এয়ারফিল্ড, বন্দর, লেবার ক্যাম্প…,' টার্গেটের তালিকাটা পড়ে যাচ্ছে রানা।

তালিকা পড়া শেষ করে বলল, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট হলো কাহালির রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন। মনে রাখতে হবে, সিমন সাফারির সিকিউরিটি ফোর্স অত্যন্ত দক্ষ। প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশি সময় নেবে না তারা। আকস্মিক হামলা চালিয়ে বেশিরভাগ টার্গেটই আমরা দখল করে নেব, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার বেশি দখলে রাখতে পারব না—যদি না সাধারণ মানুষ আমাদেরকে সমর্থন করে। সেজন্যেই জনগণের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের। তা পৌঁছুতে হলে দখল করতে হবে রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন।

'অপারেশন শুরু হবার আগেই রাজধানীতে চলে যাবেন ড. শেখ ফাহিম ফয়সল। ওখানে তিনি পুরানো একটা বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকবেন। আমরা রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন দখল করা মাত্র গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবেন তিনি, জনসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন—তাঁর ভাষণ রেডিও ও টিভি থেকে একযোগে প্রচার করা হবে।

'সাধারণ মানুষ তাকে টিভির পর্দায় দেখামাত্র জানবে যে তিনি বেঁচে আছেন। জানবে, অত্যাচারী সিমন সাফারির বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। কাজেই আমরা আশা করতে পারি দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, সমর্থন করবেন আমাদের। সিমন সাফারির স্টর্ম-ট্রুপার আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হলেও, স্রেফ সংখ্যার জোরে আমরা তাদেরকে পিষে ফেলব।

'সফল হতে হলে আরও একটা কাজ করতে হবে আমাদের। প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে সিমন সাফারির। সাপকে মারতে হলে থেঁতলাতে হয় তার মাথা। সিমন সাফারি না থাকলে তার সাঙ্গপাঙ্গরা ফণা তুলতে পারবে না। আর্মিতে তার জায়গা দখল করার মত আর কেউ নেই। যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা সিমন সাফারি নিজেই করে রেখেছেন। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সবাইকে খুন করেছেন তিনি। গোটা ব্যাপারটা ওয়ান-ম্যান শো। তবে বিস্ময়ের আঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই তাঁকে আমাদের ধরতে হবে।'

'কাজটা সহজ হবে না,' বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল শেখ ফারুখ ফয়সল। 'দেখে মনে হয় তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব জোরাল। ক্ষমতা দখলের পর তাঁকে দু'বার খুন করার চেষ্টা করা হয়, দু'বারই ব্যর্থ হয় আততায়ীরা। লোকে বলতে শুরু করেছে ইদি আমিনের মত যাদু জানেন তিনি…।'

'তুমি বসো তো, ফারুক,' ধমকের সুরে বলল রানা।

'যাদু' শব্দটা উচ্চারণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এমনকি শিক্ষিত একদল

লোকের সামনেও। সবাই তারা আফ্রিকান, আর আফ্রিকার মাটিতে অনেক গভীর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে যাদুবিদ্যার শিকড়। উপস্থিত নেতারা যদি বিশ্বাস করেন যে সিমন সাফারি যাদু জানে, নেতৃত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'সিমন সাফারি একটা শয়তান, যাদুকর নন। এ-কথা সবাই আমরা জানি। তিনি কোন রকম রুটিন মেনে চলেন না। প্রতিটি কাজ একেবারে শেষ মুহূর্তে রদবদল করেন। যে-কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোন কারণ ছাড়াই বাতিল করে দেন। এক এক রাতে এক এক স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমান, আগে থেকে কেউ জানে না কার সঙ্গে শোবেন। খুব চালাক, তবে যাদুকর অবশ্যই নন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, তাঁর শরীরে লাল রক্ত বইছে।'

হাততালি দিয়ে রানাকে সমর্থন করল উপস্থিত নেতারা। সবার চেহারায় আবার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল।

'তবে একটা রুটিন ঠিকমতই মেনে চলেন সাফারি। প্রতি মাসে অন্তত একবার ওয়েঙ্গুর মাইনিং অপারেশন দেখতে যান। মাটির তলা থেকে তাঁর সম্পদ উঠে আসছে, এটা দেখতে পছন্দ করেন ভদ্রলোক। এই ওয়েঙ্গুতেই শুধু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। গোটা দেশে এই একটা জায়গায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যাবে তাঁকে। আমরা ভাগ্যবান, মেজর সাবুর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেয়েছি।' মঞ্চে, পাশে বসা হিটা অফিসারকে ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'আপনারা জানেন, মেজর সাবু সিমন সাফারির ব্যক্তিগত ট্রান্সপোর্ট-এর দায়িত্বে আছেন। সিমন সাফারি ওয়েঙ্গুতে সব সময় একটা পুমা হেলিকপ্টার নিয়ে যান। আগামী চোদ্দ তারিখ সোমবার তাঁর জন্যে একটা পুমাকে তৈরি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি, সেদিনও তিনি ওয়েঙ্গুতে যাবেন। তারমানে আমাদের হাতে মাত্র পাঁচ দিন সময় আছে তৈরি হবার···।'

পুমা হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজে, প্যাড লাগানো বেঞ্চে প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারির পাশে বসে আছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। বনভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে পুমা, খোলা হ্যাচ দিয়ে গাছগুলোর সবুজ মাথা ঝাপসা মত দেখতে পাচ্ছেন তিনি। প্রচণ্ড বাতাস ঢুকছে ভেতরে, কথা বলার সময় গলা চড়াতে হলো।

'চাখার সিং-এর খবর কি?' চিৎকার করলেন সিমন সাফারি, তাঁর মুখ চণ্ডমণ্ড গণ্ডের কানের কাছে।

'কোন খবর নেই,' পাল্টা চিৎকার করলেন চীনা ব্যবসায়ী। 'আমরা তাঁর ল্যাণ্ডরোভারটা পেয়েছি, কিন্তু তাঁর কোন হদিশ পাইনি। দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পার হতে চলল। ধরে নিতে হয় জঙ্গলে মারা গেছেন তিনি, রানার মত।'

'ভদ্রলোক ভাল মানুষ ছিলেন,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'লেবার ক্যাম্পে সবাই তাঁকে ভয় করত। কিভাবে কাজ আদায় করতে হয় জানতেন তিনি। খরচ কমিয়ে রাখার কৌশলও তাঁর জানা ছিল।'

'হ্যাঁ,' একমত হলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আর কাউকে দিয়ে তাঁর জায়গা পূরণ করা

সহজ হবে না। ওদের ভাষাটাও ভাল বুঝতেন তিনি। আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। জানতেন কিভাবে···' নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন তিনি। কালো লোকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, সময় থাকতে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। 'জানতেন কিভাবে মানুষকে রাজি করতে হয়।'

'মাত্র অল্প ক'দিন হলো তিনি অনুপস্থিত, অথচ এরইমধ্যে আমাদের উৎপাদন কমে গেছে। উৎপাদন কমে যাওয়া মানে লাভের পরিমাণ কমে যাওয়া···।'

'ব্যবস্থা করছি আমি,' আশ্বাস দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তাঁর জায়গায় অন্য লোক আসছে। মাইনিং-এ অভিজ্ঞ এমন কিছু লোককে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। চাখার সিং-এর চেয়ে কম নয় তারা। বর্বর শ্রমিকদের কিভাবে খাটাতে হয়, তারা জানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সিমন সাফারি। কেবিনের আরেক দিকে এগোলেন তিনি সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে।

বরাবরের মত এবারও সঙ্গে একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন সিমন সাফারি। তাঁর এবারের বান্ধবীটি এক হিটা তরুণী, কাহালির একটা নাইটক্লাবে নাচে ও গান গায়। যেমন লম্বা মেয়েটি তেমনি সুন্দর তার চেহারা। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের একটা দলও রয়েছে। ক্যাপটেন সোলকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর বানানো হয়েছে, তার অধীনে পুমায় রয়েছে বিশজন ক্র্যাক প্যারাট্রুপার। সোফিয়া ক্যারল অদৃশ্য হবার পর পদোন্নতি পেয়েছে সোল। সিমন সাফারি অনুগত ও বিশ্বাসী লোকদের পছন্দ করেন, তাদেরকে পুরস্কার দিতেও কার্পণ্য করেন না। তাঁর আমলে সোল যে আরও উন্নতি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাইনিং ও লগিং কনসেশনে প্রেসিডেন্টের এই ভিজিট একঘেয়ে লাগছে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের। উবোমো এয়ারফোর্সের এই পুরানো পুমায় চড়তে সাংঘাতিক ভয় পান তিনি। এ-দেশের হেলিকপ্টার পাইলটরা যেমন বেপরোয়া তেমনি আনাড়ি। উবোমোয় তিনি আসার পর দুটো পুমা বিধ্বস্ত হয়েছে। আরোহীদের একজনও বাঁচেনি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পুমায় থাকার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই, কিন্তু থাকতে বাধ্য করা হয় তাঁকে। তাঁর সঙ্গ না পেলে সিমন সাফারি অসন্তুষ্ট হবেন।

শুধু যে শারীরিক ঝুঁকি আছে তা নয়। পাশে থাকলে প্রেসিডেন্ট সারাক্ষণ তাঁকে উৎপাদন আর লাভের অঙ্ক সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। সিমন সাফারির চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হয়, তাঁকে যেন তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। মুশকিল হলো, সামরিক অফিসার হলেও হিসাবটা তিনি খুব ভাল বোঝেন। কেউ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যান।

অবশ্যই চণ্ডমণ্ড গণ্ড ব্যবসাটা থেকে কিছু চুরি করছেন, তবে মাত্রা ছাড়াচ্ছেন না। অত্যন্ত কৌশলে কাজটা করছেন তিনি, কেউ যাতে কিছু সন্দেহ করতে না

প্যারে। তাঁর চুরির কৌশলটা এতই সূক্ষ্ম, পাকা কোন অডিটর-ও সহজে ধরতে পারবে না। অথচ সিমন সাফারি এরইমধ্যে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

আরেকটা সমস্যা হলো, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিমন সাফারির কৌতূহল। নারীদেহ কেন তাঁর কাছে লোভনীয়, এ-ধরনের প্রশ্নও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সোফিয়ার নাম উচ্চারণ করে সিমন সাফারি জানতে চেয়েছেন, কতক্ষণ বেঁচে ছিল সে।

প্যাড লাগানো বেঞ্চে একা নন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তাঁর পাশে দু'জন প্যারাট্রুপার বসে আছে। ওদের উপস্থিতির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁর চুরির কৌশলে কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা ভাবতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর চণ্ডমণ্ড গণ্ড সিদ্ধান্ত নিলেন, চুরিটা আপাতত বন্ধ রাখাই ভাল। তিনি জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেলে সিমন সাফারি চুক্তিটা বাতিল করতে ইতস্তত করবেন না। শুধু যে চুক্তিটা বাতিল করা হবে তা নয়, চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে জ্যান্ত মাটির তলায় পুঁতেও ফেলা হবে। নিখোঁজ-এর তালিকায় রানা ও চাখার সিং-এর সঙ্গে আরও একটা নাম যোগ হবে-চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল পুমা, বেঞ্চটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। খোলা হ্যাচ দিয়ে বাইরে তাকাতে নগ্ন লাল মাটি দেখতে পেলেন, দেখতে পেলেন এক সারিতে কয়েকটা মোমু বনভূমির কিনারায় কাজ করছে। ওয়েঙ্গুতে পৌঁছে গেছেন তাঁরা।

রানা দেখল ল্যান্ডিং-প্যাডকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে পুমা।

প্যাড থেকে তিনশো বিশ গজ দূরে রয়েছে রানা, একটা মেহগনি গাছের মাঝখানে। গাছটায় চড়েছে রাতের অন্ধকারে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল লোদজি হাবিব, স্নাইপার'স ইকুইপমেন্টগুলো একটা নাইলন রশিতে বেঁধে দেয় সে, রশিটা ওপরে টেনে নেয় রানা।

মেহগনি গাছটায় প্রচুর শাখা-প্রশাখা আর পাতা রয়েছে, আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। পরগাছাগুলো পরস্পরকে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, ভেতরে পাঁচ-সাতজন লোক লুকিয়ে থাকলেও নিচ থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। পরগাছা কেটে একটা জানালা তৈরি করেছে রানা, সেই জানালায় চোখ রেখে তাকিয়ে আছে হেলিকপ্টার প্যাড-এর দিকে। ওর পরনে পুরোদস্তুর ক্যামোফ্লেজ স্নাইপার'স ওভারঅল, মুখে পরেছে মেশ ফেস-মাস্ক। হাত দুটো সবুজ দস্তানায় ঢাকা।

রানার সঙ্গে একটা সেভেন এমএম রেমিংটন ম্যাগনাম রাইফেল রয়েছে, ১৬০ গ্রেন সফট-পয়েন্ট বুলেট ভরেছে ওটায়। গভীর জঙ্গলে হাতের টিপ ঝালাই করে নিয়েছে ও। সিমন সাফারির কোথায় গুলি করবে ইতিমধ্যে তা ঠিক করে নিয়েছে। মাথায় নয়, বুকে। বুকের ঠিক মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করবে ও। বুলেটটার যে বৈশিষ্ট্য, আশা করা যায় সিমন সাফারির ফুসফুস ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যাবে।

এভাবে চিন্তা করাটা অশ্লীল, মনে মনে স্বীকার করল রানা। তারপর ভাবল,

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। সিমন সাফারি যে একটা পশু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ক্ষমতালোভী নন, ভদ্রলোক আক্ষরিক অর্থেই ইতর। যাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদেরকে দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তার পাশে ভাল বলতে একজন লোকও নেই।

লতাপাতার ফাঁক দিয়ে রানা দেখল, প্রধান প্রশাসনিক ভবনের সামনে এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল লোক। বেশিরভাগই তাইওয়ানিজ এঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান। তবে কালো ম্যানেজাররাও আছে। ওদের উপস্থিতিই আভাস দিচ্ছে, রানার পাওয়া তথ্যটা মিথ্যে নয়। শুধু সিমন সাফারিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এভাবে এক জায়গায় জড়ো হবে লোকগুলো।

পুমায় যদি সিমন সাফারি থাকেন, ধরে নেয়া যায় তাঁর সঙ্গে অবশ্যই চণ্ডমণ্ড গণ্ড থাকবেন। ইউডিসি-র চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি, এর আগে প্রতিবার কাজ দেখার জন্যে প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়েছেন। রানা যদি প্রথম গুলিতে সিমন সাফারিকে মারতে পারে, তাঁকে ঘিরে থাকা দেহরক্ষীদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, দিশেহারা হয়ে পড়বে তারা সবাই, তখন দ্বিতীয় গুলিটা চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে করার একটা সুযোগ পাবে ও।

চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে গুলি করার সময় রানার মধ্যে কোন ইতস্তত ভাব থাকবে না। নিজেকে কঠিন করার জন্যে আলী শাহ আর তার পরিবারের স্মৃতি বুকের মাঝখানে লালন করছে ও। উবোমোয় ওর আসার পিছনে মূল কারণই চণ্ডমণ্ড গণ্ড। দ্বিতীয় বুলেটটা তাঁর জন্যে আলাদা করে রেখেছে রানা।

তারপর আছে চাখার সিং। তবে সে যদি প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ও, তৃতীয় গুলিটা করার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। প্যারাট্রুপার গার্ডরা ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক। দ্বিতীয় গুলিটা হয়তো ছোঁড়া যাবে, তারপর আর সুযোগ থাকবে বলে মনে হয় না।

চক্কর শেষ করে ল্যান্ডিং প্যাডে নেমে আসছে পুমা।

আয়োজন ও প্ল্যান যা করা হয়েছে, আরেকবার স্মরণ করল রানা। অবশ্য এখন আর কিছু বদলান সম্ভব নয়।

ড. শেখ ফাহিম ফয়সল কাহালি পৌঁচেছেন। একটা লগিং ট্রাকে চড়িয়ে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে। নিখুঁত ছদ্মবেশ নেন তিনি, ট্রাক ড্রাইভারের হেলপার-পথে কোথাও কোন অসুবিধে হয়নি। একইভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদও বিলি করা হয়েছে, বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইউডিসি ট্রাকে করে। মজার ব্যাপার হলো, অত্যাচারীকে উৎখাত করার জন্যে তারই পরিবহন ব্যবস্থা কাজে লাগাচ্ছে ওরা।

এই মুহূর্তে রাজধানীতে দুটো বিপ্লবী কমাণ্ডো রয়েছে, নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করার অপেক্ষায় আছে তারা। প্রথম হামলাটা করা হবে রেডিও ও টিভি স্টুডিওতে। শেখ ফাহিম ফয়সল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। বিদ্রোহ করার জন্যে আহ্বান জানাবেন জনগণকে। তিনি ঘোষণা করবেন সিমন সাফারি মারা গেছেন; সেই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটেছে তাদের ভোগান্তি ও দুর্দিনের।

বাকি দুটো কমাণ্ডো দায়িত্ব পালন করবে এখানে আর সেঙ্গি সেঙ্গিতে।

প্রথম লক্ষ হবে সিমন সাফারির এসকর্টকে নিশ্চিহ্ন করে ত্রিশ হাজার বন্দীকে মুক্ত করা।

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে, এই সংকেত আসবে রানার রাইফেল থেকে। সিমন সাফারি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও যোগে খবরটা পৌছে যাবে ড. ফাহিম ফয়সল ও ফারুক ফয়সলের কাছে। ল্যাণ্ডিং-প্যাড-এর পাশে প্রশাসনিক ভবনে শক্তিশালী একটা রেডিও আছে, তবে আক্রমণ শুরু হবার পরপরই ওটার কাছে ওরা পৌছুতে পারবে বলে মনে হয় না। ব্যাকআপ হিসেবে ওদের কাছে একটা পোর্টেবল ভিএইচএফ ট্রান্সমিটার আছে, ওটার সাহায্যে গোনডালা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। রেডিও অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে মনিকা, সে-ই সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে জানাবে যে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে।

যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, একাধিক বিকল্প ঠিক করা আছে, তবে সব কিছু নির্ভর করবে প্রথম গুলিতে সিমন সাফারি মারা যায় কিনা তার ওপর। রানা যদি ব্যর্থ হয়, সিমন সাফারির প্রতিক্রিয়া হবে আহত সিংহের মত হিংস্র ও ক্ষিপ্র। গোটা পরিস্থিতি তখন বদলে যাবে। রানা অবশ্য সশস্ত্র উহালি তরুণদের ওপর নির্ভর করতে পারে, তবে তার একটা সীমা আছে। মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল ও। সিমন সাফারিকে ওর ফেলার কথা, ওই ফেলবে।

ল্যাণ্ডিং প্যাড স্পর্শ করছে পুমা হেলিকপ্টার।

রাইফেলের বাঁটে গাল ঠেকাল রানা, টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখে নিল সামনের দৃশ্যটা। নাইন ম্যাগনিফিকেশন-এ সেট করা রয়েছে টেলিস্কোপ সাইট। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে ল্যাণ্ডিং-প্যাড-এর কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে রিসেপশন কমিটির লোকজন। তাদের মুখ, হাসি, ঠোঁট নড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও।

রাইফেল একটু ওপরে তুলল রানা, হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল। লেন্সগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী, পুমার ফিউজিলাজে হ্যাচওয়ে ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, হেলিকপ্টারের নিরাপদ অবতরণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করছে। লোকটার ওপর ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা, টেলিস্কোপের ক্রস-হেয়ার রাখল তার বুকে, সেফটি স্ট্র্যাপ-এর বাকল হলো ওর লক্ষ্যস্থল।

আচমকা এঞ্জিনিয়ারের কাঁধের পিছনে আরেকটা মাথা দেখা গেল। মেরুন রঙা বেরেট, বেরেটের গায়ে চকচক করছে ক্যাপ-ব্যাজ–দীর্ঘদেহী ও সুপুরুষ সিমন সাফারি।

'এসেছে!' বিড় বিড় করল রানা। 'মরণ তাকে টেনে এনেছে এখানে!'

সাইটের ক্রস-হেয়ার উঁচু করল রানা, ওটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করল সিমন সাফারির দুই চোখের মাঝখানে। হেলিকপ্টারের নড়াচড়া, ওর নিজের হৃৎপিণ্ড ও হাতের কাঁপন, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের তৈরি আড়াল গুলি করতে বাধা দিচ্ছে ওকে। তবু সমস্ত মনোযোগ ও ইচ্ছাশক্তি সিমন সাফারির ওপর স্থির রাখার চেষ্টা করল রানা।

ঠিক এই সময় বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা আঘাত করল ওর নগ্ন ঘাড়ে। চমকে উঠল রানা, কেঁপে গেল হাত, তারপর আরেক ফোঁটা বৃষ্টি ঝাপসা করে দিল টেলিস্কোপের লেন্স। দাঁতে দাঁত চেপে ভাগ্যকে গালি দিল রানা।

শুরু হয়ে গেল ঝমাঝম বৃষ্টি। কুয়াশার মত একটা পর্দা দেখতে পাচ্ছে রানা সামনে, ও যেন একটা পাহাড়ী জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ল্যাণ্ডিং-প্যাডটা ঝাপসা হয়ে গেছে। ওখানে স্পষ্টভাবে যাদেরকে দেখা যাচ্ছিল একটু আগে, এখন তাদের আকৃতি বদলে গেছে। প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যারা এসেছে, সবাই তারা রঙিন ছাতা খুলে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। কে সবার আগে প্রেসিডেন্টের মাথায় ছাতা ধরতে পারবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

রঙিন ছাতাগুলো বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে রানার দৃষ্টিকে। সিমন সাফারির ভাঙাচোরা একটা আকৃতি হ্যাচওয়েতে দেখতে পেল ও, নিচে নামার চেষ্টা করছে। রানা আশা করেছিল, হ্যাচওয়েতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। বৃষ্টি এসে সব ভেস্তে দিল। হ্যাচওয়ে থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, তারপর ছাতা আর লোকজনের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। হারিয়ে গেলেও, মাঝে মধ্যে তাঁর মাথাটা দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে দেখতে পাচ্ছে রানা। ক্রস-হেয়ারটা তাঁর ওপর স্থির রাখতে চাইছে ও। মাত্র দু'সেকেণ্ড স্থায়ী একটা সুযোগ পাওয়াও গেল। ট্রিগার টেনে রেখেছে ওর আঙুল, চাপ বাড়াতে যাবে এই সময় একটা ছাতা এসে আড়াল করে দিল সিমন সাফারির মাথা।

হ্যাচওয়েতে দেখা গেল ঝাপসা আরেকটা মূর্তি, রানার মনোযোগ নড়িয়ে দিল। প্রথমে সন্দেহ হলো, তারপর চিনতে পারল–চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ঝট করে তার দিকে রাইফেল ঘোরাল, পরমুহূর্তে সাবধান করল নিজেকে। প্রথম অবশ্যই সিমন সাফারিকে মারতে হবে। মরিয়া হয়ে টেলিস্কোপটা বারবার এদিক ওদিক ঘোরাল রানা, টার্গেটকে ক্রস-হেয়ারে ধরে রাখতে চাইছে। এখনও অভ্যর্থনা কমিটির লোকজন ঘিরে রেখেছে তাঁকে, ভিড়টা তাঁকে নিয়ে সরে যাচ্ছে দূরে, ভিড়ের মাথায় গিজগিজ করছে রঙিন ছাতা। এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে প্রতিটি ফোঁটা কংক্রিটে লেগে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

ভিজে গোসল হয়ে গেল রানা, মাস্কের ভেতরও ঢুকে পড়েছে পানি।

হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল ছটা প্যারাট্রুপাররা, ভিড় ঠেলে এগোল তারা, ঘিরে ফেলল তাদের প্রেসিডেন্টকে। সিমন সাফারিকে এখন দেখাই যাচ্ছে না, সবাই এখন অপেক্ষারত ল্যাণ্ডরোভারগুলোর দিকে ছুটছে, ছাতার নিচে নিচু করে রেখেছে মাথা। পায়ের আঘাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এরইমধ্যে জমে ওঠা বৃষ্টির পানি।

আবার দেখা গেল সিমন সাফারিকে, বৃষ্টির মধ্যে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছেন, এগোচ্ছেন অপেক্ষারত প্রথম গাড়িটার দিকে। টার্গেট হাঁটার মধ্যে থাকলে, সেভেন এমএম বুলেটের ভেলোসিটির কথা মনে রেখে রানাকে গুলি করতে হবে অন্তত দু'ফুট সামনে। ঝাপসা লেন্সের ভেতর দিয়ে কোন রকমে তাঁকে দেখতে

পাচ্ছে ও। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, তবু ট্রিগারের ওপর চাপ বাড়াল রানা, ঠিক যখন একজন হিটা দেহরক্ষী ছুটে তার মনিবের সামনে চলে এল।

নিজেকে সামলাবার আগেই বেরিয়ে গেল গুলি। হিটা প্যারাট্রুপারকে আধপাক ঘুরে পড়ে যেতে দেখল রানা। গুলিটা তার বুক ভেদ করে গেছে। সে ওখানে না থাকলে সিমন সাফারির অবস্থা তার মতই হত।

ছুটন্ত মানুষদের গোটা ছকটা বিস্ফোরিত হলো। হাতের ছাতা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে খিঁচে দৌড় দিলেন সিমন সাফারি। তাঁর চারপাশে সবাই দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে।

রাইফেলের চেম্বারে আরেক রাউণ্ড ভরে আবার গুলি করল রানা, সরাসরি সিমন সাফারিকে। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করা হয়নি, কাজেই লাগল না। আগের মতই প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন তিনি। পৌঁছে গেলেন ল্যাণ্ডরোভারের কাছে, রানা আবার লোড করার আগে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন সামনের সীটে।

ভিড়ের মধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখতে পেয়ে গুলি করল রানা। আরেকজন প্যারাট্রুপারকে পড়ে যেতে দেখল ও, শরীরের নিচের দিকে গুলি খেয়েছে। এরপর বাকি সৈনিকরা বনভূমির কিনারা লক্ষ্য করে উদভ্রান্তের মত ছুটতে শুরু করল, বুঝতে পারেনি রানা কোনদিক থেকে গুলি করছে।

এখনও রানা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে সিমন সাফারিকে লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি ছোড়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে ল্যাণ্ডরোভার। উইণ্ডস্ক্রীনের পিছনে একটা মাথা দেখে ট্রিগারে টান দিল ও, জানে না মাথাটা প্রেসিডেন্টের নাকি ড্রাইভারের। চুরমার হয়ে গেল উইণ্ডস্ক্রীন, তবে ল্যাণ্ডরোভার থামল না বা ঝাঁকি খেল না।

ছুটন্ত গাড়িটার ওপর ম্যাগাজিন শেষ করল রানা। তারপর কোমরে জড়ানো বেল্ট থেকে বুলেট নিয়ে রিলোড করতে যাবে, দেখল গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন-চারজন হিটা গার্ড ও প্রশাসনিক অফিসার। তারপর এক সঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল।

পেরিমিটারের বাইরে, জঙ্গলের ভেতর নিজেদের পজিশন থেকে উহালি তরুণরা গুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে, কিন্তু সিমন সাফারি এখনও বেঁচে।

রানা দেখল বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করল ল্যাণ্ডরোভার, পাশ কাটাল অফিস ভবনটাকে, ঘুরে ফিরে আসছে প্যাড ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়া হেলিকপ্টারের দিকে। পুমাকে নিয়ে বিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে পাইলট, ল্যাণ্ডিং-প্যাড-এর ওপরই স্থির হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি একটা পর্দার মত আড়াল করে রেখেছে ওটাকে।

ড্রাইভারের জানালা দিয়ে মাথা বের করলেন সিমন সাফারি, আবার তাঁকে তুলে নেয়ার জন্যে উন্মাদের মত ইঙ্গিত করছেন পাইলটের উদ্দেশে।

এই সময় জঙ্গলের কিনারা থেকে ফাঁকা জায়গাটার দূর প্রান্তে বেরিয়ে এল একা লোক। এতটা দূর থেকেও ম্যাটাবেল ইন্সট্রাক্টর রাহান ফেলুকে পরিষ্কার

চিনতে পারল রানা। সে তার কাঁধে আরপিজি রকেট-লঞ্চারের একটা টিউব বহন করছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটে সামনে চলে আসছে রাহান ফেলু।

হিটা গার্ডদের কেউ এখনও তাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। শূন্যে ঝুলে থাকা পুমার একশো কদমের মধ্যে চলে এল রাহান ফেলু, মাটিতে একটা হাঁটু গাড়ল, স্থির ও শক্ত করল নিজেকে, তারপর ফায়ার করল একটা রকেট।

সাদা ধোঁয়ার লেজ বের করে ছুটল রকেট। হিস হিস শব্দ হলো বাতাসে। পুমার সামনের দিকে আঘাত করল সেটা।

ধোঁয়া আর শিখার বিস্ফোরণে ককপিট ঢাকা পড়ে গেল। অলস ভঙ্গিতে ডিগবাজি খেতে শুরু করল হেলিকপ্টার, প্যাডের ওপর পড়ল পিঠ দিয়ে। কংক্রিটের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ঘুরন্ত রোটর। এক মুহূর্ত পর আগুন ও ধোঁয়ার একটা বিরাট বল লাফ দিয়ে উঠল, ঢেকে ফেলল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রাহান ফেলু, ঘুরেই ছুটল বনভূমির কিনারা লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আর ফিরে যাওয়া হলো না। নিরাপদ আড়ালে পৌঁছুবার আগেই হিটা গার্ডরা গুলি করে ফেলে দিল তাকে।

লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। সিমন সাফারির পালিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে গেছে সে।

যদিও প্রায় এক মিনিটের মত সময় লাগল, তবু বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে হিটা সৈনিকরা। ল্যাণ্ডরোভারে উঠে পড়েছে তারা, অনুসরণ করছে সিমন সাফারিকে। সিমন সাফারির ল্যাণ্ডরোভার অফিস ভবনকে ছাড়িয়ে সামনের রাস্তায় উঠে পড়েছে। আক্রমণকারীদের সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে নি শ্চই একটা ধারণা পেয়ে গেছেন তিনি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাঁচতে হলে সেঙ্গি সেঙ্গি রোড ধরে সবচেয়ে কাছের একটা রোড-ব্লকে পৌঁছুতে হবে তাঁকে। ওখানে তাঁর নিজের লোকজন আছে।

তাঁর লোকদের নিয়ে বাকি ল্যাণ্ডরোভারগুলোও পিছু পিছু আসছে।

সিভিলিয়ান অফিসাররা বেশিরভাগই শুয়ে পড়েছে মাটির ওপর, এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ থেকে গা বাঁচাবার চেষ্টায়। তবে কিছু লোক অফিস ভবনে আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটছে এখনও। তাদের মধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকেও দেখতে পেল রানা। তার পরনের নীল সাফারি সহজেই দৃষ্টি কেড়ে নিল। লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছোড়ার সুযোগ পেল না রানা, তার আগেই একটা ভবনের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

আবার ল্যাণ্ডরোভারগুলোর দিকে তাকাল রানা। সব মিলিয়ে মোট চারটে গাড়ি। এরইমধ্যে মেইন হাইওয়েতে প্রায় পৌঁছে গেছে ওগুলো। উহালি কমাণ্ডোরা গুলি করছে বটে, তবে একটাও লাগছে না। রাহান ফেলু মারা যাবার পর নিজেদের ট্রেনিং যেন ভুলে গেছে তারা, গুলি করছে লক্ষ্যস্থির না করেই।

মেহগনি গাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সিমন সাফারির ল্যাণ্ডরোভার,

রেঞ্জের অনেক বাইরে। উবোমোর সামরিক প্রশাসক শেষ পর্যন্ত রানাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারছেন। গোটা আক্রমণটাই ব্যর্থ হতে চলেছে। উহালি তরুণরা সব ভুলে বসে আছে। প্ল্যান অনুসারে কোন কাজই হচ্ছে না এখন। শুরু হতে না হতে ভেস্তে গেছে সশস্ত্র বিপ্লব।

হতাশার কালো ছায়া পড়ল রানার চেহারায়। এরপর কি ঘটবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ও।

দশ

জঙ্গল থেকে হঠাৎ হলুদ একটা প্রকাণ্ড ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর হেলেদুলে বেরিয়ে এল। চোখ মিটমিট করে বৃষ্টির পানি সরাল রানা, বিড় বিড় করে বলল, 'একজন অন্তত মনে রেখেছে এই পরিস্থিতিতে কি করতে হবে।' নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ওর, এই ব্যর্থতার জন্যে একা নিজেকে দায়ী করছে ও।

ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর অলসভঙ্গিতে তির্যক একটা পথ ধরে হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে, ল্যাণ্ডরোভারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ওটার পিছু পিছু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে উহালিদের ছোট একটা দল, ছুটছে তারাও, তাদের সবার পরনে নীল ডেনিম। ট্র্যাক্টরটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তারা, গুলি করছে সামনের ল্যাণ্ডরোভারকে লক্ষ্য করে।

কাছাকাছি থেকে, কাজেই এবার তাদের গুলি একেবারে ব্যর্থ হলো না। ট্র্যাক্টরটা পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পেয়ে ল্যাণ্ডরোভার ঘুরিয়ে নিলেন সিমন সাফারি। বাকি ল্যাণ্ডরোভারগুলোও অনুসরণ করল তাঁকে।

এক লাইনে খোলা জায়গায় ফিরে এল ওগুলো। আবার ওদেরকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গেল রানা। সিমন সাফারির মাথা লক্ষ করে গুলি করল ও। কিন্তু ল্যাণ্ডরোভারটা ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটছে, উঁচু-নিচু মাটির ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। রানা টেরই পেল না কোথায় লাগল বুলেটগুলো। ঝড় তুলে ছুটে গেল ট্রাকগুলো, সোজা চলে যাচ্ছে মোমু ইউনিট যেখানে কাজ করছে সেদিকে।

ওদিকটা শেষ প্রান্ত। রাস্তার মাথায় মোমুর তৈরি গভীর খাদ। পরিস্থিতি আবার অনুকূল হয়ে উঠেছে। কৃতিত্বটা উহালি ট্র্যাক্টর ড্রাইভারের।

মেহগনি গাছ থেকে ল্যাণ্ডরোভারগুলোকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। রশি বেয়ে স্ট্র্যাপের সঙ্গে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এল রানা। রশি বেয়ে এত দ্রুত নামল, তালুতে চামড়া বলে প্রায় কিছু থাকল না। মাটিতে পড়তেই ওর কাছে ছুটে এল লোদজি হাবিব, বাড়িয়ে ধরল একটা একে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল আর একটা হ্যাভারস্যাক—ওটার ভেতর স্পেয়ার ম্যাগাজিন ও চারটে এমটৈয়েনটিসিক্স গ্রেনেড আছে।

'তোমার আপামণি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বনভূমির দিকে হাত তুলে দেখাল লোদজি হাবিব। দু'জন একসঙ্গে ছুটল সেদিকে।

জঙ্গলে ঢুকে দুশো গজ এগোল ওরা। ভিএইচএফ রেডিও ট্র্যান্সমিটারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মনিকা। রানাকে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হলো সে। 'কি খবর, রানা?' জানতে চাইল সে। 'সিমন...?'

'সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে, মনিকা,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'সিমন সাফারি এখনও ওখানে ছুটোছুটি করছে। ওয়েঙ্গু রেডিও স্টেশন এখনও আমরা দখল করতে পারিনি।'

'ওহ্ গড! এখন কি হবে?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল মনিকার চেহারা।

'ট্র্যান্সমিট!' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'ড. শেখ ফাহিম ফয়সলকে সবুজ সংকেত দাও। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, মনিকা। এখন আর পিছু হটার কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু সাফারি যদি বেঁচে থাকেন...।'

'তর্ক কোরো না তো!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'যা বলছি করো। কি করা যায় দেখছি আমি। অন্তত সাফারি এখনও পালিয়ে যেতে পারেননি। এখনও সফল হবার সম্ভাবনা আছে আমাদের। আপাতত তাকে আমরা ওয়েঙ্গুতে কোণঠাসা করে রেখেছি।'

কথা না বাড়িয়ে রেডিও সেটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মনিকা, ঠোঁটের সামনে মাইক্রোফোন তুলল। 'গ্রীন বেস, দিস ইজ ক্যাকটাস। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

কাহালিতে সরাসরি পৌঁছুনোর মত রেঞ্জ নেই পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটারটার। গোনডালায় যে সেটটা রয়েছে সেটা যথেষ্ট শক্তিশালী, কাহালিতে মেসেজ পাঠাতে হবে ওটার মাধ্যমে।

'ক্যাকটাস, দিস ইজ গ্রীন বেস,' গোনডালা ক্লিনিক থেকে একজন পুরুষ নার্সের গলা ভেসে এল। লোকটা উহালি গোত্রের, অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

'দিস ইজ আ রিলে ফর গোল্ডেন হেড ইন কাহালি। মেসেজ রিডস-দা সান হ্যাজ রাইজেন। আই সে এগেন—দা সান হ্যাজ রাইজেন।'

'স্ট্যাণ্ড বাই, ক্যাকটাস।'

কয়েক মুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার রেডিওতে ফিরে এল গোনডালা। 'ক্যাকটাস, গোল্ডেন হেড অ্যাকনলেজস দা সান হ্যাজ রাইজেন।'

পিছু হটার শেষ সুযোগটাও আর থাকল না। এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন ড. ফাহিম ফয়সল। দেশবাসীকে জানাবেন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু সিমন সাফারি এখনও বেঁচে!

'মনিকা, আমার কথা শোনো।' তাকে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল রানা, যাতে তার পুরো মনোযোগ পায়। 'এখানে থাকবে তুমি। সারাক্ষণ গোনডালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না। সাফারির স্টর্ম ট্রুপাররা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ফিরে এসে আমি যেন ঠিক এখানেই পাই তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা। 'সাবধানে থেকো, ডার্লিং।'

'লোদজি হাবির,' খুদে বুড়োর দিকে চোখ নামাল রানা। 'এখানে থাকো। খেয়াল রাখো আপামণির দিকে।'

'আমার জান থাকতে আপামণি---।'

'আমাকে একটা চুমো খাও,' আবদার জানাল মনিকা।

'মাত্র একটা। পরে আরও আসছে,' কথা দিল রানা।

মনিকাকে রেখে ইউডিসি বিল্ডিংগুলোর দিকে ছুটল ও।

একশো গজও এগোয়নি, জঙ্গলের ভেতর লোকজনের আওয়াজ পেল। 'শেখ ফাহিম,' চিৎকার করল ও। এটা ওদের পাসওয়ার্ড।

'শেখ ফাহিম,' পাল্টা চিৎকার করল উহালিরা। 'দা সান হ্যাজ রাইজেন!'

'কিন্তু না, এখনও সূর্য ওঠেনি,' বিড়বিড় করল রানা, সামনের দিকে ছুটল।

উহালি কমাণ্ডের বারো-তেরোজন তরুণকে দেখতে পেল ও। সবার পরনে নীল ডেনিম জ্যাকেট। 'এসো!' সবাইকে নিয়ে সামনে এগোল ও।

খাদের দিকে যাচ্ছে ওরা। রাস্তায় পৌঁছুনোর আগেই দলে উহালিদের সংখ্যা দাঁড়াল ত্রিশ। ইতিমধ্যে থেমে গেছে বৃষ্টি, জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। যতদূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত হয়ে আছে ক্ষতবিক্ষত নগ্ন প্রান্তর, মোমু ইউনিটগুলোর কীর্তি। এক সারিতে দৈত্যাকার মেশিনগুলো রয়েছে ওদের সামনে, যেখানে বনভূমি ও লাল মাটি মিলিত হয়েছে। তুফানের মধ্যে পড়া এক ঝাঁক যুদ্ধ-জাহাজের মত লাগল ওগুলোকে।

ওদের আরও কাছাকাছি রয়েছে ল্যাণ্ডরোভারগুলো, কাদাময় প্রান্তরে পরিত্যক্ত ও এলোমেলো ভঙ্গিতে ছড়িয়ে রয়েছে। হিটা গার্ডদের দেখতে পেল রানা, হোঁচট খেতে খেতে কাছাকাছি মোমুর দিকে ছুটছে তারা।

ওদের সামনে রয়েছেন সিমন সাফারি, তাঁর ইউনিফর্ম পরা কাঠামোটা চিনতে পারল রানা। বোঝাই যায়, সবচেয়ে কাছের মোমুটাকে শক্তিশালী প্রতিরোধ ঘাঁটি হিসেবে বাছাই করেছেন তিনি। একটু গম্ভীর হলো রানা, বাছাইটা তাঁর ভাল হয়েছে।

প্রকাণ্ড মেশিনটার ইস্পাতের দেয়ালগুলো রাইফেল বা পিস্তলের গুলি অনায়াসে ঠেকিয়ে দেবে, এমন কি আরপিজি রকেটও ওটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ওটার কাছে পৌঁছুতে হলে খোলা নরম মাঠ ধরে এগোতে হবে। খোলা মাঠটাকে মোমুর আপার প্ল্যাটফর্ম থেকে কাভার দেয়া যাবে। মাঠের অর্ধেকটাও কেউ পেরুতে পারবে না, উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে গুলি করে ফেলে দেয়া হবে তাকে। মোমুকে ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা সুবিধে হলো, ইস্পাতের ওই দুর্গকে সচল করা যায়। একবার নিয়ন্ত্রণে পেলে, সিমন সাফারি ওটাকে যে-কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন।

দ্রুত নিজের চারদিকে তাকাল রানা। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে পঞ্চাশজনের মত উহালি গেরিলা যোগ দিয়েছে। খুব বেশি হৈ-চৈ করছে তারা, মাত্রা ছাড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। অনেক দূরে হলেও, তাদের মধ্যে অনেকেই সিমন

সাফারি আর গার্ডদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। জানা কথা একটা গুলিও লাগবে না, শুধু শুধু অ্যামুনিশন খরচ করা।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা না করাই ভাল। ওদের উত্তেজনা ও উৎসাহ ফুরিয়ে যাবার আগেই আক্রমণে যেতে হবে ওকে। আক্রমণে যেতে হবে মোমুতে পৌঁছে সিমন সাফারি প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই।

'সামনে বাড়ো, ভায়েরা!' চিৎকার করল রানা। 'শেখ ফাহিম! সূর্য উঠেছে!'

ওদেরকে পথ দেখিয়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে এল রানা, হৈ-চৈ করতে করতে ওর পিছু নিল সবাই। 'শেখ ফাহিম!' আবার চিৎকার করল ও, ওদের উত্তেজনা ধরে রাখতে হবে।

সবাই একযোগে চিৎকার করল, 'সূর্য উঠেছে!'

কাদা কোথাও গোড়ালি পর্যন্ত গভীর, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত। পরিত্যক্ত ল্যাণ্ডরোভারগুলোকে পাশ কাটাল ওরা। ওদের সামনে সিমন সাফারিকে দেখতে পেল রানা, মোমুর কাছে পৌঁছে গেছেন, পা রাখলেন ইস্পাতের একটা মই-এর ধাপে। নরম কাদায় ডেবে যাচ্ছে পা, এগোবার গতি কমে গেল ওদের।

মোমুতে উঠে পড়ল হিটা গার্ডরা, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে নির্দেশ দিচ্ছেন সিমন সাফারি। প্রকাণ্ড মেশিনটার ভেতর ইস্পাতের আড়ালে পজিশন নিচ্ছে তারা। মোমু থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, উহালিদের মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, গেঁথে যাচ্ছে কাদার ভেতর। রানার পাশে একজন তরুণ ঝাঁকি খেল। কাদায় মুখ দিয়ে পড়ল সে।

আক্রমণ গতি হারাল, ডেবে যাচ্ছে কাদার ভেতর। স্টীল বাল্কহেড-এর পিছনে দাঁড়িয়ে নিরাপদ বোধ করছে হিটা গার্ডরা, প্রতিটি গুলি করার আগে লক্ষ্যস্থির করার সময় সুযোগ পাচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যায় গুলি খাচ্ছে রানার লোকজন।

তারপর থেমে গেল আক্রমণ। উহালিদের কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়াল, ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল জঙ্গলের দিকে। কেউ কেউ পরিত্যক্ত ল্যাণ্ডরোভারগুলোর পিছনে আশ্রয় নিল। রাগ হলেও, রানা বুঝল ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। ওদের মধ্যে একজনও সৈনিক নয়। কেরানী, ট্রাক ড্রাইভার আর কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। দুর্ভেদ্য ইস্পাতের দুর্গ থেকে ক্র্যাক শ্যারাট্রুপাররা গুলি করলে পালাবে না তো কি করবে। না, ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না, যদিও ওরা পালাতে শুরু করায় কাদার ভেতর ডুবে মারা যাচ্ছে এত সাধের বিপ্লব।

রানা একা যায় কি করে! এরইমধ্যে হিটাদের বিশেষ নজর পড়েছে ওর ওপর, তাদের বেশিরভাগ গুলিই ছুটে আসছে ওর দিকে। পিছু হটতে বাধ্য হলো রানা, কাছাকাছি ল্যাণ্ডরোভারটার পিছনে আশ্রয় নিল।

চেসিসের পিছন থেকে রানা দেখল, মোমুর ক্রুরা স্টেশন ছেড়ে নেমে এসেছে, নিচের প্ল্যাটফর্মে অসহায়, জড়োসড়ো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তারা। একজন হিটা অফিসারকে দেখা গেল, হাত নেড়ে কি যেন বলছে তাদেরকে। একটু পরই দেখা গেল ক্রুরা মই বেয়ে নামতে শুরু করল। বোঝা গেল, মোমু

ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে।

মোমুর এঞ্জিন এখনও চলছে। একস্কেইভেটরগুলো এখনও মাটি চিবাচ্ছে, তবে প্রকাণ্ড রিগটা নির্দিষ্ট কোন দিকে পরিচালিত না হওয়ায় অন্যান্য মোমুর সঙ্গে তৈরি লাইন ভেঙে বেরিয়ে আসছে। অন্যান্য মোমুর ক্রুরা দেখল কি ঘটছে, ফলে তারাও যে যার স্টেশন ছেড়ে নেমে এল কাদায়, গুলি লাগার ভয়ে মাথা নিচু করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যে যেদিকে পারে ছুটল।

একেই বলে অচল অবস্থা। সিমন সাফারি তাঁর লোকজনদের নিয়ে মোমু দখল করে ফেলেছেন, এক অর্থে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন: আর রানার কমাণ্ডোরা আটকা পড়েছে কাদায়, না পারছে সামনে বাড়তে না পারছে পিছু হটতে।

অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে কি করা যায় ভাবছে রানা। উহালি গেরিলাদের আবার জড়ো করে আক্রমণে যাওয়া এখন আর সম্ভব বলে মনে হয় না। আক্রমণে কাজও বোধহয় হবে না। মোমুতে সিমন সাফারির লোক রয়েছে পনেরো থেকে বিশজন, কাদাভরা মাঠ পেরিয়ে মোমুর কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই উহালি গেরিলাদের শুইয়ে দেবে তারা।

মোমু থেকে গুলি করছে হিটা গার্ডরা, এদিক থেকে উহালিরাও। গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল অন্য একটা আওয়াজ। প্রথমে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জনের মত লাগল রানার কানে। তারপর মনে হলো, অশান্ত কোন আত্মার করুণ বিলাপ। নাকি শ্রী গাল ডাকছে? পিছন দিকে তাকাল রানা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর কি যেন নড়ে উঠল জঙ্গলের কিনারায়। দেখল, কিন্তু চিনতে পারল না। তা কি করে সম্ভব, মানুষ হয় কি করে?

তারপর আরও নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। জেগে উঠছে বনভূমি। হাজার হাজার অদ্ভুত প্রাণী, পোকামাকড়ের মতই অসংখ্য, যেন মিছিল করে এগিয়ে আসছে পিঁপড়েদের বিশাল একটা কলোনি। কাদা মেখে লাল হয়ে আছে তারা। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। সবাই মিলে যেন হাহাকার করছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেই হাহাকার, তারপর আওয়াজটা বদলে যেতে শুরু করল–গর্জে উঠল তারা, আক্রোশে হুংকার ছাড়ল। বনভূমি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা জলোচ্ছ্বাসের মত।

হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা কি দেখতে পাচ্ছে। লেবার ক্যাম্পের গেটগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। গার্ডদের কাবু করা হয়েছে, কাদা থেকে উঠে এসেছে উহালি ক্রীতদাসরা। কবর থেকে উঠে আসা লাশ যেন ওরা, উলঙ্গ শরীরে লাল কাদা লেপ্টে আছে। কতদিন খেতে পায়নি, কংকাল বললেই হয়।

পড়িমরি করে, হুড়মুড় করে সামনে বাড়ল তারা, হাজারে হাজারে। কে মেয়ে কে পুরুষ চেনার উপায় নেই, কাদায় ঢাকা পড়ে গেছে তাদের বৈশিষ্ট্য। শুধু শিশুদের চেনা গেল। 'শেখ ফাহিম!' আওয়াজ তুলল তারা, যেন পাথুরে তীরে লেগে বিস্ফারিত হলো সমুদ্রের একটা ঢেউ।

হিটা প্যারাট্রুপাররা গুলি করছে এখনও, গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল তাদের হুংকার আর গর্জনে। উন্মত্ত ক্রীতদাসরা গায়ে গা ঠেকিয়ে এগোচ্ছে, একে

ফরটিসেভেনের বুলেট তাদের মধ্যে এতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। যেখানে একজন লোক ধরাশায়ী হলো, পলকের মধ্যে সে-জায়গা দখল করল পাঁচজন লোক। মোমু দুর্গে হিটা গার্ডদের অ্যামুনিশনে টান পড়ল। এত দূর থেকেও তাদের আতংক অনুভব করতে পারল রানা। কয়েকজন হিটাকে হাতের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখল ও।

এখন তারা নিরস্ত্র, ইস্পাতের মই বেয়ে হলুদ দৈত্যটার ওপরের প্লাটফর্মে উঠে যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছে রেইলিং-এর সামনে দাঁড়াল তারা, দেখল নগ্ন ও লাল ভিড়টা মোমুর গোড়ায় থামল, তারপর উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। একটা মইও খালি থাকল না, প্রতিটিতে কিলবিল করছে ওরা।

আপার ডেকে হিটাদের সঙ্গে সিমন সাফারি রয়েছেন, তাকে চিনতে পারল রানা। সদ্য মুক্ত উহালি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন তিনি। উদার ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন তাদেরকে। সম্ভবত যুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি। সবশেষে, শ্রমিকদের প্রথম সারিটা যখন রেইলিং-এর কাছে পৌঁছে গেল, পিস্তল বের করে ওদের দিকে গুলি করলেন। নিজেদের শরীর দিয়ে তারা তাকে ঢেকে ফেলল, তখনও তিনি গুলি করছেন।

নগ্ন মানবসন্তানদের ভিড়ে মুহূর্তের জন্যে সিমন সাফারিকে হারিয়ে ফেলল রানা। পোকার মতই কিলবিল করছে তারা হিটা সামরিক প্রশাসকের ওপর। তারপর আবার সিমন সাফারিকে দেখতে পেল ও। কয়েকশো হাত মাথার ওপর তুলে নিল তাঁকে। আরও কয়েকশো টেনে নিল তাঁকে। রেইলিং-এর দিকে নিয়ে আসছে।

তারপর তারা তাঁকে মোমুর ওপর থেকে ফেলে দিল নিচে।

শূন্যে ডিগবাজি খেলেন সিমন সাফারি। ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, যেন ডানা ভাঙা একটা পাখি ওড়ার চেষ্টা করছে। সত্তর ফুট নিচে পড়লেন তিনি, একস্কেইভেটর হেড-এর ঘুরন্ত রূপালি ব্লেডের ওপর। ব্লেডগুলো স্যাৎ করে টেনে নিল তাঁকে, এবং মাত্র এক পলকের ভেতর চিবিয়ে এমন নিখুঁত ও মোলায়েম মণ্ড বানিয়ে ফেলল যে তাঁর রক্ত ভিজে মাটিতে সামান্য একটু দাগও ফেলল না।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা।

মোমুর ওপর হিটা প্যারাট্রুপারদের খুন করছে উহালি শ্রমিকরা, খালি হাতে একটা করে ধরছে, তারপর আক্ষরিক অর্থেই ছিঁড়ে ও ফেড়ে ফেলছে। তাদের হুঙ্কার ও উল্লাসধ্বনি পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। ওদিকে এগোল ও, তারপর কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, ওর বরং মনিকার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। মোমুতে ওরা যা করছে করুক, বাধা দিয়ে লাভ হবে না।

ঘুরল রানা, ফিরে যাচ্ছে মনিকার কাছে।

এগারো

ফিরে আসতে সময় লাগছে রানার। কমান্ডোর সদস্যরা ঘিরে ধরেছে ওকে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার আগে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে। ওর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে তারা, গান গাইছে, বিজয়ের আনন্দে হাসছে।

জঙ্গলের ভেতর থেকে এখনও দু'একটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। আগুন ধরে গেছে প্রশাসনিক ভবনে। আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে আগুনের শিখা, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে কালো ধোঁয়া। একটা ছাদ ধসে পড়ল। ওখানে আটকা পড়েছে লোকজন, পুড়ে মারা যাচ্ছে। উহলি শ্রমিকরা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে–হিটা গার্ডদের ধাওয়া করছে তারা, ধাওয়া করছে কেরানি, অফিসার, এঞ্জিনিয়ারদেরও। কালো হোক আর হলদেটে তাইওয়ানিজ, কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত একটা লোককেও রেহাই দিচ্ছে না। ধরতে পারলেই হয়, কিল-ঘুসি-লাথি মেরে শুইয়ে ফেলছে মাটিতে। তারপর শাবল, কোদাল বা ম্যাচেটি দিয়ে আঘাত করছে, টুকরো টুকরো করছে শরীরগুলোকে। সবশেষে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আগুনে। বীভৎস একটা দৃশ্য। এরই নাম আফ্রিকা।

ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। ওর একার পক্ষে ওদেরকে থামানো সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন অত্যাচারিত হয়েছে ওরা, ওদের ঘৃণা ও আক্রোশ সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জঙ্গলে ঢুকে পড়ল রানা, মনিকার কাছে যাচ্ছে।

একশো গজও এগোয়নি, দেখল গাছপালার ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটা মূর্তি ছুটে আসছে ওর দিকে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'লোদজি হাবিব!' ডাকল ও।

ছুটে এসে রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরল বুড়ো পিগমি। 'আপামণি!' হাঁপাচ্ছে সে, গলার আওয়াজ কর্কশ। রানা দেখল, লোদজি হাবিবের খুলির চামড়া উঠে গেছে, রক্ত ঝরছে কানের পাশ ঘেঁষে।

'কোথায় মনিকা? কি হয়েছে ওর?' লোদজি হাবিবকে ধরে ঝাঁকাল রানা। 'বলো।'

'আপামণি...আপামণি নেই! আপামণিকে ধরে নিয়ে গেছে সে। জঙ্গলে...।'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মনিকা, নব ঘুরিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে গোনডালার সঙ্গে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে পড়ল সে, তারপর ভাবল দেখা যাক রেডিও উবোমো ধরা যায় কিনা। রাজধানী কাহালি পর্যন্ত রেঞ্জ নয় ট্রান্সমিটারটার, তবে লোদজি হাবিব সিল্ক-কটন ট্রির মগডালে পৌঁছে দিয়েছে এরিয়ালের তার। পঁচিশ মিটার ব্যাণ্ডে রেডিও উবোমো ধরা গেল, যান্ত্রিক শব্দটা তেমন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না।

'পরবর্তী অনুরোধ করা হয়েছে মরিয়ম বুবকি তোমার নামে। অনুরোধ করেছে তোমার বয়ফ্রেণ্ড রহিম বাদশা। আজ তোমার সতেরো বছর পুরো হলো। তোমার এই শুভ জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছে রহিম বাদশা। বলেছে, সে তোমাকে অন্তর থেকে ভালবাসে। তার অনুরোধ ম্যাডোনার এই গানটা, লাইক আ ভার্জিন। শোনো তাহলে, মরিয়ম বুবকি...।'

গানটা শুরু হতে আওয়াজ কমিয়ে দিল মনিকা, সঙ্গে সঙ্গে আবার তার কানে ফিরে এল গোলাগুলির আওয়াজ ও মানুষজনের চিৎকার।

ওদিকে মরণপণ যুদ্ধ হচ্ছে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অসুস্থবোধ করল মনিকা। রানা তাকে এই জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে গেছে। যুদ্ধটা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে জানার কোন উপায় নেই তার। নিজেকে অসহায় লাগছে, ভয়ও লাগছে। কিছু একটা ঘটবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না।

হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল গানটা। কিছুক্ষণ যান্ত্রিক শব্দজট শোনা গেল শুধু। তারপর অকস্মাৎ নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'উবোমোর জনগণ। এই রেডিও স্টেশন এখন ফ্রিডম আর্মি অব উবোমোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উবোমোর মহামান্য প্রেসিডেন্টকে এখন আপনাদের সামনে হাজির করছি আমরা। ড. শেখ ফাহিম ফয়সল স্বয়ং এখন কাহালি রেডিও স্টেশন থেকে আপনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।'

এরপর শুরু হলো জাতীয় সঙ্গীত। ক্ষমতা দখলের পর এই জাতীয় সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সিমন সাফারি।

জাতীয় সঙ্গীত শেষ হলো। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি।

অবশেষে মনিকার প্রিয় ও রোমাঞ্চকর একটা ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'প্রিয় দেশবাসী, আসসালামোআলায়কুম। আমি শেখ ফাহিম ফয়সল বলছি। অত্যাচারী আপনাদের ওপর যে জুলুম চালিয়েছে সে-ব্যাপারে আমি সচেতন ও ব্যথিত। আমি জানি, আপনারা প্রায় সবাই জানেন যে আমি মারা গেছি। কিন্তু না, আমার এই কণ্ঠস্বর কবর থেকে আসছে না। আমি ড. শেখ ফাহিম ফয়সল, স্বয়ং কথা বলছি আপনাদের সামনে।' ভাষণ দিচ্ছেন তিনি সোয়াহিলি ভাষায়। 'আমি আপনাদের জন্যে বিজয়ের আনন্দ ও আশার বাণী নিয়ে এসেছি। সিমন সাফারি, অত্যাচারী স্বৈরশাসক, মারা গেছেন। দেশপ্রেমিক ও বিশ্বস্ত একদল সচেতন নাগরিক নিষ্ঠুর অত্যাচারীকে উৎখাত করেছেন, তাঁকে দিয়েছেন উচিত ও প্রাপ্য শাস্তি। আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসুন, প্রিয় দেশবাসী–আমার এই উদাত্ত আহ্বান সর্বস্তরের উবোমোবাসীর জন্যে। আপনারা জাগুন, কারণ উবোমোর আকাশে নতুন সূর্য উঠেছে...।'

ড. ফয়সলের কণ্ঠস্বরে এত আন্তরিকতা, মনিকার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল সিমন সাফারি সত্যি মারা গেছেন। তারপর আবার গুলির শব্দ ঢুকল তার কানে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে।

তার কাছাকাছি একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন শব্দ না করে তার ঠিক পিছনে চলে এসেছে লোকটা। দেখে বোঝা যায় এশিয়ান, সম্ভবত চীনা। নীল

সাফারি পরে রয়েছে, বৃষ্টি আর ঘামে ভিজে গেছে সেটা, এখানে-সেখানে কাদার দাগ লেগে রয়েছে। তাঁর লম্বা কালো চুল ঝুলে আছে কপাল থেকে। মুখে একটা অগভীর কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে, ওটা থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছে জ্যাকেটের সামনে।

তার এক হাতে একটা পিস্তল, চোখে হিংস্র ও উদভ্রান্ত দৃষ্টি। মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে আছে রাগ ও আতংকে। পিস্তল ধরা হাতটা ঝাঁকি খাচ্ছে আর কাঁপছে।

আগে কখনও না দেখলেও লোকটাকে চিনতে পারল মনিকা। লোকটার কথা রানাকে অনেকবার বলতে শুনেছে সে। দৈনিক উবোমো হেরাল্ড-এ তার ছবিও দেখেছে, পত্রিকাটা মাঝে মধ্যে গোনডালায় পৌঁছায়। মনিকা জানে, লোকটা ইউডি সি-র তাইওয়ানিজ ম্যানেজিং-ডিরেক্টর। এই লোকই রানার বন্ধু আলি শাহকে খুন করেছে, খুন করেছে তার গোটা পরিবারকে।

'গণ্ড,' বিড়বিড় করল মনিকা, ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পিছু হটার চেষ্টা করল। কিন্তু এক লাফে এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে ফেললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

ভদ্রলোকের হাতে অসম্ভব শক্তি, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মনিকা। মনিকার হাতটা মুচড়ে ধরলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, বাঁকা করে তার পিঠের দিকে নিয়ে এলেন।

'সাদা মেয়ে,' হিসহিস করে বললেন তিনি। 'জিম্মি হিসেবে ভাল…।'

আশপাশেই ছিল লোদজি হাবিব, মনিকার সাহায্যে ছুটে এল। হাতের পিস্তলটা সবেগে ঘোরালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, খুলিতে লেগে কেটে দিল বুড়োর চামড়া। তাঁর পায়ের সামনে পড়ে গেল লোদজি হাবিব। এক হাতে মনিকাকে ধরে রেখে অপর হাতের পিস্তলটা তার খুলির দিকে তাক করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড।

'না!' আঁতকে উঠল মনিকা, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বুকে। ব্যর্থ হলো লক্ষ্য, লোদজি হাবিবের মুখ থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে মাটিতে গাঁথল বুলেট। গুলির শব্দে জ্ঞান ফিরল বুড়োর, একটা গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেল সে, লাফ দিয়ে ছুটল। তাকে লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তবে লাগল না, জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল বুড়ো।

মনিকার হাতটা সজোরে মোচড়ালেন তিনি, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। 'ছাড়ুন, ব্যথা লাগছে!'

'শুধু ব্যথা দেব না, ফের যদি ধস্তাধস্তি করো একেবারে মেরে ফেলব,' হুমকি দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'হ্যাঁ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে! আর যদি ব্যথা পেতে না চাও, শান্তভাবে হাঁটো।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল মনিকা, চেষ্টা করল ব্যথা ভুলে শান্ত থাকার। 'জঙ্গলে ঢুকে কোন লাভ নেই। এই জঙ্গলে পালাবার কোন পথ নেই।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আছে,' বললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'আর কোন কথা নয়। একদম চুপ! হাঁটতে থাকো।'

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, বাধা দেয়ার সাহস পাচ্ছে না মনিকা। সে বুঝতে পারছে, একেবারে মরিয়া হয়ে আছেন ভদ্রলোক, তাঁর দ্বারা যে-কোন কাজ সম্ভব। একটু আগেই দেখেছে, খুন করার জন্যে গুলি করেছেন লোদজি হাবিবকে।

তাঁর সম্পর্কে রানা কি বলেছে, মনে পড়ে গেল। জিম্বাবুইয়ে ম্যাটাবেল আলী শাহ আর তার পরিবারকে খুন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে গুজব আছে, বাচ্চা ছেলে ও ছোট মেয়েদের ওপর বিকৃত যৌনলালসা চরিতার্থ করেন। মনিকা বুঝতে পারল, আপাতত বেঁচে থাকার একটাই সুযোগ আছে তার, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে তাকে।

আধ মাইল হাঁটল ওরা। হাঁটার গতি মন্থর, ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে, টানতে হচ্ছে মনিকাকে। সরু একটা জলস্রোতের কিনারায় পৌঁছুল ওরা। দেখেই নদীটাকে চিনতে পারল মনিকা। ওয়েঙ্গু, এই নদীর নামেই এলাকার নাম রাখা হয়েছে। মূল উবোমো নদীর একটা শাখা ওয়েঙ্গু।

ওয়েঙ্গুর পানিও লাল, মোমু ভেহিকেলের বর্জ্য দূষিত ও ভরাট করে ফেলেছে। একটা গন্ধ পেল মনিকা, পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল তার। পানি খুব কম, থকথক করছে লাল কাদা। এমনকি চণ্ডমণ্ড গণ্ডও বুঝতে পারলেন, নদীটা বিপজ্জনক। পার হতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।

জোর করে মনিকাকে মাটিতে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করলেন তিনি, তার পিঠে একটা পা দিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। হাঁপাচ্ছেন, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

'প্লীজ…,' ফিসফিস করল মনিকা।

'চোপ!' গর্জে উঠল চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'তোমাকে না আমি কথা বলতে নিষেধ করেছি!' পিঠে তুলে আনা হাতটা আরও খানিক মুচড়ে ধরলেন তিনি, ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল মনিকা।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন, 'এটা কি ওয়েঙ্গু নদী? কোন দিকে গেছে এটা? দক্ষিণে, মেইন রোডের দিকে গেছে কি?'

তাঁর চিন্তাধারা আন্দাজ করতে পারল মনিকা। গোটা এলাকা সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকার কথা তাঁর। এটা তো তাঁরই কনসেশন। নিশ্চয়ই এলাকার ম্যাপটাও তাঁর দেখা আছে। জানেন, ওয়েঙ্গু ধনুকের মত বাঁকা হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, চলে গেছে মেইন রোডের দিকে। আরও জানেন, ব্রিজে একটা হিটা মিলিটারি পোস্ট আছে।

'এটা কি ওয়েঙ্গু?' আবার প্রশ্ন করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, মনিকার হাতটা মোচড়াতে শুরু করলেন।

ব্যথায় কেঁদে ফেলল মনিকা। তবু সত্যি কথা বলল না। 'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল সে। 'এই জঙ্গল সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি!'

'মিথ্যে বলছ,' অভিযোগ করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তবে অভিযোগটা তেমন জোরাল নয়। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'তুমি কে? এখানে কি করছিলে?'

'সামান্য একজন নার্স, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে আছি। জঙ্গল সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

'ঠিক আছে,' টান দিয়ে মনিকাকে দাঁড় করালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'চলো।'

মনিকাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে রাখলেন তিনি। এবার ওরা ওয়েঙ্গুর কিনারা ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে।

হাঁটার সময় ইচ্ছে করে মাটিতে পা ঘষছে মনিকা, দাগ রেখে যাচ্ছে।

লোদজি হাবিব তার খোঁজে ফিরে আসবে, জানে সে। ওদেরকে অনুসরণ করার কাজটা সহজ করে দিচ্ছে সে। জানে, লোদজি হাবিবের সঙ্গে রানাও আসবে।

ঝোপের ভেতর বাঁ পাশ দিয়ে যাবার সময় সরু ডালগুলো সুযোগ পেলেই ভাঙল মনিকা। শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে ফেলে দিল ঝোপের পাশে, দেখেই চিনতে পারবে লোদজি হাবিব। যখনই সুযোগ এল, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মনিকা। যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দিচ্ছে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে, কমিয়ে রাখছে দূরত্ব।

তারপর কান্না জুড়ে দিল মনিকা। ফোঁপাতে শুরু করল। রেগে গিয়ে তার দিকে পিস্তল তুললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। চিৎকার শুরু করল মনিকা, 'না, প্লীজ! প্লীজ, আমাকে মারবেন না!'

মনিকা জানে, তার চিৎকার অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। লোদজি হাবিবের কান খুব খাড়া, তার গলা ঠিকই চিনতে পারবে সে। আওয়াজ শুনেই ধরতে পারবে ঠিক কোথায় আছে সে।

শুকনো পাতার ওপর থেকে বোতামটা তুলে রানাকে দেখাল লোদজি হাবিব। 'দেখুন, বাপজান, আপামণি আমাদের জন্যে চিহ্ন রেখে গেছেন। এটা আপামণির শার্টের বোতাম, আমি চিনি। আমার আপামণি শেয়ালের মত চালাক আর বুনো মোষের মত সাহসী।'

'হাঁটতে থাকো,' ধমক দিল রানা। 'পরে ভাষণ দেয়ার অনেক সময় পাবে।'

ছাপ ধরে নিঃশব্দে এগোল ওরা। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক হয়ে আছে। কথা না বলে আঙুল খাড়া করে মনিকার রেখে যাওয়া চিহ্নগুলো রানাকে দেখাচ্ছে লোদজি হাবিব—ঝোপের ভাঙা ডাল, মাটিতে পায়ের আঁচড়, এক জায়গায় হাতের ছাপ দেখা গেল, ওখানটায় ইচ্ছে করে আছাড় খেয়েছিল সে।

'আর বেশি দূরে নয়,' হঠাৎ ফিসফিস করল লোদজি হাবিব, রানার বাহু আঁকড়ে ধরল। 'খুব কাছে…।'

'সাবধান, হুট করে তার সামনে গিয়ে পড়ো না। হয়তো ওত পেতে কোথাও বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়…।'

ওদের সামনে থেকে মনিকার আর্তচিৎকার ভেসে এল, 'না, প্লীজ! প্লীজ, আমাকে মারবেন না।'

মুহূর্তের জন্যে নিজের ওপর রানার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। ছুটল ও, মনিকাকে উদ্ধার করতে হবে। খপ করে ওর কব্জি ধরে ঝুলে পড়ল খুদে পিগমি।

'না! না!' ব্যাকুল কণ্ঠে ফিসফিস করল সে। 'আপামণি আহত হয়নি! আপামণি আমাদেরকে সাবধান করছে। বিদেশী বোকাদের মত তাড়াহুড়ো করবেন না। মাথাটা খাটান, বাপজান।'

নিজেকে সামলে নিল রানা, তবে রাগে কাঁপছে ও।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোদজি হাবিব, চোখে প্রত্যাশা।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'চণ্ডমণ্ড গণ্ড তোমাকে দেখেছেন, তবে জানেন না

যে আমিও এখানে আছি। ঘুরপথে ওদেরকে ছাড়িয়ে সামনে চলে যাচ্ছি আমি, অপেক্ষা করব ভাটির দিকে। তুমি ওদেরকে খেদিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবে। ঠিক যেমন হরিণগুলোকে খেদিয়ে জালের কাছে নিয়ে যাও। কি, পারবে তো, লোদজি হাবিব?'

'পারব না মানে! বাপজান তোতাপাখির ডাক ছাড়বেন, তাহলেই আমি বুঝে নেব আপনি তৈরি হয়ে আছেন।'

একে ফরটিসেভেনের মাজল থেকে ভাঁজ করা বেয়োনেটটা খুলে নিল রানা। রাইফেলটা ঝুলিয়ে রাখল একটা গাছের ডালে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড মনিকাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন, রাইফেল এখন কোন কাজে আসবে না। ফেলে যাওয়াই ভাল।

হাতে শুধু বেয়োনেট, নদীর কাছ থেকে সরে ঘুরপথ ধরে দ্রুত এগোল রানা। আরও দু'বার মনিকার চিৎকার শুনল ও, করুণ সুরে আবেদন জানাচ্ছে। তার গলাই ওকে জানিয়ে দিল ঠিক কোথায় রয়েছে ওরা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মনিকা ও চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সামনে চলে এল রানা। নদীর কিনারা থেকে একটা গাছ উঠেছে, সেটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মুখের সামনে হাত তুলে ডাক ছাড়ল তোতাপাখির। বেয়োনেটটা বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করছে।

বনভূমির ভেতর লোদজি হাবিবের তীক্ষ্ণ-কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার গলায় ভেনট্রিলোকুইস্ট-এর সুর, শ্রোতা বুঝতে পারবে না আওয়াজটা কোত্থেকে বা কত দূর থেকে আসছে। 'ওহে, বিদেশী নাক চ্যাপ্টা। আমার আপামণিকে ছেড়ে দাও। গাছের মাথা থেকে তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আপামণিকে ছেড়ে দাও, তা না হলে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ব আমি।'

সোয়াহিলি ভাষা চণ্ডমণ্ড গণ্ড বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ হলো রানার। তবে লোদজি হাবিবের উদ্দেশ্য ঠিকই পূরণ হবে। চণ্ডমণ্ড গণ্ডের খেয়াল ও মনোযোগ থাকবে উজানের দিকে, নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে ভাটি অর্থাৎ রানার দিকে এগিয়ে আসবেন তিনি।

গাছটার আড়ালে ওত পেতে থাকল ও। খানিক পর আবার শুনতে পেল লোদজি হাবিবের গলা। 'ওহে, বিদেশী, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?'

আবার নিস্তব্ধতা নামল। চোখ আর কান আরও সজাগ করল রানা।

তারপর খস খস আওয়াজ হলো একটা ডাল থেকে। আওয়াজটা এল ঠিক ওর সামনে থেকে। মনিকার গলা শুনতে পেল ও। 'প্লীজ, না…,' শুরু করল সে, কিন্তু চণ্ডমণ্ড গণ্ড তাকে থামিয়ে দিলেন।

ফিসফিস করে বললেন, 'চোপ! কথা বললে হাত ভেঙে দেব।'

খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। বেয়োনেটের হাতলটা আরও শক্ত করে ধরল রানা। এই সময় একটা ঝোপ নড়ে উঠল। এক মুহূর্ত পর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের নীল জ্যাকেটটা দেখা গেল।

পিছু হটছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, মনিকাকে ধরে আছেন বুকের ওপর, মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন যেদিক থেকে লোদজি হাবিবের গলা ভেসে আসছে। তার হাতে

ধরা পিস্তলটা মনিকার কাঁধের ওপর, লোদজি হাবিবকে দেখামাত্র গুলি করবেন। পিছু হটে সরাসরি রানার দিকে চলে আসছেন তিনি।

রানা জানে, মার্শাল আর্ট-এ অত্যন্ত দক্ষ চণ্ডমণ্ড গণ্ড। খালি হাতে লড়াই করতে হলে বিপদেই পড়বে ও। মার্শাল আর্ট-এ রানাও কম যায় না, তবে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সঙ্গে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। কে জিতবে বলা কঠিন। সহজ উপায় একটাই আছে। সহজ ও নিরাপদ। পিছন থেকে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের কিডনিতে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দেয়া। মুহূর্তের মধ্যে অচল হয়ে পড়বেন তিনি।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, বেয়োনেটটা নিচু করে ধরে আছে। স্যাঁৎ করে এগোল ও, আঘাত করল বেয়োনেট দিয়ে। কিভাবে তিনি সতর্ক হলেন, রানা বলতে পারবে না, কারণ ও কোন শব্দ করেনি। বলা হয় কুংফু ফাইটাররা প্রায় সুপারন্যাচারাল ইন্সটিংক্ট-এর অধিকারী হয়, এ বোধহয় তাই হবে।

বেয়োনেটটা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের পাশে লাগল, হিপ বোন-এর এক ইঞ্চি ওপরে। ফলাটা ঢুকে গেল হাতলের কিনারা পর্যন্ত, তবে চণ্ডমণ্ড গণ্ড ঘুরে যাওয়ায় রানার হাত থেকে ছুটে গেল ওটা।

মনিকাকে ছেড়ে দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, পিস্তলটা ঘুরিয়ে রানার দিকে আনলেন ওর মুখে গুলি করার জন্যে। খপ করে পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ওপর দিকে তুলে দিল রানা। প্রথম গুলিটা ওদের মাথার ওপর ডালপালায় লাগল।

রানার হাতে ধরা পড়ে মোচড় খেলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, একটা ভাঁজ করা হাঁটু তুলে আঘাত করতে চাইলেন ওর উরুসন্ধিতে। একটু বাঁকা হয়ে আঘাতটা উরুতে লাগতে দিল রানা, তবে এত জোরে লাগল যে গোটা পা যেন অবশ হয়ে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, কুড়ালের পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের বাম হাত, ছুটে আসছে ওর মাথার দিকে, আঘাত করবে ওর ঘাড় ও কানের নিচে। কাঁধ নিচু করল রানা, বাহুর ওপর দিকে গ্রহণ করল আঘাতটা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ও, ঘুরে উঠল মাথা। চণ্ডমণ্ড গণ্ডের পিস্তল ধরা হাতটা ওর মুঠোর ভেতর ঢিল হয়ে গেল।

বাম হাত দিয়ে আবার রানাকে আঘাত করলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, রানা বুঝতে পারল এবার ওর ঘাড় শুকনো ডালের মত ভেঙে যাবে।

পিঠে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ধাক্কা খেয়েও ছিটকে পড়েনি মনিকা। নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটে এল সে শত্রুর দিকে, তাঁর পাঁজরে ধাক্কা মারল কাঁধ দিয়ে, যেদিকটা চিরে ফাঁক করে দিয়েছে বেয়োনেট। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ধাক্কা খেলেন, রানার উন্মুক্ত ঘাড়ে আঘাতটা লাগল না।

রানার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে হাতের পিস্তলটা ছেড়ে দিলেন।

মরিয়া হয়ে খালি হাতটা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে আটকাল রানা, পিছন দিকে ধাক্কা দিল তাকে, মনিকার ধাক্কা খেয়ে যেদিকে তিনি পড়ে

যাচ্ছেন। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ভারসাম্য হারালেন, রানাকে নিয়ে পড়ে গেলেন তিনি। দু'জনেই ওরা নদীর খাড়া ঢালের ওপর পড়ল, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নদীতে–ছ'ফুট গভীর লাল কাদা-পানিতে।

নদীতে পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাদাপানির ওপর মাথা তুলল দু'জন। দু'জনেই বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে এখনও।

রানার একটা পা এখনও অবশ হয়ে রয়েছে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড হিংস্র ও ক্ষিপ্র। রানা উপলব্ধি করল, তাঁকে ধরে রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। মনিকা দেখল বিপদে পড়ে গেছে রানা, ঝুঁকে বেয়োনেটটা তুলে নিল সে।

বেয়োনেট তুলে মনিকা আর দেরি করল না, লাফ দিল নদীর ঢাল লক্ষ্য করে, পা দুটো রয়েছে সামনে। ঢালের ওপর নিতম্ব দিয়ে পড়ল সে। পিছলে ও হড়কে নেমে আসছে। হাতে বাগিয়ে ধরা বেয়োনেট।

রানার ওপর আসীন হলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, ওর মাথার পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ঘাড় ও গলা। মনিকার দিকে পিছন ফিরে আছেন তিনি, তাঁর সাফারি সুটের জ্যাকেট লাল কাদা লেগে চকচক করছে।

পিছন থেকে আঘাত করল মনিকা। আঘাত করল যতটা ওপর দিকে নাগাল পাওয়া সম্ভব। তার প্রথম আঘাতটা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের পাঁজরে লেগে হড়কে গেল। দুর্বোধ্য কাতর আওয়াজ বেরুল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলা থেকে, মোচড় খেল শরীরটা। বেয়োনেট তুলে আবার আঘাত করল মনিকা। এবার বেয়োনেটের ডগা কোন বাধা না পেয়ে দুই পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

রানার গলা ও ঘাড় ছেড়ে দিলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, কাদার ভেতর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরে মনিকার দিকে ফিরলেন। তার পিঠের ওপর দিকে এখনও গাঁথা রয়েছে বেয়োনেট, ব্লেডটা প্রায় অর্ধেক ঢুকে গেছে।

দু'হাত বাড়িয়ে মনিকাকে ধরতে চেষ্টা করলেন তিনি, তাঁর কাদা মাখা চেহারায় পাশবিক আক্রোশ আর ঘৃণা ফুটে উঠল। ভারসাম্য ফিরে পেল রানা, লাফ দিয়ে পড়ল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের পিঠে, দুই হাত দিয়ে টিপে ধরল গলাটা, সেই সঙ্গে চাপ বাড়িয়ে কাদার ভেতর ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল শত্রুকে। দু'জনের মাঝখানে পড়ে গেছে বেয়োনেটটা, ব্লেডের সবটুকু এবার সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। মুখভর্তি রক্ত বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ঠোঁট থেকে, ভেসে গেল তাঁর চিবুক গলা ও বুক।

চাপ আরও বাড়াল রানা, কাদার ভেতর ডুবিয়ে দিল শত্রুর মাথা। লাল কাদার নিচে ধস্তাধস্তি করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তাঁর একটা হাত উঠে এল কাদার ওপর। হাতটা রানার মুখ খুঁজছে, বাঁকা আঙুলগুলো নাগাল পেতে চাইছে ওর চোখ দুটোর। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে তাঁকে চেপে ধরে রাখল রানা, হাতটা পড়ে গেল। কাদার ভেতর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের নড়াচড়া নিস্তেজ হয়ে এল।

হামাগুড়ি দিয়ে নদীর কিনারায় উঠে শুয়ে পড়ল মনিকা, চোখে আতংক, তাকিয়ে আছে রানা ও কাদার দিকে।

হঠাৎ কাদার ওপর মোটা আকৃতির কয়েকটা বুদবুদ মাথাচাড়া দিল।

এতক্ষণে খালি হয়েছে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ফুসফুস। একা শুধু রানার মাথা কাদার ওপর রয়েছে। আরও অনেকক্ষণ ওখানে শুয়ে থাকল ও, মুহূর্তের জন্যেও ডুবে থাকা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলা থেকে হাত দুটো ঢিল করল না।

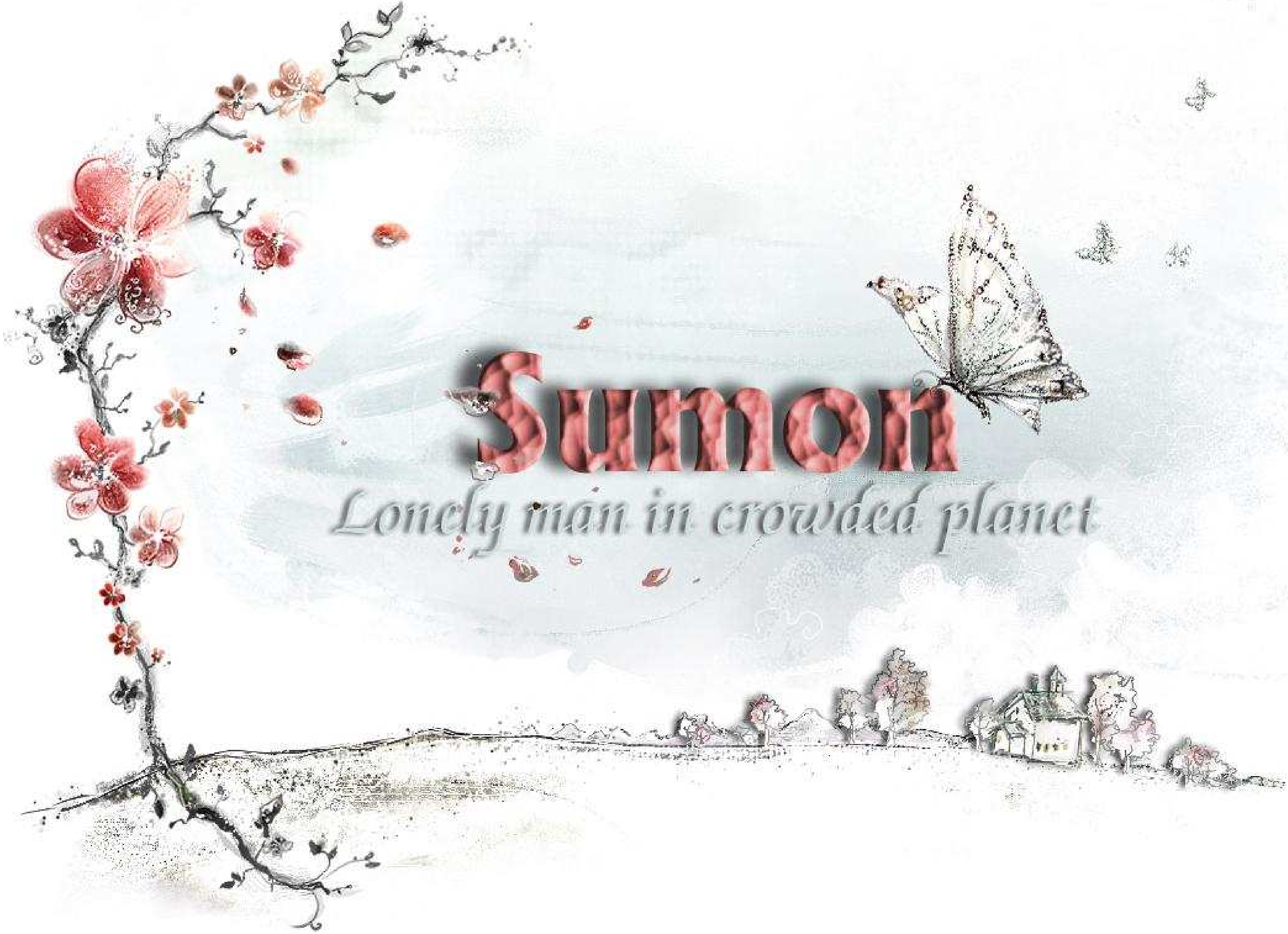
'মারা গেছে,' অবশেষে ফিসফিস করল মনিকা। 'এতক্ষণ বেঁচে থাকার কথা নয়।'

ধীরে ধীরে হাত দুটো আলগা করল রানা। কাদার তলায় কোন নড়াচড়া নেই। হামাগুড়ি দিয়ে নদীর কিনারায় উঠল ও। মনিকার পাশে শুয়ে পড়ল। ওকে জড়িয়ে ধরল মনিকা।

ধীরে ধীরে কাদার ওপর মাথাচাড়া দিল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের লাশ। কাদা মাখা শরীরটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা একটা মানুষের লাশ। ওটার দিকে একবার তাকিয়ে রানার বুকে মুখ গুঁজল মনিকা।

বিড়বিড় করে রানা বলল, 'লোকটা নিজের পাপের মধ্যে ডুবে মরল।'

-ঃ শেষ ঃ-


Sumon
Lonely man in crowded planet